বীরাঙ্গনা দাসী দিল্লি থেকে ফিরুক বা কলকাতা থেকে দিল্লি যাক, বসিরহাট থেকে কলকাতা আসুক বা কলকাতা থেকে ৭৯ নম্বর বাসে চেপে বসিরহাট ফিরুক, তার মনে কপোতাক্ষই বহে যায় শুধু। সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে। সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।

বীরাঙ্গনা দাসী জানে বিরলে না গেলে কপোতাক্ষ জাগে না। ঘুমিয়ে থাকে সেই আশ্চর্য নদ। বীরাঙ্গনা দাসী কখনো তাকে ডাকে কপোতাক্ষী বলে, তখন সে হয়ে যায় তারই মতো সাদা থান সেমিজ, বগলে পুটুলি, মুখে হাসি, মাথায় কাপড়—সে হাঁটছে শুধু হাঁটছে। হাঁটছে, বাসে চাপছে, এই ডিগা ডিগা শুনতে শুনতে বসিরহাট থেকে কলকাতা, তারপর শিয়ালদা থেকে আপার ইনডিয়া এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে গোটা ভারত দেশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিল্লি। দিল্লি থেকে কলকাতা।

যত সময় ট্রেনে থাকে বাসে থাকে একা একা, সে কপোতাক্ষকে দেখতে পায় জানালার বাইরে। সে যেদিকে চলেছে তার বিপরীতে। দুই ধার তার শ্যামলে সবুজ। নৌকোয় রয়েছে নতুন বউ। কপোতাক্ষর এক ঘাট থেকে যাচ্ছে সে আর এক ঘাটে সংসার করতে। দু চোখ দিয়ে জল ঝরছে। ওই যে দেখা যায় পুব পাড়ে সাগরদাঁড়ি গ্রাম, নদীর তীরে রাজনারায়ণ দত্তর দালান কোঠা। ওই যে দেখা যায় তার বিদায় ঘাট—অশ্রুঘাট। কপোতাক্ষ চলেছে অবিরাম। স্টিমারের ভোঁ শোনা যাচ্ছে। কপোতাক্ষ চলেছে বাঁকা ভবানীপুর, রাঢ়ুলি, কাটপাড়া, খেঁরসা, মাগুরা, বুধাহাটা, ফিংড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে, ডাক দিয়ে দিয়ে—ও চরণ, ও মেজবউ, ও কার্তিকের মা, ও ননী, ও হাফিজুর, অভিরাম, হাবলু, টিয়া, খোকন, প্রভা, ফণী—নদী চলেছে। বীরাঙ্গনা দাসী ওপার থেকে এপারে এসেছে কপোতাক্ষকে সঙ্গে নিয়ে। যখন একা হয়, দ্বিপ্রহরে, গভীর রাত্রে, মনে পড়ে যায় সব।

সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।
—বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?

বীরাঙ্গনা দাসী শিয়ালদা নেমে হাঁটতেই শুরু করে। বেলগেছে যাবে। হেঁটেই চলে যাবে। শ্যামবাজার কোন দিকে? পাঁচ মাথার মোড়ে গিয়ে দিক একটু ভুল হয়ে যায়

বটে, তারপর কারমাইকেল হাসপাতাল পার হয়ে কাছিমের পিঠের মতো ব্রিজ ধরে ওপারে পৌঁছে বাঁ দিকে ঘুরলেই অভিরামের বাসা। এ জায়গাটা বড় খোলামেলা। কতবড় মাঠ, টালা পার্ক। ছিল পার্কে পুলিশ ক্যাম্প। তা সরে যাচ্ছে। বেলগেছের ভিতর দিয়ে পাইকপাড়া হয়ে দমদমায় চলে যাওয়া যায়। কতদিন গেছে বীরাঙ্গনা। দমদমায় ট্রেন ধরে বিরাটি, বারাসাত, বেলঘরে, নৈহাটি। পায়ে হেঁটে যতদূর যাওয়া যায়, বাকিটা ট্রেনে বাসে। নৌকো তো নেই। আছে মা গঙ্গা। তাকে দেখলে মা দুর্গার কথা মনে হয়। আর তার কপোতাক্ষী যেন সোনার কলসি নিয়ে মা লক্ষ্মী। ছোটছোট দুটি পা। পা দুটি নিয়ে এল বীরাঙ্গনাকে অভিরামের বাসায়।

বীরাঙ্গনা এসেছে, বীরাঙ্গনা।

কোন বীরাঙ্গনা? মধুকবির বীরাঙ্গনা। মধুকবি? হ্যাঁ, সাগরদাঁড়ির দত্তকুলোদ্ভব শ্রীমধুসূদন।

দাঁড়াও, পথিক বর, জন্ম যদি তব/বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে।

বীরাঙ্গনা ধীরে ধীরে কী সুন্দর শোনায়—যশোরে সাগরদাঁড়ি কবতক্ষ-তীরে/জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি/রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!

গিয়ে দেখে এস পার্ক স্ট্রিট সায়েব পাড়ার কবরখানার সামনে রয়েছে মধুকবির এ সমাধি লিপি। নিজের সমাধির কথা লিখে গেছে সাগরদাঁড়ির মধুকবি।

এই হল মাইকেল বৃত্তান্তের শুরু। মধুকবির কথা বর্ণন। বীরাঙ্গনাও কপোতাক্ষ তীর থেকে এই কলকাতায় এসেছে। এপারে এসেছ যেন কপোতাক্ষ পার হয়ে। তিনি হয়তো দিল্লি চললেন, যাওয়ার পথে জামাই-এর বন্ধু অভিরামের বাসাবাড়ি একবার ঘুরে যাওয়া। কিছু বলতে হবে জামাইকে? দিল্লি থেকে কী আনব খোকন?

খোকন বলে, যা ইচ্ছে এনো দিদমা।

বীরাঙ্গনা মাসি, বীরাঙ্গনা দিদমা, বীরাবুড়ি এদের কে? কেউ না বললেই হয়। কেউ না বললেই হবে? তিনিও ওপারের, এরাও ওপারের। তিনিও কপোতাক্ষ কুলের, এরাও তাই। তাঁর বাড়ি ছিল ফিংড়ি, এদের বাড়ি বুধাহাটা। ফিংড়ি আর বুধাহাটা কতটা আর! এই চাপল খেয়ায়, ভাসতে ভাসতে পৌঁছে গেল। ভাটায় কম সময়। জোয়ারে বেশি। ফিংড়ি-তে আবার এ বাসার কর্তা অভিরামের মামার বাড়ি। সেই সূত্রে বীরাঙ্গনা মাসি তার আপনজন। শীর্ণকায় বুড়ির মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। গায়ের রং শ্যামলা। শ্যামলাই তো হবে, মধুকবি কি শ্যামল বরণের ছিল না? বয়স সত্তর পার হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো শক্ত সমর্থ, একা একা হিল্লি দিল্লি বসিরহাট-কলকাতা করে বেড়াচ্ছে। বগলে একটা পুটুলি, পায়ে টায়ারের চটি, সেটি আবার পুরুষ লোকের ডিজাইন। বসিরহাটের চর্মকার বানিয়ে দিয়েছে।

অভিরামের বউ প্রভাময়ী জিজ্ঞেস করল, মাসি কোথা থেকে?

একগাল হাসে বীরাঙ্গনা, দিল্লি থেকে আলাম বউ।

দিল্লি! কবে গেলেন?

সেই অঘ্রান মাসে, কানাই তুলে দিয়ে গেছল, ট্রেনের নাম আপার ইনডিয়া।

বাবা ওই ট্রেন! ও নাকি পৌঁছে গিয়েও পৌঁছতে চায় না।

হ্যাঁ চলছি তো চলছি, মুলুক ঘুরে আসে, আমার কী মনে হয় বউ, রাতির বেলা লাহোর করাচি ও ঘুরে আসে, কাল বিকেলে আসার কথা গাড়ির, এল আজ সকালে।

কেন তুফান মেল পালেন না।

এই গাড়ি খারাপ না, ঝুঁটি বাঁধা এক পাঞ্জাবিরে সাগরদাঁড়ির কথা শুনালাম, মধুকবি মধুকবি বলতে লাগল সে।

প্রভাময়ী হাসে, পারেনও বটে।

বীরাঙ্গনা বলে, চিঠি দিয়েছিলাম, কানাই বোধহয় কাল বিকেলে এসে ফিরত গেছে, আচ্ছা ফিরত যাবি কেন, এ বাসায় এসে থাকতি পারতিস তো।

কানাই হল বীরাঙ্গনার পুত্র। বসিরহাট থাকে। কোর্টের মুহুরি। বীরাঙ্গনাও বসিরহাট থাকে বটে, কিন্তু কত সময় আর থাকে। ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এ নৌকোয় মাঝি নেই, ইচ্ছে মতো ভেসেই চলেছে।

প্রভাময়ীর দশ বছরের পুত্রটি বীরাঙ্গনার খুব ন্যাওটা। বুড়ি দিদিমা এল অনেকদিন বাদে। তাই আজ ইস্কুল যাওয়া বন্ধ। খোকনের মাথায় হাত বুলোচ্ছে বীরাঙ্গনা। কত চুল এ ছেলের মাথায়। অভিরামেরও এমন ছিল। ছোটবেলায় আসত মামাবাড়ি। তার তো বারো বছরে বিয়ে হয়েছিল। সাগরদাঁড়ি থেকে ফিংড়ি। ফিংড়ি থেকে সাগরদাঁড়ি করে করে এতটা বয়স হতে না হতে দেশটা দু'খণ্ড। কপোতাক্ষ ফেলে এপারে। মধুকবিকে ফেলে এপারে।

মধুকবি সত্যিই তোমার? খোকন বারবার একই বিস্ময় প্রকাশ করে।

হ্যাঁরে, হ্যাঁ, আমার কেন তোরও, যা না সাগরদাঁড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয় বীরাঙ্গনা দাসী তার কী হত?

শুনে প্রভাময়ী বলে, কে যাবে জিজ্ঞেস করতি, আপনি যে ও বংশের মানুষ তা কি আমরা জানি নে।

শুনে ফোকলা গালে হাসে বীরাঙ্গনা, বলে, শুনবা বউমা, আশার ছলনে ভুলি, কী ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে?

শোন খোকন, শুনে নে, বসো মাসি, এতটা পথ এলে?

বীরাঙ্গনা বলে, শ্যালদা থেকে হেঁটে আলাম, পথের লোক কত ভালো, জিজ্ঞেস করি আর দেখায়ে দেয়।

সে কি বাসে এলেন না কেন?

বাসে ওঠা, নামা বড় ঝক্কির বউমা, হ্যাঁ গো সব আছে কেমন, কদ্দিন এ বাসায় আসিনি।

আছে, সব ভালো আছে।

আমাদের সেই ফণী?

নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে।

ফণী আসে তো?

আসে মাসি, আসে, সময় পেলেই আসে।

বীরাঙ্গনা বলে, ওর তো কেউ নেই এপারে।

হয়ে যাবে, সব হয়ে যাবে মাসি।

সেই চরণ আর আসে না।

মাথা নাড়ল প্রভাময়ী, মুখে বলল, সময় পায় না।

হুঁ। কথাটায় সন্তুষ্ট হয় না বীরাঙ্গনা। বলল, আমি ওরে চিঠি করেছিলাম, পোস্টো কাডে সব লিখেছিলাম, জবাব দেয় নি।

চিঠি পায় নি হয়তো।

তা হতি পারে, কিন্তু তুমি যে পত্তর দিয়েছিলে বসিরহাটে, তা তো পেয়েছিলাম বউমা সেবার, বিজয়ার চিঠি।

বিজয়ার চিঠি পৌঁছয়।

তা হবে কেন, আমার চিঠিই কেউ পায় না কেন, বসিরহাট গেলি কানাই বলবে চিঠি পায় নি তাই শ্যালদা স্টেশনে যেতি পারে নি।

ডাকে খুব গোলমাল চলছে মাসি, কত লোক যে চিঠি পাচ্ছে না। প্রভাময়ী বোঝাতে চায় বীরাঙ্গনাকে।

বীরাঙ্গনা বলে, হুঁ, আমি একটা চিঠি পেলাম ঐপুর থেকে, আমাদের ফিংড়ির নরেন সেনের মেয়ের বিয়ে, নরেনের বাবা ছিল ওর বন্ধু, চিঠি পৌঁছল বিয়ের দশদিন বাদে।

প্রভা বলল, এই তো হচ্ছে মাসি।

বীরাঙ্গনা মাথা দোলায়, ডাক পিয়নরে আমার বলা আছে, সে আবার মাগরোর ছেলে, বলেছে কোনও ভুল হবে না।

তবে আর কী, তুমি খোকনের সঙ্গে কথা বলো, আমি ভাত চাপাই।

ভাত চাপে বড় হাঁড়িতে। তিন কামরার এই বাসাবাড়িতে লোক অনেক। তারা আসে যায়। সব ওপারের লোক। সাতক্ষীরের কাছের দশ গাঁয়ের মানুষের ভিতর এই একটা লোক, অভিরাম নিজের পাকা ঠিকানা করতে পেরেছে। খোকনের বাবা অভিরাম সরকারি চাকুরে, অপশন দিয়ে ইন্ডিয়ায় এসেছে। খোকনের একটা দাদা ছিল, একটা দিদি ছিল। তারা কেউ নেই। দাদার নাম সায়েব, দিদির নাম ডিলডিল। এখন খোকনের একটা দিদি আছে। .... । তার কথা পরে হবে।

খোকনের মা একদিন বলছিল, যারা জন্মে চলে যায়, তারা থাকতে আসে না, তারা গন্ধর্ব, অপ্সরা এইসব হয়। তারা খুব রূপবান হয়। তাই ছিল তার দাদা-দিদিরা। পার্টিশনের সময় রোগে মরেছে। না দাঙ্গায় নয়, পরপর কলেরায় আর খারাপ জ্বরে।

মা বলে তারা হয়তো আসতে চায় নি এপারে। খোকনের মনে ধরেছে গন্ধর্ব আর অপ্সরার কথা। মা সেই গন্ধর্ব আর অপ্সরার জন্য কাঁদে এখনও।

খোকন জিজ্ঞাসা করে, গন্ধর্বরা কোথায় থাকে দিদমা?

চমকে উঠেছে বীরাঙ্গনা দিদিমা। বলে উঠল, কেন রে?

এমনি।

দিদিমা বলল, আকাশে।

আকাশের কোথায়?

বীরা দিদিমা বলল, মেঘে, মেঘের ভিতর লুকিয়ে থাকে।

খোকন বলল, সে তো মেঘনাদ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেঘনাদই তো।

মেঘনাদ কি গন্ধর্ব?

না তো, রাবণ রাজার ছেলে।

খোকন বলে, আমি বলছি গন্ধর্ব।

ওরাও তো আকাশে থাকে রে সোনা, কেন?

খোকন চুপ করে থাকে। দিদিমা এসেছে তিনদিন রেলগাড়ি চেপে। কয়লার আস্তরণ মেখে। দিদিমা এবার স্নানে যাবে। গা চিড়বিড় করছে, রেলে শুধু ধোঁয়া, জানালা দিয়ে ধোঁয়া আসে শুধু।

খোকন জিজ্ঞেস করে, দিল্লি ভারতের রাজধানী।

হুঁ, কলকাতা থেকে দিল্লি গেল রাজধানী। বলতে বলতে দিদিমা ওঠে। স্নান সেরে পুজো করবে মনে মনে। সামনে ঠাকুর দেবতা না থাকলেও চলবে। শুধু গঙ্গাজল চাই। মনে মনে ঠাকুরকে দ্যাখে দিদিমা। কোন ঠাকুর। বুড়ি হাসে গাল ভরে, সেই যে আমার দাদু হবেন, হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন...। বলতে বলতে দিদিমা মাথায় ঘোমটা টানেন। বলেন, তিনিই আমার ভগবান রে, খোকন।

দুই

বেলা এগারোটায় ফ্ল্যাট ফাঁকা। শুধু মর্নিং স্কুল থেকে টিয়া আসবে। এই ফ্ল্যাটে লোক বাড়ে কমে, ওই যে চরণ বলে লোকটার কথা বলেছিল মাইকেল দিদিমা, সেও

তো এখানে এসে ন'মাস থেকে গেছে। তারপর হঠাৎ চলে গেল। ন'মাসে এক পয়সাও দেয় নি। না দিয়েছে না দিয়েছে, অন্নের দাম অভিরাম নেবে কেন? কিন্তু সে তো কথার কথা। কলকাতায় কি অভিরামের ধানের গোলা আছে? সে তো মাস মাইনের কর্মচারী মাত্র। এ কথাটা বীরাঙ্গনা মাসির, মাইকেল দিদিমার। এখন আছে টিয়া আর হাবলু। চরণ আর এদিকে মাড়ায় না। শোনা কথা, যাওয়ার সময় একশো টাকা ধার করে নিয়ে গেছে অভিরামের কাছ থেকে। ধার শোধের ভয়ে আর আসছে না হয়তো। আবার সবাই যে এমন তা তো নয়। এই হাবলুই তো ওপারে যায় আসে এখনও। ওপারে মা বাবা ভাই বোন। হাবলু ঘুরে এলি?

হ্যাঁ, মামা।

না বলে চলে গেলি।

আর হবে না মামা।

তোর মা বাবা জানে তুই আমার কাছে আছিস?

হাবলু মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে।

এরপর হয়তো, আর এ বাসায় আসবি নে।

হাবলু চুপ করে থাকলে অভিরামের মন নরম হয়, বলে, তুই তো দাঁড়াবি হাবলু, এটা নতুন দেশ, মা বাবাদের আনতে হবে ওপার থেকে।

আসবে না।

জেঠার বাড়ি যাস? প্রভাময়ী জিজ্ঞেস করে।

না।

পিসির বাড়ি?

না।

বোন, দিদি, ডলু, বুলি কেমন আছে জানবি নে।

আমার যেতি ভয় করে। হাবলু বিন বিন করে বলে।

ভয়টা কোথায় তা অভিরাম জানে। যদি জেঠি বা পিসে বলে আর রাখা যাবে না হাবলু, নিয়ে যা, তখন?

অভিরাম তখন বলে, মা বাবাকে আসতে বল, ওপারে থাকা যাবে না।

না, এপারে এসে কী করবে, ওপারে নাকি অসুবিধে হচ্ছে না।

হচ্ছে না সত্যি?

হাবলু বলে, ওদিকে রায়েটের লোক নেই মামা, কিন্তু বুন দিদিরে তো এপারে আনতি হল, আমার মনে হয় পার্টিশন থাকবে না।

কে বলল?

লোকে বলাবলি করে, কথাটা ঠিক, পার্টিশন না মানলেই হল।

হাবলুর এসব কথা খোকন শোনে। শুনে অবাক হয়। হাবলুকে যেন আঁকড়ে ধরেছে খোকন। হাবলু বলেছে খোকনকে গড়ের মাঠে নিয়ে যাবে। সে গড়ের মাঠে যায় মাঝে মধ্যে, র‍্যামপার্টে দাঁড়িয়ে মোহনবাগানের খেলা দেখে ট্রামে চেপে ফিরে আসে। না, হাবলু বলে, সে বাঙাল নয়। তার জেলা খুলনা তো ইন্ডিয়ায় ঢুকেই পড়েছিল। শেষে কিনা মুর্শিদাবাদ রেখে খুলনা দিয়ে দেওয়া হল। হাবলু বাঙাল নয়, তাই মোহনবাগান। কিন্তু এদিককার লোক বলে, হাবলু ঘটিও নয়। বর্ডার পেরনো জার্মান পার্টি কী করে ঘটি হয়?

হাবলু এসব খোকনকে বলে। খোকনই এসব শোনার লোক। হাবলু ঘুমোচ্ছিল। দিদিমার গলা শুনে উঠে বসেছে। দিদিমা জিজ্ঞেস করে, অবেলায় ঘুমোচ্ছিলি কেন হাবলু?

হাবলু বলে, আবার কবে তুমি দিল্লি যাবে?

এই তো আলাম।

এলে তো দেখতি পাচ্ছি দিদমা, আবার যাবে কবে?

দেখি কবে যাই, বর্ষার আগে না, ওখেনে খুব গরম, জলকষ্ট।

হাবলু বলে, জানি।

আমি শাবন মাস নাগাদ যেতে পারি।

হাবলু হতাশ হল, সে তো অনেক দেরি।

কেন কী আনতি হবে?

হাবলু মাথা নাড়ে, না আমি যাতাম।

কুথায় যাবি?

দিল্লি।

দিল্লির কুথায় যাবি?

হাবলু হেসে বলল, তুমি যেখেনে যাও, তুমার সঙ্গে যাব।

দিদিমা সস্নেহে হাবলুর পিঠে হাত রাখল, হ্যাঁ রে চিঠি লিখেছিস, চিঠি পেইছিস?

হাবলু মাথা নাড়ে, নাহ্, ঘুরি আলাম তো।

ঘুরে এলি, কবে?

হাবলু বলে, এই তো দু'মাস আগে পুন্নিমেয় বাড়ি ছিলাম, সত্যনারাণ দিল মা আমারে দেখে।

সত্যনারাণ, পুরুত আছে গাঁয়ে?

কেন থাকবে না।

গেলি, তা বলে গেলি নে?

কী করে বলব, তুমি তো এদিকি নেই, কবে গেলে দিল্লি?

দিদিমা বলে, খুব ঠাণ্ডা রে, আমি কাত্তিক মাসে গিছি, ওরে বাপ! এমন ঠাণ্ডা, মনে হল মরেই যাব।

ঠাণ্ডায় কেউ যায়?

কত বেলা পর্যন্ত কুয়াশা, রোদই ওঠে না।

হাবলু বলল, জানি শুনেছি।

দিদিমা শীতের কষ্টের কথা বলতে থাকে। বলতে বলতে এও বলে যে মেয়েজামাই তাকে লেপের ভিতরে ঢুকিয়ে শুধু ওম্ দিয়েছে। শাল কিনে দিয়েছে খাঁটি কাশ্মিরীদের কাছ থেকে।

হাবলু বলল, শাবন মাসে আমাকে নিয়ে যেও।

তুই তো এমনি যেতি পারিস।

হাবলু বলল, যাব কোথায়?

কেন রমলার বাড়ি যা, আমি পত্তর করে দিচ্ছি।

হাবলু চুপ করে থাকে। দিল্লি কত দূর। তিন দিন ট্রেনে। আর সেই ট্রেন যাবে গোটা ইন্ডিয়া ঘুরে। মোগলসরাই, পাটনা, গয়া, বারাণসী...আর যদি পার্টিশান না থাকত, লাহোর, করাচি, পেশোয়ার, ঢাকা, চট্টগ্রাম...।

হাবলু এসব জায়গার কোথাও যায় নি। এমন একটা ট্রেন যদি হত সব জায়গা ঘুরে ঘুরে... বরিশাল, ফরিদপুর, এলাহাবাদ, বোম্বাই, অমৃতসর...। পার্টিশান রদ যদি হত। হবেই। হাবলু ভাবে, এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবে সব বদলে গেছে। খারাপ মানুষগুলো ভাল হয়ে গেছে। মানুষ ভুলে গেছে ধর্মাধর্ম। সমস্ত সীমান্তের রেখা মুছে গেছে। দেখবে দেশভাগ বাতিল, হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ভুলে গেছে সবাই। মানুষ পেয়েছে পাখির স্বাধীনতা।

দিদিমা জিজ্ঞেস করল, কেমন দেখলি গাঁ?

আগের মতন।

লোকে কিছু বলল না?

বলল, আবার বলল না ও।

তোর মা বাবা থাকবে?

হাবলু বলল, আসতি ভয় পায়, কোথায় আসবে?

এত লোক যে এল।

বাবার সাহস নেই।

সাহস নেই তো আছে কী করে ওপারে?

হাবলু বলল, জানি নে, দিদমা দিল্লিতে নেহেরুর সঙ্গে কথা বলা যাবে?

বীরাঙ্গনা বুড়ি অবাক, সে তো প্রধানমন্ত্রী।

দিল্লি থেকে লাহোর কাছে? হাবলু জিজ্ঞেস করে।

সে তো পাকিস্তান।

পাকিস্তান অনেক দূর?

আমি জানিনে, তুই যে গেলি কেউ তোরে কিছু বলল না, ইন্ডিয়ায় থাকিস, পাকিস্তানে গিছিস, ছেড়ে দিল?

ইন্ডিয়ার কথা জিগাস করল। হাবলু বলল।

কী জিগাস করল?

ধানের দর কত?

বুড়ি হাসতে গিয়েও চুপ করে গেল। মুখ অন্ধকার হয়ে গেল বীরাঙ্গনা দাসীর। তখন হাবলু বলল, কেউ বলল, ধান কেমন হয়েছে?

তুই কী বললি?

আমি বললাম, ওদিকি যেমন এদিকিও তেমন।

আর, আর কী জিগাস করল?

গড়ের মাঠ দেখিছি কিনা।

আর, আর কী?

দোতলা বাস কত জোরে চলে?

বীরাঙ্গনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, বলল, আর কোনও কথা বলে নি?

বলেছে।

কী বলেছে?

নেতাজি ফেরবে কি না।

বীরাঙ্গনা দাসীর চোখ ছলছল করে উঠল, বলল, কে তাকে ফিরাবে। ‘গুনগুন করে উঠল বীরাঙ্গনা, ...কেমনে ফিরিব, —হায়রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে শূন্য লঙ্কাধামে আর।’ বীরাঙ্গনা দাসী বিমর্ষ গলায় বলল, দেশটা কেমন হল রে।

হাবলু বলল, বুঝা গেল না দিদমা।

কী দেখতি তিনি ফেরবে, কোথায় ফেরবে?

নেতাজির কথা বলছ দিদমা? খোকন এতক্ষণে একটা জিজ্ঞাসা বুঝি খুঁজে পায়। সে একবার হাবলু একবার দিদিমা বীরাঙ্গনার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইছিল সবটা।

বীরাঙ্গনা দাসী বলল, তোর মাথাটা ভালো, হ্যাঁরে হ্যাঁ, তিনি কোথায় ফেরবেন, এপারে না ওপারে, ইন্ডিয়া না পাকিস্তান, দুটোই তো শূন্য লঙ্কাপুরী হয়ে গেছে, মেঘনাধের মরণে রাবণ রাজার যা হয়েছিল তা।

হাবলু বলল, কিন্তু তবু নেতাজি ফেরবে।

বীরাঙ্গনা ফোকলা গালে হেসে বলল, কিন্তু তবু যদি ফেরে দেখিস কী হয়, হ্যাঁরে

তোর বাবা মা কেমন আছে?

ভালো বেশ ভালো। হাবলু বলল, বাবা জিজ্ঞেস করল এপারে চালের মন কত? ওপারে কত যাচ্ছে?

হাবলু বলল, পঞ্চাশ টাকা।

কী সব্বোনাশ, লোকে খাচ্ছে কী?

ময়রম যে, অজেত আলির বুন, সেই ময়রমের বাবা শুনে বলল এপারে যদি একুশ টাকা হয়, এপারে আসাই ভালো।

হুঁ। বীরাঙ্গনা থমথমে মুখে চুপ করে থাকে। শুনতে থাকে হাবলুর বিবরণ। ওপারে সব আক্রা হয়ে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে? তা হাবলু জানবে কী করে? দেশ তো একটা ম্যাপ। তার ভিতরে দাগ কেটে আলাদা করে দিতেই এপারে একুশ ওপারে পঞ্চাশ। কাপড়ের দামও বাড়ছে, এক টাকার গামছা তিন টাকা।

বীরাঙ্গনা বলল, এডা হবে জানা কথা, কারোর চোখের জল শুকোবে না।

তখন হাবলু বলল, আমার কাছে ময়রমের বাপ জিগাস করল, এপারে জমির দর কত, ধান জমি, বসত জমি, আমি বলে এয়েছি খবর দেব।

ভালোই ঘুরে এলি।

না ভালো না, ঝামেলাও হয়েছল।

কেন রে, কী হল?

পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলতি বলল।

তখন তুই কি বললি?

হাবলু চুপ করে থাকল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, আমি হিন্দুস্থান, পাকিস্তান মানিনে দিদিমা।

তিন

কেউ কি ধারণা করতে পারবে যে দিদিমা এ বাড়ির কেউ না? হাবলুও না। উপায় নেই বোঝার। সে উপায় রাখে নি খোকনের মা, বাবা, প্রভা, অভিরাম। অভিরামদের দেশের বাড়িতে কি এইসব হত না? কতজন বাড়ির লোক, কতজন বাইরের অনাত্মীয়, কে এসে খাওয়ার সময় বাগান থেকে কলাপাতা কেটে এনে বসে পড়বে, তার খোঁজ কেউ রাখত নাকি?

বেলগাছিয়ার এই বাসাবাড়ি ছোট বটে, কিন্তু লোক আসার থাকার যাওয়ার বিরাম নেই। এও যেন কলকাতা দিল্লির রেলপথে একটা স্টেশন। গাড়ি কিছু সময় দাঁড়িয়ে, ইঞ্জিনে জল নিয়ে, কয়লা নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করে। পার্টিশন বছর বারো। এখনও ওপার থেকে লোক আসার বিরাম নেই। যাতায়াতেরও বিরাম নেই। এপারে এসে তাদের ফ্ল্যাটেই উঠে পড়েছিল পশ্চিমপাড়ার সুধন্য মণ্ডল তার দুই মেয়ে আর বউ নিয়ে। তারপর গেল দমদমের দিকে ঘর জোগাড় করে। লোকটা টিকতেই পারল না। শেষে অভিরামের কাছে এসে বলল, দাদা, হবে না, আমি আবার ফিরে যাই।

সে কী?

এখেনে পচে মরতে পারব না। যে দোকানে কাজে ঢুকলাম, তারা কোনও মাসে দুশো দেয়, কোনও মাসে দেড়শো, এ মাসে তো দেয় নি।

কেন দেয় নি?

বিক্রিবাটা নেই, সব সময় বেচাকেনা হবে শাড়ি কাপড়, চোত মাসে কেউ কেনাকাটা করে?

অন্য কাজ দ্যাখো।

না, আমার যে বাসা, তা নরক অভিরামদা, জমি বেচে আসতি পারি নি, ভাগের চাষও ছেল, চলে যাব।

চলেই গেছে সুধন্য। তাতে নাকি গাঁয়ের মানুষ খুশি হয় নি কেউ কেউ। কিন্তু হয়েছে অনেকে। সুধন্য চিঠি লিখেছিল পূর্ব পাকিস্তানের পোস্টকার্ডে। তার ভিটে আগলে রেখেছিল ছোট ভাই। ভেবেছিল সব তার হবে। দাদা ফিরে যাওয়ায় খুবই হতাশ হয়েছিল। তার সঙ্গে ক'জন মোল্লাও জোট বেঁধেছিল জমি সস্তায় কিনবে বলে। কিন্তু শেষে সবাই সব মেনে নিয়েছে। লোকটা ফিরে এসেছে মানে গাঁয়ের মানুষের মান বেড়েছে। বলেছিল আলাউদ্দিন মোল্লা। স্থানীয় প্রাইমারি মাস্টার। অভিরামের ক্লাস মেট। সব লিখেছিল সুধন্য।

দিদিমা একা থাকবে ভেবেছিল। কিন্তু সব যদি চলে আসে একা কাকে নিয়ে থাকবে? মেয়ে জামাই দিল্লি। ছেলে নাতিপুতিরা সব বসিরহাট। সাগরদাঁড়িতে গিয়ে থাকবে, কিন্তু কোথায় থাকবে? তাকে চেনে কে? মামার বংশ সব বিনিময় করে ইন্ডিয়ায় চলে গেছে। ছেলে চলে এল আগে। মাকে নিতে পারে নি। অথচ সাতক্ষীরে আর বসিরহাটের দূরত্বই বা কতটুকু? তার চেয়ে দিল্লি অনেক দূর। সতেরো আঠেরোশো মাইল। সাতক্ষীরে আর বসিরহাটে পনেরো বিশ মাইল বড় জোর।

খোকন বলে, তুমি থেকে গেলে আমরা তোমরা কাছে যেতে পারতাম দিদমা, এলে কেন?

ঠিক দুপুরে বুড়ি ঘুমলো কতটুকু! তিনদিন ট্রেন জার্নি করে এল। তিনদিন না ঘুমিয়ে একটা হিন্দিওয়ালা ফ্যামিলির সঙ্গে বকবক করতে করতে এল, তবু কিনা এখেনে এসে স্নান করে ঘণ্টা দেড়েক ঘুমিয়ে জেগে আছে। ঘুম থেকে উঠে টিয়াকে ডাকল, ঘুমব কী করে খুকি, মনে হচ্ছে ট্রেনে যাচ্ছি, উপাসনা বলছে দাদি, বোলিয়ে, মাইকেল পোয়েট কা বাত বোলিয়ে।

টিয়া বছর পনেরো। ক্লাস এইট। শুধু বই পড়ে। উপন্যাস। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, অনুরূপা দেবী থেকে কত খ্যাত অখ্যাত লেখক লেখিকার বই যে নিয়ে আসে লাইব্রেরি থেকে। ইস্কুল থেকে ফিরে স্নান খাওয়ার পর ভিতরের ঘরে জানালার পাশে বসে পড়ছিল 'ঘরের আলো'। কী রোমান্টিক, কী দুঃখের বই। সিন্ধু হল নতুন বউ। সে এসে সংসার ভাঙতে লাগল। এই সময় দিদিমা তাকে ডাকল। টিয়া বইটার শেষে প্রায় পৌঁছেছে, সিন্ধুর অত গর্ব অত রূপের অহঙ্কার সব ধসে পড়ছে। স্বামী মারা গেছে ক'দিনের জ্বরে। টিয়া বই গুটিয়ে এল দিদিমার কাছে। আর পড়া যাচ্ছে না। শেষটা পরে দেখে নেবে।

দিদিমা বলল, তোর কতখানি চুল রে খুকি, তোর পিসি তোরে গন্ধ তেল পাঠিয়েছে যে ভুলেই গিছি।

ওম্মা তাই, কই দাও।

ব্যাগে আছে, ব্যাগটা আন দেখি।

ব্যাগ নিয়ে এল টিয়া। ব্যাগের চেন খুলতে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল। বেশ বড় ফাইল। দেখে টিয়া মুগ্ধ। নাকে নিয়ে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বলে, দিম্মা ভালো ছিলে?

ছিলাম, কিন্তু কোথাও যে বেশিদিন মনে বসে না রে।

তাই করলে হবে দিম্মা, এখন বয়স হচ্ছে।

দিদিমা বলে, দেখবি আমি পড়ব আর মরব।

ইস্! কী যে বল না। টিয়া জড়িয়ে ধরে দিদিমাকে, বলে, দিম্মা, আমাকে একবার নিয়ে যাবে দিল্লি?

তোর মাসি মেসো ছাড়বে?

তুমি বললে ছাড়বে।

আমি বুড়ি একা যাই, তাই বলে তুই বড় হচ্ছিস তোকে কি আমার সঙ্গে যেতে দেবে, বেটা ছেলে সঙ্গে না থাকলে হয়।

তাহলে আমার যাওয়া হবে না।

তখন মনে পড়ল দিদিমার, বলল, হ্যাঁরে হবে হবে, হাবলু যাবে সঙ্গে শাবন মাসে, তখন।

টিয়া বলল, না শাবন মাসে 'হাফেয়ালি' পরীক্ষা, তো হাবলুবাবু কেন যাবেন?

যাবে কাজ কম্মোর খোঁজে।

দেশে গিয়েছিল।

হুঁ, বলল তো?

টিয়া বলল, উনি কি বি এ পাশ?

তা আমি জানি নে।

টিয়া বলল, আমি শুধু তোমার সঙ্গে যাব, ছেলেটা কী অদ্ভুত সব কথা বলে দিদমা, মাথায় গোলমাল আছে।

বীরাঙ্গনা বুড়ি হাসে, ধুস! তা হয় নাকি?

টিয়া আবার বলে, হ্যাঁ, অনেক সময় কথা বোঝা যায় না দিদমা। ওই হাবলুবাবু করে কী, এপারে এসে পড়ে পড়ে ঘুমোয়, না হয় রাস্তায় টো টো। কোথায় টিউশনি ধরেছিল, ভালো লাগে নি, সেখানেও আগডুম বাগডুম কথা বলে, ইচ্ছেমতো যায়, ছাড়িয়ে দিয়েছে, মাঝে একবার দেশে গেল, আচ্ছা এপারে যদি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে আর পাকিস্তান মানি না বলে বেড়াবে তো ওপার থেকে এল কেন?

বুড়ি বলল, সে তো আমিও জানি নে।

তা বললে হবে, যাকগে, তুমি রেডিও শুনবা?

হাবলুটা বেরোল কোথায়, চিঠি লিখতি হবে।

চিঠি আমি লিখে দেব, ও ঘরে চলো।

চলল বুড়ি। কোমরটা একটু বাঁকতে শুরু করেছে, কিন্তু সে তো নিজে সিধে থাকতে চায়। সিধে না থাকলে হিল্লি দিল্লি করা যাবে? ছেলের সংসারে অভাব। তার ছেলেপুলেও অনেক। না থাকলে সে ভালোই থাকে মনে হয়। তাই বছরের অনেকটা সময় দিল্লিতে চলে যায় মেয়ের কাছে, অভিরামের বাসায় এসে ওঠে। আরও ওঠার জায়গা আছে। তার কাছে সাগরদাঁড়ির কথা শুনতে চায় সবাই। তারা ওপার থেকে এসেছে। ওপারের কীর্তিগাথা শুনে মনে মনে উদ্দীপ্ত হয় বুঝি?

এ ঘরে এসে বীরাঙ্গনা টিয়াকে বলে, রেডিও শুনতি হবে না, বরং আমি তোর কাছে তোর মা বাপের কথা শুনি।

কী শোনবা, কী বলব?

তোর ওখানে কপোতাক্ষ ছিল।

না গাঙই ছিল না।

তাই কি হয়?

কেন হবে না, এই যে বাঁকুড়ায় মেসোর ভাই থাকে, ওখেনে গাঙে জলই থাকে না, নদীরে গাঙই বলে তো।

হুঁ! কতদিন অভিরামের মা বাপরে দেখি নি, ওদের ভালো লাগে ওখেনে থাকতি, মেসোর ভাই এসছিল এর ভিতরে?

মেসোর ভাই মানে অভিরামের ভাই। হ্যাঁ, এসেছিল, শুনে বীরাঙ্গনা বলে, তোর মেসোর বাপ, অভিরামের বাবা রামচরণ বোস, সে আমারে বুনির মতো দ্যাখে, দেখা হলে বলত, বীরা মধু কবির কথা শুনাও দেখি।

সন্ধেয় শুনব। টিয়া যেন শঙ্কিত হয়ে বলল।

ফিক করে হেসে ফেলে বীরাঙ্গনা। বলে, মধু কবির কথা অমৃত সমান/বীরাঙ্গনা দাসী কহে শুনে পুণ্যবান। ও হল মহাভারতের পর আর এক মহাভারত, রামায়ণের পর আর এক রামায়ণ।

টিয়া বলল, আমি 'ঘরের আলো'টা শেষ করি দিদমা, আর ক'টা পাতা মাত্তর, তুমি একটু গড়িয়ে নাও। বীরাঙ্গনা দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে গুনগুন করে চোখ বুজে, সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে/সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।

টিয়ার মন বসে না বই-এ। এই বীরাঙ্গনা দাসী যখন আগেরবার মেঘনাদ বধ কাব্য একটুখানি শুনিয়েছিল প্রথম সর্গ থেকে, সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি/বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে/অকালে, কহ হে দেবি অমৃতভাষিণী—এই বল দেখি অমৃতভাষিণী কারে বলে? সরস্বতীই যে অমৃতভাষিণী তা শুনিয়েছিল দিদিমা। ওফ কঠিন লাগে তার মাইকেল। কিন্তু কানে যখন আসে-বেশ। এই যে কপোতাক্ষর কথা গুনগুন করছে দিদিমা। টিয়ার মনে হল রক্ষ-রাজ রাবণের কথা শোনে। রক্ষ-রাজ বলেছিল দিদিমাই, ওরে রাক্ষস বলে কি মানুষ না, তাদের কি শোক তাপ ছিল না। প্রমীলার কি সেই বয়স যে স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়ে আহ্লাদে থাকবে? কোনও বয়সেই কেউ পারে? কী রূপ ছিল প্রমীলার। কী সুখে ছিল সে মেঘনাদকে নিয়ে। ইন্দ্রজিৎ-মেঘনাদ আর প্রমীলার সুখের কথা বলেছিল বীরাঙ্গনা দাসী। কত বড় বীরের স্ত্রী সে। কতবড় শক্তিধর রাবণ রাজার পুত্রবধূ। এমনভাবে বলে দিদিমা যে রাক্ষসরা সত্যিকারের মানুষ। টিয়া এমন কথা আগে শোনে নি। তাদের দেশের বাড়িতে ঠাকুমার ছিল মস্ত এক কৃত্তিবাসী রামায়ণ। তাতে পুষ্পক-রথে করে সীতাকে নিয়ে পালাচ্ছে রাবণ, তলোয়ার উঁচিয়ে জটায়ু পক্ষীকে কাটছে—টিয়া জেনেছিল রাক্ষস কত ভয়ানক। ঠাকুমার ঝুলির রাক্ষসের গল্প কি সে ঠাকুমার কাছে ছেলেবেলায় শোনে নি? তবু টিয়ার ইচ্ছে করল প্রমীলা আর মেঘনাদের কথা শোনে আবার। 'ঘরের আলো' থেকে মন সরে গেল। টিয়ার মনে আছে মেঘনাদ যুদ্ধে গেলে দুখিনী প্রমীলা আকুল ডাক দিয়েছিল মহাদেব আর পার্বতীকে, কেঁদে বলেছিল, 'দেখ মা পার্বতী, কুঠার যেন না ছোঁয় ওর অঙ্গ'। শুনতে শুনতে টিয়ার বুক ধকধক করে উঠেছিল। প্রমীলার আকুল কান্না কৈলাসে পৌঁছলে দেবরাজ ইন্দ্র আবার ভয় পেয়েছিল। বায়ু বেগে পালিয়ে ছিল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। টিয়া ডাকল, ও দিদমা, এই বীরাঙ্গনা?

কী বলিস টিয়া?

প্রমীলার কথা শোনাবে দিদমা?

বীরাঙ্গনা চোখ খুলল। মলিন ক্লান্ত মুখে হাসল, বলল, রক্ষঃকুল বধূ প্রমীলা কি শুধু কেঁদেছিল মহাদেব পার্বতীর কাছে, তার কি তেজ ছিল নারে টিয়া?

টিয়া বলল, ছিল দিদমা, তবু মেঘনাদ আর প্রমীলার কথা শুনাও না।

স্বামী স্ত্রীর কথা।

হ্যাঁ হ্যাঁ, কী লেখা আছে রামায়ণে?

রামায়ণে না মেঘনাদ বধ কাব্যে, পরে শুনবি রে, এখন শোন, প্রমীলা তার সখীকে কী বলল?

কি কহিলি বাসন্তী? পর্বত গৃহ-ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য যে রোধে তার গতি?

জানি জানি, জানি দিদমা, আমি বলি শোনো, টিয়া যেন কলকল করে ওঠে, দানব নন্দিনী আমি, রক্ষঃকুল বধূ-/রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী-/আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে—তাই তো?

হ্যাঁরে। বলে বীরাঙ্গনা টিয়ার গাল টিপে দিয়ে বলল, তোরও হবে অমন স্বামী—। বলেই মুখ অন্ধকার, বলল, তোর বিয়ে আমি দেব রামচন্দ্রের মতো স্বামী—। একথা বলেও ঘাড় হেট হয়ে গেল বীরাঙ্গনার। যতই বলুক লোকে শ্রীরামের কথা, শ্রীরাম কি ভালো ছিল? পরে কী হয়েছিল সীতার?

চার

হাবলু বলল, আমি কতদিন এখেনে থাকতে পারি বল দেখি।

খোকন তো অবাক, মাথা নেড়ে বলল, কী বলছ তা ধরতে পাচ্ছি নে।

হাবলু আর খোকন যাচ্ছে রেডিও পার্কে, যা কিনা অখণ্ড টালা পার্কেরই একটা অংশ, যুগের যাত্রী সঙ্ঘের ফুটবল প্র্যাকটিস দেখতে। হাবলু বলেছে তোর বাবাকে বলে ঢুকিয়ে দেব নিশীথদার কোচিং-এ।

নিশীথদাকে তুমি চেন?

খুব চিনি, তেনার বাড়ি তো ছিল তালায়।

তালা, সে কোথায়?

কেন আমাদের সাতক্ষীরে মহকুমায়, আমি বললাম আশাশুনির ছেলে, আমাকে বুকে জড়াই ধরল।

তুমিই প্র্যাকটিসে যাও না।

হাবলু বলল, না আমার আর হবে না, মানে সম্ভব না, কদ্দিন বেলগেছেয় থাকি ঠিক নেই।

বেলা গড়াচ্ছে। দু'জনে রাস্তায় বেরিয়ে যেন বেঁচেছে। বকতে বকতে, সতত হে নদ গুনগুন করতে করতে দিদিমা ঘুমিয়েছে ভিতরের ঘরের মেঝেয়, তার পাশে বুকে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে 'ঘরের আলো' শেষ করছে টিয়া। শেষ করছে আর দিদিমার কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছছে। আর এক ঘরের মেঝেয় কাঁথা পেতে মা তার ওপর

পেন্সিলে নকশা করছে। নকশা আঁকা হয়ে গেলে তার ওপর রঙিন সুতোর ফোঁড় দেবে। হাবলু বলেছে, ওইভাবে নকশি কাঁথা করে।

শুনে প্রভাময়ী বলেছিল, সে অন্য জিনিস হাবলু, আমি কি অত পারি, তবে করছি।

খোকন জিজ্ঞেস করল, তুমি চাকরি করবে না।

না, পাকিস্তান রদ করব।

ফণীবাবু, একটা দিয়েছিল না?

ধুস। হাবলু বলল, ওসব কাজ কেউ করে, মাড়োয়ারির দোকানে খিদমত খাটব?

খোকন আর কিছু বলতে পারল না। ঠিক এরপর তার এগোনোর ক্ষমতা নেই। কিন্তু একেবারে কি থামা যায়, বলল, তুমি তো বি.এ. পাশ।

তাই!

খোকন মুগ্ধ দৃষ্টিতে হাবলুদার দিয়ে তাকায়, বলে, যে বি.এ. পাশ, তার কত জ্ঞান।

কে বলেছে, তোর দিদি, ওই টিয়া?

হুঁ।

আমি ম্যাটটিক পাশ, সেকেন্ড ডিভিশন হয়েছিল।

আমি তো তাই বলেছি, দিদি বলল, না তুমি বি.এ.।

হাবলু হাসে, বলে, নবেল পড়ে পড়ে তোর দিদির মাথা যাচ্ছে, আমি কবে কলেজে ভর্ত্তি হলাম।

ওপারে কী হয়েছিল তা আমরা জানি?

হাবলু বলল, বি. এ. হলে আমি চাকরি পেয়ে যেতাম।

তুমি যে বলেছিলে আমাদের পড়াবা?

ম্যাটটিক হলে কি পড়ানো যায় না?

খোকন বলল, তুমি বি. এ. পাশ হলে ভালো হত।

হিন্দুস্থান, পাকিস্তান না হলি আরও ভালো হত।

খোকন বলল, তুমি এবার দেশে যাবার সময় নিয়ে যাবা?

হাবলু বলল, ব্ল্যাকে তোরে যেতি দেবে তোর বাবা?

ওরা হাঁটতে হাঁটতে টালা পার্ক, পার্কের পুকুর ডানদিকে রেখে রেডিও পার্কের দিকে চলল। খোকন এদিক ভালো চেনে না। তার গতিবিধি বাড়ির সামনের মাঠ পর্যন্ত। তারপর গেলেই মনে হয় হারিয়ে যাবে।

হাবলু বলল, আমি আর বেশিদিন থাকব না।

কোথায় যাবা?

যেদিকে ইচ্ছে, মানে দিল্লি যেতে পারি, না হলে লাহোর।

সেই পাকিস্তান।

হ্যাঁ, কী করব, আয়ুব খাঁর সঙ্গে দেখা করব। হাবলু কথা থামিয়ে দেয়। খোকন খুব ছোট। ফোর থেকে ফাইভে উঠেছে সবে। সব কথা ঠিক ও বুঝবে বলে মনে হয় না। টিয়া বুঝত, কিন্তু সে তো তার সঙ্গে বেরোয় না। বেরোতে পারবেও না। ঘরের ভিতর কি সব বলা যাবে?

খোকন বলল, আমিও দিল্লি যাব দিদমার সঙ্গে।

আমি যাব আমার কাজে।

ওরা এসে পড়েছে রেডিও পার্কের কাছে। এখানে টালার মস্ত জলাধার। বুক অব নলেজে আছে এশিয়ার সবচেয়ে বড় জল ট্যাঙ্কি এইটা। রেডিও পার্কে রেডিওর ট্রান্সমিশান টাওয়ার আছে, আর আছে জলের রিজার্ভার। খোকন এত কাছ থেকে জলাধার দ্যাখেনি। ঘাড় উঁচু করে উপরে তাকিয়ে দেখল যেন ঘন মেঘ।

হাবলু বলল, একদিন যদি উপরে ওঠা যায়।

উঠতি পারবা?

সিঁড়ি আছে, পস্কার তো করতে ওঠে, আমি আলাপ করেছি।

খোকন অবাক, জিজ্ঞেস করল, কার সঙ্গে আলাপ করলে?

গার্ড, কলারোয়া বাড়ি, আমাদের গাঁ থেকে দশ বারো মাইল।

কী আশ্চর্য। সে এখেনে কাজ করে?

করবেই তো, আমাদের ওদিকির লোক এদিকি ভর্তি।

খোকন বলল, তারা তো কাজ করছে।

হাবলু বুকে হাত দিয়ে বলল, আমিও আমার কাজ করব।

খোকন বলল, গার্ডের নাম কী?

নামটা জিজ্ঞেস করা হয়নি, তবে মুখ চেনা হয়ে গেছে, সে বলেছে একদিন ব্যবস্থা করে দেবে।

উপরে উঠে কী করবা?

উপর থেকে সব দেখা যায়, পাকিস্তান পর্যন্ত, আকাশে তো বর্ডার নেই খোকন, সে বলেছে দিদমার কপোতাক্ষ পর্যন্ত দেখা যাবে।

খোকন জবাব দিল না। হাবলুদার সঙ্গে টালা-ট্যাঙ্কের মাথায় সেও উঠবে তা ঠিক করে ফেলল মনে মনে। মাঠের ধারে দাঁড়িয়েছে তারা দুজন। একজন বছর পঁয়ত্রিশের মানুষ শাদা হাফপ্যান্ট আর নীল রঙের গেঞ্জি পরে মুখে বাঁশি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ঘিরে জনা পনেরো বুট হোস কালো প্যান্ট আর গেঞ্জি পরা কিশোর, সদ্য যুবক। খোকনের বয়সী জনা দুই রয়েছে। হাবলু বলল, ওই হলো কোচ নিশীথদা, ওই যে সুবীর, খুব ভালো খেলে, এ ডিভিশনে খেলবে এবার, ওর দাদা সুনীল বি ডিভিশনে।

খোকন চুপ করেছিল। জনা পনেরো খেলোয়াড় গোটা চার বল নিয়ে প্র্যাকটিশ

করতে লাগল। হাবলু বলল, তোরে নিয়ে আলাম কেন জানিস, তোরে এখেনে ভর্তি করতি হবে।

কেন?

খেলবি, নিশীথদা খুব ভালো কোচ, যুগের যাত্রীর কত নাম জানিস?

খোকন বলল, আমার খেলা হয় না।

হবে না মানে, নিশীথদা বলে দুটো ঠ্যাং থাকলেই হবে, তারে প্লেয়ার করতে কদিন আর লাগে।

তুমি খেল না।

বয়স হয়ে গেছে, আমি রেফারি হব।

রেফারি। এক গাল হেসে খোকন বলল, কবে হবা?

হব, নিশীথদা বলেছে যোগাযোগ করিয়ে দেবে।

পায়ের উপর বল নাচাচ্ছে একজন। ওর নাম সুবীর। কী সুন্দর স্বাস্থ্য। উরুর ভাঁজ কী চমৎকার। কী চওড়া বুক। হাবলুদা বলল, ও খুব ভালো ডিফেন্স, স্টপারে খেলে, দ্যাখ না জার্নেল সিং এর পরে ও হবে, তোরে একদিন গড়ের মাঠে নিয়ে যাব।

নিয়ে তো যাও না, নিজি নিজি হাওয়া খেয়ে আসো।

লিগ আরম্ভ হোক, দেরি আছে, তবে কিনা মাউন্টেড পুলিশ, ঘোড়া এমন ছুটোয় হা হা হা, সব তখন এমন দৌড়ায়, তুই দৌড়তে পারবি তো, ঘোড়ার লাথি কিন্তু ভীষণ।

খোকন কথা শুনছিল না। সে দেখছিল সুবীরের পায়ে বল উঠছে নামছে। সামনে দাঁড়িয়ে নিশীথদা। কী সুন্দর লাগছে সুবীরকে। বল ওর কথায় উঠছে, আবার উঠছে, আবার উঠছে—নামছে, আবার নামছে, আবার নামছে।

হাবলুদা বলল, নিশীথদার বাড়ির ধারে কপোতাক্ষ নদ।

তোমারে বলেছে নিশীথদা?

আমি জানি, ওসব বলতি হয় না।

দিদমাকে বলো।

বলব, দ্যাখ কপোতাক্ষ ছাড়া আর কোনও নদী নেই ওপারে।

কে বলল?

আমি জানি, খুলনায় ভৈরব, রূপসা আর ঢাকায় পদ্মা, কিন্তু দিদমা বলেছে সবার চেয়ে কপোতাক্ষ সেরা। ওই দ্যাখ নিশীথদা দেখাচ্ছে ডজ করতে হয় কীভাবে, গুরু গুরু। রহিম সায়েবের সমান কোচ, কে জানিস রহিম সায়েব?

এত জানে হাবলুদা। ওপার থেকে এল তো সেদিন। শুনে হাবলু বলল, এসব জানতি কি এপারে আসতি হয়। সব জানা যায় সব জায়গায় বসে।

খোকন ভাবে তাই হবে। হাবলুদা সব জেনেই এসেছে। ওপারে বসেই নাকি শুনেছিল

নিশীথদা, যুগের যাত্রী ক্লাবের কথা। সুবীর সুনীল দুই ভাই-এর কথা। এই যে রেডিও পার্ক, টালাপার্ক, ঝিলপুকুর—সব। হাবলুদা বুঝি আগে থেকেই চেনে কলকাতা শহরটা। ওপারে তার আশাশুনি গাঁয়ে বসেই চিনেছিল গড়ের মাঠ, লাল পাগড়ি পুলিশ আর ওই যে দোতলা বাস। দোতলা বাস নিয়ে কত কথা শুনিয়ে এসেছে দেশের বাড়ি গিয়ে। খোকন বলল, তুমি এত জানো কী করে?

জানলেই জানা যায়।

খোকন বলল, হাবলুদা আমারে তোমার আশাশুনি নিয়ে যাবা?

যাবি তুই। অবাক হয়ে হাবলু, বলল, তুই তো ইন্ডিয়ান, মানে তুই মানিস ইন্ডিয়া, তবু যাবি?

ইন্ডিয়ান হলি যাওয়া যাবে না?

কেন যাবে না, তবে আমি ইন্ডিয়া পাকিস্তান মানি নে যখন তুই মানিস কেন?

না মানলে যাওয়া যাবে?

হুঁ, ওপারে, তো কেউ কেউ আছে, তারাও মানে না।

মুসলমান?

হাবলু বলল, আমি তো ওটাও মানি নে।

তবে কী মানো?

হাবলু হেসে বলল, কিছুই মানি নে রে, জীবজন্তুর হিন্দু মোছলমান আছে?

নেই, কিন্তু মানুষ কি জীবজন্তু? কথাটা বলে খোকন টের পেল সে বুঝি সাবালক হয়ে উঠছে। হাবলুদার সঙ্গে তক্কো করতে পারছে। ওরা ফিরছিল ধীরে ধীরে। ছায়া নেমে আসছে। রাস্তার ল্যাম্প পোস্টে এসে অলো জ্বালিয়ে চলে যাচ্ছে সাইকেল আরোহী একটি লোক। টিমটিমে বালব জ্বলে উঠছে। হাবলু বলল, এই কাজটা খুব ভালো, সারা দিন ঘুমোও, সন্ধেয় উঠে আলো জ্বালাও, আর ভোরে উঠে নিভোতে হয় অবিশ্যি।

খোকন বলল, তোমার আশাশুনিতে পাকিস্তান মানে না এমন কেউ আছে?

আছে তো, হাতেবর চাচা। সামনে বলবে না, আমারে আলাদা করে বলেছিল, 'শোন হাবলু, ঠিক এডা রদ হওয়া দরকার।' পাঞ্জাবি লোক ঢুকে পড়ে তাদের বলছে, আসলি মুসলমান শুধু তারা।

খোকন বুঝতে চেষ্টা করে। এটুকু বোঝে হাবলুদার কথা সত্যি। হাবলুদা অনেক জানে, বলছে ওপারে হাতেবর চাচা, এপারে সে, এই নিয়ে কাজ হবে, হিন্দুস্থান পাকিস্তান থাকবে না, থাকবে না, ইন্ডিয়াও উঠে যাবে পাকিস্তানও উঠে যাবে।

তা কী করে হবে ইন্ডিয়া তো পুরনো নাম।

হাবলু বলল, পরে দেখা যাবে, আগে ও বর্ডার থাকবে না, ওপারে পঞ্চাশ টাকা চালের মন, এপারে একুশ, এরকম থাকবে না।

খোকন বলল, তোমার এসব কিছুই হবে না।

হাবলু বলল, হবে, ঠিক হবে।

না হবে না।

হবে! বলে মাটিতে পদাঘাত করল হাবলু। দাঁত ঘষল দাঁতে, বলল, হবে, বাজি রাখ, হবে, দশটাকা বাজি—

পাঁচ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে। দিদিমা বলল, কপোতাক্ষ নদ, কতবার বলেচি তোদের, জানিস তবু ভুলে যাস।

আমি জানি দিদমা, ভুলি নি।

হাবলু বলল, আমি ভুলে যাই, ভুলে না গেলি তুমি তো আবার বলবা না।

বীরাঙ্গনা দিদিমা বলল, ওই কবিতা দাদু বিলেতে বসে লিখেছিল, বিলেতে বসে শুধু আক্ষেপ করত সাগরদাঁড়ির জন্যি, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী—

খোকন বলল, তারপর কী হল?

কোনখান থেকে বলব? আরে আমার দাদুর মা, জাহ্নবী দাসী, তার বাপের বাড়ি কাঠপাড়া, রাঢুলির পাশে।

হাবলুদা বলল, রাঢুলিতে পি সি রায়ের বাড়ি, আমি জানি, আমার পিসির বিয়ে হয়েছিল।

কোন ঘর?

মিত্তির বাড়ি, পশুপতি মিত্তির।

দিদিমা বলল, তারা ওপারেই আছে?

পিসে রয়েচে, পিসের ভাইরা যাদবপুরে থাকে শুনেছি।

ওইপুরে গিছলি তুই?

ঐপুর শুনে খোকনের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল। দিদমার খুড়শ্বশুরমশাই নাকি ছিলেন যাদব সরকার। তাই তিনি কোনওকালে যাদবপুরের নাম নেবেন না। যাদবপুরে বড় পিসের ভাইরা থাকে। সেখানে যেতে বারণ করেছে বাবা। বড় পিসের সঙ্গে পিসের ভাইদের গোলমাল জমি নিয়ে। বড় পিসে সব জমি দখল করে রাঢুলিতে বসে আছে। পিসের ভাইরা তাদের অংশ নিয়ে নিতে বলছে, পিসে নেবে না। আবার জমি ভাগ হয়নি বলে বেচাও যায় নি। না হলে কিনতে তো রাজি আছে কতজন। জমির চাষিরাই বলছে নিয়ে নেবে। হাবলু এসব কথা কাকে বলবে, সে নিজে জানে। হাবলু চুপ করে আছে দেখে দিদিমা তার নিজের জগতে ফিরল, বলল, খোকন বড় হয়ে সাগরদাঁড়ি ঘুরে আসিস।

খোকন বলল, সে তো এখন অন্য দেশ, পাকিস্তান।

দিদিমা হাসল, অন্য দেশ এখন, তখন আবার এক হয়ে যাবে।

যদি না হয়? খোকনের মা প্রভাময়ী ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, বলছে সংসার ভেঙে গেলে আবার জোড়া লাগে?

শীর্ণকায় দিদিমা চোখ কুঁচকে কী যেন ভাবতে লাগল। তারপর মাথা দোলাতে লাগল, বলল, স্বার্থ থাকলি লাগে না।

স্বার্থ না থাকলি তো সংসারও ভাঙে না।

দিদিমা বলল, আমাদের কী স্বার্থ ছিল বউ?

মা বলল, কার ছিল আমরা জানি নে।

দিদিমা আবার নিশ্চুপ। প্রভাময়ীও রান্না ঘরে গেল। তখন দরজায় ঠক ঠক। খোকন উঠে গিয়ে দেখল ফণিবাবু। ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করে, মাসিমা এয়েচে দিল্লি থেকে?

হ্যাঁ।

আমারে চিঠি দিইছিলেন।

ফণিবাবু ঢুকতেই দিদিমা হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে কেঁদে উঠেছে, ও ফণি, তুই আমার পত্তর পেলি?

হ্যাঁ, না পেলে আলাম কেন?

বসিরহাটে পেল না কেন?

ফণিভূষণ সামলে নিল সবটা। বলল, না পেতেই পারে, আমি তোমারে দুটো চিঠি দিয়েছিলাম, পেয়েছিলে?

কোথায় দিয়েছিলি?

কেন দিল্লির ঠিকানায়।

কবে?

সেই যখন গেলে তখনই, আমার এক জোড়া আগ্রার নাগরা পছন্দ, ওদিকি খুব সস্তা শুনেচি।

সস্তা তো। এই মনে পড়েচে, খোকনের জান্যি নাগরা এনেচি, দ্যাখ দিনি, পুটলিতে আছে কিনা।

আমারটা আনলে না? ফণিভূষণ অনুযোগ করল।

আমি তো চিঠি পাই নি রে।

ফণিভূষণ বলল, এই হল ডাকের অবস্থা।

হাবলু কেন খোকনও বুঝতে পারছে ফণিবাবু কীরকম ম্যানেজ দিল। চিঠি পেয়েও দিদিমার ছেলে কানাই আসে নি শিয়ালদায়, এই ঘটনা সকাল থেকে বুড়িকে ভোগাচ্ছে, ফণিভূষণ সেখানে বুঝি চন্দনের প্রলেপ দিল। খোকন ঘরের কোণ থেকে পুটুলি এনে

দিল দিদিমাকে। বেশ বড়। এর ভিতরে শেমিজ কাপড়, একখানা গরম চাদর, চিরুনি, হিমানি স্নো সব রয়েছে। সকালে তো খুলেছিল দিদিমা, নাগরাই কই? দিদিমা খুলে ফেলল সব, ও সবই আবার বেরোল। দিদিমা হতাশ, খোকনও। দিদিমা আর্তনাদ করে ওঠে, ওই যাহ্।

কী হল?

ট্রেনে খুলেছিলাম।

কেন খুলেছিলে ট্রেনে। খোকন প্রায় কেঁদে ফেলেছে।

গার চাদর নেব বলে, তখন নাগরা জোড়া বের করলাম।

তারপর?

দিদিমা দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে হতাশ গলায় বলল, কী করে জানব?

আর ঢোকাও নি?

দিদিমা বলল, রমলা নিজি পছন্দ করে কিনে আনল আগ্রাবাজার থেকে, ভেলভেটের, তার ওপরে জরির কাজ।

হারিয়ে এলে দিদমা? খোকন প্রায় কেঁদে ফেলল।

দিদিমা বলল, সরিয়েছে। উলটোদিকের লোকটাকে আমার সন্দেহ হচ্ছিল, টেনে নেছে ও, হায় হায়, কী সুন্দর নাগরাই।

কী রঙের ভেলভেট? ফণিভূষণ জিজ্ঞেস করল।

ঘন নীল, তার ওপর সোনালি জরি, কী সুন্দর নকশা।

খোকন চুপ করে গেছে। খোকনের খুব হতাশ লাগছে। সে যে দিদিমাকে বলেছিল নাগরাই-এর কথা তা সে নিজেই ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু দিদিমা তা মনে রেখেছিল। তার পায়ের মাপ নিয়ে গিয়েছিল, মাপে মাপে কিনেছিল। পায়ের মাপের কাগজটি দিদিমা কত যত্ন করে রেখেছিল। সেটাও চলে গেছে নাগরাইয়ের সঙ্গে। ভিতরে ঢোকান ছিল।

ফণিভূষণ বলল, যাক গে, এখন তো আর ফেরৎ পাওয়া যাবে না।

দিদিমা বলল, বাচ্চার জিনিস, তার কতটা কষ্ট হল বল দেখি ফণি।

ফণিভূষণ বলল, পরের বার এন।

সে তো আনবই আনব।

খোকন গুম হয়ে বসে আছে। নীল ভেলভেট, জরির কাজ—একেবারে রাজারাজড়ার নাগরাই। খোকন বলল, তার লাগবে না।

কেন রে লাগবে না কেন? দিদিমা জিজ্ঞেস করে।

আমার দরকার নেই।

দিদিমা খোকনকে নিজের দিকে টানলেন, কেন দরকার নেই?

খোকন বলল, আমার ভালো লাগে না।

কী ভালো লাগে না? নাগরাই। আমি কী করব, চোরে যদি বালকের নাগরাই চুরি করে নেয়, আমি কী করব বল।

তখন ফণিভূষণ বলল, চাঁদনিতে পাওয়া যায়, আমি এনে দেব।

না না, খোকন মাথা ঝাঁকাতে থাকে।

আচ্ছা সে হবেখন, ফণিভূষণ বলল, তোমার সঙ্গে দেখা করতি আলাম মাসিমা, আমি এবার তুমারে আমার বাসায় নে গে রাখব।

দমদমায় তো?

হ্যাঁ, আমি তো একা লোক, তোমারে ক'দিন না হয় যত্ন করতাম।

দিদিমা বলল, যাব, খোকনের পরীক্ষা হোক, তারপর।

খোকন বলল, আমি যাব না।

যাবি নে মানে, তোরে যেতি হবে। বলে দিদিমা দু'হতে খোকনকে বুকে জড়িয়ে ধরল, ওরে বাপ, জোড়া নাগরাই এনে দেব এবার, সঙ্গে চাঁদনির পাঞ্জাবি, লখনউ পায়জামা, আমি মেয়েরে চিঠি লিখে দিচ্ছি, ও কিনে রাখবে, শাবন মাসে তো যাব, শাবন মাসে আর ক'মাস।

ফণিভূষণ বলল, হবে হবে, একবার হারাবে বলে সব্বার তো হারাবে না, আমিও যাব দিল্লি, আমার মালিক নিয়ে যাবে, আমি কিনে আনব।

হ্যাঁ, আনবি, নীল ভেলভেট, সোনালি জরির কাজ, সে যে কী সুন্দর মানাবে খোকনের পায়ে, হ্যাঁরে ফণি, কোন মাসে যাবি?

যাব, মালিক গেলেই যাব।

সে তো বুঝলাম, মালিককে বল শাবন মাসে যেতে।

ফণিভূষণ বলল, মাসি, তুমি আমার বাসায় কবে যাবা?

বসিরহাট ঘুরে আসি, নাতি নাতনিদের মুখ দেখে আসি।

ফণিভূষণ বলল, আমি একবার বসিরহাট যাব, তুমি নিয়ে যাবা?

দিদিমা বলল, কষ্ট হবে তোর।

বসিরহাট যেতি কষ্ট, কেন?

দিদিমা বলল, ফণি তোরে দেখলি খুব ভালো লাগে, তুই বে করবিনে, এখানে তো বাসা নিয়েছিস, তুই বে কর এবার।

আমারে কেডা বে করবে?

দিদিমা বলল, আছে, আমি একটা ভেবে রেখেছি, এ পারেই থাকে, বড় বংশ, সব তোরে পরে বলব, রাজি তো আমি বলি।

ফণিভূষণ কেমন হয়ে গেল, বিড়বিড় করল, আমার তো পঁয়ত্রিশ বয়স হয়ে গেছে মাসি।

হোক, সে আমার ভাবনা।

ফণিভূষণ অবাক হয়ে বীরাঙ্গনা দাসীর দিকে তাকিয়ে থাকলে। বিয়ে! এত বয়সে হয়? ওপারে থাকলে কবে হয়ে যেত। ছেলে মেয়ে হয়ে যেত। তারা বড় হত। ইস্। ফণিভূষণের গা কেঁপে ওঠে। গাঙ দিয়ে নৌকোয় করে বউ আনত সে। নদীঘাটে বউ বরণ। ধুস। কী সব ভাবছে সে? বলল, আমি তাহলে উঠি মাসি।

উঠবি কেন রে এত তাড়াতাড়ি।

ফণিভূষণ বলল, যাই, বসে আর কী করব?

না বসেই বা করবি কী, বাড়িতে কেডা আছে বল।

দিল্লি কেমন দেখলে মাসি?

রাজধানী বলে কথা, আগে তো কলকাতা ছিল রাজধানী, তাই না?

হুঁ, সে তো অনেক অনেক বছর আগে, আমাদের কিছু থাকবে না মাসি, দেশ গেল, তার আগে রাজধানী গেছে, আমরা বড় দুঃখী মাসি।

বীরাঙ্গনা বলল, বসে দুঃখ দুঃখ করলে সে মানষের কপালের দুঃখ যায় না ফণি।

ফণিভূষণ বলল, তা জানি, কিন্তু এইটাই সত্যি, তুমি দিল্লির কথা শুনাও।

বীরাঙ্গনা তখন তাজমহলের কথা শুনাতে লাগল। আগ্রা গিয়েছিল। আগ্রায় হোটেলে থাকা হয়েছিল। তবে দূর অনেক। রাস্তাটা ভালো না। ফেরার সময় ট্রেনে আসা হয়েছিল। বীরাঙ্গনা বিড় বিড় করে, ''তাজমহলের মর্মরে গাঁথা কবির অশ্রুজল।''

এ কার লেখা?

চমকে ওঠে বীরাঙ্গনা, বলে, জানি নে তো।

তোমার পিসী মানকুমারীর?

বীরাঙ্গনা মাথ নাড়ে, না, এ আমি ছুঁচে সুতোয় চটের উপরে লিখেছিলাম, আমারে দেখতে এল, ওইটা দেখে—। বীরাঙ্গনা মাথার ঘোমটা টেনে ফিক করে হেসে ফেলে, বলল, দিল্লিতে যেমন শীত, তেমনি গরম, মাছ খায় না বেশিরভাগ, মাছ কিনলে মুড়ো এমনি দেয়—।

ফণিভূষণ বলল, মাছ কুটলে মুড়ো দেব, ধান ভানলে চিঁড়ে।

হ্যাঁরে হ্যাঁ। ওসবে সুখ আছে, কিন্তু যা বলছিলাম, আর দেরি না ফণি, বিয়ে তোরে এবার করতি হয়।

ছয়

বীরাঙ্গনা বলছিল, আমার অতবড় দাদু, মাইকেল এম এস দত্ত, বড় দুঃখী ছিল রে।

হাবলু বলল, জানি, তার একটা কারণ আছে।

কী কারণ? বীরাঙ্গনা জিজ্ঞেস করে।

হাবলু বলল, তাঁর কবর না কলকাতায়?

হ্যাঁ, খেস্টান তো।

হাবলু বলল, আমি দিল্লি গে বলব, হিন্দু মুসলমান খিস্টান রদ করো।

বীরাঙ্গনা হাসল ফোকলা গালে, তাই কি কখনও হয়, আমি মানব কেন?

মানবা না, আবার বলবা তোমার মাইকেল দাদুর খুব দুঃখ ছিল।

বড় কবি ছিল, কবির দুঃখ কেন সেডা কবিই জানে হাবলু, কবির আবার ধম্মো কী, বুঝতে পারলি আমার কথা?

হাবলু বলল, কবিতা যদি লিখা যেত?

ভিতরে আসে কবিতা?

বুঝিনে দিদমা, কবিতা লিখা বড় সাহসের ব্যাপার, তাই না?

বীরাঙ্গনা বলল, আমার দাদু ছিল অকুতোভয়। অকুতোভয় না হলি অতবড় হয়? মানুষ যদি অকুতোভয় না হয় তবে সে বড় হতি পারে না, আবার যে যত বড় হয় সে তত দুঃখী হয়, দত্ত বংশ দুঃখীর বংশ, মা জাহ্নবী দুঃখে মরে, বাবা রাজনারায়ণের কত দুঃখ। মধু কবি তো দুঃখের সাগরে ভাসে। রাবণের দুঃখ কত বল, পুত্রহারা রাবণ রাজার দুঃখ কে বুঝতে পেরেছিল বল আমার সেই মধু কবি ছাড়া। আবার ধর, দত্ত বংশের আর এক দত্ত মানিকরাম, সে ফার্সিভাষায় কবিতা লিখত, মধু কবি যেমন আমার দাদু, তিনি তেমন মধু কবির ঠাকুদ্দা, তার জীবনও ছিল এক দুঃখের নদী।

এই বীরাঙ্গনা দাসী। মধু কবির কাব্যের নামে নাম। দত্ত বংশের সঙ্গে তার লতায় পাতায় কী সম্পর্ক তা কেউ কি জানে? তবে সাগরদাঁড়ির সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক তো আছে। কপোতাক্ষর সঙ্গে চোখের জলের সম্পর্ক তো আছে। ঝাঁপি খুলে বসেছে বীরাঙ্গনা। ওপার থেকে এনেছে এই কথার ঝাঁপি। তার ভিতরে সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা। সে সব যখন দেখায় একটু একটু করে, কত রঙ বিচ্ছুরিত হয় তার ভিতর দিয়ে। মানিকরামের কথা কে জানে হাবলু? মানিকরাম তো কবি ছিলেন। সেই মানিকরামই জন্মাল মধু হয়ে। মানিকরামের দুঃখ বয়ে নিয়ে মধু এল রে হাবলু।

হাবলু বলল, আমি দুঃখ দেখতি পাই।

কী রকম দেখিস?

হাবলু বলল, মুখ আঁধার করে থাকে, একা একা ঘোরে।

অবাক বীরাঙ্গনা বলে, তোর হবে।

হাবলু বলল, তার কথা কেউ বোঝে না।

ঠিক, ঠিক বলেছিস।

হাবলু বিড় বিড় করল, তোমার সাগরদাঁড়ি তো দুঃখের গাঁ।

হ্যাঁ, মধু কবির জন্যি সবাই কষ্ট পায়, হিন্দু পায় মুসলমান পায়।

হাবলু বলল, সাগরদাঁড়ির হিন্দুস্থান পাকিস্তান তাহলি নেই?

না, নেই, ওটি মধুমাখা দেশ। বলে বীরাঙ্গনা যেন ঝলমল করে উঠল। তার কেঁচকানো চামড়া চানটান হয়ে গেল, মুখশ্রী বদলে গেল। যৌবনের রূপ ঝলক মারল চোখেমুখে।

হাবলু তা দেখে বলল, তুমি হলে মধুমাখা বীরাঙ্গনা।

দিদিমা বলল, মধু কবিরই তো সৃষ্টি বীরাঙ্গনা।

হাবলু বলল, যদি হিন্দুস্থান পাকিস্তান না থাকে, চলো আমরা সাগরদাঁড়ি যাই।

দিদিমা বলল, অন্তরে নেই, কিন্তু হয়ে তো গেছে, বর্ডারের ওপারে পড়ে গেছে।

গেছে তো গেছে, কিন্তু মধুমাখা দেশ আমাদের দেশ। হাবলু যেন ঘোরের ভিতর বলল। আর তা শুনে বীরাঙ্গনা দাসীর দু'চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

ফণিভূষণ, খোকন চুপ করে শুনছিল হাবলু আর বীরাঙ্গনার আলাপ। ফণিভূষণ এবার বলল, কাঁদবেন না মাসি, মাসি কেঁদ না, যা হয়েচে তা মেনি নিতি হবে।

হাবলু বলল, কিছুই হয় নি ফণিকাকা।

কিছু হয় নি মানে?

আমি এ সব মানি নে।

তখন খোকন বলল, আমিও মানি নে।

হাবলু বলল, দিদিমাও মানে না।

ফণিভূষণ বলল, আমাদের মানা না মানায় কী আসে যায় হাবলু?

বীরাঙ্গনা দাসী এসব কথা শুনছিল না, বিড়বিড় করছিল, অশরুঘাটে বসে সাগরদাঁড়ির মানুষ কাঁদে, এখনও কাঁদে।

অশরুঘাট কোথায় মাসি? ফণিভূষণ জিজ্ঞেস করে।

বীরাঙ্গনা বলল, এই যে দেশ পড়ে থাকল, মানুষ চলে এলে, সাগরদাঁড়ির লোক মধু কবির জন্য যেমন তেমনি হিন্দুর জন্যি বসে অশরুঘটে জল ফেলে দু'চোখের, মধুহীন কোরো নাকো তব মনঃ কোকনদে...মধুহীন হয়ে গেল সব, এপার ওপার, কপোতাক্ষ সাগরদাঁড়ি, আশাশুনি, ফিংড়ি—সব।

অশরু মানে অশ্রু, চোখের জল, সে ঘাট কোথায় বললে না? ফণিভূষণ জিজ্ঞেস করে।

রাজনারাণের বাড়ির কাছে কপোতাক্ষর ঘাট, বিদায় ঘাট, অশরু ঘাট।

কী সোন্দর নাম, কপোতাক্ষ তাহলে অশরু নদী?

বলতি পারিস, ওর জলে মা জাহ্নবীর চোখের জল মিশি গেছে।

তুমি কী সুন্দর বল মাসি, আমরা পারি নে। ফণিভূষণ বলল, তোমার কথা শুনে আমার চোখেও জল এসে যাচ্ছে।

কপোতাক্ষর তো কপোতের চোখের জল, জাহ্নবীর চোখের জল, সাগরদাঁড়ির মানুষির চোখের জল, আর বাবা রাজনারায়ণের।

তাঁর চোখেও জল ছিল? জিজ্ঞেস করল ফণিভূষণ।

ছিল রে ছিল, না হলি রাবণ রাজার কান্না হল কী করে—

করি স্নান সিন্ধু নীরে, রক্ষেদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।।

মধু সাগরদাঁড়ি থেকে ফিরি গেলি, রাজনারায়ণ দত্তর এমনি হয়েছিল।

সব থমথম করছে। হাবলু ফণিভূষণ খোকন পাথর হয়ে বসে আছে যেন। কপোতাক্ষর জল নড়ছে না, স্রোত বইছে না, বাতাস নেই। কপোতাক্ষর দুই কূলের গাছগাছালি চোখের জল ফেলছে যেন কপোতাক্ষর জলে। আকাশের পাখিরা, কপোত, শালিক, ময়না, টিয়া সব চোখের জল ফেলছে নদীর উপর। কেন ফেলছে চোখের জল? সেই যে মানিকরাম গেল সংসার ত্যাগ করে সাধু হয়ে তাই ফেলছে। সেই যে ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া মধু মাদ্রাজ যাওয়ার আগে মায়ের কাছে এল, মায়ের সঙ্গে দেখা করবে। না দেখা পেয়ে ফিরে গেলে চোখের জল পড়ল। তারপর সেই যে সাগরদাঁড়ি শূন্য হয়ে গেল ধর্ম ধর্ম করে, হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয়ে, গাঁর যত মুসলমান চোখের জল ফেলল অশ্রুঘাটে বসে।

মানিকরামের কী হয়েছিল?

মানিকরাম দত্তর ফার্সি কবিতা শুনে শুনে জমিদারের মেয়ে তাকে ভালোবেসে ফেলল। জমিদার ছিল মুসলমান। মানিকরামকে সে যাঞা করলে মানিকরাম বলল, হিন্দুর সঙ্গে এ সম্পর্ক হয়?

হাবলু বলল, হয় না, তখন মেয়ে পার করে দিতে হয়।

কোথায় পার করবে? বীরাঙ্গনা জিজ্ঞেস করে।

বর্ডার, পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্থান, হিন্দুস্থান থেকে পাকিস্তান।

তখন তো তা ছিল না। জমিদার বলল মানিকরাম তুমি যদি ভালোবেসে থাক, আমার কন্যে যদি ভালোবেসে থাকে, তবে তুমি ইসলাম নাও, মুসলমান হও, মানিকরাম পারল না, জমিদারবাড়ি ছাড়ল।

হিন্দুস্থান পাকিস্তান না থাকলে ধর্ম থাকল কেন? হাবলু জিজ্ঞেস করে।

বীরাঙ্গনা বলল, ধর্ম থাকে, অকুতোভয় না হলে ধর্মত্যাগ হয় না।

সবাই চুপ করে গেল। বীরাঙ্গনা গুনগুন করছে, কেঁদে মরে জমিদারের মেয়ে, কবি মানিকরাম তাকে ছেড়ে গেল, গ্রাম ছেড়ে গেল, কপোতাক্ষ ছেড়ে গেল, সাধু হয়ে গেল বুকের ভিতরে কষ্ট নিয়ে। কত লোকের চোখের জল পড়ল। সেই জমিদারের মেয়ের চোখের জল পড়ল।

হাবলু বলল, থাক দিদমা, আমার দুঃখ হচ্ছে।

কত দুঃখ রে, কতখানি?

হাবলু বলল, আমি সাগরদাঁড়ি যাব।

কী করে যাবি? কে নিয়ে যাবে তোরে?

পথে জিজ্ঞেস করতি করতি যাব, হাঁটতি হাঁটতি যাব।

বীরাঙ্গনা বলল, বর্ডারে ধরে নেবে।

তবু যাব, যদি চোখে জল আসে, অশ্রুঘাটে গিয়ে ফেলি আসব।

দূর বোকা, অশ্রুঘাট সব জায়গায়, হিন্দুস্থান পাকিস্তানে অশ্রুঘাট ভরে গেছে, যত নদী তত অশ্রুঘাট—বুঝলি। ফণিভূষণ হাত রাখে হাবলুর পিঠে, বলে, আমার ভৈরব, রূপসায় কি অশ্রুঘাট নেইরে, শ্যালদা স্টেশনে কম চোখের জল পড়েছে মাসি, কী করব, মানুষ জন্মায় চোখের জল ফেলতি।

বীরাঙ্গনা অবাক হয়ে ফণিভূষণের দিকে তাকিয়ে। কী বলছে ফণিভূষণ। এত জেনে গেল কবে? না এই এখনই জানল। বীরাঙ্গনা দাসীর কাছে কপোতাক্ষর বিদায় ঘাট, অশ্রু ঘাটের কথা শুনে এই এখনই জেনে গেল। মানুষ তো জেনে ফেলে এক লহমায়। যদি তার বুকের ভিতরে গিয়ে সেই জানা সব অজানাকে দূরে সরিয়ে দেয়, তবে তা জেনে ফেলতে কত সময়।

বীরাঙ্গনা বলল, তোর ভিতরে আর কেউ আছে?

ফণিভূষণ বলে, কে আছে?

বীরাঙ্গনা বলল, না হলে তুই বললি কী করে ও কথা?

ফণিভূষণ বলে, আমাদের তো বিদায় নিতে হয়েছে মাসি, হয় নি?

বীরাঙ্গনা চুপ করে থাকে। তখন টিয়া ঢুকল পায়ে পায়ে। মস্ত ঝুলের ফ্রক। ফিতেটা কোমরে আঁটা নয়। এসে বসল বীরাঙ্গনার পাশে। আড় চোখে দেখল হাবলুকে। হাবলু তাকে জিজ্ঞেস করল, তোর নবেল পড়া শেষ হল?

সব সময় কি নবেল পড়ি আমি?

তোর নবেলে কী লেখা থাকে রে?

জানি না যাও। টিয়া মুখ ঝামটা দিল, তারপর বীরাঙ্গনাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি মানিক রায়ের কথা বললে, তারপর কী হল?

কী হবে, সে তো সাধু হয়ে গেল দুঃখে।

সেই জমিদারের মেয়ের নাম কী ছিল দিদমা?

হাবলু বলল, ময়রম, সে খুব সুন্দর, নবেল পড়ে না।

টিয়া রেগে গেল। রাগ কপট নাকি সত্য তা ধরবে কে? বলল, হাবলুদা ওসব কথা বলো না, তখন নবেল ছিল না, ছাপাই হত না বই।

হাবলু বলল, না তাই-ই, থাকলে ও পড়ত না।

বীরাঙ্গনা শুনতে শুনতে বলে, কলহ করিস কেন, ময়রম তার নাম কে বলল রে?

হাবলু বলল, আমি জানি।

এহ, তুমি সব জানো। জিভ বের করে ভেঙাল টিয়া, ময়রম হতে যাবে কেন?

হাবলু বলল, তাহলে তুই বল, তোর নবেল পড়া মাথা, চন্দ্রমুখী না পার্বতী?

ইস! কী তুমি ফালতু কথা বলো হাবলুদা, ও তো দেবদাসে আছে।

হাবলু তখন ফণিভূষণকে জিজ্ঞেস করে, কী নাম ছিল তুমি বলো।

ফণিভূষণ বলল, জানে মাসি, মাসি তুমি বলো।

বীরাঙ্গনা বিড় বিড় করে, জুলেখা নাকি ময়রম? হাবলু যা বলল তাই হোক, ময়রম জমিদারের মেয়ে, মাথা ভরা চুল, দুধে আলতায় রং, চোখ দুটো টানা টানা, চোখে শুধু অশ্রু থাকে। মানিকরাম চলে গেল। আর আসে না কবি মানিকরাম। ময়রম তখন গাং পাড়ে বসে কাঁদে—যত নৌকো যায়, ডাক দেয়, ওগো তোমরা কি তারে দেখেছ, মানিকরাম, দত্ত কুলোদ্ভব কবি মানিকরাম। তারা বলে, না, না, না। ময়রম বলে, দেখলে বলো ময়রম গাং পাড়ে বসে তার জন্য কাঁদে।

শুনতে শুনতে টিয়ার মুখ থমথম করে। এই সব কথা শুনতে কষ্ট হয় যেমন, ভালোও লাগে তেমন। ওগো তোমরা দেখেছ তারে? দেখেছ? সে কি আর ফিরবে না? ভালোবাসার ভিতরে যে কেন হিন্দু মুসলমান থাকে? ভালোবাসা, ভালোবাসা।

কী হল তোর? বীরাঙ্গনা জিজ্ঞেস করে।

টিয়া বলল, গাঙের ধারটা কান্নার জন্য হয় দিদমা?

বীরাঙ্গনা দাসী তার পিঠে হাত দেয়, বলে, বুঝবি, পরে বুঝবি।

সাত

ফণিভূষণকে শোনায় বীরাঙ্গনা কপোতাক্ষ প্রশস্তি। শুধু ফণিভূষণ কেন, খোকন, হাবলু শোনে, প্রভাময়ীও এসে বসে। গুণগুণ করে প্রভাময়ীও...সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে...ও কবিতা তিনি লিখলেন বিলেত গিয়ে। তখন মা জাহ্নবী বেঁচে নেই। বিলেত গিয়ে মা জাহ্নবী, অশ্রুঘাট, কপোতাক্ষর কথা মধুর মনে পড়ে। বিলেতের নদীতে অশ্রুঘাট দেখা যায়। অন্ধকারে বসে মধু কবির কপোতাক্ষর কথা মনে পড়ে। অন্ধকারে যেন কপোতাক্ষর কলকল শব্দ শুনতে পায় মধু।

হাবলু বলে, কপোতাক্ষর কলকল আমিও শুনি দিদমা।

বুড়ি ফোকলা গালে হাসে, বলে, আমিও শুনি, এই যে এতডা দিন দিল্লি ছিলাম, ভোর রাতি কপোতাক্ষর স্টিমারের ভোঁ শুনতে পাতাম।

ফণিভূষণ বলল, আমি তাহলে উঠি।

উঠবি কেন, থেকে যা।

না, থাকলি যা আছে ঘরে তালা ভেঙে নিয়ে যাবে।

দিনমানেও তো থাকিস নে, নেয় না?

দিনমানে আশপাশে কত মানুষ, যাই মাসি। বলে ফণিভূষণ উঠল, গিয়ে ভাত চাপাতি হবে।

বুড়ি বীরাঙ্গনাও উঠল, বলল, কতকাল আর নিজে রেঁধে খাবি?

থাক মাসি থাক।

কেন থাকপে রে, ও ফণি—তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

এই তো বললে, আবার কী বলবে?

কই বললাম, বলি নি তো।

এই যে অশ্রুঘাট, কপোতাক্ষ নদ...এসব কি কথা নয়?

এসব কথা, এর বাইরেও কথা থাকে, তা আছে, তোরে বলতি হবে, তোরেও শুনতি হবে, তোর বাসায় যাব।

তাহলে চলো, এখন চলো।

বীরাঙ্গনা বলল, আজ না, কাল যাব আমি।

কী করে যাবা, আমি এসে নিয়ে যাব?

তুই আমারে কাগজে লিখে দে, দমদম জংশন তো, ঘুঘুডাঙা পার হয়ে, ওসব আমি চিনি, ঠিক খুঁজে বের করব।

না পার যদি?

পারব পারব, পথের লোক পৌঁছে দেবে ঠিক।

হাবলুরে নিয়ে যেও না হয়।

না আমি একা যাব, হাবলু পরে যাবে।

ফণিভূষণ চুপ করে থাকল। বুড়ি আবার বসে পড়ল। কিছু সময় চুপ করে গুনগুন করতে লাগল, হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন, তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি, পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি...।

ফণিভূষণ আর দাঁড়াল না। অনেকটা হেঁটে যেতে হবে। পথের আলো কোথাও আছে কোথাও নেই। আবার ঘুঘুডাঙায় যে বসতি আছে পথের ধারে তা ভালো না। একদিন তাকে হাত ধরে টেনে ছিল। চলল সে। যেতে মন খারাপ হচ্ছিল বটে, তবে নিজের বাসায় ফেরার তো টান আছে একটা। আগে ছিল ভিটে, এখন হয়েছে বাসা। এখন ভেসে বেড়াতে হচ্ছে যে। ভিটেবাড়িতে ফিরতে পারবে কবে সে জানে না।

ফণিভূষণ চলে যেতে বীরাঙ্গনা চুপ করে থাকল কিছু সময়। হাবলুকে জিজ্ঞেস করল তার মা বাবা ভাই বোনের কথা। বনগাঁয় যে থাকে তার কথা। বসিরহাটে যে বোন থাকে তাকে দেখেছে বীরাঙ্গনা। তখন খোকন বলল, তুমি সাগরদাঁড়ির কথা আর বলবা না দিদমা, মধু কবির কথা?

বলবে। তা বলতেই তো বসেছে বুড়ি। তার বলার কথা তো ওইটা। ওই কথা সঙ্গে নিয়ে ওপার থেকে এসেছে। তা বাদে তো আর কিছুই আনতে পারে নি। তবে যেটুকু এনেছে তারই বা ভার কত? সাগরদাঁড়িকে ওপার থেকে এপারে যেন তুলে এনেছে বীরাঙ্গনা দাসী। ওপারে মধু কবির গাঁয়ে যেন সাগরদাঁড়ি আর নেই। নেই-ই বা বলে কী করে, অশ্রুঘাট থাকলে সাগরদাঁড়ি থাকবে না? পার্টিশান হল, যশোর ওপারে গেল, মধুমতী কপোতাক্ষ চিত্রা নদী ওপারে গেল, একদল মানুষ চলে এল সব ছেড়ে, তা দেখে আর একদল মানুষ যারা রয়ে গেল তারা যখন একা হল জনে জনে, ভাবল যা হল তা ঠিক হল না। অশ্রুঘাটে এক একজন গেল আর জল দেখল চোখের। সেই যে সেখানে, যেখানে মধু কবি মাদ্রাজ যাওয়ার আগে এসে তাঁবু ফেলেছিল। গাঁর মানুষ বলে বিলেত যাওয়ার আগে। যখন মধু বিলেত যায় তখন মা জাহ্নবী বেঁচে নেই। বেঁচে নেই তাই মধু আসবে কেন?

তারপর? তারপর যা হয়েছিল সব সাগরদাঁড়ির মানুষ বলবে। তখন বলেছিল, এখন বলবে, পরেও বলবে। আর মানুষ যদি না থাকে, গাঁ যদি শূন্য হয়ে যায়, সবাই যদি ঘুমিয়ে পড়ে কপোতাক্ষ সব বলবে। তুমি যদি একা যাও অশ্রুঘাটে, তোমার সামনে নদী, মাথায় তারা জ্বলা আকাশ, সে আকাশে চাঁদ আছে কী নেই তা নিয়ে ভাবার দরকার নেই, নদীর জল কথা বলবে তোমার সঙ্গে। গাঙের জল বলবে, এসো বীরাঙ্গনা বসো এই ঘাটে, এখেনে সব রাতে মধু এসে বসে থাকে।

মধু! কবি মধুসূদন?

হ্যাঁ, মেয়ে, তারে দেখি, সে কথা বলে না, শুধু তাকিয়ে থাকে।

বীরাঙ্গনা বলল, কই সে কোথায়?

ওই দ্যাখো গাঙে তার নাও ভাসাল, মায়ের কাছে এল, মার দেখা মিলল না, খ্রিস্টান হয়েছে মধু, রাজনারায়ণের মানে লেগেছে, বলেছে দত্ত বাড়িতে যেন পা না দেয়।

বীরাঙ্গনা বলে, মধু এসেছে খবর গেল মা জাহ্নবীর কাছে। মার বুক ফাটে যে। মধুর আগে দুটো সন্তান ছিল তার, বাঁচেনি। বেঁচে আছে এইজন। এ কী রকমভাবে বাঁচা? মধু তার আদরের ধন, বুকের কলজে। কিন্তু মধুকে দেখার উপায় নেই। গাঁর মানুষ বলে, আমরা কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান, আমাদের তো রাগ নেই মধুর ওপর। মধু গাঁয়ের রত্ন। সে সায়েব হল কী হল না, তাতে আমাদের কী যায় আসে? রাজনারায়ণ জমিদার। তার আঁতে লেগেছে।

তারপর কী হল? কপোতাক্ষ বলে সে অনেক কথা। কিন্তু জানে আমার যাত্রাপথের দু'পাশের গাঁর সব মানুষ। তারা বলে একা একা সমস্ত রাত জেগে থাকত মধু, যদি

রাতের অন্ধকারে মা আসে। কেউ বলে জেগে থাকত আর গুনগুন করত, রেখো মা দাসেরে মনে...

তাই কি কখনও হয়? ও কবিতা কবে লেখা আর মধু কবে হল শ্রীমধুসূদন? হয় হয় মনে করলেই সব হয়। যা ঘটে নি তাও ঘটানো যায় যদি মন সেই দিকে ধায়। কেউ বলে মা এসেছিল একদিন। কেউ বলে না আসে নি। রাজনারায়ণের ভীষণ জেদ। মুখ দেখবে না মধুর।

সেটা কি ভালো হয়েছিল? না না একদম না। কত বড় হয়েছিল মধু। তারে কি এভাবে বিদায় দেওয়া ভালো? বীরাঙ্গনাকে বলেছিল ইস্টিমারের সারেঙ হাতেম মোল্লা। মধু জন্মাতে সাগরদাঁড়ি মধুময় হয়ে গেল, বলতে বলতে সে চোখ মুছেছিল অশ্রুঘাটে বসে।

থাক আর বলতে হবে না মাসি, আমারও দুটো সন্তান নেই, একটা বেঁচে আছে, আমি সহ্য করতে পারছি নে, প্রভাময়ী বলে।

শুনে বীরাঙ্গনা বলে, মা হলে সব সহ্য করতে হয়, শোন প্রভা, গাঁর মানুষ বলে, এসো মধু, আমাদের ঘরে এসো।

মধু বলল, জমিদার শোধ নেবে।

নেয় নিক, তবু তুমি গাঙের ধারে পড়ে থাকবা, আমরা কী করে ঘরে থাকি, ও মধু এসো, আমরাও তুমার বাপ মা।

মধু বলল, মা এসে ফিরে যাবে।

মা জাহ্নবী আসতি পারবে না।

মধু চুপ করে থাকল। গাঁর লোক তখন বলল, যদি তুমি এখেনে পড়ে থাক মধু, আমরাও পড়ে থাকব সবাই।

কেন, আমি পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত বিধর্মী সন্তান।

গাঁর মানুষ বলল, তুমি আমাদের মধু।

গাঁর মানুষ বলল, তুমি না থাকলে সাগরদাঁড়ি মধুহীন হবে।

মধু চুপ করে থাকল। কলকাতা শহরে যারা ছিল তার ঘনিষ্ঠ, তারা সব দূরে সরে গেছে ধর্মত্যাগ করার জন্য। কাজ নেই তার। পেট চালানো দায়। কলকাতা শহরটাকে মনে হচ্ছিল বিদেশ বিভুঁই। অচেনা। চেনা মানুষগুলি তাকে চিনতে পারছিল না। শহর তাকে চায় না মনে হচ্ছিল। এই যে এই কলকাতা প্রভা। বিদেশ যেমন হয় তেমনি এ শহর তার কাছে দুঃখের হয়ে উঠল। সে মাদ্রাজ যাবে। যাওয়ার আগে একবার মা জাহ্নবীকে প্রণাম করে যাবে না? মা জাহ্নবীকে দেখে যাবে না? বাড়িতে ঠাঁই হল না, তাঁবু ফেলল গাঙ-পাড়ে। আশ্চর্য। কলকাতা নেয় নি, সাগরদাঁড়ির চাষাভুসো, কামার কুমোর, কপোতাক্ষর মাঝিমাল্লারা ডাকল, এসো মধু এসো।

দত্তবাড়ির ঘুলঘুলিতে বাসা করা, ছাতের উপরে পাক মারা কবুতর—কপোতের দল উড়তে উড়তে মধুর মাথায় আসে, ডাক দেয়, এসো মধু এসো।

কপোতাক্ষ নদ বলে, যাও মধু যাও।

গাঁয়ের এক বুড়ো ধরল নগেন কে, পুরাতন ভৃত্য, দত্তবাড়িতে তার বাস, তাকে বলল, এই তুই নিয়ে যা তোর মধুদাদাকে।

নগেন বলল, মধু দাদা চলুক, আমি পিছে পিছে যাই।

না তুই ডেকে লিয়ে যা, বল বড়বাবু ডেকেছে।

বড়বাবু ডেকেছে? নগেন বিস্মিত হল, ডেকেছে নাকি?

বলবি তুই, বলতি পারবি নে।

নগেন খুব সরল প্রকৃতির মানুষ। মধুর বয়সি কিংবা বড় হতে পারে এক দু'বছরের। শক্তপোক্ত মানুষ। মাথায় তেমন লম্বা নয়। কপোতাক্ষর পলি মাটির মতো তার গায়ের মেটে রঙ। চোখ দুটি ছোট ছোট। মাথার চুলে কদম ফুলের মতো ভাব। খোঁচা খোঁচা উঠে আসে সর্বসময়। নগেন বুঝতে পারছিল না বড়বাবুর কথা যা বলছে বুড়ো বছিরদ্দি তা সে জানল না কেন আগে? বছিরদ্দি জানল, সবাই জানল অথচ সে জানল না? বছিরদ্দির পাশে দাঁড়ান আর এক চাষা, গুরু মণ্ডল বলল, 'হাঁ হাঁ, লিয়ে যা লগেন, মধুবাবু কত বড় 'শিখ্খিত্', তার মান তারে না দিলে হবে? তারে ডেকে লিয়ে যেতি হবে, আসো মদু বসো মদু করতি হবে।'

বছিরদ্দি চোখ পাকিয়ে উঠল, এই গুরু তুই থাম, যা লিয়ে যা, কেস্তান হয়েচে, তা বলে কি মদু আর মদু নেই, বাপের বেটা তো বাপের বেটাই আছে, সাগরদাঁড়ির বেটা সাগরদাঁড়িরই রয়েছে, বল গে বড়বাবু ডেকেছে।

কখন ডাকল চাচা?

কখন ডাকল? বছিরদ্দি মাথা নাড়ে, তা তো জানি নে।

তুমারে কেডা বলল?

কেডা বলল? বছিরদ্দি মাথা ঝাঁকায়, নাহ্ কেডায় তো বলে নি?

বলেনি যদি কেডায়, তবে জানলে কী করে?

বড়বাবুর বুক ফেটি যাচ্ছে, তুই লিয়ে যা।

নগেন বুঝতে পারে না কী করবে? মধু কি বাড়ি চেনে না। ওই তো দালান বাড়ি। মধু তার বাড়িতে নিজে যাবে, তাকে নিয়ে যেতে হবে কেন? মধু খেস্টান হয়েছে বলে? খেস্টান হয়ে কি মধু আর মধু নেই? মধু কি সব ভুলে গেছে? এই সাগরদাঁড়ি গাং কপোতাক্ষ, দত্তবাড়ি, চুষির আম গাছ, জাম জামরুল—সব। খেস্টান করে তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে সব কথা। তাহলে কি মা জাহ্নবী, পিতা রাজনারায়ণের কথা মনে নেই মধুসূদনের? নগেনকেও ভুলে গেছে? ভুলেই যদি যাবে তবে এল কী করে কপোতাক্ষ

পাড়ে সাগরদাঁড়ি গ্রামে?

নগেন বলল, মধুদাদা তো সব ভুলে গেছে।

ভুলে গেছে, কেডা বলল? বছিরদ্দি অবাক।

না ভুললে বাড়ি যায় না কেন?

ধুস। তোর মাথায় গোবর, কেস্তান হয়েছে না, কই আমার ঘরে কেউ খেস্টান হলে আমি তো এমন করতাম না, যা করেছিস ভুল করেছিস বাপ, আবার আগের মতো হয়ে যা।

বড়বাবু না করেছে আমারে।

বড়বাবুই ভুলেছে অমন সোন্দর বেটাকে, ধুস আমরাই যাব, এ দেশ্য সহ্য করা যায় না নগেন, রাজার বেটা পথে বসে থাকবে, এ কখনও হতি পারে? বলে বুড়ো বছিরদ্দি গামছা দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

আট

মা জাহ্নবীর কাছে খবর নিয়ে গেল নগেন, মধু এসেছে, গাঙের ধারে তাঁবু ফেলেছে, বড়বাবুর হুকুম কেউ যেন মধুর কাছে না যায়।

একা রয়েছে সে?

নগেন মাথা নাড়ে, বলে গাঁ ভেঙে পড়েছে, গাঁর লোক বলছে চলো মধু মার কাছে চলো, দেখি বড়বাবু দত্তমশায় কী বলে?

কী বলল সে?

না, তার তো মাথা উঁচু, উঁচু মাথা নোয়াবে না। গাঁয়ের কোনও বুড়ো বলে, যা হয়েছে হয়েছে, কাছারি ঘরে ওঠো মধু, ভিতরে না হয় না গেলে, তুমি তো খেস্টান, বড়বাবু তাই বারণ করেছে।

মধু বলল, না, রাজনারায়ণ দত্ত এসে নিয়ে গেলে নাকি সে যাবে। বোঝো তাহলে কেমন অকুতোভয় সে। বাপের মান আছে, মান তো তারও আছে। মাথা সে নোয়াতে পারে মা জাহ্নবীর কাছে। মাথা সেখানে নোয়াতেই এসেছে মধু। গর্ভধারিণীকে চোখের দেখা দেখবে একবার। সে যাবে বহুদূর। কবে ফিরবে জানে না। যাত্রাকালে মায়ের চরণ ছুঁয়ে যাবে।

কোথায় যাবে মধু?

গাঁর মানুষ বলে, বিলেত গিয়েছিল মধু, যাওয়ার আগে এসেছিল। যখন বিলেত গিয়েছিল তখন তো মা জাহ্নবী বেঁচে নেই। না থাকুক। কবে কী হয়েছিল তা তারা জানবে কী করে? নিজেদের মতো করে ভেবে নিয়েছে। কাহিনি গড়ে নিয়েছে। এতো আর সন তারিখ মেলানো ইতিহাস নয়, এ হল অশ্রুঘাটের কথা। একথা সাগরদাঁড়ির

লোকের মনে মনে তৈরি হয়।

তাঁবু ফেলেছে শ্রীমধুসূদন গাঙপাড়েই। হায়রে। দত্তকুলোদ্ভব শ্রী মধুসূদন, সাগরদাঁড়ির মধু কিনা গাঙ ধারে একা একা। সঙ্গে দুটি কাজের লোক। তারা পশ্চিমা হবে। হিন্দিতে কথা বলে, শুনে ভারী আহ্লাদ হয়।

গাঁর মানুষ বলল, আমরা তাহলে বলি বড়বাবুকে?

মধু বলল, না, বড়বাবু সবই জানেন।

লোকে চোখ মুছল। অত বড় দালান কোঠা, তার ভিতরে কত কত ঘর, কত অলিন্দ কত চবুতরা, কত পায়রার বকমবকম, দাস দাসী, রাজানারায়ণ দত্তর চার বউ, তাদের সন্তানাদি, মধুর সেখানে স্থান নেই।

লোকে বলল, কোথা যাও মধু, তুমি সাগরদাঁড়ি ফিরে এসো।

মধু হাসল। ভালোবাসায় অভিভূত হল, মাথা নড়ল, না তা হয় নাকি?

কেন হয় না?

আমার কাব্য আমার কবিতা।

লোকে চুপ করে গেল। কারোর কারোর হয়তো জানা ছিল মাণিকরামের কথা, মধুর খুল্ল পিতামহ, রাজনারায়ণের কাকা, এই কবিতা তাকে শেষ করেছে। সন্ন্যাসী হয়ে কোন দেশে চলে গেছে কে জানে? মাণিকরামের ছায়া যেন মধুর ভিতরে। কিন্তু মাণিকরাম তো ধর্ম ত্যাগ করেনি, মধু করল। মাণিকরাম যা পেরেছিল মধু তা পারে নি। কত কথা গাঁয়ে ভেসে আসে। মধু নাকি ইংরেজ সায়েবের ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করবে তাই ধর্ম ছেড়েছে। মাণিকরাম যা করে নি, মধু তাই করেছে। এসব কথা কেউ বিশ্বাস করে কেউ করে না। বিশ্বাস করে রাজনারায়ণকে সমর্থন করলেও মধুকে দেখে সব রাগ জল হয়ে গেছে। মধুময় হয়ে উঠেছে সাগরদাঁড়ি।

লোকে বলছে, আহা, মধুর কী দোষ, সায়েবরা লোভ দেখিয়েছে, বিলেত পাঠাবে, মেম বিয়ে দেবে, তাই মধু কেস্তান হল।

কলকাতার কেল্লায় লুকিয়ে রেখে সায়েব পাদরি ওকে খ্রিস্টান করল, না হলে রাজনারায়ণ ছেলেকে উদ্ধার করতই ঠিক। লেঠেলরা সমস্ত শহর চুঁড়ে খুঁজে পায়নি দত্ত কুলোদ্ভব শ্রী মধুসূদনকে। মধুকে পেলে খ্রিস্টান করতে পারত না ওরা।

বিন বিন করছে সাগরদাঁড়ির লোক। কপোতাক্ষর তীরে তারা ভিড় করে আছে। আহা দুটো সন্তানের মৃত্যুর পর একে বাঁচাতে পেরেছিল জাহ্নবী মা। কত আদরে বড় হয়েছে। এখন পড়ে আছে নদীঘাটে। ওই যে তাঁবুর ওধারে দাঁড়িয়ে আছে নগেন। ভোরবেলায় নগেন নিয়ে এসেছিল নারকোলের নাড়ু ক্ষীরের তক্তি, রাতে নিয়ে এসেছে ভাত। মা জাহ্নবী লুকিয়ে পাঠিয়েছে। নগেন দেখছে মধু পায়চারি করছে ইংরেজি-বিলিতি ভাষায় কী যেন বলে যাচ্ছে দুলে দুলে। নগেন কিছুই বুঝতে পারছে না, কিন্তু মধুর

গলার স্বরে যে দুঃখ আছে কষ্ট আছে তা টের পাচ্ছে। তার বয়স মধুরই বয়স। মধুর সঙ্গে সে বড় হয়েছিল...।

শুনতে শুনতে ফণিভূষণ বলে, তুমি এ গল্প তো আগে বলো নি মাসি।

বীরাঙ্গনা বলল, ও বাসায় শুনালাম, তুই তো থাকলি নে কাল।

বীরাঙ্গনা এসেছে হাঁটতে হাঁটতে, একা একা। দমদম থেকে বেলগাছিয়া যে পায়ে হাঁটা পথ তা বীরাঙ্গনা ভালো চেনে। আর ঠিকানা খুঁজে মধুর বাড়ি আসা তার কাছে জল ভাত। ফণিভূষণের একটি ঘর, একফালি বারান্দা, তারই একধারে ঢেকে রান্নার ব্যবস্থা। এ বাসায় ইলেকট্রিক নেই। হেরিকেন জ্বলে ফণিভূষণের ঘরে। সে কাজ করে বড়বাজারে। খাতাপত্তর দ্যাখে, হিসেব রাখে। তার মালিকের অনেক ব্যবসা। সে ফণিকে চিৎপুরে থাকার জায়গা দিচ্ছিল। কিন্তু ফণি যায় নি, বিনা ভাড়ায় হলেও যায় নি। সেখানে যে বাড়িতে ঘর দিচ্ছিল সেখানে সব মাড়োয়ারি পরিবার। ফণি কী করে থাকবে? তারা মাছ খায় না, ফণির মাছ ছাড়া চলে না। তারা সব পয়সাওয়ালা লোক। ফণি কারও আশ্রয়ে থাকতে চায় না।

বীরাঙ্গনা বলল, ফণি তোর সঙ্গে আগে দেখা হয় নি কেন?

ফণি হাসল। পার্টিশন কত চেনা লোককে দূরে ঠেলে দিয়েছে, অচেনা লোককে কাছে এনে দিয়েছে। অভিরাম যখন খুলনায় কাজ করত, তখন ফণি তার মাকে নিয়ে সেখানে যেত মাঝেমধ্যে। অভিরাম সরকারি লোক। ফণির তার কাছেই দরকার পড়ত, তাদের পৈতৃক সম্পত্তি দখল হয়ে যাচ্ছিল। সেই আলাপ। ফণিকে ভালো লেগেছিল অভিরামের। ফণিরও মনে হয়েছিল অভিরামদা লোকটা ভালো, নির্ভরযোগ্য। মা ওপারে চোখ বুজেছিল। সম্পত্তি বেচেবুচে ফণি এপারে চলে এসেছিল। এপারে এসে খুঁজে বের করেছিল অভিরামকে। অভিরামের বাসায় উঠেছিল প্রথমে, তারপর এই বাসা। অভিরামের ওখানে বীরাঙ্গনা মাসির সঙ্গে তার পরিচয়।

ফণিভূষণ বলল, মাসি মধুর কথা কি শেষ হয়ে গেল আজ?

মাথা নেড়ে বীরাঙ্গনা বলল, মধুর কথা কি শেষ হয়?

রাজনারায়ণ কী করল মাসি, মা জাহ্নবী?

কেউ জানে না রাজনারায়ণের বুক পুড়েছিল। মধুকে সে গোপনে সাহায্য করে। কিন্তু সাগরদাঁড়িতে রাজনারায়ণের অন্য রূপ। ঘাটে মধু বসেই থাকল। জাহ্নবী ঘরে বসে মূর্ছা যেতে লাগল।

বীরাঙ্গনা বলে, শোন ফণি, শোন—

জাহ্নবী কাঁদিয়া কহে
ঘরে আয় মধু
বুকখানি খালি মোর

রোদ-পুড়া ধূ ধূ।

ফণি জিজ্ঞেস করে, এ কার লেখা?

ফোকলা গালে বীরাঙ্গনা হাসে, আমার আমার, লিখিনি, মনে মনে সুর তুলেছি।

সুর! এ কি গান?

হ্যাঁরে ফণি, সুর, সুর ছাড়া কিছু হয়, গান ছাড়া কি সুর হয় না?

ফণি বলল, ছন্দ হয় মাসি।

ওই হল, ওটি না থাকলে জীবন আর জীবন থাকে না ফণি, অশ্রুঘাটে বোশেকমাসের অন্ধকারে জাহ্নবী পুত্র শ্রী মধুসূদন বড় কোনও ইংরেজ কবিকে আউড়ে যাচ্ছিল, কবি বায়রন হতে পারে, নাকি নিজের কবিতা তা নগেন কী করে বুঝবে, নগেন বলে, শুনতে শুনতে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

এমনি এমনি! না বুঝে?

হয় হয়, ভাষা যা হোক, তোমরা বলবে সুরটা কেমন, ও ফণি, মার নাড়ি ছেঁড়া ধন মধু নাকি কালাপানি পার হয়ে যাবে, আর কি হবে দেখা?

ফণি বলল, এসব গল্প, দ্যাখো মাসি তোমারে তো আগে চিনতাম না, দাদার বাসায় গিয়ে তোমারে চিনলাম, শুনলাম তুমি মধু কবির কথা জানো, তারপর দেখি তুমি মধু কবিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ, নিয়ে এসে বিলোচ্ছ, যত বিলোও তত তোমার ভিতরটা ভরে যাচ্ছে, ও মাসি মধু যখন বিলেত যায় মা জাহ্নবী তখন বেঁচে নেই।

বীরাঙ্গনা বলে, সে কি আমি জানি নে?

তবে কী করে মধু গেল সাগরদাঁড়ি।

মাদ্রাজ যাওয়ার আগে হতি পারে, এসব সাগরদাঁড়ির মানুষের কথা।

ভুল কথা।

ভুল হলে ও সত্যি, লোকে কপোতাক্ষর তীরে বসে এই কথা কতদিন ধরে ভেবে ভেবে চোখের জল ফেলেছে, সত্যি হবে না?

ফণি বলে, আমি বুঝতে পারছি নে।

চেষ্টা কর, অন্তর দিয়ে ভাব, বুঝতে পারবি, মা জাহ্নবী বাড়ির ছাদে উঠে দেখতে চায় কোথায় তার মধু, নগেন তাকে বলেছে অন্ধকারে একবার নিয়ে যাবে, বাবু ঘুমোলে নিয়ে যাবে। মা জাহ্নবী বলছিল, আমি জীবনে মরিয়া আছি নগেন, আমি মরিয়া বাঁচিব, কিন্তু আমার বাছার মুখখানি না দেখিয়া মরিতে ইচ্ছা করে না। বলতে বলতে বীরাঙ্গনা স্থির হল। তখন ফণি জিজ্ঞেস করে, দেখা হল?

শুনতে পায় নি বীরাঙ্গনা, বিড়বিড় করে-

দুগ্ধ-স্রোতো রূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে
আর কি হবে দেখা?—যতদিন যাবে,

ফণি তখন বলল, তুমি ওপার থেকে এলে কেন মাসি?

না এসে কী করতাম। বীরাঙ্গনা মুখ তুলে বলল।

সাগরদাঁড়ি থাকতে, তোমার মধু কবিরে নিয়ে থাকতে।

সাগরদাঁড়ির সে বাড়িতে কারা থাকে জানি নে।

তাঁর কেউ নেই?

তাও তো জানি নে ফণি? আর আমার ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি সব এপারে চলে এল, আমি ওপারে থাকি কী করে, হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয়ে গেল, সাগরদাঁড়িতে আমি কি থাকতি পারতাম?

সাগরদাঁড়ির মানুষ তোমারে ভালবাসত ঠিক।

কিছু বলা যায় না, গরিব চাষারা সব যেন স্বাধীন হয়েছে ফণি।

ফণিভূষণ বলল, আসলে কি তা হবে?

কী জানি, বুঝতি পারি নে কিছু।

গরিব পাবে না হিন্দুর সম্পত্তি, খারাপ লোক দখল করবে।

বীরাঙ্গনা চুপ করে থাকল, তারপর বলল, কলকাতা তো আমি দেখি নি আগে, কলকাতায় আসার খুব ইচ্ছে ছিল আমার, কানাইরে বলেছিলাম একেবারে কলকাতা আসতি, কিন্তু বসিরহাটে ওদিকের অনেক লোক। কানাই বলল, কলকাতায় হারায়ে যাবে, কিছু করে উঠতি পারবে না।

কলকাতায় আসে নি ভালো করেছে।

কিন্তু আমার যে খুব সাধ ছিল কলকাতায় আসি, মধু কবি তো এখেনেই ছিল ফণি, এখেনে তাঁর সমাধি, খিদিরপুরে বাড়ি।

সেই জন্যে কলকাতা? ফণিভূষণ হাসল।

হ্যাঁ সেই জন্যে, আমাকে একদিন পার্কস্ট্রিট নিয়ে যাবি, সেখেনে তাঁর সমাধি লিপি আছে,

হ্যাঁ শুনেছি, দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তবে বঙ্গে।...

শোন আমি বলি ঃ যশোরে সাগরদাঁড়ি কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

ফণিভূষণ বলল, তোমারে আমি নিয়ে যাব।

খিদিরপুর নিয়ে যেতি হবে ফণি।

যাব, যাব।

মহাতীর্থ দেখে আসি ফণি, আমাদের ফিংড়ি থেকে তো এসব দেখতি আসতি পারতাম না, কে আমারে আনবে এখেনে বল।

ফণিভূষণ বলল, তোমার মধুকবিই তোমারে এনেছে মাসি, প্রাণভরে সব দেখে নিও।

বড় কষ্টে জীবন গেছিল রে তাঁর।

জানি মাসি, শুনেছি।

কে বলেছে তোরে?

অভিরামদা এক এক সময়ে যে বলে।

হুঁ। মাথা দোলায় বীরাঙ্গনা।

মাসি তুমি কথা শেষ কর নি, দেখা হল কি মধু আর মা জাহ্নবীর?

এসব জানে সাগরদাঁড়ি গ্রাম, তারা যা বলে তাই সত্য, শোন ফণি—। বীরাঙ্গনা তাঁর স্মৃতির ঝাঁপি খুলতে থাকে একটু একটু করে।

নয়

এ সব কত কালের কথা। কত দূরের কথা। এসব সত্য হতে পারে, নাও পারে, কিন্তু সাগরদাঁড়ি—কপোতাক্ষ তীরের মানুষ বলে, সত্য। সত্য যে খ্রিস্টান মধু এসেছিল মায়ের কাছে। মা জাহ্নবীকে প্রণাম করে মধু চলে যাবে কালাপানির ওপারে। তখন মাদ্রাজ যাওয়াও কালাপানি পার হওয়া। মধুর নৌকো ভিড়েছে কপোতাক্ষর ধারে, তাঁবু ফেলেছে মধু কপোতাক্ষ তীরে। ওই দেখা যায় দত্ত বাড়ি, রাজনারায়ণ দত্তর অট্টালিকা। কলকাতা থেকে ক'দিন আগে রাজনারায়ণ ফিরেছে জাহ্নবীকে নিয়ে। পুত্রকে ফেরাতে পারে নি, ব্যর্থ, অপমানিত রাজনারায়ণ ক'দিনের জন্য শ্বাস নিতে এসেছিলেন সাগরদাঁড়ি। আর ধান কাটা আরম্ভ হবে, হচ্ছে, সে কারণেও তাকে ফিরতে হয় এই সময়ে। এ বছর ধান হয়েছে ভাল, ভাল ফসল রাজনারায়ণকে পুত্র শোক ভোলাচ্ছিল। সে জাহ্নবীকে বলেছে, মনে করো তুমি পুত্রহারা মাতা, আমি পুত্রহারা পিতা।

এখন অঘ্রান মাস। হিমের পরশ লেগে গেছে প্রকৃতিতে। কপোতাক্ষর ঘাটে বজরা ভিড়লে সাগরদাঁড়ি ভেঙে পড়ল, কে এল, গোরা দারোগা, নীলকর ফার্গুসন আর কুঠির আমিন? নতুন করে দাগাবে নীল চাষের জমি? সে সব কেউ না, এসেছে কেস্তান মধু। মধু যে ধর্ম ছেড়েছে, এ কথা জানতে কি বাকি আছে কারো? ওই যে দত্ত বাড়ি, মস্ত অট্টালিকা, তার মাথায় চক্কোর মারছে গোলা পায়রার ঝাঁক। কুবো পাখিটা ডাকে আবার থেমে যায়, আবার ডাকে। মধুর তাঁবু থেকে দূরে দাঁড়িয়ে সাগরদাঁড়ির মানুষ কথা বলছিল দত্তবাড়ির কাজের লোক নগেনের সঙ্গে। নগেনের কাছে তারা সবটা জানল, নগেন যেটুকু জানে। নগেনকে পাঠিয়েছে মা জাহ্নবী, যা দেখে আয় মধুকে, ওর বাবার তো বারণ আছে, মধু আমার এবাড়িতে ঢুকতে পারবে না।

বুড়ো বছিরদ্দি জিজ্ঞেস করল, বাড়ি গে কী বলবি মারে?

নগেন কাঁধের গামছা কোমরে বাঁধতে বাঁধতে বলল, বলব, মদুদাদা এয়েচে।

দূর হনুমান, সে কি তোর মা জননী জানে না? বছিরদ্দির ভাই ছমিরদ্দি বলল।

নগেন এই কথা শুনে বিভ্রান্ত হয়ে কোমরের গামছা খুলে ফেলে কাঁধে রাখে, বিড়বিড় করে বলল, জানে, তবু তো আমারে পাঠাল।

তুই নিয়ে যা মদুরে। বুড়ো বছিরদ্দি বলল।

যাবে না, বাপ ওরে তেজ্য-পুত্তুর করেচে।

আরে ওরম হয়, আবার মিলও হয়, যা নিয়ে যা। ছমিরদ্দি বলল।

নগেন বলল, যাবে না তো মাও জানে, বাবুরও বারণ আচে।

বুড়ো বছিরদ্দি মাথা নাড়ে, বলে, ছাওয়ালরে দেখলি বাবুর মন ফেরবে।

নগেন বলল, কেস্তান হয়ে গেছে যে তারে কী করে ঘরে নেবে বাবু, বাবুর তো ধম্মো আছে, ছুঁতি পারবে কি মা?

নগেনের এই কথায় বছিরদ্দি ছমিরদ্দি চুপ। তা বটে। মোছলমান ছোঁয় না যখন কেস্তান ছোঁয় কী করে? এই ঠাণ্ডার দিনে কতবার চান করবে মানুষ। তারা ঘাড় দুলিয়ে সমর্থন করল নগেনকে। রাজনারায়ণ দত্ত কঠিন মানুষ। হিন্দু ধর্ম আরো কঠিন। ঠিকই তো কেস্তান ছুঁয়ে চান না করলে হিন্দু কি হিন্দু থাকে। চ্যান করোরে, গোবর মুখে দাওরে, আগুন ছোঁওরে, নিমপাতা দাঁতে কেটে লোহা ছুঁয়ে বুঝি ঘরে ঢুকতে হবে। মড়া ছুঁলে যেমন হয়, শ্মশান থেকে ফিরলে যেমন করে হিন্দু। বছিরদ্দি মনে মনে জানে, অমন হলেই তবে হিন্দু। তবেই মনে ভক্তি আসে।

নগেন সব জানে। নগেন বাবুর সঙ্গে কলিকাতায় বাবুর খিদিরপুরের বাড়িতে থাকে, বাবুর সঙ্গে ঘোরে। একবার তমলুকও গিয়েছিল, সেখানে গাঙ যেন সমুদ্দুর। বাবু এলে সে গাঁয়ে ফিরে আসে। মা জাহ্নবী আসে বাবু এলে তাঁর সঙ্গে। নগেন তাই মা জাহ্নবীর সঙ্গে ফেরে বলা যায়। নগেন এ বাড়ির বাঁধা লোক। তার বয়স মধুর চেয়ে একটু বেশি। মধুকেও সে খুব মান্য করে, ভয় করে। মধুকে অবাক হয়ে দ্যাখে, পাপের ভয় নেই, নরকের ভয় নেই, তেলের কড়ায় ফেলে দিয়ে ভাজবে যমদূত, সে ভয় নেই, কী সাহস মদুদাদার!

সাহস তো বটে মধুর। কলকাতায় যখন খবর হলো মধু কেস্তান হয়েছে গির্জে গিয়ে, তার নামের আগে মাইকেল বসেছে, তখন বাবুর ভাড়া করা লেঠেল শহর দাপিয়েও খুঁজে পায় নি মধুকে। লেঠেলরা সব বেহারী, আহির—গোয়ালা। আহিরিটোলা গিয়েছিল বাবু নৌকোয়, সঙ্গে নগেন। কী সব চেহারা তাদের, দেখলে বুক কাঁপে। যেমন আড়ে তেমনি বহরে। পাকানো মোচ, দাপিয়ে দাপিয়ে হাঁটে। অমন মানুষ এদিকে মেলে না। ওই সব ঘোষেদের মানে গোয়ালা—আহিরদের যেমন চেহারা, তেমনি তাগড়াই তাদের গরুগুলো। এদিকে অমন হয় না। নগেন মধুর খোঁজে এসে আহিরিটোলার আহিরদের

কথা বলে। অমন তেজ দেখা যায় না এদিকের মানুষের ভিতর। শুধু সাগরদাঁড়ির মধুরই নাকি অমন তেজ। দত্তবাড়ির ছাওয়ালই অমনি হয়েছে। এতক্ষণে ধরা গেল নগেন কেন আহিরদের কথা এত মন দিয়ে বলছিল। কে না জানে বেহারি গোয়ালারা অমন দুর্দান্ত হয়। যশোরেও তারা আছে দশ ঘরের মতো।

হুঁ, মধু অমন মস্ত হয়েছে। অমন তেজ হয়েছে তার। বাপ-ঠাকুর্দার এত সম্পত্তি, মোকদ্দমা করে বাপের কত আয়, দিন গেলে কত পয়সার ঝনঝনানি, সব ছেড়ে সে গির্জের পুরুতের কাছে গিয়ে যিশুর ধর্মে দীক্ষা নিল! সে যে বিধর্মীর ধর্ম তা কি মধু জানে না? খুব জানে। জানত বাপ তাকে তেজ্য করবে, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে, তবু সে ফিরল না। সে যে কবি হবে। কালাপানি পার হয়ে সায়েবের দেশে যাবে। আর সেই জন্য বাবা, মা, সাগরদাঁড়ি, জমিদারি—সব কিছু ত্যাগ করতে পারল। নগেনের বড় অবাক লাগে। মধু তার চেয়ে ছোট, কিন্তু মনে হয় কত বড়। মধু যেন তার বাবার চেয়েও বড়। কী সুন্দর রামায়ণ, মহাভারত শোনাত মা জাহ্নবীকে। নগেনও তার ভাগ পেয়েছে। মধুর সব মুখস্থ। গড়গড় করে বলে যেত লক্ষ্মণের শক্তিশেল, মেঘনাদের বীর বিক্রম আর মরণ। শুনতে শুনতে মা জাহ্নবীর চোখে জল, মধু বলত, কপোতাক্ষর ধারা। বলতে বলতে নগেনের চোখে সেই ধারা নামল। বাবু রাজনারায়ণ বলেছে, ছেলে মরে গেছে ধরে নাও মধুর মা।

শুনে মা জাহ্নবী দেওয়ালে মাথা দিয়ে মুখ আড়াল করে, সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে। দেখতে দেখতে রাজনারায়ণ বলেছিল, কেঁদে ন্যাও, ও কাঁদাতি এয়েছিল।

নগেন দরজায় দাঁড়িয়ে, সে যে বলবে, 'বাবু অমনি কথা বলবেন না, মদুদাদা ফিরে আসবে, আসবেই ঠিক, তকন বুকি টেনি নিয়ো বাবু।' কিন্তু কথা তার বুকের ভিতরেই রয়ে গেল। রাজনারায়ণের উগ্র মূর্তির সামনে কথা বলে এমন সাধ্য আর সাহস তার কই? কিন্তু বাবু যখন বলল, 'দ্যাও, নিমপাতা দাঁতে কাটি, আগুন দ্যাও ছুঁয়ে নিই, ল দ্যাও...শ্মশান থেকে আলাম কিনা।' শুনতে শুনতে মা জাহ্নবী মাটিতে লুটিয়ে। নগেন ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবুর পা জড়িয়ে ধরেছিল, আর না বাবু, এতে মঙ্গল হবে না মদুদাদার।

সরে যা নগেন। গর্জন করে উঠেছিল রাজনারায়ণ দত্ত।

নগেন সরে নি, বলেছিল, মদুদাদা আমার বড়ভাই বাবু, মদুদাদা আমার কত্তা, তারে অভিশাপ দিও না, বুক ফেটি যাচ্ছে।

বিড় বিড় করে কী বলিস নগেন? বছিরদ্দি তাকে ঝাঁকিয়ে দিল এক হাতে।

নগেন কাঁধের গামছা আবার কোমরে বাঁধল, বলল, বাবু আর মা খুব দুঃখ পেইছে বছির চাচা।

তা হলে ঘরে নিয়ে যা। ছমিরদ্দি বলল।

বাবু হলেন মদুদাদার বাপ, যেমন বাপ তেমনি বেটা, দুজনারই খুব রোষ।

শুনে বছিরদ্দির ছোট ছমিরদ্দি বলে, তাই বলে সাগরদাঁড়ির ছাওয়াল গাং ধারে পড়ি থাকবে, তা আমাদ্দের দেখতি হবে?

কে যেন বলল, তুমার ঘরে যদি হতো?

কেডা বলে? ছমিরদ্দি ঘুরে দ্যাখে বুড়ো যতীন মিত্তির। সে বলল, আমার ঘরে হলি আমি কী করতাম তা জানি, কিন্তু তুমার ঘরে হলি তুমি কী করতে খুড়ো?

যতীন মিত্তির মাথায় ছাতা ফুটোতে ফুটোতে বলে, ঘরি তুলতি পারতাম না, ধম্মোডা চোদ্দো পুরুষির, তা ত্যাগ করা মানে চোদ্দো পুরুষ ত্যাগ করা এডা জান?

বুড়ো বছিরদ্দি বলে, আমি ফেরত নিতাম ছাওয়াল, ছাওয়াল বলি কথা, বলতাম বাপ কেস্তান হইচিস হ, কিন্তু সংসারে থাক, নমাজও দে।

তা হয় নাকি? যতীন মিত্তির সংশয় প্রকাশ করল অবাক হয়ে।

হওয়ালি হয়। বছিরদ্দি বলল হাসি মুখে, আল্লা মাপ করলিই হলো, আমরা কেডা!

অত সুজা না আমার ধম্মো। যতীন মিত্তির বল।

তা বলে ছাওয়াল গাং ধারে পড়ে থাকবে মা'র জন্যি? বছিরদ্দি বলল, থাক না কেস্তান হয়ে, বেঁচি থাকলিই হলো, সে বুঝতি পারলি ঘুরি আসবে একদিন না একদিন।

যতীন মিত্তির মাথা নাড়ে প্রবল আপত্তিতে, বলেছিল, হ্যাঁহ্, ইবার ধম্মো রাখাই দায় হবে, এ তুমার ধম্মো না, আমাদ্দের কত ঠাকুর বলো, এ যদি মত দেয়, ও বলবে, না, হতি পারে না।

ঠাকুর তুমার আমার মতন হতি পারে না, কথাডা তুমি মানষির সংসারের কথা বলতিছ, ঠাকুর মত দেবে, দেবেই, যা নগেন গিয়ে বল, মা ডাকতিছে, বলগে, ঘরে চ মদুদাদা।

মদুদাদা কি যাবে? নগেন সংশয় প্রকাশ করেছিল।

যাবে না! কেন যাবে না?

যাবে যদি গাং ধারে তাঁবু ফেলল কেন? নগেন বলল।

দত্তবাড়ির সদর বন্ধ, তাই। বছিরদ্দি বলেছিল।

নগেন মাথা নাড়ে, বলে, মা জননী দোর গোড়ায় বসে আছে, কানছে, মদুদাদা মা'র সঙ্গে গাং ধারে দেখা করবে বলে বসে আছে।

এডা হয় না, সাগরদাঁড়িতি এমন হয় নি কখনো—বিন বিন করে উপস্থিত আর পাঁচজন, মুসলমান, নমঃশূদ্র চাষারা বলতে লাগল। যতীন মিত্তির বলে, ধম্মো রাখতি হয়, দত্তবাবু ঠিক করেছে, ধম্মোত্যাগী পুত্তুর আর পুত্তুর থাকে না, এডা হিন্দু ধম্মের ব্যাপার, তুমরা কী বুঝবা, নগেন তুই ঘরে যা।

শুনে কোলাহল করে উঠেছিল সকলে। বুড়ো বছিরদ্দি কোমরের লুঙ্গির গিট খুলে আবার বাঁধতে বাঁধতে বলেছিল, আমি না হয় মোছলমান, বেজাত হলাম, তা গোপাল, নেপাল, ঠাকুরচাঁদ, নমঃরা কি হিঁদু না, তুমি একা হিঁদু?

তার জবাবে যতীন বলল, ও তুমরা জান না বছির, হিন্দুর নানা ভাগ আছে, এ নিয়ে কথা না বলাই ভাল, নগেন তুই বাড়ি যা।

নগেন চুপ করে আছে। যতীন মিত্তিরের কথা সে মানতে পারছে না। বছিরদ্দি ছমিরদ্দির কথা তার মনে ধরেছে। সে বলল, খুড়ো তুমি বাড়ি যাও, মদুদাদা কী করে তা সে বোঝবে।

যেন না যায়, গেলি ল' নিমপাতা আর আগুন।

কেঁপে উঠেছিল নগেন। ফটফটে দিনমানেও তার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। কথার মর্মার্থ ধরতে পেরে গোপাল সর্দার হেঁকে উঠেছিল, বড্ড অলক্ষুনে কথা তুমার খুড়ো, তুমার তো ছাওয়াল নাই, নাই বলে ইসব বলতি পার, যাও ঘরে যাও।

হাঁ হাঁ, ঘরে যাও। গর্জন করে উঠেছিল ছমিরদ্দি, বলেছিল, আমরা যাব কত্তাবাবুর নেকট, তার জমির চাষা আমরা, আমাদ্দের কথা তিনি শুনুন, দেখি কেমন না করতি পারেন।

শুনে নগেন ভয় পেয়েছিল, শেষকালে তার ঘাড়ে না দোষ চাপে। মিত্তির লোকটা গিয়ে সাত-পাঁচ করে লাগাবে। সে বলেছিল, বাবুর মন ভাল নাই, কারো কথা শুনে কিছু করার কি লোক তিনি, মনে যদি চায় মদুদাদারে ডেকে ঘরে নেবে।

তাহলি মদুরে নে যা। ছমিরদ্দি বলে।

যাবে না। নগেন বলে।

বলিচিস যেতি?

বাবু না বললি আমি বলতি পারব না, তুমরা গিয়ে বলো ওরে।

তখন বছিরদ্দি এগিয়ে গেছে হনহন করে, তাকে দেখে আর সবাই। নগেন সবার পিছনে। তাকে সামনে দেখলে মধু ভাবতে পারে সেই এদের নিয়ে এসেছে। মধুর মন বোঝা দায়। বছিরদ্দি গিয়ে দাঁড়াল তাঁবুর কয়েক হাত দূরে, ডাক দিল, ও মদো, মদো বাপ আমার, এ কি কাণ্ড, তুমি বাপ এই গেরামের ছাওয়াল, আমার ছাওয়াল, তুমার মা জননী যেমন তুমার জননী, চাচিও জননী তুমার।

মধু বেরিয়ে এসেছিল তাঁবু থেকে। খাঁটি সায়েবের বেশে। ট্রাউজারের গালিস চেপে ধরেছে শাদা শার্ট। মাথা ভরা ঘন কোঁকড়ানো চুল, গালে চাপ দাড়ি, দুই চোখ দপদপ করছে। বছিরদ্দির মনে পড়েছিল নীলকর ফার্গুসন সায়েবের কথা, শুধু সেই লোকটা বেজায় ধলো। বুড়ো অবাক হয়ে প্রায় ভিনদেশি বনে যাওয়া রাজনারায়ণের পুত্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার চোখের পলক পড়ে না। একে কি আর মদো বলে ডাকা যাবে? তখন মধু কথা বলেছিল, বছিরচাচা ভাল আছ?

হ্যাঁ বাপ, তুমি ভিটেয় যাও, এমন করতি নেই।

মধু জবাব না দিয়ে গাঙের দিকে তাকিয়েছিল। বুড়ো বছিরদ্দি জবাবের অপেক্ষা করছিল। মধু মাথা ঝাঁকিয়ে অসম্মতি প্রকাশ করেছিল। তা দেখে বছিরদ্দি আবার বলেছিল, বাপ বেটায় অমন হয় রাম রাবনের যুদ্ধু, তাই বলে কি রাবন রামেরে ভক্তি-ছেদ্দা করত না, যাও, মা জননী অন্ন-জল ত্যাগ করেছে।

মধু ফিরে তাকিয়েছিল, সবাইকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল, তারপর বলেছিল, নেপালকা', তোমার মেয়ে ভাল আছে?

তুমার মনে আছে তার কথা, পা তো শুকনো বাঁশের মতো, খুঁড়োয়ে হাঁটে। বলতে বলতে নেপালের চোখে জল, গামছার খুঁটে চোখ মুছে বলল, বে দিইছি চাকদায়, ভাল আছে।

বাহ্! অস্ফুট গলায় মধু আনন্দ প্রকাশ করেছিল।

মা জননী সাহায্য কলল বে'র সময়, মা যেন কপোতাক্ষি, যাও, মা'র কাছে যাও। নেপাল সর্দার বলেছিল।

তুই ঘরে যা মদো, এখেনে থাকলি শুদু কত্তামশাই কেন, গাঁর নিন্দে হবে। ছমিরদ্দি বলেছিল।

মধু তখন বলেছিল, শেষবারের মতো গাঁ দেখতে এলাম চাচা, জন্মভূমি-জননী, দেখে চলে যাব, আমি দত্তবাড়িতে আসি নি।

এ কী বলতেছ তুমি বাপ! আর্তনাদ করে উঠেছিল বছিরদ্দি, এ কী বলো, আহা মুখখানা শুকোয় গেছে, যাও মা'র কোলে যাও।

মধু চুপ করে ছিল। সে কি বিচলিত হলো, তার ভিতরটা কি ভাঙল! মধু বুঝতে পারছিল সাগরদাঁড়ি তার সঙ্গে আছে। এই সমস্ত অনার্য-প্রায়, নিম্ন বর্গের মানুষই তো রক্ষকূলের উত্তরাধিকারী। মেঘনাদ মেঘনাদ! বছিরদ্দি আবার বলেছিল, যা বাপ ঘরে যা, বাপ বেটায় অমন হয়, আমার ঘরে কি হয় না, এক একদিন তোর ভাই, নইমুদ্দি, সারাদিন মাঠের ধারে গে বসে থাকে, অলস অলস, কিছুতি বাড়তি কিছু করবে না, বিবির সাথে ফুসফুস।

মধু বলেছিল, আমি ধর্ম ত্যাগ করেছি।

ফিরে আয় ফিরে আয়, সাত পুরুষির ধম্মো কি অমনি যায়, ত্যাগ হয়। বছিরদ্দি বলে দম নিয়েছিল, তারপর বলেছিল, তোর রামায়ণ মহাভারত ত্যাগ করতি পারবি তুই মদো, অমি তোর কাছে রামায়ণ শুনিচি।

মধু যেন নিজের ভিতরে কাঁপুনি টের পেয়েছিল। চাষারা তাকে তো পেড়ে ফেলল প্রায়। কে বলছে, শেতলা, মনসা, দুগ্গা কালী ভুলতি পারবা তুমি ছোট কত্তা, ভয় নেই অন্তরে?

মধু বলল, তোমরা এলে ভালো হলো, দেখা তো হলো।

তবে যাও, বাড়ি যাও। বলল আর একজন। তাপর আর একজন, আর একজন। ছমিরদ্দি বলেছিল, যা মদো, তুই না গেলি আমাদের ঘরে রান্না হবে না, মুকি ভাত রোচবে না।

মধু পায়চারি করছিল। মাথা দোলাচ্ছিল। বিলিতি ভাষায় বিড়বিড় করছিল। বছিরদ্দি বলছিল, মা কষ্ট পেলি কারো ভাল হয় না মদো, আমার তুমার শাস্তরে তাই লিখা।

মধুসূদন বিচলিত হয়েছিল। তার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল বুঝি। কেউ তা দেখল না, নগেন চোখ মুছছিল গামছার খুঁটে। সবাই চুপ। মধু গিয়ে দাঁড়িয়েছিল গাঙ ধারে। ধীরে ধীরে বলেছিল, আমি না হয় পরের ভাটায় চলে যাই, মারে বলে দিয়ো মধু কালাপানি পার হবে, আমি মাদ্রাজ যাব।

কী বলো, সত্যি! বছিরদ্দির চোখে যেন আলো ফুটল।

হ্যাঁ চাচা, মধু দ্রাবিড় দেশে যাবে, ওরা রাবনের পুজো করে।

ওরা কারা? একজন জিজ্ঞেস করেছিল।

মেঘনাদের দোসর।

বুজা গেল না। ছমিরদ্দি বলেছিল।

তখন নগেন সেই ভীড় থেকে আলাদা হতে আরম্ভ করেছে। দৌড়তে শুরু করেছিল। দত্তবাড়ির দিকে। হায়! মধু ভাটায় নৌকো ভাসাবে, গাঙ তখন সাগরে যায়, মধু সাগরে চলে যাবে, সাগর পার হয়ে রাবনের লঙ্কাপুরীতে। তারপর কি বিলেত? তমলুকে সে দেখেছিল বিলেতের জাহাজ। কত বড় পাল তুলে চলেছিল সে। মধু আর রাজনারায়ণের সঙ্গে তমলুকে গিয়েছিল নগেন। কী সব্বোনাশ! বজরা নিয়ে মধু কালাপানির ওপারে যাবে? মা জননী ছাড়া কে এখন আটকাবে মধুকে? মহাবিপদ সামনে। আর তো ক'ঘণ্টা, এক প্রহরও না, ভাটা পড়ে যাবে। সন্ধে হবে তখন। নগেন ছুটছিল মা জাহ্নবীর কাছে ভাটার কথা নিয়ে। মধু ভাটা পড়লে নাও ছাড়বে। বাড়ি পৌঁছে দেখল মা বসে আছে উঠোনে। নগেন তাঁর সামনে গিয়ে আছড়ে পড়ে পা জড়িয়ে ধরল, মাগো, জুয়ার গেলি মদুদাদার নাও ছাড়বে, কালাপানি পার হই যাবে, তুমি যাও একবার।

মা জাহ্নবী কান্না ফুরোন, শুকনো খটখটে গলায় চোখ মেলে বলল, গাঙের জল তাহলি সাগরে যাবে না নগেন, গাঙ আর সাগরে যাবে না নগেন, দেখিস তুই, কপোতাক্ষি আমার মা, মা ওরে নে যাবে না।

দশ

কেউ বলে দেখা হল, কেউ বলে হয় নি। যখন মা জাহ্নবী এল রাতের অন্ধকারে। তখন মধুর নৌকো ছেড়ে গেছে। অন্ধকার গাঙ কপোতাক্ষ নিয়ে গেছে মধুকে অনেক দূর। আবার কেউ কেউ এমন কথাও বলে, এসব কিছুই হয় নি। মধু আসে নি সাগরদাঁড়ি।

এসব শুধু কল্পনা। মা জাহ্নবী চলে গেল, মধু বিলেত গেল। একদিন রাজনারায়ণও চলে গেল। অনেক অনেকদিন বাদে মধুর খবর এল। মধু কঠিন রোগে, কষ্টে দুঃখে অভাবে মরেছে। তাকে কবর দেওয়ার উপায়ও নাকি ছিল না। খরচ দেবে কে? কিন্তু অতবড় কবি। তাই কি হয়? সব হয়েছিল।

কিন্তু অশ্রুঘাট তাহলে হল কী করে? হয়তো মধুর মৃত্যুর সংবাদ এলে। মৃত্যু সংবাদ সাগরদাঁড়িতে পৌঁছলে, সাগরদাঁড়ির মানুষ সন্তান হারানোর বেদনা পেয়েছিল। যে কথা লিখেছিল মধু কবি তার কাব্য মেঘনাদ বধ-এ। রাবণ রাজার যে হাহাকারের কথা লিখেছিল মধু কবি, সেই হাহাকারে আছড়ে পড়ল হয়তো সাগরদাঁড়ির মানুষ। কিন্তু এতো কথার কথা ফণি। আসল কথা হল মা ছেলের দেখা হল।

কবে দেখা হল, কখন?

বলছি, বলছি, আমার ঠাকমা বলত দেখা হয়েছিল।

ফণিভূষণ চুপ করে থাকে। বিন বিন করছে বীরাঙ্গনা দাসী। বলছে নগেনের কথা। নগেন কোনকিছুই বোঝে না। শুধু অবাক হয়ে মধুর কথা শোনে। কী বলছে মধু তা নগেন টের পাচ্ছে। কষ্টের কথা বলছে মধু অন্ধকারে পায়চারি করতে করতে। মানুষ যখন কাঁদে ভিতরে ভিতরে তা আর এক মানুষ ধরতে পারে যদি তার ভিতরেও কান্না থাকে। নগেনের চোখে জল এল। নগেন ডাক দিল, ও মদু, মদু দাদা।

মধুসূদন চমকে ফিরল, তুমি এখনও বসে নগেন ভাই?

নগেন বিড় বিড় করে, মদু তুই কী বলিস, কী বলিস মদু দাদা?

তুই তো বুঝবি নে নগেন ভাই।

বুঝিনে তবে আমার চোখে জল আসে কেন।

মধু থমকায়। মধু অবাক হয়ে অন্ধকারে ঘাড় গুঁজে বসে থাকা নগেনকে দ্যাখে। নগেনের তো অক্ষরজ্ঞান নেই। মনসাভাসান ছাড়া নগেন কি আর কিছু জানে? হ্যাঁ জানে চাঁদ সদাগরের হাহাকার। নগেনের মা বুড়ি তাকে কেমন শোনাত তা, লখিন্দরের সেই ডাকঃ 'ওঠো ওঠো বেহুলা সায়বেনের ঝি/তোরে খাইলো কালনিদ্রা মোরে খাইলো কী?' নগেন ওইসব জানে। নগেন কী করে তার ভাষা বুঝবে? নগেন বায়রন জানবে কী করে?

তুমি জান মাসি? ফণি জিজ্ঞেস করে।

বীরাঙ্গনা দাসী বলে, কী করে জানব। আমি জানি মধুর কাব্য কবিতা, আমি জানি শুধু মধুর দুঃখ, সব দুঃখ ওর ভিতরে রেখে গেছে মধু, তুই পড় ফণি, তোর চোখও ভিজে যাবে।

ফণি বলে, সেই নগেনের সঙ্গে আমার কতই বা তফাৎ মাসি, আমি শুধু হিসেব জানি, আমার মালিক শিউপ্রসাদ আগরওয়াল আমারে খুব পছন্দ করে। লোকটার ব্যবসা

ছিল যশোরেও, যেত আসত। সে সব গেছে। শিউপ্রসাদ আমারে দিয়ে খাতা সারে। আসল খাতা, নকল খাতা। আমি তাই করি। শিউপ্রসাদ বলে বাবু তুমি ভালো করে কাজ করো, তুমি অভাবে থাকবে না। তোমার সব আশা পূরণ হবে। তুমি রিফ্যুজি, হামি ভি রিফ্যুজি, যদিও কলকাতায় আমার সব ছিল, যশোরে যা ছিল তা গেছে কিছু। বাকিটা আমি আনতে পেরেছি। মাসি আমি শুধু খাতা সারতে পারি। সত্যি মিথ্যে যেমন বলে আমার মালিক শিউপ্রসাদ আমি তেমনি পারি। তা বাদে আমি অন্ধ। আমি আর কিছুই দেখতে পাই নে, আমি কালা, আর কিছুই শুনতে পাই নে আমি।

শুনতে শুনতে বীরাঙ্গনা মাথা নাড়ে, বলে, একথা কী বলিস ফণি?

সত্যি কথাই বলি।

বীরাঙ্গনা বলে, তাই কি হয়, যদি তুই অন্ধ হতিস, কালা হতিস, তবে আমার এসব কথা শুনতিস? শুনতি পেতিস?

তুমি যা শোনাও তা আমার শুনতি ভালো লাগে, মনে হয় জীবনে এটাই পাওয়া, জীবনের এই কথাগুলোই মধুভরা।

বীরাঙ্গনা হাসে, বলে, মধুমাখা কথা এসব। সাগরদাঁড়ির মানুষ মধুকে নিয়ে কত কথাই না ভেবেছে। সব কথাই মধুমাখা, শুনলি জীবন ধন্য হই যায় ফণি।

ফণিভূষণ বলে, তুমি নগেনের কথা শেষ করলে না?

নগেন। নগেন দেখছিল অন্ধকারে মধুর দুটো চোখ আকাশের তারার মতো জ্বলে আছে। কী ম্লান সেই আলো। মধু তার সামনে এসে দাঁড়ায়, বলে, এতো ইংরিজি ভাষা নগেন, বিলেতের খুব বড় কবির কবিতা, আমি বিলেত যাব, বিলেত গেলে বিশ্বজোড়া নাম হবে আমার।

তোর মা কাঁদে মধু দাদা।

জানি, আমি মায়ের কাছে এয়েছি।

নগেন বলল, মদুদাদা, মদু, বলে যা, যা বলছিলি।

মধুসূদন তখন মেঘনাদ বধ থেকে শোনাল একটু একটু অংশ। গমগম করে উঠল তার কণ্ঠস্বর। নগেন চুপ করে শুনতে শুনতে নিঃশব্দে কাঁদে। মধুর গলায় যেন নগেন কপোতাক্ষর স্রোত ধারা দেখতে পাচ্ছিল। মধু খ্রিস্টান। মধুকে ছোঁয়া বারণ। .....সবাই দূর থেকে দ্যাখে মধুকে। মধুর সঙ্গে আসা কলকাতার পাচক রান্না চাপায়। লোকে তা দ্যাখে। কিন্তু কাছে যেতে সংকোচ হয়। যদি ছোঁয়াছুঁয়ি হয়। কিন্তু তারা তো মধুকে ঘরেও ডেকেছিল। মানুষের আচরণ ধরা যায় না।

নগেন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। তখন গভীর রাত্রি। জাহ্নবী জেগেছিল, নগেন ফিরতে জিজ্ঞেস করে, কেমন দেখলি মধুরে?

নগেন বলল, আগের মতো, মদু দাদার মতো মদু।

'কী বলল মধু?

তোমার কথা বলল মা।

আমার কথা কী বলল মধু?

নগেন বলল, সে আমি বলতে পারব না, আমি তো পাঠশালে যাইনি মা, অমি তো কানা আর কালা। আমি চোখে দেখি নে, কানে শুনি নে, আমি জানি নে মদুদাদা কী বলল, তবে আমার দুচোখ ভিজে গেছে শুনে।

তখন জাহ্নবী বলল, ওরে, আমারে শুনা।

তুমি কী করে শুনবা মা?

তুই বল মধুর কথা।

আমি তো জানি নে মা। তবে শুনতি শুনতি মনে হচ্ছিল ভোর হল তো সন্ধে হল, সন্ধে হল তো রাত হল, রাত হল তো ঠিক দুপুর গেল....দিন রাতির নানা সময় যেন আমার সামনে ফুটি উঠতি লাগল, মনে হতি লাগল অন্ধকারে কপোতাক্ষর জল কাঁদে।

তাই মনে হল নগেন, সত্যি?

হ্যাঁ গো মা, মনে হল নদীর বুক ফেটি যাচ্ছে।

আর কী মনে হল তোর?

মন হল আকাশ ভাঙতেছে মা, আকাশের তারা কানতেছে।

কান্না ছাড়া আর কিছু ছিল না?

না মা ছিল না, কান্না ছাড়া আর কিছু থাকে?

কেন রে, মধু থাকে না, মধুর ভিতরে মধু নেই।

আছে মা, তাও কান্না হয়ি বেরচ্ছে।

জাহ্নবী বলল, আমাকে নিয়ে চ নগেন, আমি এখন যাব।

বাবু ঘুমোয় নি, জেগি বসে আছে।

কেডা বলল, দেখলি তুই?

হ্যাঁ বাবুর জানালা খোলা, বাবু জানালা দিয়ে বাইরি তাকায়ে।

বাবু তোরে দেখল?

নগেন বলল, হ্যাঁ মা দেখল, জিজ্ঞেসও করল, আমি বলিও দিলাম মদুরে দেখতি গেছি।

বাবু তা শুনল?

হ্যাঁ মা শুনল, কিছু বলল না।

তবে আমারে নিয়ে চ।

বাবুরে না বলি যাবা।

মা জাহ্নবী বলল, আমি বলতি গেলি, বলবে যেও না, খিস্টান ছেলে, ও আমাদের কেউ না, কিন্তু লুকোয়ে গেলি ও লোক মনে শান্তি পাবে।

বাবু কি গেছে?

যেতি পারবে না।

লুকোয়ে যদি যায়।

জাহ্নবী বলল, সেকথা আমারে জানাবে না, চ আমারে নিয়ে চ মধুর কাছে।

বীরাঙ্গনা দাসীর কথায় মধুসূদন কপোতাক্ষ তীরে গভীর রাত্রে মেঘনাদ বধ কাব্য থেকে কয়েক পংক্তি উচ্চারণ করেছিল নগেনের সুমুখে। আসলে এও তো বীরাঙ্গনার জুড়ে দেওয়া, শোনা কাহিনির ভিতর আর এক কাহিনি। মধু তো মাদ্রাজ গেল ১৮৪৮-এ। মেঘনাদ বধ লেখা হল প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৬১ তে। তখন মা জাহ্নবী বেঁচে নেই। বীরাঙ্গনা কী শুনেছে শৈশব থেকে সাগরদাঁড়ির মানুষের কাছে, তার সঙ্গে কীভাবে মিলিয়েছে নিজের কল্পনা তা সে নিজেই জানে না। জানে শুধু মধু কবি কপোতাক্ষ সাগরদাঁড়ি মা জাহ্নবী। মা জাহ্নবী শুনবে না 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের কোনও না কোনও সর্গ, এ কখনও হতে পারে। বীরাঙ্গনার মনে হয় সে নিজেই যেন শুনেছিল সব। তারও তো সন্তান গিয়ে গিয়ে একটি পুত্র একটি কন্যাকে নিয়ে এপারে আসতে পেরেছে। আর তিন সন্তানকে শিশু অবস্থায় হারিয়েছে। কোন মা সন্তান হারা ছিল না তখন? যদি কেউ প্রশ্ন করে, মধু শোনাল তার মাকে? কেন শোনাবে না, শুনিয়েছিল। নগেন বুঝি শুনেছিল ঃ

''কোথা প্রাণ সখে
রাখি এ দাসীর কহ চলিলা আপনি
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী!"

প্রমীলা বলেছিল স্বামী মেঘনাদকে যুদ্ধযাত্রার সময়। নগেন বলল, কী সব বলছে মদুদাদা, চোখ ভিজে যায় মা, চলো তুমারে শুনাব।

এসব বীরাঙ্গনার শোনা কথা, তার বানানো। সত্য না হলেও সত্য। বাস্তবের নয়, কল্পনার।

আমারে শুনাবে। আমারে। কাঁদতে কাঁদতে নিঃশব্দে নগেনের পিছু পিছু চলল মা জাহ্নবী। কিন্তু মা জাহ্নবীর যাত্রাটি সত্য। তা ঘটেছিল নিশ্চিত। সাগরদাঁড়ির মানুষের মনে ঘটেছিল তা। গভীর রাত্রে মা জাহ্নবী পুত্রের উদ্দেশে ঘর থেকে বেরিয়েছিল, না বেরোলে কপোতাক্ষর ঘাট কী করে বিদায় ঘাট—অশ্রুঘাট হয়। কপোতাক্ষ সত্য। কপোতাক্ষর ঘাটও সত্য। তাহলে মা জাহ্নবীর যাওয়াও সত্য। ঘর থেকে বেরিয়ে দীর্ঘ বারান্দায় দাঁড়িয়েছে জাহ্নবী মা। এখনও এ বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে মধুর হস্তাক্ষর ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কাঠ কয়লার লিখেছিল কবে শ্রী মধুসূদন দত্ত সাগরদাঁড়ি গ্রাম। জাহ্নবী ডাকল নগেনকে, জল মিষ্টি, নারকেল নাড়ু নিবি নে নগেন, নিজ হাতে মধুরে খাওয়াই।

তোমারে চান করতি হবে না মা?

কেন? চমকে ওঠে জাহ্নবী।

খেস্টান মদু, তারে ছুঁয়া যাবে তোমার?

আমার মধুরে আমি ছোঁব না, কী বলিস নগেন?

নগেন বলল, ছুঁবা তো বটে, নিজির মদু তোমার, নিজির ছাওয়াল, তারে ছুঁয়ে চান করবা কেন মা, কিন্তু লোকে জানলে দুষবে।

লোকে তো মধুর পক্ষে।

সে তো দূর থেকে পক্ষে, কেউ কি তার কাছে যাচ্ছে, যাচ্ছে না।

জাহ্নবী জিজ্ঞেস করল, তাহলে কী হবে, তুই কী বলিস?

আমার বলায় কী হবে, আমি তো ছোটলোকের ঘরের।

তবু তুই বল, তুই কি চাস মধুরে আমি নিজে হাতে খাওয়াব না?

নগেন চোখ মুছতে মুছতে বলল, তা কী করে হয়, মা তার মদুরে ছোঁবে না, তালি যে তার কিছুই পাওয়া হবে না মা, খালি হাতে ফেরবে মদুদাদা।

এগারো

গিয়েছিল মা জাহ্নবী?

বীরাঙ্গনা চুপ করে আছে। কপোতাক্ষ তীরে কি দেখা হল মা জাহ্নবীর সঙ্গে? মধু সাগরদাঁড়িতে এল মাতৃমুখদর্শনে। ব্যর্থ হয়ে এবার ফিরে যাবে কলকাতায়, সেখান থেকে কতদূর যাবে কালাপানি পার হয়ে। মধুর জন্য ক'দিন ঘুমোচ্ছে না রাজনারায়ণ। খুব শক্ত করে বুক বেঁধেছে। অবাধ্য পুত্র। বিধর্মী পুত্র, উচ্ছৃঙ্খল পুত্র, সাগরদাঁড়ির দত্ত বংশের মুখে কালি দিয়েছে মধু। রাজনারায়ণ টাকা বন্ধ করেছে ছেলেকে সতর্ক করতে। বুঝুক। কিন্তু সে তো এও বোঝে মধু প্রতিভাবান। মধু খুব বড় কিছু হবে। মধু আসলে বাল্মিকী। বাল্মিকী রত্নাকর হয়ে যাচ্ছে। মধু কপোতাক্ষ স্রোতের বিপরীতে যাওয়া মাছের মতো সমাজে যা চলতি হাওয়া তার বিপরীতে দাঁড়ায়। শুধু ধর্মটি ত্যাগ করা ব্যতীত। মধুর সঙ্গে কত রাত্রি পর্যন্ত এই কপোতাক্ষ তীরে রাজনারায়ণ কথা বলেছে। বালক বলত, তার প্রাণে রাবণ রাজার জন্য কষ্ট হয়। মেঘনাদ কত বড় বীর। রাম লক্ষ্মণ তার কাছে ভীরু, কাপুরুষ। সব সত্য নয় তা মনে করে রাজনারায়ণ, কিন্তু মধু যে এইরকম ভাবে তা শুনে টের পেয়েছিল তার ছেলে আর পাঁচটি বালকের মতো নয়। মা জাহ্নবী গেল ত্রস্ত পায়ে মাথায় কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে। আগে আগে চলে নগেন। রাজনারায়ণ ওদের যেতে দেখে নিজেকে লুকোয় জানালা থেকে সরে গিয়ে। রাজনারায়ণ জেগে আছে, মুখোমুখি হলে জাহ্নবী ফিরে আসত। স্বামীকে আহত করে সে মধুর কাছে যেত না। তাতে স্বামীর কষ্ট আরও বেশি হত। জাহ্নবী যেতে যেতে ঘুরে তাকিয়ে দ্যাখে জানালায় কোনও মুখ নেই। রাজনারায়ণ তাহলে ঘুমিয়েছে।

নগেন বলল, মা মধুরি বাড়ি ডাক।

আসবে না।

তুমি ডাকলে ফিরাবে না।

তোর বাবু?

বাবু তো ঘুমাই গেছে।

জাহ্নবী বলল, না, ঘুমোবে না, ও লোক ঘুমোতে পারে না।

জানালায় থাকত তাহলে।

জাহ্নবী আর কথা বলল না। তার মন বলছে মধুর বাবা ঘুমোতে পারে না। হ্যাঁ, জেগে আছে সে। তাকে ডেকে নিয়ে এলেও হত। নগেন রয়েছে যে। নগেন থাকলে সে আসতে পারে না। তার মান যেত। সাগরদাঁড়ির লোক জেনে যেত রাজনারায়ণের মিথ্যে আস্ফালনের কথা। রাজনারায়ণ লুকিয়ে তার খ্রিস্টান ছেলের কাছে গেছে—লোকে হাসত। নগেন সাক্ষী থাকলে হত না। কিন্তু নগেন না থাকলে তারা দুজন, মধুর মা বাবা মধুর কাছে যেত। সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ছেলে কি পারত? কত নিষ্ঠুর হতে পারে সে? নিষ্ঠুর পুত্র তো কবিতা লিখতে পারে। মধুর অন্তর তো জানে জাহ্নবী। খুব নরম। মধু মা বাবার কাছে ফিরে আসত।

জাহ্নবী বলল, নগেন তুই গিয়ে দেখে আয় বাবু ঘুমায় কিনা।

না ঘুমায় যদি, আমারে যদি জিজ্ঞেস করে?

বলবি, সত্যি কথা বলবি।

ভয় করে মা।

জাহ্নবী বলে, বাবুরে ডেকে আনবি, বলবি মা আছে বাইরে।

এত রাতি, বাবু আমারে ছাড়বে না মা।

জাহ্নবী বলল, যদি বাবু দেখে থাকে?

তাহলে বাবু হাঁক দিত।

জাহ্নবী চুপ করে থাকে। তার মন বলছিল মধুর বাবা জেগে। মধুর বাবা সব জানে। সে লোকের ভিতরও কি পুড়ছে না? মধুর বাবা চায় জাহ্নবী ছেলেকে দেখে আসুক। না হলে জাহ্নবী বাঁচবে না। জাহ্নবীকে রাজনারায়ণ আর তিন বউ এর চেয়ে ভালবাসে বেশি। রাজনারায়ণ সংসারের চাবিকাঠি তার হাতে দিয়েছে। জাহ্নবীর কথায় তার সতীনরা ওঠে বসে। জাহ্নবী ভাবল এমন তো হতে পারে সে যেমন লুকিয়ে যাচ্ছে ছেলের কাছে, রাজনারায়ণও তেমনি গেছে বা যাবে। দু'জনে পরস্পরের কাছে লুকোচ্ছে। জাহ্নবীর কোনো দ্বিধা নেই, ছেলে ধর্মত্যাগ করুক বা না করুক, তাকে সে পেটে ধরেছিল। দুটি গিয়ে এই একটি ছিল তার। তার যদি ধর্ম যায় যাবে, ছেলেকে নিয়ে থাকবে সে? কিন্তু তা হবার নয়। রাজনারায়ণ কার কাছে থাকবে? আর ধর্ম কি ত্যাগ হয়? ত্যাগ করে

সে যাবে কোথায়? সকাল সন্ধেতে তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে প্রার্থনা করছে না কি, মধু যাতে ফিরে আসে। ফিরে এলে প্রায়শ্চিত্ত করে ঘরে তুলে নেবে।

নগেন বলল, মা কী করব?

চ। বলে অন্ধকারে এগোতে থাকে মা জাহ্নবী। নদীর ধারে এসে পৌঁছয়। উত্তরে যেতে হবে একটু। নদীর পাড় অন্ধকারে ছেয়ে আছে। দাঁড়ায় জাহ্নবী, কপোতাক্ষর অন্ধকারে তাকায়। বুক হু হু করে ওঠে।

বীরাঙ্গনা আঁচলে চোখ চাপা দেয়, বলে, ফণী, আর কি হবে দেখা?

ফণিভূষণ বলল, গোলমাল মিটে শান্ত হোক, তোমার সঙ্গে আমি যাব।

বীরাঙ্গনা বলল, এতো মেটার নয়, ধর্ম নিয়ে আলাদা হলে আর কি মেলে?

ফণিভূষণ বলল, যখন মানুষ একা হয়, বোঝে না কি?

বীরাঙ্গনা বলল, জোট বাঁধে যদি ধর্ম নিয়ে তবে সে জোট ভাঙে না।

ফণিভূষণ বলল, তারপর কী হল বললে না?

বীরাঙ্গনা বলল, কী হল তা যারা জানত, তারা তো কেউ নেই।

ফণিভূষণ বলল, তুমি শোনো নি সাগরদাঁড়ির লোকের কাছে।

বীরাঙ্গনা চুপ করে থাকল। কপোতাক্ষর কাছে শুনেছে সে। দুরকম কথা শুনেছে। এক কথা হল, জাহ্নবী গিয়ে দ্যাখে নৌকো চলে যাচ্ছে। হতাশ মধু ফিরে যাচ্ছে নদীপথে আবার। শুধু জলে দাঁড় ফেলার শব্দ। মা জাহ্নবী শূন্য বুকে আছড়ে পড়ল মাটিতে। চোখের জলে মাটি ভিজল। অশ্রুঘাট হল কপোতাক্ষর তীর।

ফণিভূষণ বলল, নগেন তো গেল আর মা জাহ্নবীকে নিয়ে এল, মধু চলে গেল এর ভিতরে?

না যায় নি, কতকালের কথা, আর আমরা তখন কোথায়, জন্মোও হয় নি, কপোতাক্ষ তখন ছিল আরও বড়, সাগরের মতো প্রায়, জোয়ারে উথালপাথাল, কী গর্জন, কী ঢেউ।

মা জাহ্নবীর সঙ্গে দেখা হল?

হল মনে হয়। তখন জোয়ার এল গাঙে। বানে যেন জল ঢুকছিল গাঙের ভিতর। দুপাড়ে জল ধাক্কা মারছিল। থই থই করছিল নদী। মধু বসেছিল তাঁবুর সামনে। মাথার উপর সাগরদাঁড়ির আকাশ। মায়ের পায়ের শব্দ সে শুনতে পায়। মা জাহ্নবী তখন নগেনকে বলে, তুই জাগিয়ে তোল, এখন নিশ্চয় মধু ঘুমিয়েছে।

নগেন বলল, হতি পারে মা, না হলে মদুর গলার স্বর শুনতি পেতে, ইংরিজি বলত সে নিজের মনে, কী কষ্ট সেইসব কথার ভিতরে।

ঘুম থেকে তুলবি।

তুলতি হবে না মা, এমনিই উঠে যাব ও তুমার জন্যি এয়েচে।

মধু দাঁড়িয়ে গেল অন্ধকারে গুনগুন আলাপ শুনে। মায়ের গলার স্বর সে চিনতে পারে। এই কণ্ঠস্বরের জন্য যে এতদূর আসা। সে থরথর করে কাঁপছিল। সে খ্রিস্টান হয়ে গেছে। টের পাচ্ছে খ্রিস্টান হওয়া মানে এই কপোতাক্ষ, এই সাগরদাঁড়ি, মা জাহ্নবী সকলকে ত্যাগ করে চলে গেছে সে। আলাদা হয়ে গেছে সে। সে আলাদা না হতে চাইলেও সমাজ আলাদা করে দিয়েছে তাকে। সমাজে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান পরিচয়ই বড়। এ বাদে কোনও পরিচয় নেই।

মা এসে দাঁড়িয়েছে। মা দেখতে পাচ্ছে মধুকে। মধুর মুখের উপর মেঘমুক্ত শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ এখনই আলো ফেলেছে। মুখখানি কী ক্লান্ত। মা ডাকল, মধু, আমি এয়েচি, মধু তুই কোথায় যাবি?

এ প্রবাস ছেড়ে মাদ্রাজে যাব মা।

কালাপানি পার হয়ে?

মধু বলল, ওই যে পাখিদের দ্যাখো মা, শীতের সময় দক্ষিণের বিলে এসে নামে, ওরা কত পাহাড়, কত সমুদ্র পার হয়ে আসে, ওদের কী হয়?

নগেন বলল, পাখিদের কি ধম্মো নাই মদু?

মধু বলল, তারাও এসেছে কালাপানি, সাত সমুদ্র পার হয়ে, ইংরেজদের কথা বলছি, এদেশে এসে কি ধর্ম গেছে তাদের? শোনো মা, এ কোন ভিনদেশী এসেছে আমাদের ঘরে, মহাকবি ভার্জিলের ইনিড কাব্য থেকে বললাম, ইংরেজে এসেছে আমাদের পরিত্রাণ করতে।

বাছা ওরা যবন ধর্ম পালন করে, আমার সংসার-মধুহীন হল।

মধু চুপ করে থাকে।

মা জাহ্নবী বলল, বাছা তোর মুখ বড় শুকনো লাগে।

মধু বলল, হিমালয় পার হয়ে অতীশ দীপঙ্কর গিয়েছিল তিব্বতে, সে তো তার ধর্ম নিয়েই গিয়েছিল মা, আর্যরা এসেছিল কত নদী কত পাহাড় পেরিয়ে...।

মা বলল, তোর তো ধর্ম গেছে আগে, এতই যদি সত্য হয়, তবে কেন তুই ধর্মত্যাগ করলি মধু?

মধু চুপ করে থাকে। তার কথা আর তার জীবন মিলছে না। সে কেন পিতৃপুরুষের ধর্মত্যাগ করল? না করলেই বা কী হত? ইংরেজদের সহায়তা মিলত কি? সে কি বিলেত যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারত? হোমার, ভার্জিল, বায়রন, মিল্টনের দেশে দেশে যাওয়ার কথা ভাবতে পারত? সে কবি যশঃপ্রার্থী। সে জানে, বঙ্গভাষা আর বঙ্গদেশ তাকে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে নিয়ে যাবে না, মা কি এসব কথা বুঝবে? সন্তানের কি অন্য আকাঙ্ক্ষা থাকে না? মা কি সব পূরণ করতে পারে? ডানায় জোর হয়ে গেলে পাখির ছানা কি মা পাখিতে ধরে থাকে? ধরে, রাখতে পারে?

মা জাহ্নবী বলল, তোর বাবার সঙ্গে দেখা হবে না তোর?

মধু চুপ করে থাকে। পিতা পুত্রের সংঘাত যতটা না তার ধর্মত্যাগ নিয়ে তার চেয়েও বেশি পুত্রের প্রতি পিতার অধিকার বোধ নিয়ে। পিতার অধিকারবোধ পুত্রের স্বাধীনতা হরণ করে। সেখানেই পুত্র অবাধ্য হয়। মধুসূদন যে আকাঙ্ক্ষায় ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম নিয়েছিল, তার কোনওটাই পূরণ হয়নি তখনও। কবি যশ আকাঙ্ক্ষা তার প্রবল। কিন্তু কবি হিসেবে বড় কোনও স্বাক্ষর রাখেনি তখনও। ব্যর্থতা তার ভিতরে হতাশা তৈরি করেছিল প্রবল। যে খ্রিস্টান পাদরি-পুরোহিতের দল তাকে আশ্বাস দিয়েছিল অনেক, তারা ক্রমশ তাকে ত্যাগ করছিল। ধর্মান্তরের কারণে হিন্দু সুহৃদ-বন্ধুরাও দূরে সরে যাচ্ছিল। সে একা হয়ে পড়ছিল কলকাতায়। বাবা-মার আশ্রয়ে যে যাবে, সংকোচ তো ছিলই। আত্মাভিমান ছিল। আত্মাভিমানে সে ছাড়তে চাইছিল বঙ্গভূমি। মায়ের কথায় জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

তোর বাবা কি কষ্ট পাচ্ছে না?

মধুসূদন বলল, মা তোমাকে দেখতে এসেছি।

তোর বাবার যে বুক ভাঙছে, বন্দি করে রেখেছে সে নিজেকে ঘরের ভিতর, চোখে ঘুম নেই।

মধুসূদন বলল, মা তোমার মুখখানি এই অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখা যায়।

তুই বাবার কাছে চল মধু।

আমি কোথাও যাব না মা, আমার ভাগ্য আমাকে যেদিকে নিয়ে যায়, যাব।

তোর বাবা অন্ধকারে একা বসে আছে মধু।

মধুসূদন বলল, দৃপ্ত পুরুষেরা শেষ অবধি একাই হয় মা, আমিও।

বাবার কাছে নত হবি নে তুই?

মা জাহ্নবী আর বাবা রাজনারায়ণের সন্তান আমি, দত্তকুলোদ্ভব, আমাকে যেমন গড়েছ তোমরা, আমি তেমনই হয়েছি মা, আমার প্রণাম দিয়ো রাজনারায়ণ দত্তকে।

মধুর এই কথায় মুখ আঁচলে ঢেকে মাটিতে বসে পড়ে জাহ্নবী। কপোতাক্ষর অপর পাড়ে শৃগালেরা প্রহর ঘোষণা করল সেই সময়। চাঁদ নেমে গেল কয়েক সুতো। আকাশের তারারা করুণ আলো নামিয়ে দিল পৃথিবীর পথে। মধুসূদন ডাকল, মা তুমি কাঁদছ।

হ্যাঁ তোর মা কাঁদছে মদুদাদা, কানছে, মা বাপরে দুঃখ দিতি হয়?

মধুসূদন বলল, নগেন মারে তোল।

তুমি তোল, মারে কাঁদাও তুমি, কেন কাঁদাও, কেন যাবা অন্যদেশে, মা বাপ ঘরে বসে কাঁদবে, তুমি অন্যদেশে গে কী করবা?

আমার আর কোন উপায় নেই, মা তুমি ওঠো, আমি তো মাদ্রাজ যাব, সে বহুদূর বটে, কিন্তু ইংল্যান্ডের মতো দূর তো নয়। মা আমাকে ভবিষ্যতে বিলাত দেশে যেতে হবে, আমি বাবার সঙ্গে সেবার তমলুক গিয়ে বন্দরে ইংল্যান্ডগামী জাহাজ দেখেছি মা। সমুদ্র আমাকে ডাক দিচ্ছে প্রতিনিয়ত, মা তুমি ভালো থেক, মধু জগৎসভায় পা বাড়াচ্ছে এবার।

জাহ্নবী মুখ তুলে বলল, না যাবিনে।

আমি তো সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছি মা।

না মধু না, কোন মা তার সন্তানকে বিচ্ছেদের অনুমতি দেয়?

বিচ্ছেদ হয় না মা, তুমি আমার সঙ্গে সব সময় থাকবে, আমাকে যেতেই হবে।

জাহ্নবী আবার বলল, না মধু না।

শুনতে শুনতে ফণিভূষণ বলে, মাসি আর বলো না, আমার বড় মনে পড়ছে দেশের কথা, আমাদের গাঁর কথা—

বারো

মা জাহ্নবী আর মধুকবির কথা বলতে বলতে হঠাৎ খেয়াল হল বীরাঙ্গনার। আর একটা কথা তো আছে তার সঙ্গে। সেই জন্যই তো ফণিভূষণের বাসায় আসা। এইসব বলতে বলতে সে কথাটা যদি না বলা হয় তবে তো আসার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। বীরাঙ্গনা বলল, তোর বাসায় ইলেকটিক দেবে না?

হচ্ছিল একশো বছর আগের কথা। ফিরে এল একেবারে আঁকাড়া বাস্তবে। ফণি বলল, তুমি তোমার কথা তো শেষ করলে না?

ও কথার কি শেষ আছে ফণি, আর খেই পাচ্ছিনে, মনে করতি হবে সব।

মনে নেই?

আছে, তবে ভুলে ও যাই মাঝে মধ্যে।

ভুলো না মাসি, ভুললে পরে বলবে কী?

আমি না বলি, আর একজন বলবে।

ফণিভূষণ বলল, আর কেডা জানে, মানকুমারী বসু কার পিসি হত।

বীরাঙ্গনা বলল, পিসির তবু দেখে যেতি হয় নি পার্টিশান, হিন্দুস্তান পাকিস্তান, তার আগে খুলনায় চোখ বুঁজল পিসি।

ফণিভূষণ বলল, তাঁর কথা বলো তাহলে।

পরে বলব, পিসির খুব দুঃখের জীবন ছিল রে ফণি—শোন,

''প্রাণভরা ব্যথারাশি সাশ্রুনেত্র, ম্লান হাসি,
এরূপে ক'দিন কাটাইব।
রমনী-হৃদয় নদী, ক্ষুদ্র কেন নিরবধি?

চল সখি। সাগরে সঁপিব,”

তুমি তারে দেখেছ মাসি?

কেন দেখব না, খুলনায় তাঁর বাড়ি গিছি আমি।

ফণিভূষণ বলল, আমি জানতামই না, কত গিছি খুলনায়।

মন্বন্তরের বছরে তিনি চোখ বোঁজেন, ও হবেখন ফণি, বলছি কবে দেবে ইলেকটিক, শহরে থাকবি, হেরিকেন জ্বালবি তা কী করে হয়?

ফণিভূষণ বলল, ভিতরে আসতি দুটো পোস্ট লাগব, তার দাম দিতি হবে, এখেনে সব গরিব মানুষ, কে দেবে দাম?

যাকগে, দেশের বাড়িতি তো ছিল না। বীরাঙ্গনা ফণিভূষণকে সান্ত্বনা দেয়। বলে, এসে যাবে ঠিক, এসব কি আটকানো যায়?

হুঁ, ওই যে বললে না দেশের বাড়িতি ছিল না, না ছিল না ছিল, গ্রামদেশ ঠাণ্ডা ছিল, গাছ ছিল কত।

হুঁ, মাটি তো ঠাণ্ডা হয়, কলকাতায় মাটি কম তাই না? তুই সন্ধেয় কী করিস ফণি, একা একা ভালো লাগে।

ফিরিই তো রাত নটা নাগাদ, আমি সারাটা পথ হেঁটে আসি।

কেন, বাসে আসা যায় না?

ভিড় খুব, আর আমার তাড়ার কী আছে, হেঁটে এলি সময়ও কাটে, পয়সাও বাঁচে, গাঁ দেশে কত বাস ছিল মাসি?

যেখানকার যেমন, রাতি এসে রান্না করিস?

সকালেই করে নিই, রাতি গরম করে নেয়া হয়।

চুপ করে থাকল বীরাঙ্গনা। তখন ফণিভূষণ বলে, মাঝে মাঝে ভাতে ভাত ও করে নিই মাসি, ঘি ছিল না, এমাসে বড়বাজার থেকে পেয়েছি, ওরা তো শুধু ঘি ঘায়, ঘি আর মাখন খেয়ে কী রকম চেহারা আমার মালিকের।

মালিক দিয়েছে?

হ্যাঁ মাসি, সে আমায় শুধু বলে মাছ মাংস ছেড়ে নিরামিষ ধরতে।

কেন, তুই পারবি?

আমি নিরিমিষ খেলে সে খুব খুশি হয়।

তোর যদি ইচ্ছে হয় খাবি।

আমি মাছ ছাড়া পারি নে, মাছে ভাতে বাঙালি।

তা তো ঠিক।

সবাই চায় আর সবাই তার মতো হোক।

ওরা কি হিন্দু না?

হিন্দু বাঙালি ছাড়া কোনও হিন্দু নাকি মাছ মাংস খায় না, আমারে শোনায়।

বীরাঙ্গনা বলল, ফণি তোর এবার সংসার করা দরকার।

ফণিভূষণ বলল, আমি যদি মাছ মাংস ছাড়ি, মাইনে বাড়াবে।

এই কথা বলেছে?

হ্যাঁ মাসি, সুযোগ বাড়বে বলেছে, আসলে মাছ মাংস ছোঁয়া লোক পছন্দ করে না।

তুই কী করবি?

ফণিভূষণ বলল, হবে না মাসি, আমারে তো বিনিপয়সায় থাকতেও দিচ্ছিল, আমি যাইনি, আমার তো গাঁ গেছে, দেশ গেছে, ভিটেমাটি ছেড়ে এয়েছি, আর কিছু ছাড়তি পারব না।

বীরাঙ্গনা বলল, তুই এবার বিয়ে কর ফণি।

ফণিভূষণ বলল, ভয় করে।

কিসের ভয়, বিয়ে তো করতিই হয়।

একা মানুষ, আমার আর কেউ নেই, অভিরামদা, তুমি তো দূরের লোক, আপন হয়েছ, অভিরামদা আমারে আশরয় না দিলি শ্যালদা স্টেশনে থাকতি হত, তারপর হয় দণ্ডকারণ্য, না হয় বাঁকুড়া, বীরভূম, রাণাঘাটে ক্যাম্প যেতি হত।

পায়ের তলার মাটি তো পেয়েছিস, এবার সংসারে শক্ত হয়ে বস।

ফণিভূষণ বিড়বিড় করে বলে, কী জানি, মনে তো হয় ভেসেই আছি।

আমি মেয়ে দেখেছি, সে খুব ভালো হাতের কাজ করে, কাঁথায় এমন নকশা করে ছুঁচ সুতোয় যে তাকিয়ে দেখতি হয়, কাপড়ে ফুল তোলে, দেখতিও ভালো।

ফণিভূষণ বলে, আমার বয়স হয়ে গেছে।

কী আর বয়স হয়েছে, এপার ওপার করে করেই না বয়স হয়ে যাচ্ছে ফণি, সময়ে বে-থা কি হল কারোর, তোদের ভাগ্যই খারাপ, সে মেয়ের ও তো বয়স হয়ে যাচ্ছে, মা বাপ ওপারে, জেঠার বাড়িতে থাকে, উপায় নেই।

ফণিভূষণ খোলা জানালা দিয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে। দূরে ল্যাম্প পোস্টে আলোর আভাস। ফণিভূষণ অপেক্ষা করছিল আরও কথার জন্য। বীরাঙ্গনার কথা তার ভালো লাগছে। তার ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞেস করে, কেমন মুখখানি তার? চোখ দুটি? মাথায় কি অনেক চুল? লেখাপড়া কতদূর? হয় নি নিশ্চয়। কী করে হবে, মা বাপ ওপারে, সে এপারে জেঠার বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে। পড়াশুনো কি এগোতে পেরেছে? কিন্তু পড়তে পারে তো। ঝরঝরে বাংলা। হাতের লেখা সুন্দর, ইংরিজি পড়তে পারে অল্পস্বল্প। বাকিটা ফণিভূষণ তার মতো করে শেখাবে। কিন্তু ফণিভূষণকে মেয়ে দেবে কেন? ফণিভূষণের সাতকূলে কেউ নেই। ফণিভূষণের অমন হবে কী করে? সে মেয়ে বিয়ের পর কী পাবে? শ্বশুর, শাশুড়ি দেওর ভাসুর ননদ ননদাই—কোনোটাই না। বউ আনবে, বরণ করবে কে? উলুই বা দেবে কে? তার কাছে মেয়ে দেবে কেন মা বাপ?

বীরাঙ্গনা বলল, ওপারে নাইন অবধি উঠেছিল, জেঠার বাড়িতে আর পড়া হল না, মাথা ছিল পড়ার।

এপারে কোথায়?

পরে বলব, তুই আগে কথা দে।

কী কথা দেব মাসি, আমার তো পাকা কাজও নেই।

এইটাই তোর পাকা কাজ, মালিক তো ভালোবাসে।

হ্যাঁ বাসে, কিন্তু ওই যে কথা, বাবু তুমি চিৎপুরে এসে থাক, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, বাবু তুমি মছলি ছাড়ো।

ওডা ভালোবাসে তাই বলে, তুই সাড়া না দিলি আর বলবে না।

হুঁ, লোকটা ভালো, তবে সবাই চায় মানুষ তার মতো হোক, তার নিজের মতো, কিন্তু মানুষ যে সবাই আলাদা আলাদা এডা কে কবে বুঝবে? না বুঝার জন্যিই তো দেশটা ভেঙে গেল, বুঝল না মুসলমানও থাকে, হিন্দুও থাকে, খ্রিস্টানও থাকে, জৈনও থাকে, যে যার নিজের মতো থাকে।

বীরাঙ্গনা বলল, তার মা বাপের অনেক মেয়ে, দুটো এপারে জেঠা পিসির ঘরে পড়ে আছে, দু'টো ভাই দু জায়গায়, আমার মনে হচ্ছে ওদের পাশে দাঁড়ানোর দরকার।

কে বলল তুমারে?

বলেছে তার পিসি, আমি হ্যাঁ বলে দিল্লি চলে গেলাম, ফিরি আসতি মনে পড়ল, তোরে দেখে ভাবলাম ফণিই তো হতি পারে।

ফণি বলল, এপারে আসছে না কেন?

কোথায় আসপে, ওপারে পড়ে রয়েছে যদি থাকা যায়, মুসলমানরা একবার উঠোনে গরুর মাথা ফেলি গিসলো কিন্তু তাতে অন্য মুসলমানরাই আপত্তি করে, রাগ করে, তখন খারাপ লোকগুলো চুপ করে গেছে, আর কিছু হচ্ছে না।

পরে তো হতি পারে মাসি, আর হবেই।

তখন বুঝবে, বাপের তো কাজ করার ক্ষমতা নেই, কোনও দিন কাজকম্মো করে নি, জমি জমা নিয়ে থেকেছে, কী করবে এপারে এসে তা ভেবে তার মাথা খারাপ।

ফণিভূষণ চুপ করে থাকল। বুঝতে চেষ্টা করছিল সব। তার কেউ নেই। একা মানুষ। বিয়ে করলে ঘাড়ের উপর এতজন। সব তো তাকেই বুঝে নিতে হবে।

অনেকটা শুনে ফণিভূষণ বলল, ওদের তো একদিন এপারে আসতিই হবে।

মেয়েগুলো এপারে পার করে বিয়ে দিতে পারে যদি, ছেলেরা থাকতিও পারে, নাও পারে, ওরা হয়তো থেকিই যাবে।

এভাবে চার মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে?

একটার হোক—তোর উপর আমার অনেক ভরসা ফণি।

ফণিভূষণ ভাবছিল তার উপর কোনও ভারই নেই, একেবারে নির্ভার মানুষ সে। একা একটা পেট চালানো কত সোজা। জমিজমা বিষয় সম্পত্তি থাকলে যে চিন্তাটা থাকে তাও গেছে। তখন একা হলেও জমিজমাই বড় ভার। মামলা, মোকদ্দমা, লেঠোলেঠি কত কিছু হয়। সে তো বেশ আছে। তার উপরে ভার চাপাতে চাইছে বীরাঙ্গনা মাসি। কিন্তু সে নেবে কেন? না নিয়ে তো বেশ আছে। কোনও চিন্তা নেই। রাতে দেশের বাড়ির কথা মনে পড়ে বটে। খুলনা শহরের কথা মনে পড়ে। ভৈরব রূপসার কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে প্রতিবেশী হিন্দু মুসলমানের কথা, তখন একটু কষ্ট হয়। সেই কষ্টও দিনদিন কমে যাচ্ছে। শুনেছে তাদের ভিটে কোনও মুসলমান পরিবার দখল করে নিয়েছে। তারা আরও দক্ষিণ থেকে এসেছে। একেবারে হা ঘরে। এদিকে লোকটা এসেছিল পেটের ধান্ধায়, তাকে বসিয়ে দিয়েছে গাঁর লোক। ভালো হয়েছে।

বীরাঙ্গনা জিজ্ঞেস করে, কী হল ফণি?

ফণিভূষণ বলে, আমি পারব কেন?

তুই ই পারবি, তোর সে ক্ষমতা আছে।

আচ্ছা মাসি, সে তুমার কে হয়?

বীরাঙ্গনা বলল, তুই আমার যেমন হস, সে ও আমার তেমন, এমনি আলাপ, শুনতি মনে হয়েছিল তোর কথা।

আমি এত ভার নেব কেন?

তোরে নিতি হবে কেন, তুই মাথার উপর থাকপি।

ফণিভূষণ বলল, আমি কী করব বলতি পারছি নে।

ভাব, মেয়ে দেখে আয়।

ফণিভূষণ বলল, আগে জানতে হবে তো বিয়ে আমি করব কিনা, যদি করি এত ভার মাথায় নিয়ে করতি পারব কিনা।

ফণি অন্য মেয়েগুলোর বিয়ে তার বাবা মা-ই দেবে, তুই শুধু গার্জেন হবি এপারে।

ফণিভূষণ চুপ করে ছিল। তার মনে হয় এই যে সে ঘণ্টা দেড় দুই হেঁটে বাসায় ফেরে কলকাতার পথ দিয়ে, পথে কোনো দেখার মতো ব্যাপার হলে দাঁড়িয়ে পড়ে, আবার হাঁটে, কেন পারে এমন? না, তার বাসায় কেউ বসে নেই, মাথায় কোনও ভার নেই। ভার থাকা ভালো না মন্দ? তার যে মালিক সেই আগরওয়ালজি সেদিন দুঃখ করছিল তার ছেলে ব্যাবসায় বসতে চায় না, সে বলে 'লিখা পড়া' করে বাঙালিবাবুর মতো অফিসার হবে, কিন্তু অফিসারের চাকরি কত টাকা দেবে? লোকটার খুব চিন্তা হয়েছে। অতবড় ব্যবসা, তবু কত চিন্তা। তার কিছুই নেই, বীরাঙ্গনা মাসি সব দিয়ে ভার করে দিতে চাইছে মাথা।

বীরাঙ্গনা বলে, দায় দায়িত্ব, পাঁচটা মানুষের দুঃখ, চোখের জল এসব যদি তোরে না দেখতি হয় তবে জীবনটা কী জন্যি ফণি? শুকনো হয়েই থাকপে সব, বয়স হলি বুঝবি।

তের

ফণিভূষণ ধীরে ধীরে জীবনের অনেক সূত্র, উপাদান বুঝতে থাকে। কিন্তু এটাও বোঝে বীরাঙ্গনা মাসির কথা যত মধুর হোক বাস্তব যে বড়ই নিষ্ঠুর। সবাই যে যার নিজের মতো করে বেঁচে থাকতে চায়। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিন্তু ক'জন পারে সত্যনিষ্ঠ জীবননিষ্ঠ হয়ে থাকতে? পরার্থে জীবন উৎসর্গ করতে? মানুষকে যে বেঁচে থাকতে যুদ্ধ করতে হয় তা পার্টিশনের পরে এপারে এসে বুঝতে পারছে ফণিভূষণ। তেমন মানুষ কই, যে অন্যের কথা ভাবে।

ফণির চোখে অভিরাম বোস। তার বাসায় এখনও অবারিত দ্বার। না হলে ওপারের লোক এসে যাবে কোথায়? চেনা মানুষগুলো ভেসে যাবে, অভিরাম বসে বসে দেখবে। কিন্তু এটাও তো সত্য, মানুষ বড় স্বার্থপর। মানুষ এক হয়ে থাকতে পারে না। থাকতে পারলে, একে অপরের কথা ভাবলে কি দেশ ভাগ হত? হিন্দু মুসলমান আলাদা হয়ে যেত? একজন আর একজনের ভার কি নিতে পারত না? ওপারে হিন্দুর ভার নিত মুসলমান, এপারে মুসলমানের ভার নিত হিন্দু। এটা করলে যারা ম্যাপের ভিতর দাগ কেটে দুটো দেশ করে দিয়েছে, ম্যাপ ছিঁড়ে হিন্দু মুসলমানের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে, তাদের শিক্ষা হত।

কী বলছিস ফণি?

ফণিভূষণ বলল, যখন আমি বললাম ছইলদ্দি আমি চলে যাব, সব চলে যাচ্ছে আমি কী করে থাকপ, ছইলদ্দির চোখমুখে কি আনন্দের ভাব জেগে উঠল মাসি তা যদি জানতে, সে ছিল আমার জমির চাষা।

খুব গরিব? বীরাঙ্গনা জিজ্ঞেস করে।

গরিব তো বটে, প্রথমেই বলল, দা'বাবু গেলি জমি আমারে লিখে দিয়ে যাও, কত চাও দা'বাবু।

তুই কিনবি? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

কিস্তিতে দিতি পারি।

আমি তো চলি যাব, কিস্তি দিবি কারে?

ছইলদ্দি বলেছিল, উপায় নেই দা'বাবু তাহলি দেব না, আমি তো ভাবতিছি তুমি কবে যাবা, তুমি যদি না যাও আমার কপাল খারাপ।

কিছু দিয়েছিল? বীরাঙ্গনা জিজ্ঞেস করে।

খুব সামান্য, আরও হয়তো পারত, দেয় নি, বলেছিল সবাই তো এমনি পেয়ে যাচ্ছে, হিন্দুদের জমি মুসলমান পাবে পাকিস্তানে এই রকমই তো আইন, এইর'মই তো বলেছে আমাদের জিন্না তুমাদের নেহেরু।

বীরাঙ্গনা শুনছে। এ কথা যে তার না শোনা তা নয়। কিন্তু ফণিভূষণ আচমকা এ কথা তুলল কেন? ফণিভূষণ বলল, যে যার স্বার্থ দ্যাখে মাসি, ছইলদ্দিরা আমার চাষা, ওর বাপ ও আমাদের জমি চষত, কীর'ম বলল আমি কবে চলে আসপ সেই জন্যি সে বসে আছে।

বীরাঙ্গনা বলল, জমি পাবে তাই।

সে তো অন্যের জমি, তথন তো আমার কষ্টটা সে দেখতে পেল না।

বীরাঙ্গনা বলল, চাষা জমি পাচ্ছে, দেশ ভাগ না হলি সে কি জমি পেত ফণি?

এ তুমি কী বলছ, এভাবে সুযোগ নেওয়া কি ঠিক?

আমি অনেক ভেবেছি ফণি, জমিজমা সব আমাদের হিন্দুদের ছিল।

ফণিভূষণ বলে, সেই জন্য নিয়ে নিতে হবে?

তুই থাকলি হয়তো নিত না।

বেঁচে না থাকতিও পারতাম তখন, জমির জন্য বসেছিল যে, অথচ লোকটা ভালো।

বীরাঙ্গনা বলল, তাও হতি পারত, যে ভাবছিল তুই চলি এলি জমি দখল করবে, সে যদি দ্যাখে তুই গেড়ে বসে আছিস, তখন তার ভিতরে দুষ্ট চিন্তা ঢুকতি পারে।

ফণিভূষণ আচমকা বলে, ওরা খুব গরিব ছিল এটা সত্যি মাসি, তার ভিতরে ও কিছু দিয়েছিল, বেশির ভাগ তো কিছু দেয় নি, পালপাড়া, কামারপাড়ার সব চলে এল, বামুন পাড়ার সব চলে এল এক কাপড়ে সব ফেলে রেখে।

রায়েট হয়েছিল?

হবে হবে করছিল, কায়েতপাড়ার এক ঘরে আগুন লাগল, এমনিই লেগেছিল মাসি, লোকে বলল, ওরা আগুন দেছ। তবে সত্যি সত্যি যে আগুন দেয় নি কোথাও তাও তো নয়। পাশের গাঁয় পাড়ার পর পাড়া পুড়িয়ে ছাই করে দিল, কেউ জল পর্যন্ত ঢালতি পারল না। আমাদের কায়েতপাড়ার আগুন আবার তারাই এসে নিভাল, যাদের নামে পরদিন দোষ হল।

বীরাঙ্গনা বলল, এই রকম হয়, এ আমি জানি।

ফণিভূষণ বলল, সব ছেড়ে দিয়ে একেবারে খালি হয়ে এপারে এসেছি মাসি, তুমি আবার ভার চাপাতি চাও?

ভার নিয়ার ভিতরে আনন্দ নেই?

কী জানি!

ক'জন তোর উপর নির্ভর করবে, তা তোর ভালো লাগবে না?

ফণিভূষণ বলল, আগে বুঝব কী করে?

মানুষ এতবড় বিপদে আর কখনও পড়েনি ফণি, আমার তাই মনে হয়, দেশ চলে গেল, ছেলে মেয়ে এর ওর ঘরে মানুষ হচ্ছে, ভেসে আছে যেন, তুই হবি খড়কুটোর মতো, তোরে ধরে বাঁচপে, তোর মতো কেউ পাশে থাকলি সাহস পাবে।

আমি পারব কিনা জানি নে।

বীরাঙ্গনা বলে, জগতে যা ঘটে, আমরা যা ঘটতি দেখি তার বাইরেও কিছু থাকে রে, তা এমনি মানুষের চোখে পড়ে না, যদি মনে একটু দয়ামায়া থাকে তো ধরা যায় সব, তুই পারবি ধরতি।

কী জানি। তুমি আমারে অন্য কিছু শুনাও।

শোন তাহলে, যখন হিন্দুস্থান পাকিস্তানের কথা মনে হয়, ভিটেমাটি ছেড়ে আসা, রায়েট আগুন রক্ত, শ্যালদা স্টেশন, সোমত্ত মেয়ে চুরি এসব মনে আসে, আমার মনে পড়ে শুধু রাবণ রাজার কান্না, পুত্র শোক ভেসে আসে ফণি—

হায়রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর! কি সান্ত্বনা ছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে
আমারে?...

শুনতে শুনতে ফণিভূষণ মাথা নামায়। বুক ভার হয়ে যাচ্ছে। বুড়িমাসি বীরাঙ্গনা জীবনের সব ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দেয় কবি মধুসূদনকে। অন্তত নিজে মিলগুলি খুঁজে পায়। যে বিষাদ, শোকতাপ মধু কবির কাব্যে কবিতায় জড়িয়ে তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেয় বীরাঙ্গনা। কিন্তু ফণিভূষণ নিজেকে তার সঙ্গে একাকার করবে কীভাবে? তার তো ওসব নেই। সে ওপার থেকে এসেছে নিঃস্ব হয়েই। একেবারে নিঃস্ব। তার বোন ভগ্নিপতি জমি জমার দিকে লোভ দিয়েছিল। গাঁয়ে গরিব মানুষ-চাষারা দিন দিন এসে বলে যাচ্ছিল, 'বাবু তুমি যদি ওপারে ইনডিয়া-হিন্দুস্থানে চলি যাও, আমারে দক্ষিণের দুবিঘে দিয়ে যেও। যা পারি ধরে দিচ্ছি, বাকিটা পরে দেব বাবু।'

একজন নয়, নানাজন। যারা চাষা ছিল তারা। যারা চাষা ছিল না, তাদের মতোই জমিতে লোক খাটাত, তারাও। চাষারা বলছিল, তুমরা যাচ্ছ, এতে আমরা বাঁচপো তুমাদের দয়ার শরীর, দিয়ে যাও, ওপারে গিয়েও তুমাদের হবে।

হবে। তোমরা তো আমাদের মতো ভাগ্য লিয়ে আসনি ফণিদাদা, ফণিভাই, তুমাদের মা লক্ষ্মী আছে, তিনি আবার দেবেন, আবার হবে ওপারে গে, এপারেও আমরা বাঁচলাম, আমাদের জমি হল আমাদের ধান হল আমাদের অন্ন হল।

ফণিভূষণ টের পেয়েছিল আর থাকা হবে না। পার্টিশান হয়ে গেছে মানে পাকিস্তান জন্ম নিয়েছে। পাকিস্তান জন্ম নিয়েছে মানে মুসলমান কিছু পাবে। কী পাবে? পুড়ো হাফিজদ্দি তার উঠোনে সন্ধেবেলায় বসে বলত, লিগ বলেচে বাবু, এবার মোছলামানের দুঃখ যাবে।

হিন্দুর দুঃখ শুরু হবে?

জিভ কেটেছিল বুড়ো, তোবা তোবা, এডা তুমি কী বলো ফণি, একজনরে দুঃখ দিয়ে আর একজনের সুখ হয়, হতি পারে কখুনো?

তাই ই তো হয়।

হয় না, আমার চাচার ঘরে অন্ন না থাকলি আমার মুখে অন্ন রোচে?

রোচেনা, তুমি বলছ চাচা?

হ্যাঁ, ফণি, তবে কিনা মোছলমান অনেক কষ্ট করেছে, অনেক দুঃখ সয়েচে বলা যায়, তার সঙ্গে পোদ—নমঃশুদ্দুরাও, এবার সে সব কষ্ট যাবে।

কী করে যাবে?

বুড়ো হাফিজদ্দি চুপ করে শূন্য অন্ধকারে চেয়েছিল। হেমন্তের সন্ধ্যা। হিম পড়তে শুরু করেছিল। গায়ে তার একটি গামছা। তা দিয়ে মাথা ঢাকতে গেলে গা আলগা হয়ে যায়—নুন আনতে পান্তা ফুরোনর দশা। ফণিভূষণ ছিল দাওয়ায় বসে। মা গেছে মাস দুয়েক। শ্রাদ্ধ শান্তি শেষ। বোন ভগ্নিপতির কথায় সাড়া না দেওয়ায় তারা অভিমান করে চলে গেছে।

যশোরে মেজদি তার খুড়তুতো ননদের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে চেয়েছিল, সে না করে দিয়েছিল। সেই মেয়েটাকে দেখেছিল সে। বড় আহ্লাদী। বাপের ঘরে পাটের ব্যবসা। তা নিয়ে মেয়ের আহ্লাদ যে কেন হয়? শুধু সাজতে ভালোবাসে। আধো আধো কথা বলতে ভালোবাসে। কাজ করতে চায় না। কেন করবে? তার বাপের বাড়ি কি দাসদাসী কম আছে? কাজের লোক, রাতদিনের লোক, রান্নার লোক। ফণি না করতে মেজদি অসন্তুষ্ট হয়েছিল। বোন, ভগ্নিপতি গার্জেন। তাদের কথা শুনতে হবে না? না শোনে নি ফণি। এরকম বউ তার মনের ভিতরে নেই। কীরকম আছে তাও জানে না। দেখলে বুঝতে পারবে। মনে যদি ধরে যায়।

বুড়ো হাফিজদ্দি উঠোনে বসে বলছিল, মা ঠাইরেন যদি থাকত, আমাদের দুঃখু থাকত না।

এত কাল ছিল তো মা ঠাকরুণ, দুঃখ হল কেন?

তখন তো পাকিস্তান হয়নি।

মা বেঁচে থাকতেই তো হয়েছে।

তখন তো মা পড়ুটে হয়ে পিছল ফণিভাই।

তা সত্য। মা ওদের দুবেলা বসে খাওয়াত। উঠোনে নিম গাছের ছায়ায় পাত পেড়ে বসে গেলেই হল। দাওয়ায় উঠত না। দাওয়ায় ওঠে নি কেউ কোনওদিন। হাফিজদ্দি বলল, এই যে জাড়, মা কী সোন্দর গা'র কাপড় দিইল ফণিভাই।

তা কী হল?

চুরি হল না গেল হপ্তায়, গা'র কাপড়খানা ও নে গেছে, আমার বড় জাড় লাগতেছে, আমি দাওয়ায় উঠি, ভালো হিম পড়তেছে ফণিভাই।

ফণিভূষণ চমকে যায়। এ ঘটনা কোনওদিন ঘটেছে? দাওয়ায় উঠেছে কেউ কখনও?

ইস্কুলের হেডমাস্টারও উঠোনে বসেছে। আলাউদ্দিন স্যারকে দেওয়া চেয়ার জলে ধুয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাওয়ায় তুলেছে মা। কিন্তু মা তাকে বড় মান্য করত। গলায় আঁচল দিয়ে নমস্কার করত। হাফিজদ্দি উঠে এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ কাঁপছে লোকটা। পাতলা গামছায় কি শীত আটকায়? হাফিজদ্দি দাওয়ার সিঁড়িতে পা দিতে দিতে বলেছিল, কিছু মনে কোরো না ফণি ভাই, মা ঠাইরেন থাকলিও উঠতি দিত, এখন পাকিস্তান হয়ে গেছে, এখন আর এসব থাকবে না।

ফণিভূষণ বলল, হিন্দুর ধর্ম যাবে?

তা কেন, ওতে গুনাহ্ হবে, সেডা থাকবে, কিন্তু পাকিস্তান হই গেছে, এখন কি মুসলমান জাড়ের ভিতরে উঠনে বসপে, বসপে না।

কেডা বলল?

উঠে এল হাফিজদ্দি, ঠাণ্ডা শানের মেঝেতে বসে অন্ধকারে হাত ঘষতে লাগল, বলল, কোনওদিন এখেনে হাত দিই নি ফণি ভাই, কীরম তেল তেলে, হ্যাঁ সবাই তো তা বলতেছে, বলতিছি তুমি তো ওপারে যাবা, আমারে আমার চাষ করা জমি দক্ষিণের দেড় বিঘে—ওতে আবার ইস্কুলির মাস্টার এন্তাজের খুব লোভ, ওর পাশেই তো তার চার বিঘে, এন্তাজরে দিয়ো না ফণিভাই, তুমি আমার ছোট ভাই-ইর মতো, মা ঠাইরেন তা বলত—

ফণিভূষণ ভাবতে ভাবতে টের পায় শূন্যই হয়ে গেছে সোনার লঙ্কা ধাম। বুকের ভিতরটা যেমন, বাইরেটাও। সে জমি তো এন্তাজ মাস্টারই নিয়েছিল জোর করে। রায়ট লাগাতে পারত জমি যদি তারে না দিত ফণিভূষণ।

চোদ্দ

হাবলু যা বলে তার অনেকটাই ওর বানানো। ওই যে বলেছিল ওর নামে একটা চাঁপা গাছ পুঁতেছে ওর মা পাকিস্তানে, এতো রূপকথার গল্প। ঠাকুরমার ঝুলিতে এ গল্প আছে, খোকনকে বলল টিয়া। টিয়া হল খোকনের মাসির মেয়ে। মাসিরা এখনও ওপারে আছে। মেয়েদের পার করে দিয়েছে। এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। আর এক মেয়ে এই টিয়া। সে তার বড় মাসির কাছে থাকে বড় মাসির মেয়ের মতো। খোকন বলল, তা কি ও জানে না, খুব জানে, কিন্তু কথাটা সত্যি হতেও তো পারে।

কী করে সত্যি হবে?

খোকন বলল, কী করে আবার, সত্যি হতেও পারে, ওর মা কতদূরে আছে, মা বলেছে যখন মিথ্যে বলেছে?

টিয়া মুখ অন্ধকার করে বলল, সে তো আমার মাও কতদূরে। ওই পাকিস্তানেই, আমার মাও তো ভাবে। বলে চুপ করে থাকল টিয়া। খোকনও। চাঁপা গাছ কি মেয়েদের

কথা মনে রাখে? ঠাকুমার ঝুলিতে ছিল তো রাজপুত্তুরের কথা। রাজপুত্তুর তো ছেলেরা হয়। রাজকন্যে কি ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করতে যায়? কথাটা বলবে না বলবে না করেও খোকন বলে ফেলল। বলতেই টিয়া মাথা ঝাঁকায়, বলল, যায়, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর কথা জানিস তুই! তবে হ্যাঁ চাঁপা গাছ টাছ সব বানানো, ও হয় না।

হয় না, আবার হয়। খোকন মনে করে হতে পারে। পারেই। যেমন হাবলুদা দিল্লি গিয়ে জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে দেখা করতে পারে। খেলতে নেমে বড় প্লেয়ার হয়ে যেতে পারে। সবই তো হয়। কেউ না কেউ হয়, সুতরাং হতে পারে। চাঁপা গাছও তাই। গাছের প্রাণ আছে।

টিয়া বলল, হাবলু আবার দেশে যাবে বলেছিল না?

দিল্লি ঘুরে এসে।

ধুর দিল্লি গিয়ে কী করবে, বরং দেশে যাক।

সে ওর ইচ্ছে।

টিয়া বলল, কী করে, সারা দিন টো টো?

চাকরি করবে বলছে।

কে ওকে চাকরি দেবে?

খোকন বল, বড় হলে চাকরি করে সবাই।

তাই নাকি, আমার বাবা তো চাকরি করে না।

খোকন বলল, আমার বাবা তো করে।

হ্যাঁ কেউ করে, কেউ করে না, হাবলুও করবে না।

খোকন মাথা নাড়তে থাকে। টিয়া আবার বলল, আমি বলে দিলাম ও কিছুই করবে না, যারা ওরকম আজগুলি বানায়, তারা ওইসব নিয়ে থাকে।

খোকন চুপ করে থাকল। টিয়াদির কথাগুলো তার পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু সে কথা সে বলতে পারছে না। দেখল শুধু সে নয়, জানালার দুই শিকের মধ্যিখানে বসে সাদা বেড়ালটাও চুপ করে কথা শুনছে। বেড়ালটা টিয়ার খুব বাধ্য। ন্যাওটা। হাবলু বলে, ওপার থেকে এসেছে।

এই কথা খোকন বলে দিতে টিয়ার কী হাসি, বলে, হাবলুর মাথায় গোলমাল, বেড়াল আসবে কেন, বেড়ালের কি হিন্দু মুসলমান আছে?

হাবলু শুনে বলেছিল, আছে কি নেই তা বেড়াল নিজে জানে।

টিয়া ওর কথার কোন্য মূল্যই দেয় নি। খোকনের মনে হয় হলেও তো হতে পারে। হয়তো বেড়াল পিছু পিছু এসেছে। না হলে গন্ধ শুঁকে শুঁকে এসেছে। আসতেই পারে। এতো কলকাতা শহর। বেড়াল থাকত, সেই অজ-পাড়া গাঁ, বুধাহাটা কি খেঁরসায়। বেড়াল থাকত সেই পাকিস্তান, পাকিস্তানে কেন থাকবে বেড়াল?

কেন থাকবে মানে, আমার মা বাবা নেই?

আছে টিয়াদি, তবে তুমি এলে কেন?

টিয়া বলল, জানিনে যা, তুই বড্ড তক্কো করিস খোকন, তুই বড্ড পাকা হয়েছিস খোকন, ওই হাবলু তোকে এমন করে দেচ্ছে, আগে তুই এমন ছিলি নে।

কী কথার কী কথা তা বুঝবে কে? খোকন বেড়ালটাকে আচমকা ভয় দেখাল হাত আর শরীর ঝাঁকিয়ে। বেড়ালটা কেমন চমকে গেল। তারপর আবার স্থির। তা দেখে খোকনের কী হাসি। আর তাতেই চটে গেল টিয়া। সে তার লম্বা ঝুলের কোমর নামানো ফ্রকের ফিতে খুলে আবার বাঁধতে বাঁধতে বলল, এসব হাবলুর শিক্ষা।

কেন, আমি পারি নে?

তুই মিঁয়াও কে ভয় দেখালি কেন?

খোকন বলল, তাতে হল কী?

তোর হাবলুদা রাস্তায় গিয়ে কুকুর দেখলে ঢিল ছোঁড়ে?

না তো।

ঢিল ছুঁড়তে বল না, তখন বোঝা যাবে কত সাহস।

খোকন বলল, শুধু শুধু তা করবে কেন?

যাতো, আমি এই বইটা শেষ করি।

খোকন বলল, তোমার বেড়ালটাকে সঙ্গে যেতে বল না।

কোথায় যাবি?

মাঠে যাব।

ওম্মা, এই দুপুরে মাঠে, কী ঝনঝনে রোদ।

খোকন বলল, কী করব, তুমি তো যেতে বলছ।

বড্ড ডিস্টাব করিস খোকন, ঘুমো না, তুইও তো তোর হাবলুদার সঙ্গে যেতে পারিস।

খোকন চুপ করে থাকল। হাবলুদা যে কোথায় কোথায় চাকরির জন্য ঘোরে। হচ্ছে না। বাবা এক জায়গায় পাঠিয়েছিল, বিলিতি ঘড়ির কোম্পানিতে, হাবলুদা যায় নি, পরে বলেছে চিনতে পারেনি।

শুনে টিয়া বলেছিল, দ্যাখ গিয়ে গড়ের মাঠে শুয়ে ঘুম মারছিল।

তুমি গড়ের মাঠ দেখেছ?

দেখিনি, তবে শুনেছি খুব বড়, আচ্ছা কত বড় হবে?

খোকন বলল, হাবলুদা এলে জিজ্ঞেস করে বলব।

ছাড় তো তোর হাবলুদা, তুই আর আমি একদিন গড়ের মাঠে ঘুরে আসব।

হাবলুদাকে নিয়ে যাব, আমি তো গড়ের মাঠ চিনি নে।

চেনা আর কঠিন কী, জিজ্ঞেস করলে লোকেই বলে দেবে।

খোকন চুপ করে থাকে। কলকাতা শহরে নাকি কতজন হারিয়ে যায়। একথা তার মা কতবার বলেছে। পাড়া ছেড়ে, বাড়ির সামনের টালাপার্ক ছেড়ে দূরে কোথাও না যাওয়ার কথা প্রায়ই মা বলে। তাহলে তারা গড়ের মাঠ যাবে কী করে?

টিয়া এখন শরৎচন্দ্র পড়ছে। খোকন চুপ করে বসে আছে। গরমের দুপুর, ইস্কুলে গরমের ছুটি, এখন সে যাবে কোথায়? হাবলুদা থাকলে কথা হত। হাবলুদা তার নানা পরিকল্পনার কথা বলে। শুনতে বেশ লাগে।

খোকন না পেরে বলল, গড়ের মাঠে যাবে টিয়াদি?

গড়ের মাঠ। কেন রে?

ওম্মা তুমি ভুলে গেছ, সেদিন যে বললে?

বলেছিলাম বুঝি, না যাব না।

খোকন হতাশ হল, বলল, তা'লে আমি হাবলুদার সঙ্গে যাব।

তোর ওই হাবলুদা, ও তো প্রত্যেকদিন গড়ের মাঠ যায়।

তোমাকে বলেছে?

না গিয়ে করে কী, গিয়ে তো গাছতলায় ঘুমোয়, দ্যাখ গিয়ে এখনও ঘুমোচ্ছে নাক ডেকে ডেকে, খুব নাক ডাকে, তাই না?

জানি না তো।

তুই কিছুই জানিস নে, ও নাক ডাকে ঠিক।

কী করে জানলে?

যারা অলস তারা নাক ডাকে, এই তুই চুপ করতো, আমি গৃহদাহটা শেষ করি, এসব তোর হাবলুদা পড়েছে?

সন্ধেয় হাবলু বলল, ওসব পড়ে লোকে গোল্লায় যায়।

তার মানে?

মানে ওসব মেয়েদের বই, আমি তোকে বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায়ের বই এনে দেব, ব্যায়াম করবি, ওতে ব্যায়ামের নিয়ম সব বলা আছে।

খোকন বলল, তুমি গড়ের মাঠে গিয়ে ঘুমোও ঠিক দুপুর বেলা?

ওই টিয়া বলেছে তাই তো, গড়ের মাঠে ঘুমোলে ঘুম ভাঙে না।

ভাঙে না মানে?

অতবড় মাঠ তো, ঘুমিয়ে পড়লে অতবড় ঘুম হবে, কতবড় বিছানা বল দেখি, একি তোর তোষক মাদুর সতরঞ্চি, একটুখানি।

খোকন হেসে ফেলল, বলল, তাই হয় নাকি?

হয়, সেইজন্য দিন রাত লাল পাগড়ি পাহারা দেয় লাঠি নিয়ে, কেউ যদি ঘুমিয়ে পড়ে, তো হল কী, একদিন একটা লাল পাগড়ি নিজেই ঘুমিয়ে পড়ল, সে উঠল সাতদিন

বাদে, তার কানের কাছে কামান ফাটানো হল তবে।

যাহ্। তুমি এমন কথা বলো।

একদিন ওই বেড়ালটাকে নিয়ে গিয়ে আমি ঘুম পাড়িয়ে আসব, দ্যাখ তুই, পাকিস্তানি বেড়াল পোষা আমি বের করছি, আমি হিন্দুস্থান পাকিস্তান মানি নে।

তুমি না মানলে হবে কী, সবাই তো মানে।

সবাইকে একদিন আমার পথে আসতি হবে। আমি সেদিন গড়ের মাঠে সভা করব, স্পিচ দেব।

খোকনের মনে হয় একদিন গড়ের মাঠে যায়। হাবলুদা বলেছে, তোর টিয়াদিকে বলে দিবি, হয় কামান ফাটাতে হবে, না হয় সোনার কাঠি।

সোনার কাঠি?

হ্যাঁ, ঘুম ভাঙাতে ওই লাগে। বলে হাবলুদা পা দুলোয়, বিড়বিড় করে, আমি দিল্লি যাব, যেতিই হবে।

গড়ের মাঠ নিয়ে যাবে?

হাবলুদা বলল, সময় নেই রে খোকন, এখন আমার কাজ বর্ডার ভেঙে দেওয়া।

তার মানে?

পাকিস্তান রদ্ করা, নিশীথদাও একমত আমার সঙ্গে।

খোকন কিছুই বোঝে না। শুধু দ্যাখ সেই পাকিস্তানি বেড়ালটা বসে আছে ঘরের কোণে। একবার লেজটা তুলল। চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে মাথাটি নামিয়ে শুয়ে পড়ল। দু পায়ের ভিতর মুখ গুঁজল। ওইটা ওর ভান্। আসলে কথা শোনে। এটা জানে হাবলুদা। তবু ওই সব বলছে দেখে খোকন ইঙ্গিত করতেই বলল, ও জানুক, ও তো ইনফর্মার।

তার মানে?

মানে খোঁচড়।

তার মানে?

লাগান ভাঙান করে।

কারে লাগায়?

পাকিস্তানি চরদের।

তারা কারা?

তা তো জানি নে, তোর টিয়াদি হবে নাকি?

খোকন বলল, কী যে বল তুমি হাবলুদা।

না হবে না তবে বেড়ালটাকে রেখেছে কেন বল দেখি।

খোকন মাথা নাড়ে। জানে না। এও এক ঠিক দুপুর। বাইরে আজ গরম হাওয়া

বইছে। এত গরম নাকি কলকাতায় আগে কখনও পড়ে নি। পশ্চিম থেকে ভকভক করে গরম বাতাসের ঝলক আছড়ে পড়ছে শহরের পথে ঘাটে, দালান কোঠায়। হাবলুদা বেরিয়েও ফিরে এসেছে। রাস্তাঘাটে নাকি লোক নেই। থাকবে কী ? আইসক্রিম গাড়ি, মালাইওয়ালা পর্যন্ত ঘরে ঢুকে গেছে। লোক ছুটেছিল গঙ্গায় ডুব দিতে। তাছাড়া করবে কী? এ দিকে তো পুকুর ডোবা নেই। তাদের ওদিকে এমনি গরম কালে পুকুরের জল ঘোলা না করে কে উঠত? কলকাতায় তো পুকুর বলতে ওই একটা ঝিল। আর গাং বলতে গঙ্গা। গরম বাতাসের ঠেলায় গাঙের জল, ঝিলের জল ফুটছে।

সত্যি? খোকন বিস্মিত, অত বড় ঝিল-পুকুরের জল টগবগ করছে? হ্যাঁ, করছে তো বটে। একটা গাঙ একটা পুকুর কত আগুন খেতে পারে রে। কারমাইকেল হাসপাতালের ওখেনে যে খাল আছে সে খাল প্রায় শুকিয়ে গেছে। হাবলুদা বলল, এই জন্য ইন্ডিয়ায় গরম বেশি, পাকিস্তানে ঠাণ্ডা।

কী জন্য?

অনেক কারণ আছে, সবটা তোর মাথায় ঢুকবে না খোকন। বলে হাবলুদা স্থির দৃষ্টিতে বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, ওর কানের কাছে ঠোঙা ফাটাতে পারিস, কী রকম চমকে ওঠে দেখবি।

খোকন বলল, আমার ঘুম পাচ্ছে।

ঘুমো, আমি বেড়ালটারে জেরা করি। কথাটা বলে হাবলু বেড়ালের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকল।

পনের

হাবলুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে খোকন। হাবলুদা কি তাহলে পশু পাখির ভাষাও জানে। বেড়ালের ভাষাও। বেড়ালের ভাষা মানে তো 'ম্যাও'। গোঁফ ফুলিয়ে ঝগড়া। আর? খোকন একবার ভাবে হাবলুদার কথা সব বানানো, আবার ভাবে, না সত্যি।

ঘুমো, আমি বেড়ালটারে জেরা করব।

জেরা মানে? জেরা করবা কেন? খোকন জিজ্ঞেস করে।

জিজ্ঞেস করে জানি আসলে ও কী করতে পড়ে আছে এ বাড়িতে।

মাছের কাঁটা, দুধ খেতে।

সে তো অনেকেই দেবে, এ বাড়িতে কেন?

কেন? হাঁই তুলল খোকন।

খবর নেচ্ছে, আমি তো পাকিস্তান রদ করাব, দিল্লি যাব, তারপর ওখেন থেকে করাচি যাব, করাচি থেকে ফিরে ঢাকা যাব, ঢাকা থেকে আমি সাতক্ষীরে যাব, সবারে

রাজি করাতে হবে তো, আমার বাবারেও। তাহলি জেঠার বাড়ি থেকে দিদি ফেরবে।

খোকন আবছা শুনছিল। ঘুম এসে গেল প্রায়। সে তবু জড়ানো গলায় বলল, মাইকেল দিদমা, তারে রাজি করাবা তো?

হুঁ, তাহলি সাগরদাঁড়ি যেতি হবে, রেখো মা দাসেরে মনে—আত্মবিলাপ জানিস তুই খোকন?

খোকন ঘুমিয়েই পড়েছে। হাবলু বছর কুড়ি। হাবলু কী করবে বুঝতে পারছে না। ওপারে ফিরে যাবে না এপারে, ইন্ডিয়াতেই...। কিন্তু ওপারে তো জমিজমা রয়েছে, খাওয়ার অভাব নেই, চলে যায়। এপারে কী হবে? লোকের বাড়ি থাকা। বেড়ালটার দিকে তাকিয়েই রইল হাবলু। বেড়ালটা আচমকা মাথা তুলল চোখ খুলে। হাবলু পাশ ফিরে খালি মেঝেয় বালিশ ফেলে শুয়ে আছে। দুই প্রাণীর চোখে চোখ মিলেছে। হাবলুর মনে হল পাকিস্তানি বেড়াল হাসছে। কেন হাসছে? হাবলু ভাবছিল ঝুড়ি চাপা দিয়ে ওকে ধরে বস্তায় পুরে ওপারের ট্রেনে তুলে দেবে। যাহ্। ওপারে চলে যা।

হাবলু উঠে বসল। বেড়াল চুপ করে শুয়ে আছে। হাবলুর মনে হল ওই বেড়াল আর তার কীই বা তফাৎ। কাঁটাকুটো খেতে সেও তো পড়ে আছে এ বাড়ি। বেড়ালও এসেছে পাকিস্তান থেকে, সেও। হাবলু ডাক দিল, মিঁঞাও।

বেড়াল মুখ তুলল। সন্দেহ পরায়ণ চোখে তাকাল হাবলুর দিকে। তখন দরজায় এসেছে টিয়া, এই তুলতুলি, এদিক আয়।

হাবলু চট করে ঘাড় ঘুরোয়, ওর নাম তুলতুলি?

হ্যাঁ। হাবলুকে দেখে একটু গুটিয়ে গিয়েও সিধে হয়ে দাঁড়ায় টিয়া। সে আজ শাড়ি পড়েছে। শাড়ি পরে একটু জবরজং বটে, কিন্তু বড়ও হয়ে গেছে যেন অনেক। হাবলু জিজ্ঞেস করেছে, ও বলেছে ওর ওই নাম?

খিলখিল করে হাসে টিয়া, বলবে কেন, আমি নাম দিয়েছি।

ও কী বলেছে, স্বীকার করেছে।

টিয়ার চোখমুখে কৌতুক ফুটে উঠল, বলল, ওর নাম লীলাবতী।

মাথা নাড়ল হাবলু, মিথ্যে বলেছে।

তাহলে কী নাম।

আমি বের করতে চেষ্টা চালাচ্ছি, লুকোতে পারবে না।

টিয়া অবাক চোখে হাবলুকে দেখছিল। হাবলুদা এমনিতে বেশ, কিন্তু কথা বললে অনেক সময় সব গোলমাল। খোকনকে ওই লাইনে নিয়ে যাচ্ছে। হাবলুর কথা বেদ বাক্য, সব বিশ্বাস করে খোকন। কিন্তু বেদই বা বিশ্বাস করে ক'জন। টিয়া বলল, আসল নাম বের হলে কী করবে?

বস্তার ভরে পাচার করে দেব।

ফিরে আসবে।

বর্ডারে আটকে যাবে। হাবলু বলল।

তুমি আটকে ছিলে?

হাবলু বলল, আমি তো ইন্ডিয়ায় থাকব বলে এসেছি।

ও ও ইন্ডিয়ায় থাকবে। টিয়া মুখে শাড়ির আঁচল দিয়ে হাসি চাপল। টিয়ার কথা শুনে হাবলু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল টিয়ার মুখের দিকে। টিয়ার মুখখানা যেন কার মতো? লেডি মাউন্টব্যাটেন নাকি পদ্মজা নাইডু? নাকি, নাকি! মাইকেল দিদমা যে জমিদারের মেয়ের কথা বলেছিল সেই ময়রম—মানিকরামের দুঃখে যে মরল, নাকি অজেত এর বোন ময়রম এর মতো। ময়রম এমনি হাসত যেন। সে না পেরে বলল, তুই কি ময়রম?

ময়রম মানে?

ময়রম, ময়রম, মরিয়ম, অজেত এর বোন, হাসেম চাচার মেয়ে।

তারা কারা?

উতুলির হাসেম চাচা, উতুলি আমার মামার বাড়ি।

মরিয়মকে কি আমার মতো দেখতে?

একেবারে, তুই ময়রম ও ওপারে থাকলি নে।

না থাকলাম না, আমি টিয়া।

ময়রম এপারে এসে হিন্দুস্থান বলে টিয়া হয়ে গেলি?

টিয়া মাথা ঝাঁকায়, মোটেই না, আমি টিয়া, পাখির হিন্দুস্থান-পাকিস্তান থাকে?

টিয়া অবাক হয়ে হাবলুকে দেখছে। দু'চোখে কী আশ্চর্য সম্মোহন দৃষ্টি। হাবলুর দুটো চোখ কত বড়বড়। এখন খালি গা হয়ে আছে। কী পোক্ত শরীর। এ ঘরে পাখা নেই। হাবলু এখন ঘামছে। বুকের উপর বিজবিজে ঘামের বিন্দু। রগের কাছটায় ঘাম। গালে খুব পাতলা দাড়ি। মাথার চুলে কোনওদিন তেল দেয় না হাবলু। ডোরাকাটা একটা পায়জামা পরা। হাবলুর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে টিয়া আচমকা কেঁপে উঠল যেন। তার হাত সিরসির করতে লাগল। হাবলু বিড়বিড় করল, ময়রম এই দুপুরে আম জারানো যা মেখেছিল, কুশির আম, মনে পড়ে তোর?

টিয়া সম্মোহিতের মতো ঘাড় কাত করে, হ্যাঁ?

ময়রমের তিনটে পোষা বেড়াল ছিল, তাদের নাম গয়না, রয়না আর আয়না, আমি তাদের বলতাম গয়না বিবি, রয়না বিবি আর আয়না বিবি, ময়রম আয়না বিবিরে নে ইন্ডিয়ায় চলে এল, তাই তো হল।

টিয়ার কথা থেমে গেছে। মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে হাবলুর মাথার চুল ধরে নেড়ে দেয়, না, না, না, মোটেই না, তুমি এত বানাতে পার, তুমি খুব পাজি।

হাবলু পা ছড়িয়ে বসেছে। পায়জামা মালাই চাকি অবধি টেনে তোলা। পায়ে বেশ রোম। বুনো বুনো। কিন্তু টিয়ার ভালো লাগে। হাবলু দাঁড়ালে কী রকম ঘাম-গন্ধ। মনে হয় সব সময় যেন ওপার থেকে হেঁটে এল। একেবারে তার আশাশুনি গ্রাম থেকে হাঁটতে হাঁটতে বর্ডার পার হয়ে চলে এল। ফেলে এল মাইকেল দিদমা, বীরাঙ্গনা দাসীর সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষ নদ তাদের গ্রাম খেঁরসা। ইস! টিয়ার আচমকা মনে পড়ল মা বাবার কথা। ওপারের কথা। তার দিদির কথা। দিদি রয়েছে সেই মালদা। দিদি তাকে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু মাসি দেয় নি। মাসির মেয়ে গেছে, ছেলে গেছে, পড়ে আছে খোকন। মাসি তাকে আকড়ে ধরে বলেছিল কোথাও যাবি নে, এখেনে থাকবি, বোন ভগ্নিপতির বাড়িতেই থাকে?

হাবলু দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসেছে। টিয়া তাকে বলল, আচ্ছা ময়রম কে?

কেন তুই ময়রম।

আমারে তুমি ময়রম বলো কেন, ময়রমের সঙ্গে তোমার কী?

হাবলু বলল ময়রম খুব ভালো।

ভালো মানে, কতটা ভালো?

সেডা তুই জানিস।

আমি তো টিয়া, আমি জানব কী করে?

হাবলু বলল, বল দেখি, বন থেকে বেরোল টিয়া/টোপর মাথায় দিয়া—এডার মানে কী হল?

টিয়া বলল, একদিন তোমার তরকারীতে খুব করে ঝাল ঠেসে দেব, লঙ্কা।

হাবলু বলল, ময়রম এমনি বলত।

খোকন ঘুমোচ্ছে না ঘুমের ভান করছে তা টিয়া জানে না। মুখ নামিয়ে খোকনের মুখ দেখল। জেগে জেগে তাদের কথা শুনছে। খোকনটা খুব পাকা। বড় হচ্ছে তো। হাবলুর সঙ্গে এখন টিয়ার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে খুব। কী কথা বলবে সে? মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ গো ময়রম তো সেই জমিদারের মেয়ের নাম, তার নামও।

হুঁ। হাবলু বলল, যারে আমার পছন্দ তারেই ময়রম বলি।

ইস। তার মানে কী? টিয়াকেও হাবলুর পছন্দ। কী কথা বলল? টিয়ার বুকের ভিতরে যে হুড়মুড়িয়ে গাঙের জোয়ার আসছে। ছলছলাৎ। সে ধীরে ধীরে নিজেকে সামলায় অন্য দিকে তাকিয়ে। হাবলুর দিকে তাকালেই গা হাত পা এমন হয়ে যাচ্ছে।

হাবলু বলল, জমিদারের মেয়ে ময়রম মানিকরামের জেবনটা শেষ করে দিল, তাই তো।

মোটেই না। টিয়া মুখ ঘোরায়। তার ইচ্ছে হচ্ছিল ময়রম আর মানিকরামকে নিয়ে গল্প করে হাবলুর সঙ্গে। হাবলু হাবলু। মোটেই দাদা বলতে চায় না সে। ভালো লাগে

না। হাবলু বলে ডাকলে হয়। তাতে কি রেগে যাবে? বিশ্বাস নেই। টিয়া বলল, মানিকরামের কথা জানো তুমি?

হ্যাঁ জানি, কত মানিকরাম আছে, আমাদের আশাশুনিতে ময়রা মানিক ছিল, ওর চেয়ে ছোট রসমুন্ডি, দানাদার কেউ তৈরি করতে পারত না, চিটে কদমা যা করত, দাঁতে আটকালি তুলা কঠিন।

না না, সেই মানিকরাম?

কোন মানিকরাম, একদিন ট্রামে একজনের সঙ্গে আলাপ হল, বলল তার নাম মানিকলাল, সে ট্রামের ড্রাইভার, দুঃখ করছিল, কলকাতার বাইরে দিল্লি আগ্রা করাচি লাহোর যাওয়া যাবে না ট্রাম নিয়ে।

ওফ্! এসব না, সেই যে কপোতাক্ষ সাগরদাঁড়ি, মাইকেল মধুসূদনের ঠাকুর্দা সেই মানিকরাম, যাকে কিনা ইয়ে মানে...। টিয়া নেমে গেল।

কী বলছিলি বল ময়রম।

তুমি বল না, দিদমা যে বলছিল মধু কবির ঠাকুর্দা মানিকরাম কবি ছিল।

হুঁ, তারপর?

তারপর তার কবিতা শুনে জমিদানেরর কন্যার কী হল?

কী হবে 'লাভ' হল তাই তো, লাভ মানে তো ভালোবাসা।

ওফ্ তুমি না! জানো সেই গল্পটা, কবি মানিকরামের কী হল?

কী হল বল, কী জানিস বল?

টিয়া বলবে? কী বলবে? মানিকরাম ছিল তার নাতি মধু কবির মতে কবি। ফার্সি ভাষায় লিখত কবিতা। ফার্সি ভাষাটা জানে না টিয়া। হাবলুদাও জানে না ঠিক। তার চেয়ে যদি বাংলায় কবিতা লিখত কবি মানিকরাম সে বড় সুন্দর হত—যাও পাখি বলো তারে/সে যেন ভোলে না মোরে। কবি মানিকরামের কবিতা শোনে জমিদারের মেয়ে ময়রম—মরিয়ম, আড়াল থেকে। শুনতে শুনে তার মনে হয় মানিকরাম ছাড়া সে বাঁচবে না। যদি বিয়ে করে মানিকরামকে করবে। লিখল চিঠি, তোমার কবিতার চেয়ে তুমি সুন্দর কবি/তোমার চেয়ে কবিতা সুন্দর হে, আকাশের রবি।

নাহ্ হচ্ছে না। টিয়া বানাতে পারে না। কবি মানিকরাম কী বলল জবাবে তা সে বলতে পারবে না। বলুক হাবলু। হাবলু তুমি বলো। হাবলু অবাক হয়ে দেখছে টিয়াকে। ময়রম বসে আছে কপোতাক্ষ তীরে। কত নৌকো ভেসে যায় গাঙ দিয়ে? ওগো তোমরা দেখেছ কি কবি মানিকরামকে, সে কি সাগরদাঁড়ি যায় নি?

হাবলু বলল, মানিকরাম ময়রমরে ছেড়ে চলে এল ইনডিয়া কেন না সে পাকিস্তান মানে না, সে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলতে পারবে না, হিন্দুস্থান জিন্দাবাদও না।

আহা, ওসব কথা বলছি নে। টিয়া অধৈর্য হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ এইটা, তখন ময়রম দাওয়ায় বসে পথ চলতি লোককে ডাকে, ওগো আশাশুনির হাবলুকে দেখেছ—দ্যাখোনি তো—আমিও যাব ওপারে-যাব যাব।

এল? টিয়ার বুক ঝমঝম করছে আবার দুঃখও হচ্ছে। হাবলু মোটেই বোঝে না। বোঝে না। বলছে ময়রম তো এল। কই ময়রম? হাবলু চুপ করে থাকে। দু'চোখ বন্ধ করে। টিয়ার ইচ্ছে করছে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে কিল মেরে মেরে জিজ্ঞেস করে, তাহলে আমি কে, আমি কি আমি না, আমি কেন ময়রম হতে যাব হাবলু, কেন কেন?

ষোল

অভিরাম জিজ্ঞেস করল, হাবলু তুই কী করবি?

হাবলু বলল, কী করব মামা?

কিছু তো তোকে করতে হবে?

হাবলু বলল, হ্যাঁ মামা করতে হবে।

রবিবারের সকালে হাবলু আর অভিরামের ভিতর কথা হচ্ছিল। মা বাবা দেশে, হাবলু এখানে পড়ে আছে মাস আষ্টেকের উপর। মাঝে ক'দিন ওপারে গিয়ে ফিরে এসেছে, কিন্তু হাবলু করবে কী? না হয় পড়ুক। ভর্তি হয়ে যাক আই.এ.-তে। অভিরাম বইটই এনে দিয়ে সাহায্য করবে। হাবলু টিউশানিও করবে। কিন্তু ওর তো কোনওদিকে নজর নেই। এপারে তো স্থিত হতে হবে। মা বাবাকে আনতে হবে। ওপারে তো তারা চিরকাল থাকতে পারবে না।

অভিরাম খুব গম্ভীর মানুষ। অভিরামের চোখে চোখে রাখতে ভয় পায় হাবলু। পাশের গাঁয়ের লোক, তাই মামা। না হলে অভিরামের সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক কোথায়? রক্তের সম্পর্ক নেই বলেই হাবলু আছে এখানে। থাকতেও পারছে। অভিরামের দুটো অন্ন দিতে কোন ও আপত্তি নেই, কিন্তু হাবলুকে তো দাঁড়াতে হবে কিছু একটা নিয়ে, ধরে। দুজায়গায় কাজের জন্য পাঠিয়েছিল অভিরাম, হাবলু যায় নি। দু'বারই দুরকম অজুহাত দিয়েছে। একদিন মিছিল ছিল রিফ্যুজিদের। সে মিছিলে ঢুকে পড়েছিল। সে তার কাছেই যেতে চেয়েছিল, কিন্তু মিছিলের লোক তাকে টেনে নিয়েছিল। কী আশ্চর্য! তার ভিতরে তাদের ওদিকের রাম মিস্ত্রি, শ্যাম মিস্ত্রি, যদু মিস্ত্রি, তিন ভাই-ই ছিল। আরও আশ্চর্যের হল তারা নাকি মিছিলের খবর পেয়েই এসেছিল। পরের দিন আবার ফিরে গেছে বর্ডারের ওপারে। তারা ওপারেই থাকতে চায়। চায় পাকিস্তান রদ হোক। হাবলুও তাই চায়। শুনতে শুনতে কীরকম অবিশ্বাসীর চোখে তাকিয়েছিল অভিরাম, জিজ্ঞেস করেছিল, পরের দিন?

চিনতে পারি নি মামা।

কেন ট্রামে করে ডালহৌসি যাবি, জিজ্ঞেস করলেই লোকে দেখিয়ে দিত।

হাবলু বলল, ট্রাম বিকল হয়ে গিয়েছিল মামা।

অভিরাম বলল, বাড়ি ফিরে এলি? চাকরি করবি না তুই?

হাবলু বলল, আমি দিল্লি যাব।

তখন প্রভাময়ী ঢুকল, সক্কালবেলায় ওরে নিয়ে পড়লে, ওর কি চাকরির বয়স হয়েচে না মন হয়েচে।

তাহলে পড়ুক।

হ্যাঁ পড়বে, মা বাবাকে আনুক।

হাবলু বলল, তারা তো আসবে না।

ভালো আছে ওপারে?

গেলাম তো, বলল তো কোনও অসুবিধে নেই।

বছর দশ দেশভাগ হয়ে গেছে। যখন হয়েছিল, হাবলুর তখন বছর দশ হবে। এখন কুড়ি। হাবলু বলল, অসুবিধে আছে, তবু বলে নেই, দ্যাখো মামি ওপার থেকে ময়রম তার বেড়াল আয়না বিবিরে নে এপারে চলে এল, এটা কি ভালো থাকলি হত?

কী বলছিস? অভিরামের ভ্রু কুঁচকে যায়, বোঝার চেষ্টা করে।

হাবলু বলল, উতুলির ময়রম, অজেতের বুন, উতুলি আমার মামার বাড়ি, ময়রমের ছেল তিন বেড়াল...।

হাবলুর অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনে অভিরাম অবাক। কী বলছে এ ছেলে? প্রভাময়ীর চোখ মুখে কৌতুক ফুটে উঠে বিষণ্ণতা এল, বলল, এসব তুই জানলি কী করে!

জানি, আমি টের পাই।

কী টের পেলি?

হাবলু বল, এইরকম অনেকে চলে আসতেছে, এই ধরো না মামি, আমিও তো চলে এয়েচি, মা বাবা কেন আসবে না?

অভিরাম বলল, তুই কলেজে ভর্তি হয়ে যা, না হয় কাজে ঢোক।

হ্যাঁ মামা তাই হবে।

এখন তো ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে, দেখি মণীন্দ্র কলেজ না হয় সিটি, বিদ্যাসাগরে তোরে ভর্তি করা যায় কি না।

আমি রাজি, কিন্তু শাবন মাসে দিল্লি যাব।

দিল্লি! কোথায়?

হাবলু তার মনোবাসনা খুলে বলল, শুনতে শুনতে অভিরাম হেসে ফেলল, নেহরু, তোরে ফাটকে পুরে দেবে।

কেন?

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা যায়?

কেন যায় না?

না যায় না।

কারা দেখা করতি পারে?

অভিরাম বলল, ওসব মাথা থেকে তাড়া, কলেজে ভর্তি হ, এটা নতুন দেশ, কিন্তু এটাই আমাদের দেশ, এখেনেই তোকে থাকতি হবে।

হাবলু চুপ করে শোনে।

অভিরাম বলল, তোর বাবাকে আমি চিঠি দেব?

বাবার চোখ খুব খারাপ, ঝাপসা দ্যাখে সব।

তোর মা পড়ে দেবে, দুটো বোনও তো বড় হয়ে গেছে, পড়তে পারবে।

এপারেও তো দু'জন আছে মামা।

হাবলুর কথায় পারম্পর্য হারিয়ে যায় বারবার। অভিরামের তা নজর এড়ায় না, বলল, তুই কিছু একটা কর।

হাবলু বলল, করব, কিন্তু মা বাবা আসবে না মামা, বলে, এপারে খাবে কী?

অভিরাম উঠে গেল। প্রভাময়ী ডাকল, রুটি তরকারি নিয়ে যা, সকালে তো খাস নি এখনও।

হুঁ। হাবলু ওঠে। প্রভাময়ী চাপা গলায় বলল, তোর মামার কথা রাখ, কিন্তু তোকে দাঁড়াতে হবে হাবলু, বনগাঁ বসিরহাটে দুটো বুন, ওদের বিয়ে দিতে হবে তো, তোর বাবা চিঠি লিখেছে তোর মামার কাছে তা জানিস?

বাবা লেখেনি, হয় বুন না হয় ভাই লিখে দেছে, বাবার এখন উপায় নেই, কবরেজ ডাক্তার সব না করে দিয়েছে।

তোর বাবা বলেছে, ওরা লিখেছে হয়তো।

কবে এল চিঠি?

এর ভিতরে এয়েচে, ওখেনে ওরা থাকতি চায়, কিন্তু আর দুটো বুনও তো বড় হয়ে যাচ্ছে, তাদেরও তো এপারে পাঠাবে, বড় মেয়ে ওখেনে নিরাপদ না।

হাবলু বলল, হুঁ, কিন্তু মামি যদি পাকিস্তান রদ হয়।

তা হয় নাকি, দশ-এগারো বছর হয়ে গেল, এতদিন বাদে হয়?

হাবলু থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকল। প্রভাময়ী হাত রাখল হাবলুর পিঠে, বলল, বনগাঁ যাবি বলেছিলি।

কেন?

বাহ্ তোর দিদি তো দেখতি চায় তোরে।

হাবলু বলল, জেঠার বাড়ি আমার ভালো লাগে না।

তাই বললে হয়, তোর তো জেঠা, তারা তোর দিদিরে রেখেছে।

আপনার তো নয়।

কে বলল, তোর বাবার বড় ভাই।

বাবা বলে তাই, কিন্তু আপনার বলে মনে হয় না, বাবা ভুল বলে।

ওসব ভাবলি চলে হাবলু, আপনার জেঠা, দিদিটারে দেখে আসবি নে?

হাবলু বলল, মাসি খেতে দাও।

প্রভাময়ী বোঝে একথা হাবলু পছন্দ করছে না। কিন্তু পছন্দ না করলেও হাবলুকে তো বুঝতে হবে। হাবলুর বাবা মৃগেন রায় খুব বিপদে পড়েছে। চারটি মেয়ে। ওপারে থাকা যায় কিন্তু মেয়েদের রাখা যায় না। এপারে পাঁচ কাঠা জমি সমেত ভিটে বাস্তু পাচ্ছিল মসলন্দপুর। শুধু ভিটে বাস্তুতে করবে কী? খাবে কী? ওদের বাড়ি অনেক ভিতরে। অত ভিতরে বিনিময়ে করে যাওয়ার লোক তেমন পাওয়া ভার। প্রথম দিকে পেয়েছিল, বছর ছ'সাত আগে। কিন্তু তখন ভেবেছিল ভারত পাকিস্তান থাকবে না। এখনও হয়তো তাই মনে করে, তবে বিশ্বাস ভাঙছে, ভয় ঢুকছে। চিঠিতে লিখেছে বিহারি লোক ওদিকে জমিজমা ধরে বসতি করছে। তাদের ভাষা বোঝা যায় না।

টিয়া এসেছে, জিজ্ঞেস করল, কী হল মাসি?

কিছু না, কী হবে?

হাবলুর দিকে আড় চোখে তাকায় টিয়া, বলল, মেসো কী বলছিল?

কিছু না, কী বলবে?

টিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। হাবলু ঘর থেকে বেরিয়ে রান্না ঘরের দরজায় দাঁড়ায়। প্রভাময়ী বলল, হাবলুদাকে রুটি তরকারি দে, ওর খিদে পেয়েছে।

টিয়া হাবলুকে হাত দিয়ে সরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল, বলল, তুমি ঘরে যাও হাবলুদা, আমি দিয়ে আসছি।

হাবলু ফিরে এল। হাবলুর মন খারাপ হয়ে গেছে। মামি যে কেন দিদির কথা বলল। দিদির নাম বুলি। দিদি তাকে গেলবার ভাইফোটার পর চিঠি দিয়েছিল, পত্রে আমার ফোটা নিস ভাই, ভাই-এর কপালে দিলাম ফোটা/যমের দুয়ারে পড়ল কাটা...

হাবলু একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল। সত্যিই তো এ তার নিজের বাড়ি না। এখেনে কতকাল থাকবে? কিছু তো করতে হয়। বাবা তো সেইজন্য পাঠিয়েছিল বনগাঁর জেঠার বাড়ি। হাবলু সেখান থেকে পালিয়ে এখানে। বাবা তাকে পাঠিয়েছে দুই বোনকে দেখতে। তাদের গার্জেন নাকি সে। হাবলু কোনও খোঁজই রাখতে পারে না।

টিয়া ঢুকল রুটি তরকারি নিয়ে, বলল, কী বলছিল মেসো?

কিছু না তো, বলবে কী?

আমি শুনেছি, তুমি কিছু করবা না হাবলুদা?

কী করব, আমি পাকিস্তান রদ করব তো বটে।

পাগল একটা, চাকরি বাকরি করবা না?

হাবলু বলল, করব, কিন্তু সময় হোক, সব কিছু সময়ে হয়।

টিয়া বলল, মেসো কিন্তু খারাপ বলে নি।

হাবলু এবার বিরক্ত হল, বলল, তুই তো দেখছি মেসো হয়ে গেলি, আমার ভালোমন্দ নিয়ে তোর চিন্তা করতে হবে না।

টিয়া বসে পড়ল তার সামনে মেঝেতে। হাবলু পছন্দ করছে না এসব কথা। ঠিক আছে বলবে না। কিন্তু তার ইচ্ছে হয় হাবলু চাকরি করুক। শীতের দিনে সুট পরে অফিসে যাক। হাবলু একটা বাসা নিক। জমি কিনুক দমদম বিরাটির দিকে। এইরকম নাকি হয়। মাসির কোন ননদের ছেলে ভালো চাকরি পেয়েছে সরকারে। লেখাপড়ায় খুব ভালো সে। ছিল কোন বস্তি বাড়িতে। এখন দমদমের দিকে ভালো বাসাবাড়ি নিয়েছে। বিরাটিতে তিন কাঠা জমি কিনেছে। বাড়ি তুলবে। ওপার থেকে ওরা কিছুই আনতে পারে নি। ওদের বাড়ি ছিল অনেক দূরে, পদ্মার ওপারে। দাঙ্গা হয়েছিল খুব। বাড়ি ঘরদোরে আগুন লেগেছিল। এক বস্ত্রে লুকিয়ে ছিল। কোনও মুসলমান প্রতিবেশীর ঘরে। শেষে তারাই পার করে দেয়। কিন্তু বাড়ি ঘরদোর দখল করে নিয়েছে খারাপ লোকে। টিয়া সব শোনে। মাসি সেই ননদের ছেলের কথা বলে। তার নাম নবীন। সে আরও বড় পরীক্ষা দিয়ে আরও বড় চাকরি পাবে।

হাবলু জিজ্ঞেস করল, তুই বসলি কেন সামনে?

টিয়া হাসল, বলল, হাবলুদা, মানিকরামের গল্পটা শেষ কর নি।

ওডা দিদমার গল্প, তোর নবেলে আর মন হচ্ছে না?

টিয়া হাসল, আহা, নবেল কি খারাপ?

নবেল পড়ে বলেই লোকের এত কষ্ট, এই তুই যা নবেল পড়গে তোর বেড়াল নিয়ে, বেড়ালরে নবেল শোনা, আমার ভালো লাগছে না।

টিয়ার তখন খুব ইচ্ছে হয় হাবলুর পিঠে হাত দেয়, ভালো লাগছে না, লাগবে হাবলু তুমি যদি বড় একটা চাকরি করো ওই মাসির ননদের ছেলে নবীন না কার মতো। তারপর দমদমায় জমি কিনবে। বাড়ি করবে।

হাবলু বলল, মানিকরামের মতো আমি সাধু হয়ে যাব।

আঁতকে উঠল টিয়া, সে কী, বলছ হাবলুদা।

হাবলু বলল, কেন নেতাজি সাধু হয়ে আসে নি শোলমারি না কোথায়, শুনিস নি তা, শুধু নবেল, খবরের কাগজ দেখিস?

হুঁ। টিয়া সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়।

খবরের কাগজ তো বলছে উনিই নেতাজি।

তাতে হল কী?

নেতাজি ফিরুক তা তুই চাস নে।

ফিরলে কী হবে? টিয়া উদাসীন গলায় জিজ্ঞেস করে।

হিন্দুস্থান পাকিস্তান রদ হবে।

সেডা কি ভালো হবে?

আবার যে যার ভিটেয় ফিরে যাবে। বলে হাবলু আচমকা বিরক্ত হয়ে ওঠে, তুই তো কিছুই বুঝিস নে, তোর নবেলে তুই কী পাস, কী লেখা থাকে?

পড়ে দ্যাখো না, চরিত্রহীন এনে দেবে আমাকে?

হাবলু বলল, আর ওসব পড়তি হবে না, নেতাজি ফিরলি নাটক নবেল বন্ধ, আমারে রক্ত দাও, আমি তোমারে স্বাধীনতা দেব, কদম কদম বড়ায়ে যা, দিল্লি চলো....।

খিলখিল করে হেসে ফেলে টিয়া, পাগল একটা, নেতাজি ফেরবে না।

চুপ! তুই যে পাকিস্তানি তা ধরা যাচ্ছে।

টিয়া আবার হাসল, আর তুমি হলে হিন্দুস্থানি, তাইতো, দেখ ওসব উঠে গেলেও কেউ যাবে না, কলকাতা ছেড়ে কেউ যায়, আমি তো যাব না।

যাবিনে, সত্যি?

না, অবশ্য তুমি যদি নিয়ে যাও...বলতি পারি নে কী হবে!

হাবলু বিস্মিত দৃষ্টিতে টিয়াকে দেখছে। কেমন লাগছে যেন এই মেয়েটাকে। সেই ময়রমের মতো! অজেত আলির বোন!

সতের

খোকনের বন্ধু হয়েছে। একজন নয়, চার পাঁচ জন। তাদের ভিতর শংকর থাকে কাল্টুদের বাড়ির একতলায়। ভাড়াটে। তারাও ওপারের লোক। বরিশাল। শংকররা তিন ভাই। বড় ভাই গেছে ভোপাল। ওদিকে চাকরি করে। কলকাতায় আসেই না। আসা খুব ঝামেলা। দুবার রেলগাড়ি বদল করতে হয়। শংকর বলে, ওদিকে রায়পুর, বিলাসপুর, নাগপুর, ভিলাই...এই রকম কত জায়গা। ওদিকে কত রিফ্যুজি আছে। ভারত দেশটা কত বড় তা হাওড়া স্টেশনে গেলে ধরা যায়।

খোকন বলল, হাওড়া স্টেশনে যাবা হাবলুদা?

খড়গপুর যাব যখন, হাওড়া দিয়ে যেতে হবে।

দিল্লি?

হাবলু বলল, দিল্লি তো শ্যালদা দিয়ে আপার ইনডিয়া এক্সপ্রেস, আমি শ্যালদা গিয়ে ট্রেন দেখে এসেছি।

খোকন আশ্চর্য হল। কবে গেল শিয়ালদা? বলে নি তো। হাবলু বলল, গিয়েছিল সে। এর ভিতরেই গিয়েছিল। তবে কিনা স্টেশনটা তার ভালো লাগে নি। কেন? না

শিয়ালদা স্টেশনটা রিফ্যুজিদের স্টেশন। সব জার্মান পার্টি। জার্মান পার্টি মানে? হাবলু বলল, রিফ্যুজিদের জার্মান পার্টি বলে এদিকের ঘটি মো'নবাগানিরা। হাবলু বলে, সব চেয়ে ভালো হল মোহনবাগানের সাপোর্টার হয়ে যাওয়া। তাহলে ঘটিরা ধরতে পারবে না তারা জার্মান পার্টি কিনা।

ধরতে পারলে কী হবে?

হাবলুদা বলল, ধূর ভাল্লাগে না, আমরা তো ইনডিয়ার লোকই ছিলাম, পার্টিশান হয়ে পাকিস্তানি, তারপরে এপারে এসে জার্মান পার্টি।

জার্মান পার্টি কেন?

হাবলু বলল, নিশীথদা, ওই যে যুগের যাত্রীর কোচ, উনি বললেন জার্মান দেশও ভাগ হয়ে গেছে।

হিন্দুস্থান পাকিস্তান?

প্রায় তাই, তবে এদিকে যেন যাওয়া আসার উপায় আছে ওদিকে তা নেই, দেওয়াল উঠে গেছে, পাঁচিল।

খোকন বলল, তুমি কত জান হাবলুদা, চলো হাওড়া স্টেশনে যাই, ওখেনে গেলি নাকি ধরা যায় ইনডিয়া কত বড়।

তোরে খড়গপুর নিয়ে যাব, যাবি তো, টুবলু ওখেনে থাকে, আমার কাকার বাড়ি, কাকা রেলে চাকরি করে, কত বড় টাউন, কলকাতা তার কাছে কিছু না।

কে বলল?

বলবে কে, তবে ওইটাই সত্যি, কাকার কোয়ার্টারে কত বড় বড় ঘর, সামনে বাগান, ধর তোর বন্ধু কাল্টুদের মতো।

কাল্টুদের বাড়ি অনেক বড়। একতলায় দুটো ঘর, শুধু শংকররা ভাড়ায় থাকে। তার উপরে আরও দুটোতলা। খোকন একদিন গিয়েছিল। কীরকম গা ছমছম করছিল। বাড়িটা খুব চুপচাপ। আসলে অনেক ঘরে তালা লাগানো। কাল্টুর বাবা ব্যবসায়ে যান সকালবেলা। মা আর তিনবোন তিন ভাই। কেউ গলা তুলে কথা বলে না। কেন বলে না, না মায়ের বারণ আছে। মাকে ওরা খুব ভয় করে। খোকনকে একবার দেখল কাল্টুর মা। কিছু জিজ্ঞেসও করে নি। কথাও বলে নি।

হাবলুদা বলল, শ্যালদা গেলি ধরা যাবে ওটা রিফ্যুজি স্টেশন, প্ল্যাটফরমে সব বসে আছে হাড়ি কুড়ি কাঁথা মাদুর বোচকা বুচকি নে, সব ঢাকা বরিশাল খুলনার লোক, বরিশাল এক্সপ্রেস করে এয়েচে।

তুমি কেন গিয়েছিলে?

আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, দিল্লির গাড়ির খোঁজ নিতি।

সত্যি সত্যি যাবে?

যাব তো, এই তো গরম যাচ্ছে, বিষ্টি নামল বলে, শাবন মাস আর এক মাস, আষাঢ় তো পড়ে যাচ্ছে।

খোঁজ নিলে কবে গাড়ি যাবে?

নিলাম, গাড়ি তো সব দিন যায়, দেখেও এয়েচি, কত বড় গাড়ি।

কী করে যায়, একটা গাড়ি সব দিন যাবে কীভাবে?

অত জানি নে, শোন গাড়ি না যেন একটা দাঁড়াস সাপ, দেখেচিস?

খোকন মাথা নাড়ে।

খুব লম্বা, বাস্তু সাপ, আমাদের বাড়িতে, আশাশুনিতে আছে।

সাপ আর কত বড় হবে?

লম্বা, খুব লম্বা, মানে গাড়ি খুব লম্বা, দেখলি দাঁড়াস সাপের কথা মনে হবে, বগির পর বগি, তাতে সব চেপে বসে আছে, আড়াইটের সময় ছাড়ল গাড়ি, দেরিতে ছাড়ল, আসলে ন'টা কতয় যেন ছাড়ে।

কারা বসে আছে?

মাঠের কাছে এসে গেছে ওরা। হাবলু উত্তর না দিয়ে মাঠ দেখছিল। আজ তো কেউ নেই। প্র্যাকটিসে নামেনি যুগের যাত্রী। হাবুলর আলাপ হয়ে গেছে সুবীর, সুনীলের সঙ্গে, ভোলার সঙ্গে, নিশীথদার সঙ্গেও। মাথার উপরে বিকেলের আকাশ একটু একটু করে অনুজ্জ্বল হচ্ছে। পুবদিকে গোল্লা পাকানো একদলা মেঘ আছে। সুতোর কুণ্ডলীর মতো প্রায়। হাবলু মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল, বিষ্টি হবে খোকন।

কখন হবে?

রাতি হবে, আমার বাবা খুব ভালো বলতি পারে কখন বিষ্টি হবে কখন হবে না, গন্ধ শুঁকেই বলতি পারে, চোখে তো দ্যাখে না, মেঘের গন্ধ পায়।

মেঘের গন্ধ অত উপর থেকে নীচে নেমে আসে! খোকন বিস্মিত।

হাবলু হাসল, বলল, আসে বলতি পারিস, আসলে বাতাসের গন্ধ।

কী করে পারে গো হাবলুদা?

বাবা জানে, তবে আমি ওইটা বুঝতে পারি যেন, কোন মেঘ জল ধরে আছে টের পাই এটটু এটটু।

আশ্চর্য! সব মেঘেই তো জল থাকে, জল বাষ্প হয়, বাষ্প মেঘ হয়।

না, সবটা ঠিক না, সব মেঘে জল থাকে না! বলে উদাসীন হল হাবলু, বলল, টিয়ার মা বাবা কোথায় থাকে?

পাকিস্তান, তুমি জান না? সবাই তো জানে, আমার ছোট মাসির মেয়ে।

বেড়ালটা জানে, ওই আয়না বিবি?

খোকন হেসে ফেলল, কিছু উত্তর করল না।

হাবলু বলল, আমি পাকিস্তান মানি না এটা শুনে অনেক লোক বলেছে মানা উচিত না।

খোকন বুঝতে পারল না সবটা, তবে আন্দাজ করতে পারল। বলল, তুমি না মানলি হবে কী, আমরা তো পাকিস্তান থেকেই এসেছি।

হাবলু বলল, নিশীথদাও পাকিস্তান মানে না, বলেছে আন্দোলন করতে হবে এনিয়ে, মানা ঠিক না।

না মান না মান কিন্তু ওটা তো অন্যদেশ, ইন্ডিয়া আমাদের দেশ।

হাবলু বলল, তুই বড় হ বুঝবি সব, আমি নেহেরু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে গিয়ে বলি, করাচি গিয়ে আয়ুব খাঁকে বলি।

খোকন হাসল। এসব কথা তার অলীক মনে হয় যেমন কিনা টিয়াদিদির বেড়ালকে আয়না বিবি বলা। হাবলু বলল, পাকিস্তান রদ হলে আয়না বিবি আবার ফিরে যাবে দেখবি তোর টিয়া দিদিকে সঙ্গে নিয়ে, আসলে ও তো ময়রম, অজেতের বুন।

খোকন হুঁ বলে চুপ করে থাকে। হাবলু তখন তার মামার বাড়ি উতুলির কথা বলতে থাকে। উতুলির অজেত তার বন্ধু। সাঙ্ঘাতিক তার শটের জোর। এক শটে বাঁশের বারপোস্ট ভেঙে দিয়েছে কতবার, জাল ছিঁড়ে দিয়েছে কতবার। তার খুব ইচ্ছে ছিল মোহনবাগানে খেলবে। আর হচ্ছে না। নিশীথদার সঙ্গে এ ব্যাপারেও কথা বলছে হাবলু। নিশীথদা ভেবে বলবে বলেছে। ময়রম মানে মরিয়ম খুব করে বলেছিল এই ব্যাপারটা দেখতে। বদলে সে এক বাটি রসের পায়েস দিয়েছিল তাকে। রসের পায়েস খেতে যে কী মধুর। খেজুর রস দিয়েই হয়। দুধের নাম গন্ধ নেই। রসের ভিতরে চাল।

খোকন বলল, অমি খেজুর রস খাই নি।

খাবি কী করে, পাকিস্তান রদ না হলি আর খেতি পাবি নে, কলকাতায় তোর খেজুর গাছ আছে? তোর টিয়া দিদিরে জিজ্ঞেস করে দেখিস।

হাঁটতে হাঁটতে ফিরছিল ওরা। হাবলু বিড়বিড় করছিল, ওরা ম্যাচ খেলতি গেল, আমারে বলল না, অথচ নিশীথদা বলেছিল পরের ম্যাচে আমাকে লাইন্সম্যান করবে, সেই ম্যাচ যদি আজ হয় এটা ঠিক হল না।

হাবলুর কথার পারম্পর্য থাকছে না। হাবলু ফিরে এল শিয়ালদা স্টেশনে। সবুজ গাড়ি বরিশাল এক্সপ্রেস খুলনা পর্যন্ত যায়। খুলনা স্টেশনের গায়ে ভৈরব নদ। না না না রূপসা। রূপসায় নৌকো চাপলে, স্টিমারে চাপলে বরিশাল। নিশীথ সাধু—নিশীথদা তাকে তাই বলেছিল। নিশীথদারও মা বাবা পড়ে আছে ওপারে। আর দুই দিদি, একজন ঝালোকাটি একজন মাধবকাটি। জামাইবাবু দিদিরা আসে নি এপারে। তবে মা বাবা আসবে, দুটো ভাই নিয়ে এপারে চলে এসেছে নিশীথ সাধু আগে। হাবলুর বকবক শুনতে খোকনের খুব ভালো লাগে। নামগুলো কী সুন্দর, ঝালোকাটি, মাধবকাটি, বরিশাল, বাগেরহাট, খুলনা, যশোর, সাগরদাঁড়ি—রেখো মা দাসেরে মনে....। খোকনের মনে পড়ে গেল মাইকেল দিদিমার কথা। সে জিজ্ঞেস করল, নিশীথদা কি মাইকেল জানে? রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে, শুন মোরে কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে! হাবলু মাথা নাড়ে, নাহ্। ফুটবল ছাড়া কিছুই জানে না নিশীথদা। ফুটবল আর দুটো ভাইকে নিয়ে এপারে চলে এয়েচে, ওই সুবীর, সুনীল...ওদের এ ডিভিশান থেকে ইন্ডিয়া অবধি তোলবেই তোলবে। বলে, রিফ্যুজি কতডা পারে প্রমাণ করে দেবে।

খোকন চুপ করে থাকে। সে গিয়েছিল নিশীথ সাধুর কাছে। নিশীথ সাধু তাকে দৌড় করিয়ে, পায়ে বল দিয়ে, ব্যায়াম করিয়ে শেষে বলে দিয়েছে, হবে না, সবার সব হয় না। খেলা সবার ভিতরে থাকে না।

সে কেমন কথা? খেলতে কি তার ইচ্ছে হয় না? খেলা নেই মানে? খোকনের ইচ্ছে মিথ্যে প্রমাণ করে নিশীথ সাধুর কথা। সেও তো ওপারের ছেলে। তারা না হয় রিফ্যুজি কালোনিতে থাকে না, তাই বলে কি রিফ্যুজি নয়? আর রিফ্যুজি হলে ফুটবল কেন হবে না? তার দুই ভাই সুবীর সুনীলের হচ্ছে কী করে?

চুপ করে আছিস যে? হাবলু তার গায়ে হাত রাখল, ধুস! আমি অজেতের জন্য তেল মারি নিশীথদারে, বলেওছি। উতুলি চিনল নিশীথদা। উতুলির কিরণ ভদ্ররে চিনি কিনা জিজ্ঞেস করল। উতুলির ভদ্ররা বিরাট ফ্যামিলি। অনেক ঘর। তারা অনেকে কলকাতায় ও থাকে। অজেতরা অবশ্যি ভদ্র না, অজেত আলি ওর নাম। ময়রম কতবার করে বলেছে। নিশীথদা বলেছে হিন্দুস্থান পাকিস্তান না রদ হলি হবে না।

খোকন বলল, তুমি আমার জন্য বললে না কেন?

তোর তো ফুটবল হবে না।

না হবে না, হবে না উনি জানল কী করে?

জানবে না তো কোচ হল কী করে, তুই লেখাপড়া করে নবীন হবি।

কে নবীন?

তোর পিসি না কার ছেলে, বড় চাকরি পেয়েছে, সে চাকরিতে নাকি অনেক উপরি।

খোকন গুম মেরে যায়। সে তো কত দেরি? এখন কী করবে? এখন পড়বে। হাবলু বলল, তুই বরং নবেল পড়া শুরু কর, শরচ্চন্দ্র।

খোকন রেগে গেল, এসব বলছ কেন?

তুই আমার কথায় তাল দিস নে কেন?

কী তাল দেব, কী বলব?

বল পাকিস্তান মানি নে, হিন্দুস্থান পাকিস্তান নিপাত যাক।

খোকন অবাক। বলে কী হবে? সে বললেই হয়ে যাবে? সে বলল, আমি অতশত বুঝি নে, বললিই হল, না বললি কী হবে?

তুই তো দেখছি আমার মতো, আমারে যতবার বলে পাকিস্তান জিন্দাবাদ করতি, আমি ততবার বলি মানি নে।

খোকন বলল, আমি পাকিস্তান দেখি নি, আমি কী করে ওসব বলব?

হাবলু চুপ করে থাকে। হঠাৎ একেবারে কী গম্ভীর। খোকন জানে এই সময় হাবলুদা বর্ডার পার হয়ে যায়। তার গ্রাম আশাশুনিতে পৌঁছে যায়। না হয় উতুলি চলে যায়। অজেত আলির সঙ্গে মাঠে নেমে পড়ে। খোকন ডাকল, ও হাবলুদা?

তোর বাবা কদ্দিন আমারে রাখবে বল দেখি।

কেন গো, বাবা তো কিছু বলে নি।

আমার তো চাকরি করা হবে না, আমি কী করি বল দেখি, তোর পিসির ছেলে নবীনের কথা হচ্ছে সবসময়, কানুনগোর চাকরি, আমি তো ওসব করব না, তোর টিয়া দিদি পর্যন্ত বলছে—আমি কী করি বল দেখি।

কিছু করতে হবে না, চুপ করে থাক।

তাহলে আমারে যেন কেউ চাকরি করতে না বলে। হাবলু গরগর করে বলল।

মা বাবারা ওরকম বলে। খোকন বিজ্ঞের মতো বলল।

মা বাবাদের কথা বাদ দে, এই যে পার্টিশন হল, এরা কী করতি পারল, সব মেনে নিয়ে কেউ সুড়সুড় করে চলে এল, কেউ ছেলেমেয়ে পার করে দিল, শোন তোর টিয়া না ময়রম দিদি, তারে বারণ করে দিবি।

খোকন অবাক, বলল, তুমি বলে দাও?

না, ওসব নবেল পড়া মাথা, যদি পড়ত মেঘনাদ বধ কাব্য, তবে বুঝা যেত।

তুমি পড়েছ?

আমি! আমি পড়ব কেন, আমি তো আগে জানতাম না আমাদের ওদিকে তার বাড়ি সাগরদাঁড়ি, দিদমা তো পড়েছে।

হুঁ। খোকন চুপ করে থাকল। সে যদি টিয়াদিদিকে বলতে যায় এমন মুখ ঝামটা দেবে, বলবে, আয় তো দেখি এই সরল অঙ্কটা কর। হাবলু তাকে ডাকল, বলবি তো, তোর উপর আমি নির্ভর করছি।

তুমিই বলো।

না, উনি শুধু নবীন নবীন করছে, তারে দেখেছিস?

হ্যাঁ, তুমিও দেখবা, আসবে কাজে যাওয়ার আগে।

কী করতে আসবে রে। দ্যাখ তোর টিয়াদিদিরে বলে দিবি চাকরি পেলিও আমি ঘুষ খাব না, সব নেতাজি ফাণ্ডে দিয়েও দেব।

খোকন আবার চুপ। তার কেমন যেন লাগছে। বুঝেও বুঝে উঠতে পারছে না। কথাগুলো টিয়াদিদিকে বলতে হবে কেন? মাকে বললেই তো হয়। না হয় না, হয় না। খোকন মাথা নাড়াতে লাগল নিজের মনে।

আঠের

বীরাঙ্গনা মাসী—বীরাঙ্গনা দিদিমা, মাইকেল দিদ্‌মা বসিরহাট ঘুরে টুরে আবার এসে পৌঁছল অভিরামের বাসায়। ঠিক সন্ধেবেলা। অভিরাম বাড়ি ফিরেছে। হাবলু পড়া দেখছে খোকনের। বীরাঙ্গনা মাসি দেখল টিয়ার পড়ার বই-এর ভিতর নতুন সংসার। নতুন সংসার নামের একটি নভেল। মেয়েটাকে কতবার বলেছে লাইব্রেরিতে যা, মাইকেল নিয়ে আয়। মেঘনাদ বধ, বীরাঙ্গনা কাব্য, তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য—কোনওদিন দেখল না বুড়ি। টিয়া বলে, বুঝতে পারি নে দিদমা, বড় কঠিন লাগে।

আমার তো কঠিন লাগে না রে খুকি।

তোমার দাদু তাই লাগে না।

বুড়ি বলল, সব রেখে এয়েচি রে।

কী রেখে এয়েচো?

সব, বিদায়ঘাট—অশরুঘাট, মা জাহ্নবীর কপোতাক্ষ, রাজনারায়ণের অত বড় দালান কোঠা।

টিয়া বলল, বেশ হয়েছে, নিয়ে আসা যায়?

বুড়ি বলল, এনিচি রে, বইগুলা এনেচি।

বসিরহাটে?

বীরাঙ্গনা বলল, আমার ছেলে, তোর মামাও পড়ে না রে, সে কোর্টের মুহুরি, বলে, জজ ব্যারিস্টার হত যদি মধু কবির কাব্য বুঝতে পারত, আচ্ছা লোকটা কত কষ্ট পেয়েছে অথচ কতবড় জ্ঞানী, তার জ্ঞান কি সব ধরা যাবে না বোঝা যাবে?

টিয়া বলল, আমি একবার সাগরদাঁড়ি যাব দিদমা?

যাবি, আমি তোরে নিয়ে যাব, হ্যাঁ রে খুকি ওই হাবলুর একটা বুন তো বসিরহাট থাকে ডলি, আর বড়টা থাকে বনগাঁ, বুলি, আর দুটো ওপারে?

আমি তো জানিনে দিদমা।

তুই কেন জানিস নে?

আমি কী করে জানব, হাবলু তো আমার কেউ না।

এরম বলতে নেই, কে কার 'কেউ' না 'কেউ না' তা কি কেউ বুঝতি পারে, এই ধর এই অভিরাম, এ আমার কেডা, কেউ না, কিন্তু সব।

টিয়া হাত তুলল, বুয়েছি বাবা বুয়েছি, আমি বলছি হাবলুদার কাউরে আমি চিনি নে দিদমা, কিন্তু হাবলুদা খুব ভালো ছেলে, একটু একগুঁয়ে।

ও কিছু বলে নি।

হুঁ। মুখটিপে হাসল টিয়া, বলল, বলেছে।

কী বলেছে?

বলেছে আমার বেড়ালটা হল আয়না বিবি, আর আমি হলাম ময়রম।

তার মানে?

মানে তো হাবলুদাই জানে, সেই যে মানিকরাম-ময়রম।

মানিকরাম! মানিকরাম তো সাধু হয়ে হারিয়ে গিছল।

জানি দিদমা, হাবলুদা আবোল তাবোল বলে শুধু, এখন দিল্লি যাবে দিল্লি যাবে করছে।

আমি বলছি ডলিটা বড্ড ছোট, হবে না, বড় বুনটার বয়স কত?

ওরে জিজ্ঞেস করো।

সে তো হাবলুর বড়, পিঠোপিঠি ভাই বুন।

তাই হবে।

তুই কিছুই জানিস নে কেন?

টিয়া হেসে ফেলে, কী করে জানব, ওকি বলে?

তখন বীরাঙ্গনা দিদিমা বলে, ফণির তো বিয়ে দিতে হবে।

ফণি কাকা, বিয়ে হয় নি?

ওমা বিয়ে হলে কি একা একা থাকে!

টিয়া চুপ করে থাকল। তার এখন নাইন। শরীর ভরে উঠেছে এখানে আসার পর। গায়ের রংও ফর্সা হয়েছে। কলকাতার কলের জলে তাই হয়। এখন টিয়াকে গৌরী বলা যায়। যখন তাকে দিয়ে গিয়েছিল বাবা এমন ছিল না সে।

বীরাঙ্গনা দিদিমা বলল, ফণির সঙ্গে যদি হাবলুর দিদির সম্বন্ধ করি।

টিয়া বলল, করো, আমি কী জানি এসবের?

কেমন হবে বল না।

টিয়া বলল, মাসিকে বল।

মাসি মানে প্রভাময়ী। হ্যাঁ প্রভাময়ীকে বলবে বীরাঙ্গনা। বুঝতে পারছে না কেমন হবে। ফণি তো পাল্টি ঘর নয়। তন্তুবায়। তাঁতি। হাবলুরা কায়স্থ। হবে কি? ভালো হবে? ওপারে থাকলে কি হত? কিছুতেই না। ওপারে থাকলে কত চেনা জানা পাল্টি ঘর পাওয়া যেত। তারা এপারে এসে সব ছত্রখান হয়ে গেছে। এখন ফণির বিয়েটা দেওয়া দরকার। না দিলে ওর বয়স আরও বেড়ে গিয়ে আর সম্বন্ধ হবে করা যাবে না।

বীরাঙ্গনা ওঠে। অভিরাম অন্য ঘরে গেঞ্জি লুঙ্গি পরে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিল। বীরাঙ্গনা ঢুকতে বলল, মাসিমা কখন?

এয়েচিরে, আমার কড়া কথা আছে।

বলো বলো।

প্রভারে ডাকি, প্রভাও থাকুক।

কী কথা মাসিমা?

বলছি, আগে প্রভা আসুক। বলে দরজার কাছে গিয়ে হাক দেয় বীরাঙ্গনা, ও বউ, এদিকে আসবি।

তিন ঘরের ফ্ল্যাটে সরু একখানি প্যাসেজ। তার গায়ে রান্না ঘর, কলতলা।

প্রভা এল হাত মুছতে মুছতে, বলল, রুটি খাবে তো মাসি?

না খাব না, আমার কড়া কথা আছে।

কথা ছাড়া তুমি আস নাকি?

না আসি নে, কিন্তু সে তো সাগরদাঁড়ির কথা, একথা তা নয়। বলতে বলতে মেঝেয় পা মেলিয়ে বসে বীরাঙ্গনা। ধীরে ধীরে তার ভাবনার ঝুলি খুলতে থাকে। শুনতে শুনতে অভিরামের চোখে অবিশ্বাস। প্রভাময়ীর চোখেও। এ হয় নাকি? যাদের মেয়ে তারা তো ভাববে। তারা যদি রাজি না হয় কী করে হবে? ফণির আছে কি? এপারে ঘর বাড়ি নেই। টাকা পয়সা হয়তো আছে। ওপার থেকে আনতেও পারেনি বেশি কিছু। থাকে বাসাবাড়িতে। চাকরি তো তেমন না। ক'টাকা দেয় বড়বাজারের ব্যবসায়ী? বীরাঙ্গনা দমে গেল, তারপর বলল, কিন্তু দুটো মেয়ে দুজনের ঘরে, দুটো ছেলে দু ঘরে, ওরা ওপারে, এভাবে সংসার চলে?

কী করবে উপায় নেই, ওপারে বড় মেয়ে রাখার সাহস নেই।

নিজেরা রয়েচে, গাঁ দেশে থেকে কী হবে?

কিছু হবে না, কিন্তু হতেও তো পারে, খারাপ লোক সব দিকে আছে।

সে তো এদিকেও হতি পারে অভি।

অভিরাম বলল, পারে।

রিফ্যুজি ক্যাম্পে হচ্ছে না!

হচ্ছে, এই তো কাগজে দিয়েছে, শ্যালদা স্টেশন থেকে রাত্তিরে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গেছে।

কী সব্বোনাশ কোনও দিকি নিস্তার নেই। বীরাঙ্গনা বলে।

হুঁ, রেলের পুলিশ দেখেও দ্যাখেনি।

বীরাঙ্গনা বলল, মানুষ মরতেচে পথে ঘাটে শেল কুকুরির মতো, এক মন্বন্তর দেখিচি পঞ্চাশে, এখন যেন আরও বড় মন্বন্তর।

না মাসিমা, আরও বড় হবে কেন, তবে পথে ঘাটে যাদের আশ্রয় তাদের কোনও উপায় নেই।

আমি বনগাঁ যাব ফণিরে নিয়ে?

বনগাঁ কেন?

হাবলুর দিদি তো জেঠার বাড়ি থাকে বনগাঁয়।

তোমারে চেনে?

চিনাতে কতক্ষণ, পরিচয় দেব।

মাসিমা তুমি হলে ব্রজেনের শাশুড়ি, ব্রজেন আমার বন্ধু, আমাদের এক গাঁয় বাড়ি, তাই তুমিও আমার প্রণম্য, আর তুমি মাইকেলের বংশ, কিন্তু ওরা কী করে চিনবে, ওরা আশাশুনির লোক, অনেকদিন ধরে বনগাঁ কোর্টে প্র্যাকটিস করে হাবলুর জেঠা, ওরা এপারেই এসেছে বিশ পঁচিশ বছর, ব্যবসাও আছে বনগাঁয়, ওরা কি সাগরদাঁড়ি চেনবে?

চেনবে না?

চেনবে, কিন্তু তোমারে চেনবে না।

তোরে তো চেনে, যদি বলি তুই পাঠালি?

কেন পাঠালাম, মেয়ের জেঠা এখন গার্জেন, সে জানবে না, তোমরা চলে যাবে, তারা রেগে যেতে পারে।

তাহলে আমি কী করব?

কিছু করতে হবে না।

তাই বললি হয় অভি, ফণির ব্যবস্থা করতি হবে, বড় ভালো ছেলে, আর জেঠার বাড়ি, পিসির বাড়ি কেউ ভালো থাকে, সব কি আমার অভিরাম? বলে বীরাঙ্গনা দাসী গালে হাত দিল।

অভিরাম বলল, দ্যাখো, তবে কিনা ফণি পাত্র হিসেবে খারাপও না, কোনও দায় নেই, ঝামেলা ঝনঝাট নেই, একা, শরীর স্বাস্থ্য ভালো, ছেলেও ভালো, বয়সে হবে?

বেশি হয়ে গেছে?

তিরিশ তো পার।

পঁয়তিরিশ পার না তো?

না, আমি ঠিক জানি নে, জিজ্ঞেস করে নিয়ো, ওরে বয়সের তুলনায় বেশি বয়স্ক লাগে মাসিমা, দ্যাখো যদি পারো।

আমি পারব। বীরাঙ্গনা বলে।

অভিরাম হেসে ফেলে, বলল, হ্যাঁ তুমি পারবা, তোমার অন্তঃকরণ বড় ভালো মাসি, কেউ বলেছিল তোমারে এ সম্বন্ধ দেখার জন্যি?

মাথা নাড়ল বীরাঙ্গনা, বলল, দিল্লি যাওয়ার আগে ওর বসিরহাটের পিসি বলেছিল ছোটটার জন্য, ঘাড় থেকে নামাবে। তখন খোঁজ নিয়ে ভাবলাম বড়টার বিয়ে আগে হওয়া দরকার, হাবলুটারে দেখলি মায়া লাগে, ওরে কোথাও ঢোকান যাচ্ছে না।

অভিরাম বলল, কিছুই করছে না, দেখা যাক কী হয়, মানুষ কিছু না কিছু শেষ পর্যন্ত করে, সব প্রাণীই করে।

বীরাঙ্গনা উঠল। উঠতে অভিরাম তার স্ত্রী প্রভাময়ীকে বলল, শুনেছি জাহ্নবী দেবী অমন ছিলেন, দান ধ্যান, লোকের জন্য চোখের জল ফেলা—

প্রভাময়ী বলল, কপোতাক্ষর দেশের মানুষ অমন হয়।

হয় কিনা আমি জানি নে, খারাপ লোকও তো কম দেখি নি, তবে কিনা কপোতাক্ষ শান্ত নদী, ওই নদীর ধারের মানুষ শান্ত হয়, নরম হয়।

প্রভাময়ী এবার পাল্টা বলে, তাই যদি হবে তবে মাইকেল মধুসূদন অমন হয়েছিলেন কেন, উনি কি শান্ত ছিলেন?

অভিরাম বলে, না, শান্ত থাকলে অত কষ্ট করতে হয় এক জীবনে, উনি সাত জন্মের দুঃখ কষ্ট একজন্মে ভোগ করে গেছেন, মাসিমা, ও মাসিমা কোথায় গেলেন, ও মাসিমা কতদিন আপনার কাছে সাগরদাঁড়ির কথা শুনি নি।

পাশের ঘরে টিয়ার সঙ্গে শুনল বীরাঙ্গনা। শুনে মাথায় থান কাপড় টানল, বলল, ভুল হয়ে যায় এক এক সময়, অভিরাম লেখাপড়া জানা মানুষ, জামায়ের বন্ধু মানে জামাই-ই বটে, চল, ডাকল, চল অভিরে সাগরদাঁড়ির কথা শুনাই, ওর বাবা এমনি বলত আমারে, এলে বীরা, শুনাও দেখি সাগরদাঁড়ির কথা।

টিয়া উঠতে উঠতে বলে, সাগরদাঁড়ির কথা অমৃত সমান/বীরাঙ্গনা দাসী কহে শুনে পুণ্যবান—দ্যাখো দিদমা কেমন বলে দিলাম।

দিবি তো। বলে হাত বাড়িয়ে টিয়ার গাল টিপল বীরাঙ্গনা, বলল, তোর জন্যি তো পালকি চেপে বাজনা বাজিয়ে বর আসবে।

আহ্, দিদমা! থামো না, টিয়া লজ্জায় লাল হল।

ভালো ছেলে দ্যাখবো আমি, ওপারের সংসারধম্ম আত্মীয় স্বজন মা মাসি কাকা জেঠা পিসি পিসে সব হারায় গেছে এপারে, এপারে আবার সব গড়ে তুলতি হবে না, তোর হবে, রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী—না, না না, আমি এডা কী করলাম, চল, তোর মেসোরে সাগরদাঁড়ির কথা শুনাই।

শুনাবা, বলছি তুমি তো মানিকরামের কথা শেষ কর নি দিদমা।

ওর আবার শেষ কী, সাধু হয়ে গেল।

আর সেই ময়রম?

জমিদারের বিটি, তারও শাদি হয়ে গেল।

ও মা, সে পারল, তার জন্য একজন সাধু হয়ে গেল, আর সে বিয়ে করে বরের সঙ্গে শ্বশুর ঘর গেল!

তাই তো যায়রে খুকি।

না, তা হয় না, তার সঙ্গে মানিকরামের আর দেখা হল না?

কী জানি, সে কথা তো জানি নে।

যদি দেখা হয় দিদমা, সাধু হলেও কি মানুষ না, সাধু হয়ে সব ব্যথা ভুলে যেতে পারে, পারে না, সব সঙ্গে থাকে। বলতে বলতে থমথমে মুখ নিয়ে চুপ করে গেল টিয়া। দিদিমার গা ঘেঁষে এল, বলল, হাবলুদার বুন না দিদি, সে বনগাঁ থাকে?

তাই তো জানি, হাবলুরে জিগাস করিস তো।

করব, বলছি হাবলুদাও তো কাজ কম্মো করতে পারে।

করতে তো হবে, লোকের ঘরে কতদিন পড়ে থাকবে। বিড় বিড় করে বলল বীরাঙ্গনা দাসী, আস্তে আস্তে দায়িত্ব নিতে হবে না, বাসা দেখতি হবে, মা বাবারে নিয়ে আসতি হবে, ওপারে তো থাকা যাবে না চিরকাল।

তুমি একটু বুঝাও দেখি, আমার এত লজ্জা করে। বলে টিয়া জাপ্টে ধরল বীরাঙ্গনাকে।

তোর লজ্জা করবে কেন, হচ্ছিল তো হাবলুর কথা। কথাটা আচমকা থামিয়ে দিয়ে বীরাঙ্গনা দাসী মুগ্ধ হয়ে টিয়ার রূপ দেখতে লাগল।

উনিশ

হাবলু আর খোকন দু'পাশে, মাঝে মাইকেল-দিদিমা বীরাঙ্গনা। মেঝেয় মাদুর কাঁথা চাদর আর মশারি, আর দুটো হাত পাখা। সিলিং ফ্যান এই তিন ঘরের ফ্ল্যাটে নেই। অভিরামের ঘরে দক্ষিণের হাওয়া আসে, তার পাশের ঘর যেখানে টিয়া আর প্রভাময়ী, সেই ঘরেও আসে তবে কম। একটি ঘরে, যে ঘরে হাবলু খোকন, সেখানে দরজা দিয়ে কখনও সখনও হাওয়ার প্রবেশ ঘটে, ভুল করে চলে আসে হয়তো মধ্যরাতে।

অভিরামের বাবা মা এখন বাঁকুড়ায়। সেখানে অভিরামের পরের ভাই কৃষ্ণরাম থাকে। কৃষ্ণরাম বাঁকুড়া কালেক্টরিতে কাজ করে। জমি কিনে শহরের প্রান্তে বাড়িও করে ফেলেছে এর ভিতরে। তার কাজে নাকি উপরি আছে ভালো। অভিরামের এসব পছন্দ হয় না, কিন্তু পুরুষ লোক তো আয়ই করবে। কৃষ্ণ তাই করছে, এতে অন্যায়ের কী আছে? রিফ্যুজি হয়ে এসে এর ভিতরে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছে, যেভাবে দাঁড়াতে হয় দাঁড়াবে। কোনও না কোনওভাবে তো তাকে দাঁড়াতে হবে। একথা অভিরামের বাবার। তিনি পূর্ববঙ্গের ভিটে বাড়ি উঠোন পুকুর বাগান বেড় ফেলে এসে অভিরামের এই ফ্ল্যাটে দমবন্ধ করে থাকতেন প্রায়। ঘর ছাড়া পা ছড়ানোর জায়গা নেই। কৃষ্ণরামের বাড়ি তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। তবে বাঁকুড়ায় খুব গরম, শীতের দিনে ঠাণ্ডাও তেমন। জল কষ্টও খুব। তা সত্ত্বেও বাঁকুড়া তাঁর পছন্দের কেন না পায়ের তলায় মাটি আছে। এই শহর তো ইট কাঠ পাথরে ঢাকা। পায়ের তলায় সিমেন্ট বালি ছাড়া কী আছে?

অভিরামের একটি মেয়ে একটি ছেলে। মেয়েটা নেই। এপারে এসে মেয়েকে হারিয়েছে প্রভাময়ী। জ্বর নামেনি কিছুতেই। তাও তো বছর আট হতে গেল। এখন মেয়ে বছর আঠেরো হত। খোকন তখন বছর দুই। ছেলে আর মেয়ের তফাৎ ছিল বছর আট।

মশারি টানিয়ে চারপাশ গুঁজে প্রভাময়ী চলে গেল ষাট ওয়াটের আলো নিভিয়ে। বাইরে মশা বন বন করছে। বীরাঙ্গনা তালপাতার পাখা চালাতে চালাতে ডাকল হাবলুকে, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে হাবলু।

হাবলু বলল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কী কথা?

দিল্লি যাবে কবে?

বীরাঙ্গনা বলল, শাবন মাসে বলেছিলাম, তো হবে না।

কেন হবে না?

আমার অন্য কাজ আছে হাবলু, তোরে সেই কথা বলব।

হাবলু চুপ করে থাকল। তার মনে হতে লাগল মাইকেল দিদিমা বোধহয় ওপারে যেতে চায়। কার সঙ্গে যাবে? কে নিয়ে যাবে? হাবলু। একা একা দিল্লি যেতে পারে কিন্তু এই সামনের যশোর সাতক্ষীরে যাওয়া কঠিন। ওটা তো এখন পাকিস্তান। অন্য দেশ। বিদেশ হয়ে গেছে।

বীরাঙ্গনা বলল, বনগাঁ নে যাবি আমারে?

যশোর যাবা নাকি?

না বনগাঁ শুধু, জেঠার বাড়ির আছে না তোর?

হাবলু কঠিন গলায় বলল, আছে।

জেঠার বাড়ি যাসনে?

না। হাবলু সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়।

বীরাঙ্গনা চুপ করে থাকে। তারপর হাবলুর পিঠে হাত রাখে। উল্টোদিকে মুখ করে শুয়েছিল সে। বীরাঙ্গনা ডাকল, ও হাবলু তোরা ক'ভাই বুন?

চার বুন দুই ভাই, তুমি তো জান দিদমা।

তোর সম্বন্ধে অমি কিছুই জানি নে।

হাবলু বলল, দিদমা তুমি বনগাঁ না গিয়ে দিল্লি চলো।

যাব যাব, তোরে সঙ্গে করেই যবে, কিন্তু হাবলু তুই তো বড় ভাই।

দিদি বড়।

দিদির নাম তো বুলি, তাই না?

হাবলু বলল, দিদি জেঠার বাড়ি থাকে বনগাঁ।

তোরা তো পিঠো পিঠি।

হুঁ।

বীরাঙ্গনা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, বলল, কী যে হয়ে গেল, কপোতাক্ষয় শুধু মানষের চোখের জল, এ জীবনে এও দেখতি হল, অতবড় কবি যত দুঃখ পেয়েছিল একা, তার

সমান দুঃখ পেয়েছে দেশবাসী।

উনি তো একা, এখেনে কত মানুষ দিদমা, তার চেয়ে এ দুঃখ বেশি।

হ্যাঁ, তবে নিক্তিতে মাপলে সমান, মানুষ তো একসঙ্গে দুঃখ পায় না, আলাদা আলাদা, কত মানষের কত রকম দুঃখ।

হাবলু বলল, হ্যাঁ, অজেত ময়রম তারা কি দুঃখ পায় নি?

তারা কারা?

পরে বলব তোমারে দিদমা।

বীরাঙ্গনা বলল, হাবলু ফণি বড় ভালে ছেলে।

হাবলু বলল, হ্যাঁ মনে হয়।

কী খাটে, মাড়োয়ারি অবিশ্যি ওরে ভালোও বাসে।

হাবলু বুঝতে পারছিল না কী বলবে। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল দিদিমা তাকে ওই মাড়োয়ারি গদিতে কাজ করতে বলবে। ফণি কাকা তো তাকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিল শোভাবাজারে। হাবলু যায় নি। হাবলু যাবে না। একবার যদি ঢুকে পড়ে তবে আর পাকিস্তান রদ যেমন হবে না, ওপারে যাওয়াও হবে না। আর এসব কাজ সে করবে না। বরং নিশীথদাকে ধরে গড়ের মাঠে ঢুকে পড়বে লাইন্‌স ম্যান হয়ে। তারপর রেফারি। হাবলুর কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে বীরাঙ্গনা আবার ডাকল তাকে, কথা বলছিস না যে?

কী বলব?

আমি ফণির বাসায় গিয়েছিলাম, তুই গিছিস?

হাবলু অন্ধকারে মাথা নেড়ে বলল, না।

যাসনি কেন, আমি তো হেঁটে চলি আলাম।

হাবলু বলল, দমদম তো, ঘুঘুডাঙা দিয়ে লীলা সিনেমা হল।

হুঁ, তুই চিনিস ওদিক?

হাবলু বলল, না, ফণিকাকা বলেছিল।

কাকা বলিস কেন, দাদা বলবি।

হাবলু বলল, খোকনও বলে, হ্যাঁ দিদমা বসিরহাটে পিসির বাড়ি তুমি চেন তো, এবার গিসলে?

হ্যাঁ, ডলুর সঙ্গে দেখা হল, ভালো আছে।

আমি তোমার সঙ্গে বসিরহাট যাব?

যাস, পিসির বাড়ি যাবি তো?

আমি তোমার বাড়ি থাকব, ওদিকে ভোমরা বর্ডার দিয়ে সাতক্ষীরা খুব কাছে, ও পথ আমি চিনি।

ডলুটা বড্ড ছোট।

ছোট তো হবে, দিদির পরে আমি, আমার পর ডলু, ডলুর আগে আর এক বুন ছিল, সে নেই।

বীরাঙ্গনা চুপ করে থাকল। তার সন্তান বলতে দুটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। আর চারটির কথা এখন ভুলে গেছে। এক মুহূর্তে অন্ধকারে তারা যেন ভেসে উঠল। সব ক'টিই তার কোলে মরেছে। সব ক'টিকেই কপোতাক্ষর ধারে রেখে এসেছে। পূর্ববঙ্গের এসব গাঁগঞ্জে অসুখ একটু পেঁচিয়ে গেলেই আর রক্ষা করা যেত না। ডাক্তার বদ্যি হাসপাতাল ওষুধ কোথায়? এমন শহর যদি হত কেউ কি যেত? কিন্তু গিয়েছেও তো। খোকনের বড় বোনটা কি যায় নি। ওই বয়সেই কী রূপ ছিল তার! বীরাঙ্গনা আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছল, বলল, ওরা কেউ থাকার জন্য আসে না।

হাবলু বলল, তোমার বাড়ি দু'দিন থাকব, ডলুরে ডেকে আনবা?

কেন তুই যাবি।

হাবলু বলল, না আমি যাব না।

বীরাঙ্গনা বলল, তোরা দাঁড়াবি একদিন, শোন হাবলু আমি বনগাঁ যাব, ফণির তো বয়স হয়ে যাচ্ছে, ম্যাট্রিক পাশ, কাজ করছে, বাসা নেছে দমদমায়, ওর তো বিয়ে দিতে হবে এবার, ওর তো কেউ নেই এপারে।

কবে বিয়ে?

ঠিক করতে হবে তো।

হাবলু বলল, আমি কী করব দিদমা, ফণিকা'রে নিয়ে যাও।

না তোরে যেতি হবে, দ্যাখ হাবলু সত্যি কথাটা বলি ডলু তো খুব সুন্দর, কী মায়া ওর মুখে, দেখলি প্রাণ ভরে যায়, আমার ছেলে তো ওরে খুব ভালোবাসে, বলছি তোর বড় বুন কি ওই রকম সুন্দর?

হাবলু বলল, আমার দিদি আরও সুন্দর দিদমা, গা'র রং একেবারে দুধে আলতায়, দিদির যে কী হবে দিদমা, কতদিন দেখিনি দিদিরে।

বীরাঙ্গনা বলল, চ দেখে আসবি, ফণিও যাবে।

না, জেঠার বাড়ি আমি যাব না দিদমা, কিছুতেই যাব না।

বীরাঙ্গনা বলল, তোর দুঃখ কি তোর মা বাবার চেয়ে বেশি?

হাবলু বলল, তুমি ঘুমোবে না দিদমা?

নারে ঘুমোব না, এক একদিন এমন হয় সমস্ত রাত প্রায় জেগে ভোরে কাক ডাকলে ঘুম আসে, আজ তাই হবে বোধহয়।

সকালে উঠবা না?

বীরাঙ্গনা বলল, উঠব তো, ফণির বাসায় যাব, তোরে সঙ্গে করে যাব।

হাবলু বলল, তুমি চোখ বুঁজে থাক, ঘুম এসে যাবে।

নারে, আমি আর কথা বলব না না হয়, তুই ঘুমো।

তা কী হয়, পাশে যদি কেউ জেগে থাকে, আমার ঘুমও আসবে না, ঘুম উড়ে গেছে দিদমা, শোনো দিদমা তোমাদের এই টিয়ারে আমার ময়রম মনে হয়।

হতি পারে, অন্ধকারে যখন শুয়ে থাকি মনে হয় দেশের বাড়িতে আছি।

একেবারে ময়রম, অজেতের বুন।

তোদের ভাগ্যি ভালো, অভিরামের মতো মানুষ হয় না।

হাবলু বলল, সেই জন্যি তো আমি দিল্লি যেতি চাই দিদমা, আমি কলকাতায় থাকব না, থাকলি এখনে থাকতি হবে, কাকিমা কোনওদিন মুখ আঁধার করেও কথা বলে না, বকা ঝকা করে না, শুধু ভালোবাসে।

ওরা এই রকম, ওরা ভগবানের অংশ।

তাই খুব লজ্জা করে, আমি কী করব দিদমা?

তোর লজ্জা করে, টিয়ারও, তুই একটা কিছু করবি তো। বীরাঙ্গনা বলল।

টিয়া! ও কী বোঝবে, আমি কী করব? সে ডা আমি বোঝবো।

ওই কথাই তো বলছি হাবলু, ভালো করে শোন আগে কী করতি হবে। বীরাঙ্গনা তার পরিকল্পনার ঝুলি খুলতে থাকে। হাবলু শুনতে শুনতে উঠে বসে। অবাক হয়ে শোনে। বুঝতে পারে না কথাটা কী করে সত্যি হবে। ফণিভূষণ তো কাকাই বটে। তার সঙ্গে দিদির বিয়ে কী করে হবে? মা বাবা তো ওপারে। সবাইকে আসতে হবে। বিয়েটা হবে কোথায়? তাদের তো এপারে কিছুই নেই। কিছু বলতে নেই। দাঁড়ানোর জায়গা নেই। বিয়ে কি তাহলে আশাশুনিতে হবে? ফণীভূষণ, তার দিদি দুজনেই ইন্ডিয়ার লোক। ইন্ডিয়ার লোক পাকিস্তানে গিয়ে বিয়ে করতে পারে? বর কনে ইন্ডিয়ার, অথচ তাদের বিয়ে হবে পাকিস্তানে। কী করে হবে? বিয়ে যদি জেঠার বাড়ি হয় তবে হাবলু যাবে না। জেঠার ছেলে তাদের বড়দা, অবনীদা তাকে মাটিতে ফেলে মেরেছিল। জেঠি আটকাতে আসে নি। দিদি বারান্দায় বসে দেখেছিল। হাবলুর কী অপরাধ ছিল? হাবলু নাকি বিড়ি খেয়ে এসেছে। হাবলুর মুখে বিড়ির গন্ধ। হাবলু যত বলে হতে পারে না, অবনীদা গর্জন করছিল, তাহলে কি সে মিথ্যে বলছে? সে মিথ্যেবাদী? আসলে হাবলুকে তাড়ানোর দরকার ছিল ওখান থেকে। কীভাবে তাড়াবে? দিদি নিঃশব্দে কাঁদছিল। হাবলুকে বলেছিল, ভাই তুই চলে যা, বড়ি ফিরে যা, আমারেও নিয়ে যা ভাই।

হাবলু বলেছিল, তুই থাক আমি বাসা ঠিক করে নিয়ে যাব, চাকরি ঠিক হয়ে যাবে, তোরে এখেনে রাখব না দিদি।

শুনতে শুনতে বীরাঙ্গনা বলে, তাহলে তো টিয়া ঠিক বলেছে।

কী ঠিক বলেছে, ও কি জানে সব?

না জানলেও, তোর জন্যি ভাবনা করে তো।

ওফ্! ওরে ভাবতি বলেছে কেডা।

ঠিক আছে ওরে ভাবতি হবে না। বীরাঙ্গনা বলে, কিন্তু তুই ভাববি তো।

আমি যে ভাবি নে তা কেডা জানল? হাবলু বলে।

তাহলি এই কথাটা নিয়ে ভাব, শোন ওপারে মানষের কাজ ছিল না, খেত খামার চাষ করে চাষা ফসল তুলে দিত আর ঘরের পুরুষ মানুষ তাস পাশা খেলে দিন কাটাত, এপারে এসে উপায় নেই হাবলু, আলিস্যির দিন নেই আর, উঠি পড়ি লাগতি হবে, কলকাতা পেথমে ওপারের মানুষরে দুঃখ দেবে, পরে বুকে তুলে নেবে।

হাবলু গুম হয়ে থাকল। এইসব কথাবার্তায় খোকনের ঘুম ভেঙেছে। সে না পেরে বলল, হাবলুদা পারবে, বলেছে তো হিন্দুস্থান পাকিস্তান রদ করবে।

ও মা, দুই জেগে আছিস? বীরাঙ্গনা গাল ভরে হেসে খোকনকে নিজের কাছে টানল, বলল, ভালো করে লেখাপড়া কর, ইংরিজি শিখবি ইংরেজদের মতোন, বাংলা শিখবি বাঙালির মতোন, এখন ফার্সি দরকার হয় না, মধু কবিরে ফার্সিও শিখাতে নিয়ে যেত সাগরদাঁড়ি গাঁ থেকে অন্য গাঁ-এ।

খোকন বলল, অত ভাষার লোক কোথায় পাব যে কথা বলব?

তা বটে। বীরাঙ্গনা মাথা নাড়ে অন্ধকারে, তারপর বলে, কাব্য কবিতা পড়বি, তার জন্যি তো ভাষা দরকার, আর চাকরি বাকরি কিসে হয় কেডা জানে, হাবলু দেখবি বড় চাকরি করবে, দিদিরে যখন বলে এয়েছিল, ঠিক করবে আমি জানি।

কুড়ি

হাবলুর চাকরি। মনে করলেই হয়? বাসা! মনে করলেই হবে?

কই তার চাকরি, কই তারা বাসা? সে আশাশুনি গিয়েছিল বনগাঁ থেকে। বনগাঁ থেকে দিদিকে নিয়ে আসবে বলতে, বাবা বলেছিল, বড় ভাই-এর কাছে মার খেয়েচিস, আমি যখন ছোট ছিলাম ওই বড়দা আমারে মারে নি?

না বাবা, আমারে তাড়ানর জন্যি মেরেছে।

বাবা গুম হয়ে বসে থাকল। তার বাবা লোকটা আসলে খুব অলস। তার কথা শুনে একটু সময় চুপ করে থেকে দুপুরের ঘুম মারতে গেল। তারপর বিকেলে উঠে দিব্যি ডাবের জল খেয়ে চুপ করে বসে থাকল। চোখে তেমন দ্যাখে না বলে বেরোয় না তত বাড়ি থেকে। মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করল। আর দুই বোন লিলি আর ফেলি। তোর দিদির গায়ে হাত দেয়? জেঠিমা? তুই দেখেচিস? না হাবলু দ্যাখে নি, কিন্তু জেঠিমা যে দেয় তাতে তার কোনও সন্দেহ নেই। জেঠার কোনও কথাই খাটে না ও বাড়িতে। জেঠা খুব ভয় করে দুই ছেলে আর তাদের মাকে।

হাবলু বলল, ঝিগিরি করতে পাঠালে?

কী করব বল, ওপারে গিয়ে তোর বাবা করবে কী? মা বলল।

তাহলে দিদি আর ডলুরে ফেরত নিয়ে এস।

এপারে রাখি কী করে, তুই যা না হাতেবর চাচার বাড়ি, শুনে আয় না।

তারা কী বলছে, পাকিস্তান মঞ্জুর?

মঞ্জুর তো অনেক বছর হয়ে গেল। বাবা বলেছিল স্তিমিত গলায়।

তারপর কী হল?

হাবলু বলল, বাবা রাগ করল খুব, বলল, আমারে এপারে আসতি হবে না, কিন্তু বুনগুলো যেমন আছে থাকপে।

বীরাঙ্গনা বলল, এ কীরকম বাপ!

হাবলু বলল, কী করবে দিদমা, বাবা মোটে কাজ করতি চায় না, নড়ি বসতি চায় না, খাটতি চায় না, সে অভ্যেসও নেই, আর চোখ দুটো এক সঙ্গে যাচ্ছে, কিছু করতিও পারে না।

বীরাঙ্গনা বলল, ফণির সঙ্গে আমি যদি তোর বড় বুনির বে দি, তোর বাবা মানবে তো, পাল্টি ঘর না, ওরা তাঁতি, তন্তুবায়।

হাবলু বলল, অনেক বেশি বয়স হচ্ছে না দিদমা।

পুরুষ মানষের আবার বয়স, আমার সাথে তোর দাদুর ষোলো বছরের তফাৎ ছিল রে হাবলু, লোকটাকে কী ভয় লাগত, যখন ডাক দিত বীরা বলে, আমার গা হাত পা ঠাণ্ডা হই যেত, কিন্তু—। বলতে পারল না বীরাঙ্গনা। এত বয়সেও কী লজ্জা!

তিনি মেঘনাধ বধ পড়ত দিদমা?

না পড়লি আমি শিখলাম কী করে?

তিনি তোমারে শিখাইছিল?

অন্ধকারে বীরাঙ্গনার মুখ আলো হয়ে যায়। হাবলু যেন তা দেখতে পায়। বীরাঙ্গনা বলল, খুব উৎসাহ দিত সেই হেডমাস্টার।

হেডমাস্টার?

হ্যাঁ, আমিও তাই বলতাম, হেড মাস্‌সাই।

উনি কি মাস্‌সাই ছিলেন?

হ্যাঁ। বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল বীরাঙ্গনা, খুব দয়ার শরীর ছিল তাঁর।

কত লোককে দান করেছেন, অন্নবস্ত্র দিয়ে কতজনকে বাড়িতে রেখে ছিলেন, অভিরামকে দেখলে তাঁর কথা মনে হয় বীরাঙ্গনা দাসীর। তার আসল নাম তো ছিল ছায়ারানি। ন'বছর বয়সে পতিগৃহে এসে এই নাম পেয়েছিলেন স্বামীর কাছ থেকে। বীরাঙ্গনা কাব্যে একাদশ সর্গে একাদশ নারীর কথা বলেছিলেন মধুসূদন। সেই এগারোজন বীরাঙ্গনা তাঁর ভিতরে প্রবেশ করেছে তাদের সৌন্দর্য, দুঃখ বেদনা, ঔদার্য, জ্ঞান ধর্ম-সব নিয়ে। বীরাঙ্গনাকে কথায় পেয়েছে। বলছে ন'বছর বয়সে পঁচিশ বছরের স্বামী। আর সেই পঁচিশ বছরে সুন্দর মানুষটি তাকে চোখ রাঙিয়ে বলল, পড়তে হবে, না পড়ে তুমি কী করবে, হেঁসেল ঠেলবে, হেঁসেল ঠেলার লোক আছে, তুমি মধুকবির গাঁ থেকে এসেছ তোমার মা মধুকবির বংশ ধারার কোনও এক ধারা, মধু কবির মতো বড় কবি ভূভারতে নেই, ছিল না, হবে না, মধু কবির মতো প্রতিভা সারা জগতে নেই, তাঁর রক্তের এক কণা তো আছে তোমার ভিতরে বীরাঙ্গনা, তুমি হেঁসেল ঠেলবে কেন? হাবলু হাবলু তুই শুনছিস।

হাবলু বলল, শুনছি দিদমা।

বীরাঙ্গনা বলল, আমার যা সব সেই মানুষ দিয়ে গেছে, আমার তো কিছুই ছিল না হাবলু, জগৎটা আসলে কী তার কিছুই জানতাম না, সব তোর দাদু দিয়ে গেছে, মাথার ভিতরে এমন নেশা ঢুকোল, আমি মধু কবিরে দেখতি পাতাম তাঁর মেঘনাদ বধ কাব্যে, বীরাঙ্গনা কাব্য তোর দাদুর মুখে শুনতে শুনতে। তোর দাদু যখন বলত...

''বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?''

এ কি মেঘনাধ বধ? হাবলু জিজ্ঞেস করে।

না, এ হল বীরাঙ্গনা কাব্য, রাজা দুষ্মন্তকে লেখা অভাগিনী শকুন্তলার চিঠি...। এখন বলতে গেলে মনে হয় লোকটা যদি আর ক'দিন থাকত জগতে, আমারে রেখে গেল, আমি কী করব একা একা?

একা হবা কেন দিদমা?

একা মনে হয় কখনও কখনও, অনেক রাত্তিরে, ও হাবলু আমারে সে লোক দুষ্মন্ত রাজার মতো ফেলে গেছে মনে হয়।

হাবলু বিস্মিত। সত্তর পার করা দিদিমা যেন নিজের বুকের খাঁচা খুলে তাকে দেখাচ্ছে, দ্যাখ হাবলু, এর ভিতরে কপোতাক্ষ নদ, সাগরদাঁড়ি, কেশবপুর, যশোর, মধু কবি আর সেই রাজা দুষ্মন্ত, সব আছে। আমার পিসি মানকুমারী বসু, তিনি মধু কবির ভাই-ঝি নাকি। ও হাবলু হাবলু ঘুম আসছে বাপ?

হাবলু বলল, না দিদমা।

ফণি একটু বয়সে বড়, তোর দিদিরে খুব যত্ন করবে যেমন আমারে করতি তোর দাদু, ফণি ঠিক ভালোভাবে দাঁড়াবে, তোর আলসে বাপ তোদের জন্যি কিছুই করবে না, হাতনেতে বসে বসে জীবন কাটিয়ে দেবে দেখিস, তারপর তাড়া খেলি পলায়ে আসবে, ওসব লোকের দ্বারা জগতে কিছু হয় না।

হাবলু বলল, না দিদমা, আমার বাবা খুব ভালো, খুউব, খুব ঠাণ্ডা মানুষ। বাবারে

গাঁর লোকও ভালোওবাসে খুব। হিন্দু মোসলমান—সবাই।

হাবলু তার বাবাকে বলেছিল, যদি এপারে এত নিশ্চিন্ত থাকো, তবে দিদি আর ডলুরে কেন ওপারে ফেলে রাখবা, আমি নিয়ে আসি।

ওর বাবা মৃগেন রায় বলেছিল, আমি কী বলব, তুই হাতেবর চাচারে জিজ্ঞেস কর গিয়ে।

হাবলু বলেছিল, কী জিজ্ঞেস করব, তিনি কী বলবেন, তুমি বলো।

বাবা চুপ করে ছিল। হাবলু বেরিয়েছিল। হাবলুকে দেখে সবাই অবাক, তুই না ইন্ডিয়ায় চলে গেলি হাবলু, ইন্ডিয়া তোরে নিল না?

হাবলুর কী মন খারাপ তখন। সে রেগে বলেছিল, আমি হিন্দুস্থান পাকিস্তান মানি নে, এডা মোটেই ভালো হয়নি।

কী বলতিছিস, পাকিস্তান মানিস নে? রুখে গিয়েছিল কলিম। কলিম তার সঙ্গে পড়ত। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার নূর আলির ছেলে। বাজারের ভিতর হাবলুকে ঘিরে পাঁচ সাতজন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, কী হয়েছে কলিম, কী বলতেছে ও বেটা, ইন্ডিয়া থেকে এয়েছে না?

হাবলু টের পেয়েছিল ক'বছরেই সব বদলে গেছে। সে তো মাত্র ছ'মাস ছিল বনগাঁ বসিরহাটে। জেঠা আর পিসির বাড়ি। তার ভয় করছিল। চেনা লোক সব, কিন্তু তাদের চোখ বদলে গেছে। তাদের মুখের চেহারা বদলে গেছে। কে যেন বলে উঠেছিল। শালারে ধোলাই দে, ডাক দেখি হাজি সায়েবরে।

কে হাজি সায়েব? হাবলু তো চেনে না। হাজি সায়েব গিয়েছিল এপার থেকে। এপার থেকে মানে বিহার থেকে। তার জবানই আলাদা। চোস্ত উর্দু না হিন্দিতে কী বলেছিল হাটের ভিতর থেকে এগিয়ে এসে। হাবলু সে ভাষা বুঝতে পারে নি। কে একজন হাবলুর কথা তাকে বোঝাচ্ছিল। হাবলু তার কথা শুনতে পাচ্ছিল। বুঝতে পারছিল। দিদি আর ডলুর কথা বলছিল। তাদের সমেত হাবলু ইন্ডিয়ায় চলে গিয়েছিল। ফিরে এসেছে একা। কেন মেয়ে দুটোকে নিয়ে আসতে পারে নি। হা হা হা হা। হাসছিল কারা কারা যেন।

সেই সময় হাতেবর চাচাকে দেখতে পেয়ে ভীত হাবলু যেন বেঁচে গিয়েছিল, চাচা! ডাক দিয়েছিল।

একজন বলেছিল, চাচা তোর কী করবে, তুই পাকিস্তান মানিস নে, তোরে পুলিশে দেব, একেবারে লাহোর জেলে চালান হয়ে যাবি সাতক্ষীরে জেল থেকে, এখান থেকে মালপত্তর ইন্ডিয়ায় রেখে আসবি আর বলবি পাকিস্তান মানি নে, মানিস নে তো মেয়ে দুটোরেও নিয়ে আয়, সবাই থাক।

বাজার গমগম করছিল। বাজারে হাবলুকে নিয়ে তাপ বেড়ে যাচ্ছিল। কয়েকজন

বলছিল, বাকিরা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তার ভিতরে অনেক মুখেই হাবলু ভয়ের চিহ্ন দেখেছিল। তার সবাই চেনা মানুষ, মুসলমান চাষা, ব্যাপারি, ফকির। জনা আট-দশ শুধু হাবলুকে ভয় দেখাচ্ছিল। হাজি সায়েব চুপ করে ছিল। তার দুটো চোখ হাবলুকে মেপে নিচ্ছিল। একবার বলে উঠেছিল, বহুৎ বদমাশ!

হাতেবর চাচা এসে দাঁড়াতে নূর আলির ছেলে কলিম একটু গুটিয়ে গিয়েছিল, তবু বলেছিল, ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া থেকে এসে বলছে পাকিস্তান মানে না।

তুই হাবলুরে চিনিস নে কলিম? হাতেবর মিঞা ঘুরে দাঁড়িয়ে ছিল।

কেন চেনব না?

তবে এসব বলছিস কেন, ও তো হাবলু, মৃগেনের ছাওয়াল, ওর মতো ভালো ছাওয়াল হয়, তিনবার পদ্মদিঘি পারাপার করতি পারে।

তাতে কী হয়েছে? কলিম বলে উঠেছিল।

ও কত ভালো ফুটবল খেলতি পারে, জানিস নে?

কেন জানব না।

আশাশুনিরে কাপ এনে দিইছিল সে বছর।

কলিম বলেছিল, তা বলে পাকিস্তান মানি নে বলবে?

হাতেবর মিঞা বলেছিল, ও কথা বলে নি।

বলেনি! কলিম অবাক, কেডা বলল যে বলে নি?

আমি বলতিছি যে বলে নি, ও আশাশুনির ছাওয়াল, ও কেন বলবে ও কথা, ও কথা বললি যে বেপদ হতি পারে তা ও জানে না?

না চাচা ও বলেছে।

না বলে নি, আমি তো দাঁড়ায়ে।

তুমি শুনিছ?

হ্যাঁ শুনিছি, ও বলে নি।

কলিম বলল, আমি ওরে বললাম ইন্ডিয়া থেকে আবার যে পাকিস্তনে এলি, ও তখন কী বলল।

ও কথা বলে নি। হাতেবর মিঞা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, ওর জেঠা পিসি ওপারে পড়ে গেছে, তাদের ঘরে ও যাবে না?

সে তো আমার খালাও বসিরহাটে থাকে। কলিম বলেছিল।

বসিরহাট তো ইন্ডিয়ায়।

হ্যাঁ, খালা আসবে না বলেছে।

সম্পক্কো তুলে দিবি?

তা কেন দেব, আব্বা তো ঘুরে এল।

তাহলি ও যাবে না কেন?

কলিম চুপ করে গেল। তার মাথায় ঢুকছে না সবটা। সে বিহার থেকে আসা হাজি সায়েবের অনুরাগী হয়েছে। হাজি সায়েব বলেছে ওপারে খুব দাঙ্গা হয়েছে। তার একটা ভাই কাটা পড়েছে ভাগলপুরে। সে ওখানে বড় ব্যবসা করত। এপার থেকে হিন্দুদের তাড়াতে হবে। রাখা চলবে না। পাকিস্তান মুসলমানের দেশ হবে। হবেই।

চুপ করে আছিস কেন কলিম?

কলিম বলল, আমার এক চাচাও থাকে হাসনাবাদ।

তবে ভেবে দ্যাখ।

কলিম বলল, লেকিন, হাবলু তো বোলা হায়।

শুনে হে হে করে হেসে উঠেছিল হাতেবর মিঞা, বাবা তোর মুখে এ কোন ভাষা, এডা শিখালো কে?

কলিম বলল, পাকিস্তানে বাংলা চলবে না।

তবে কী বলবে?

উর্দু, সবারে উর্দু শিখতি হবে।

তবে বাংলা নে কী করা হবে? হাতেবর মিঞা জিজ্ঞেস করল।

বাংলা তো মোছলমানের ভাষা না।

বাহ্ বাহ্, ভালো শিখিছিস, তোর মা বাপ কী বলে?

কলিম বলল, যা বলে বলে, লেকিন উর্দু শিখনাই পড়েগা।

হাতেবর মিঞা বলল, এতবছর ইংরেজ থাকল, ইংরিজি হয়েছে আমাদের ভাষা?

তর্কে, কথার পিঠে কথা হচ্ছিল। তখন একটু স্বস্তি পাচ্ছিল হাবলু। ভিতরটা একটু দমে গিয়েছিল। সব আগের মতো নেই। কলিমই তো বদলে গেছে। এখেনে তার ওসব কথা খাটবে না। ওপারে এসব কথায় কেউ মাথা দেয় না, আবার কলকাতা শহর বলে কেউ গায়েও মাখে না। এপারে তা নয়। তখন একজন জিজ্ঞেস করল, তোর মা বাপরে নিতি এইচিস?

না, কুথায় নে যাব?

ওপারে জমি বাড়ি দেখিচিস?

মাথা নাড়ে হাবলু, না চাচা, মা বাপ তো যাবেও না।

না গেলি থেকি যাক, কী আর হবে থাকলি!

বুনরা, তাদের কী হবে?

হুঁ। বুড়ো নইমদ্দি চিন্তিত হল। কথাটা তো সত্যি। কোনও কিছু হলেই মেয়েমানুষ আগে মরে। মেয়েমানুষ ধরে আগে টান দেয়। আশাশুনিতে কিছু হয় নি বটে, হতে কত সময়? এই যে ভিনদেশি ভাষা নিয়ে কলিম গলা ফাটাচ্ছে, এ নিয়েও লেগে যেতে

পারে। তখন? বুড়ো বলল, যা করবি ভেবে চিন্তে করবি, আমাদের বয়স হয়ে গেছে, দিনকালও বদলি গেছে, আমাদের কথা আর কেডা শোনবে বল।

একুশ

ভাষাটা উর্দু। সে ভাষা মধুর ভাষা তো নিশ্চয়। বড় বড় লেখক কবির ভাষা। কিন্তু হাজি সায়েবের মুখে তো চোখ রাঙানি।

এডা খাঁটি উর্দু না, কিন্তু নিজির কথা ভুলি গিলি? হাতেবর চাচা বলেছিল কলিমকে।

কলিম বলেছিল, পাকিস্তানে থাকলি উর্দু শিখতি হবে, হাবলুরেও শিখতি হবে, নইলে কোনো কাম কাজ হবে না।

হাতেবর ডেকেছিল, হাবলু আয়।

কলিম হাতের শিকার ফসকে যাওয়ার খুব হতাশ হয়েছিল। তার কাজই তখন হয়েছিল কারণে অকারণে হিন্দুদের অপমান করা। গাঁর লোক একাজ সমর্থন না করলেও তাকে কিছু বলত না। সব যেন কেমন হয়ে যাচ্ছিল। কলিম হাবলুকে খুব বাগে পেয়েছিল। রাগও ছিল। হাবলুর বোন ডলুর প্রতি দুর্বল হয়েছিল সে। তাকে পার করে দিয়ে হাবলু ফিরল, এটাও ছিল কারণ। ডলুও তার সঙ্গে ভালোই কথা বলত। প্রশ্রয় দিত বড় হতে হতে।

কলিম বলেছিল, ও কথা যেন না বলে আর।

ও কথা বলে নি ও, কেন ওরে দোষ দিচ্ছিস।

কলিম চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। হাতেবর মিঞা চলে যেতে সে উপস্থিত একজনকে জিজ্ঞেস করেছিল, ও বলে নি, কালু তুই ছিলি নে দাঁড়ায়ে?

কালু মোল্লা বলেছিল, আমি শুনি নি।

তুই শুনিস নি, শুনেছিলি?

না শুনি নি। বলে হন হন করে হাঁটতে লেগেছিল মধ্যবয়সী চাষা। তখন কলিম ধীর পায়ে হাজি সায়েবের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল, দেখা হায় চাচা?

দেখা, হাতেবর কো দেখা হায়।

আমি কি ঝুট বলেছি?

নেহি।

তো? এডা কী হল, ওরে থানায় টেনে নিয়ে গেলে হত।

চুপ রহো বেটা, ধীরে চল না বেটা, সব কুছু হো যায়েগা।

কলিম হাঁটা লাগিয়েছিল হাজি সায়েব চলে যেতে। হাটে সে কী রকম একা হয়ে গিয়েছিল। যারা তখন তার কথায় হে হে করে হাসছিল তারাও দূরে দূরে সরে গেল। কলিমের দিকে কেউ হাসি মুখে তাকাচ্ছিল না। তাকে সমর্থন করে কেউ আর এগিয়েও

এল না। কলিম হাঁটতে হাঁটতে দেখেছিল হাতেবর মিঞার বাড়ির দিকে যাচ্ছে ওরা। সেও পিছু ধরেছিল। হাঁটতে হাঁটতে শেষে না পেরে এক দৌড়ে চলে এসেছিল হাবলুর পাশে, এই ডলু কেমন আছে রে?

হাবলু বলেছিল, তোর সঙ্গে আমি কথা বলব না।

আচ্ছা, তা'লি আমি তোরে ছাড়ব না।

হাতেবর মিঞা দাঁড়িয়ে ছিল, তুই দিনদিন কীর'ম বলদের মতো হয়ে যাচ্ছিস কলিম, আয় সঙ্গে আয়, মাথা ঠান্ডা কর।

কলিম বলল, তুমি আজ ওরে বাঁচায় দিলে।

কেন রে, তুই ওরে মারতিস? হাতেবর ঘুরে জিজ্ঞেস করেছিল।

না থানায় নে যাতাম, তারপর ও বুঝত।

তুই একেবারে ভিনদিশীর মতো হয়ে গিছিস, থানায় দিলে ওরে খুলনায় চালান করে দিত, সেডা ভালো হত?

ঘানি ঘুরাত।

হাতেবর মিঞা হাত নাড়ায়, এই তুই যা দেখি, তোর সঙ্গে কথা বলতিও প্রবৃত্তি হচ্ছে না, ও তোর কী করেছে, ও ওর বাপ মার কাছে এয়েচে, এডা তো ওরও গাঁ নাকি, তুই কেন ওরে বিপদে ফেলতি চাস?

সেডা ও জানে।

কী জানে ও, এই হাবলু কী বলছে ও।

হাবলু বলল, আমায় চলি যেতি হবে চাচা, আমি থাকব না, ও আমারে ঠিক ফাঁসাবে, ফাঁসাবেই, আমি ওর কিছু করি নি।

তখন ঝপ করে কলিম তার হাত ধরে টেনেছিল, এই হাবলু, আমি বলদই বটে, কিসে কী হতি পারে ধারনা নেই, এই ডলু পড়তেছে তো?

হ্যাঁ, মাস্টাররা ভালোবাসে ওরে।

ডলু আমার কথা জিজ্ঞেস করে না?

হাবলু বলল, আমি কলকাতায় থাকি, আর ও বসিরহাট, দেখাই হয় না।

তাই! তোর ভাই ডবু?

খড়গপুর শুনে কলিম বলল, এডা কীর'ম হলো, ভাই বুনি সব আলাদা?

হিন্দুস্থান পাকিস্তান এই করেছে। বলে হাবলু হাতেবর চাচার কাছে সমর্থন চেয়েছিল।

হাবলু বলল, কলিমের সঙ্গে ডলুর ভাব হচ্ছিল, সেই ভয়ে দিদি আর ডলুরে এপারে পাঠিয়ে দিল বাবা।

একেবারে বিক্কিরিবাটা করে চলে আসুক।

না আসবে না, ওপারে তো অসুবিধে হচ্ছে না।

সত্যি হচ্ছে না? বীরাঙ্গনা জিজ্ঞেস করেছে।

কথা হচ্ছে পরদিন বেলায়। যে কথা গত রাতে থেমে ছিল ট্রাম কোম্পানির পেটা ঘড়িতে একটা বাজলে, সেই কথাই যেন এখন আবার শুরু হয়েছে। আজ আকাশ মেঘে ভারী। সবদিক কেমন অন্ধকার অন্ধকার হয়ে আছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিচ্ছে বীরাঙ্গনা। হাবলু বলছিল, সে না এলেও পারত, কিন্তু বোন দুটো এপারে থাকবে, সে ওপারে, তা কী করে হয়? আর সে তো মানে না হিন্দুস্থান পাকিস্তান, সে মনে করে এসব কিছুই থাকবে না, তার ইচ্ছে বনগাঁ নয়, হয় বসিরহাট, না হয় যশোর কোথাও একটা বাড়ি করে মা বাবা গাঁ ছেড়ে আসুক। সাতক্ষীরে তার পছন্দ না, কেন, না সাতক্ষীরে খুব ঘিঞ্জি হয়ে যাচ্ছে। জায়গাটা তো ছোট। তবে সাতক্ষীরে দিয়ে বসিরহাট কাছে হয়, যশোর দিয়ে বনগাঁও তো কাছে। বা বনগাঁ থেকে যশোর কাছে, আবার বসিরহাটও যাওয়া যায় হাবড়া, তেঁতুলে হয়ে।

বীরাঙ্গনা বলে, তুই এমন বলছিস যেন ভাগ হয় নি।

হয় নি বিশ্বাস করলি হয় নি দিদমা, সবাই যদি বলে হয় নি, আমরা হিন্দুস্থান পাকিস্তান মানি নে, তবে তাইই হবে।

সবাই বললে হবে?

হবে।

সবাই বলবে কেন?

সবায়ের তো ক্ষতি ছাড়া লাভ হচ্ছে না।

তোর কলিমের কী ক্ষতি?

হাবলু বলল, ডলু, ডলুরে নে আসায় কলিম হাজি সায়েবের লোক হয়েছে, ও হাজির বাড়ি বিহারে ছিল, রায়টে ওর ভাই কাটা পড়েছিল বলে, ওরও ক্ষতি হয়েছে যদি কথা সত্যি হয়।

হতি পারে, রায়ট কি কম হয়েছে?

আমাদের আশাশুনিতে হয় নি।

আশাশুনি তো গাঁ, গাঁয় ওসব হয় না।

সাতক্ষীরেয় হয় নি?

খুলনায় হয়েছিল, তুই শুনিস নি, নোয়াখালির কথা?

হ্যাঁ, কিন্তু সবাই যদি বলে হিন্দুস্থান নেই পাকিস্তান নেই, আছে শুধু ভারত-ইনডিয়া, আগে যেমন ছিল, তবে এসব হবে না।

বীরাঙ্গনার কথা বাড়িয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। এসব নিয়ে আর কেউ কথা বলে না। বলতে গেলে হিংসার কথা শোনায়। হাবলু যা শোনাচ্ছে তার একটা মানে আছে।

হাবলু বলছে, শুধু কি হিন্দু এয়েচে, মোসলমানও গেছে, সবাই যে যার ভিটে ছেড়ে গাঁ ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে, যারা যায় নি যাক।

কথাটা অদ্ভুত। বীরাঙ্গনা হাবলুর কথাটা বুঝতে চেষ্টা করল। যারা যায় নি, যাবে, তার মানে? ওপারের মুসলমান কোথাও যায় নি, এপারের হিন্দুও তাই। তারা যাবে কেন? হাবলু বলল, যেতে হবে।

হাবলু বলল, আমার মনে হচ্ছে দিদমা, আমি দিল্লি হয়ে করাচি যাব, আমি এসব মানি নে।

বীরাঙ্গনা চুপ করে থাকল। হাবলু যা বলছে তা পার্টিশনের পরপর মনে হত। মনে হত পার্টিশন সত্যি নয়। স্বাধীনতা এল যখন দেশভাগও যাবে। হতে পারে নাকি? দাঙ্গা লেগেছে তাই মানুষ পালাচ্ছে, আবার ফিরে আসবে, আবার সব আগের মতো হয়ে যাবে। ম্যাপে জোড়া লেগে যাবে। কিন্তু হল কই? তবে ঠাকুর্দা কবি মধুসূদনের ভিটে বাড়ি ওপারেই তো থাকল। এপারে আনা গেল না। এপারে এনে বসাবে কোথায়? কত বড় গ্রাম সাগরদাঁড়ি, কতবড় নদী কপোতাক্ষ।

বহু দেশ দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে!

এই কপোতাক্ষকে এপারে এনে রাখত কোথায় বীরাঙ্গনা দাসী, রাজনারায়ণ দত্তর ভিটেবাড়ি, নদী তীর, বিদায়ঘাট—অশ্রুঘাট। হাবলু বলল, খুব শিগগির এমন হবে, মানুষ বলবে পার্টিশান ভুয়ো।

বললেই কি তা হয়ে যাবে?

দ্যাখো হয় কিনা।

থাকলে, হয় যদি আমি সাগরদাড়ি গিয়ে পড়ে থাকব, তুই আমার সঙ্গে ফণির বাসায় চ, ফণিকে নিয়ে তো যেতি হবে।

মামারে বলো।

সে আমি বলব, চ, আজ ছুটি আছে, সকালেই যাই।

তুমি খুব হাঁটতি পার তাই না দিদমা?

বীরাঙ্গনা ফোকলা গালে হাসে, বলে, পারি, আমাদের দেশে গাড়ি ঘোড়া টেরাম বাস কোথায় ছিল বল, গোরুর গাড়ি আর হন্টন।

হুঁ, আচ্ছা দিদমা, কলকাতাও যদি পাকিস্তান হয়ে যেত।

তাই তো বলত আমাদের গাঁর ইসরাফিল, কলকাতাও ঢুকে যাবে, আমি কিছুই বিশ্বাস করতাম না, তবে শুনতে ভয়ও করত।

হাবলু বলল, তাহলি কলকাতা ছেড়েও যেতে হতো।

কোথায়?

হাবলু বলল, এসবের কোনও মানে নেই, মনে হয় বাবা ঠিক করছে, আমিও ঠিক করছি, বাংলার এপার নেই, ওপার নেই, বুঝলে?

দুপুরে বেরোল দু'জনে ভাত খেয়ে। আকাশ অন্ধকার হয়ে আছে। হাঁটতে কোনও কষ্ট নেই। এদিকে ঠুনঠুন টানা রিকশা। ওতে উঠতে চায় না বীরাঙ্গনা। আহা! লোকটার খুব কষ্ট, টেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু পয়সাও তো পাবে। না উঠলে হবে? বীরাঙ্গনা বলল, হেঁটে যাবই বলেছি হাবলু। হাঁটতি আমার কোন কষ্ট নেই, শ্যালদা থেকে হেঁটে বেলগেছে এয়েচি দিল্লির গাড়ি থেকে নেমে।

জিমখানা গ্রাউন্ড—টালাপার্ক বাঁদিকে রেখে হাবলু হাঁটছিল বীরাঙ্গনা দিদিমাকে নিয়ে। বুড়ি বলল, এদিকে জমি আছে, ফণি যদি কিনতে পারত। শুনে হাবলু বলল, দাম কত জান দিদমা? আমি দর করেছিলাম, আমাদের সব বেচেও এখেনে জমি কিনা যাবে না।

বীরাঙ্গনা বলল, এডা যদি হয় তবে এরপর তোর পরের বুনটার ব্যবস্থা করব, তুমি বাপ মার বড় ছেলে—।

হাবলু বলল, ডলুরে কলিম শাদি করবে বলেছে।

ওতো ওপারে।

এপারে এসে নিয়ে যাবে শাদি করে।

তা হয় নাকি, কেন হবে? মুসলমান হিন্দু আলাদা, বিয়ে হয় না।

হাবলু বলল, ডলুও কলিমের জন্য কেঁদেসল।

তুই জানিস?

হ্যাঁ।

ও মোছলমান, তবু?

ওই ভয়ে তো বাবা পাঠিয়ে দিল, দ্যাখো দিদমা যদি পার্টিশন না থাকত, যদি হিন্দু মোছলমান না থাকত!

বীরাঙ্গনা বলল, তাই কি হয় রে হাবলু?

কেন হবে না?

রয়েছে যে, হিন্দু মুসলমানের জন্যি তো এতবড় কাণ্ড।

আমি ওইটেও বলব।

ওডা হতি পারে না হাবলু।

হাবলু বলল, হলি আর কোনও সমস্যা থাকে না।

বাহ্, আমার শিব পুজো দুর্গাপুজো থাকবে না?

হাবলু দাঁড়ায়। পাইকপাড়ার মোড়। এবার ডান দিকে ঘুরে বাঁদিকে যেতে হবে। হাবলু বোঝে দিদিমার কথাগুলো তো সত্যি? কেউ মানবে? নমাজপড়া, সবেবরাত,

ঈদ, মহরম, দুর্গাপুজো সরস্বতী পুজো ভুলে যাওয়া যাবে? যদি এমন হয় সবাই ভুলে গেল? ওটি কেমন হবে?

বীরাঙ্গনার জিজ্ঞাসায় হাবলু বলল, ধর সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলে সবাই যে যেমন আছে, এটি ভুলে গেছে, পার্টিশানও ভুলে গেছে। এরকম তো হতে পারে দিদমা।

ধূর! তা হয় নাকি? বীরাঙ্গনা হাসল, তুই একটা পাগল!

বাইশ

পাইকপাড়ার ভিতর দিয়ে বড় বড় পুরনো নতুন দালান কোঠার ভিতর দিয়ে কালো ভাঙাচোরা পিচ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাবলু আচমকা দাঁড়িয়েছে। দমদম কাছে এসে গেছে। ডানদিকে খোলার ঘরের গায়ে টিনের পাতে লেখা, 'গৃহস্থের বাড়ি, প্রবেশ নিষেধ।'

ওডা কি দিদমা?

বীরাঙ্গনা আচমকা হাবলু হাত ধরল, চ চ, ও কিছু না।

ওর'ম লেখা কেন?

কেন, ইচ্ছে হয়েছে লিখেছে।

ওর'ম লেখে?

বীরাঙ্গনা হাবলুকে টানতে থাকে, চ চ, ওসব দেখতি হবে না।

হাবলু বলল কেন?

বীরাঙ্গনা বলল, ঘরে চ, বলব।

রাস্তা নির্জন। থমথম করছিল সব মেঘের ছায়ায়। গৃহস্থের বাড়িগুলির দরজা বন্ধ। সবাই ঘুমিয়ে আছে। বীরাঙ্গনা বলল, পরে জানবি সব, পাপ পাপ, মানষের পাপ, উপায় নেই তাই এই পাপ-পাঁক দেখতি হয়।

হাবলু কিছু আন্দাজ করতে পারল এবার। গায়ে কাঁটা দিল। তাদের আশাশুনিতে ছিল না, কিন্তু সাতক্ষীরেতে তো ছিল। হাবলুর মনে পড়ে গেল। সব নাকি পদ্মার দিকের মেয়েমানুষ। পদ্মা পার থেকে তাদের ভাগিয়ে সাতক্ষীরেতে এনে তুলেছিল। তাদের ঘরের দশা আরও খারাপ ছিল।

হাবলু বলল, আমি জানি দিদমা।

তাহলে চ। হাঁটতে লাগল বীরাঙ্গনা।

হাবলু বলল, এরা মুসলমান না হিন্দু?

ওর আবার হিন্দু মুসলমান কী, মেয়ে মানুষ। বলতে বলতে বীরাঙ্গনার মুখ চোখ কুঁচকে গেল, বলল, ওপারের মেয়েলোকও আছে।

তুমি কী করে জানলে?

ঢাকাইয়া ভাষা শুনেছি সেদিন যাবার পথে, রিফ্যুজি হবে।

হাবলু বলল, তাহলে তো হিন্দু।

না হতিও পারে, মেয়েমানুষ।

এতে হিন্দু মুসলমান দরকার হয় না?

বীরাঙ্গনা বলল, হাবলু তুই তো বড় হয়ে গিছিস বাপ।

আমি যা জিজ্ঞেস করলাম, বললে না তো?

মেয়েমানুষের ওসব কী, শ্যালদার প্ল্যাটফর্ম থেকে তুলে নিয়ে যায় নি? ওপারে হয় নি অত্যাচার? এপারে হচ্ছে না?

তবে কলিমের ভয়ে ডলুরে এপারে পাঠাল কেন বাবা?

কলিম তো মুসলমান।

ডলু তো মেয়েমানুষ, তার কি ধর্ম আছে?

বীরাঙ্গনা থমকে দাঁড়াল দমদম রোডের মুখে। বড় একখানি দোতলা বাস টার্মিনাস থেকে বেরিয়ে যাত্রা শুরু করল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। ধোঁয়ার গন্ধটা হাবলুর ভালো লাগে। সাতক্ষীরে থেকে মোটরে ভোমরা বর্ডারের কথা মনে পড়ে গেল। ঠিক সেই রকম গন্ধ। বীরাঙ্গনা তার কথা শুনে বিড়বিড় করছিল, না নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, তারপর বলল, ডলুর চেয়ে তোর তোর বাপের মান যাবে বেশি, মেয়েমানুষ ভাত কাপড়ের দাসী, যেখেনে যাবে ওই একই তো কারণ।

ডলুরও পছন্দ কলিমরে, আমি বলেছিলাম ও তো মুসলমান।

তাতে কী বলল?

কিছু বলে নি, কিন্তু নাও করে নি।

এখনও কি মনে ধরে রেখেছে?

আমি জানব কী করে?

বীরাঙ্গনা বলল, ধম্মোত্যাগ হবে তো, ধম্মো ত্যাগ করতি বুকি বল লাগে। অকুতো ভয় হতি হয়।

ডলু গুমরে বসেছিল, রাতভর ঘুমায় নি।

ওরা হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে রেলব্রিজ পার হয়ে লীলা সিনেমাকে উলটোদিকে রেখে ঢুকে গেল সঙ্কীর্ণ রাস্তায়। তারপর পৌঁছে গেল পুরনো বাড়ির দরজায়, কড়া নাড়ল বীরাঙ্গনা। দরজা খুলল ফণিভূষণ, লুঙ্গি আর গেঞ্জি গায়ে। হাবলুকে সঙ্গে দেখে উদ্ভাসিত হয়ে গেল ফণিভূষণের চোখ মুখ, আরে তুই যে।

নিয়ে আলাম, ও বাসায় বসে কী করবে, ওর তো কিছু করতি হবে ফণি।

ফণিভূষণ বলল, আয় হাবলু, করবে, ওর বয়েস কত বলো, এখন তো পড়ার সময়, পাকিস্তান থেকে চিঠি এল?

হাবলু মাথা নাড়ে। ফণিভূষণের একটি ঘরে আলো অল্প ঢোকে। তার উপর আজ মেঘলা দিন। দিনের বেলাতেই বেশ অন্ধকার। ফণিভূষণ বলল, হেরিকেন জ্বালব নাকি মাসি, মেঘ করেছে তো খুব।

বীরাঙ্গনা বলল, না, বস হাবলু, মাদুরি বস, আজ থেকি যাবি তুই।

হাবলু বলল, বনগাঁ যাবা কবে?

হকচকিয়ে যায় বীরাঙ্গনা, বলল, হবেখন, শোনো যা করবা তুমি ভয়ডর রেখি করলি হবে না, কী ফণি ঠিক বলেছি তো?

ফণিভূষণ বলল, বুঝতি পারলাম না, তুমি জল খাবা মাসি?

বীরাঙ্গনা মাথা নাড়ল, বলল, কী মেঘ করেছে ফণি, মেঘ দেখলি কপোতাক্ষর কথা মনে পড়ে যায়, বিদায়ঘাটে গিয়ে যদি দাঁড়াস তুই, দেখবি ওর মাথায় সব সময় মেঘ, চোখ জলে ভার হয়ে আছে।

এ জন্মে আর যাওয়া হবে না। ফণিভূষণ বল।

হাবলু বলছে পাকিস্তান থাকবে না।

কেডা বলল হাবলু?

হাবলু বলল, রদ হবে, হবেই, হিন্দু মুসলমানও তাই।

কী বলছিস, হিন্দু মুসলমানের কী হবে?

থাকবে না, ধম্মোও রদ্ হবে।

ফণিভূষণ বলল, পশ্চিম দিকে সূর্য ওঠপে হাবলু, ওসব ভেবে লাভ নেই, পাশের বাড়ির লোকটা তার ফ্যামিলি নিয়ে এসেছে, একটা বুনকে রক্ষা করতে পারেনি, বর্ডারের আগে তুলে নে গেছে।

হাবলুর গা শক্ত হয়ে গেল, বলল, পাকিস্তান রদ করার দরকার এই জন্যি।

এই জন্যিই হিন্দুস্থান পাকিস্তান রাখা দরকার, ভিন্ন হয়ে থাকাই ভালো যদি একসঙ্গে বনিবনা না হয়। ফণিভূষণ বলল, ওসব আর হবে না।

বীরাঙ্গনা খুপরি জানালা দিয়ে বাইরে ভেসে থাকা মেঘলা আলোর দিকে চেয়ে কপোতাক্ষর কথা ভাবছিল। নদী, স্টিমার, দুপারের গ্রাম সব মুছে গিয়ে কী করে ভাঙাচোরা খোয়া-পিচ ঢালা রাস্তায় এসে পড়ল সে? হাঁটছে শুধু হাঁটছে। যে ধর্ম নিয়ে এত সব হল, ম্যাপে দু'ভাগ করে দিয়ে দুটো দেশ করে দিল। সেই ধর্ম বড় সহজ কি? ডলু যে কলিমকে বিয়ে করবে ভেবেছিল, তাও কি সহজ হত? ডলু কি ভালো থাকত? বাপ মা কি ওকে আর মনে রাখত? ওর বাপ মা কোনওদিন ওর মুখ দেখত? মুসলমান উঠনে এসে দাঁড়ালে গোবর ছড়া দেওয়া হয়, হাতনেতে কোনওকালে উঠেছে মুসলমান? যারে ছুঁলে স্নান করতে হয় তার ঘরে মেয়ে গেলে কেউ সে মেয়ের মুখ দেখতে পারে? ডলু যদি কলিমের সঙ্গে পালাত, কিংবা কলিম যদি ডলুরে নিয়ে তার বাড়িতে তুলত,

হাবলুর মা বাপ আশাশুনি ছেড়ে চলে আসত ঠিক।

বীরাঙ্গনা বলল, ধম্মো ত্যাগ করলি খুব অসুবিধে হয়।

কী হয়! ফণিভূষণ আচমকা একথা শুনে অবাক, বলল, কে ধম্মো ত্যাগ করতি যাচ্ছে?

বীরাঙ্গনা বলল, আমার ঠাকুর্দা, মধুকবি করেছিল।

সে তো সবাই জানে, বিলেত যাওয়ার লোভে। ফণিভূষণ বলল।

লোভ ছিল না মধুকবির, তারও ভালো লেগেছিল, ইংরেজের ধম্মো তো, বোঝে নি সবটা।

কী ভালো লেগেছিল? হাবলু জিজ্ঞেস করে।

হাবলু তুই বড় হয়ে গিছিস, অত বড় পণ্ডিত, অতবড় কবি, সে বিলেত যাবে, বিলেত গে বড় কবি হবে তা যেমন ভাবত, এটাও যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি খ্রিস্টান মেয়েকে ভালো লেগেছিল মধুর।

হাবলু বলল, ভালোবাসা হলি ধম্মো থাকে না?

না থাকে না।

ধম্মো কোনও বাঁধা হয় না?

না হয় না।

পার্টিশন হয় না?

না হয় না।

হাবলু বলল, ডলুরে যদি কলিম বে করত তাহলি আশাশুনিতে হিন্দুস্থান পাকিস্তান থাকত না?

বীরাঙ্গনা বলল, অত সহজে কি হয়রে হাবলু, মধু কবি সমস্ত জীবন দিয়ে তা বুঝেছিল, ভালোবাসাও সব না, সে কি সাগরদাঁড়িরে ভালোবাসত না?

সে ভালোবাসা আর এ ভালোবাসা কি এক? হাবলু জিজ্ঞেস করে। তার সংকোচ কেটে গেছে। বীরাঙ্গনা দিদিমা যেন বন্ধু হয়ে গেছে। আবার বন্ধুর সঙ্গেও সব কথা বলা যায় না, যা বলা যায় বীরাঙ্গনাকে।

বীরাঙ্গনা বলল, সব ভালোবাসাই ভালোবাসা, কেউ নিজির দেশ ভালোবাসে, নেতাজির কথা ভাব, কেউ নিজির গাঁ ভালোবাসে, কেউ ভালোবাসে নিজির ভাষারে, তা না বুঝতি পেরে ভাবে ভিনদিশি ভাষাই বুঝি তার ভালোবাসার যোগ্য, পরে ফিরে আসে নিজির ভাষায়।

হাবলু বলল, কলিম, কলিম উর্দুরে ভালোবাসে, বলে উর্দুই সেরা ভাষা, হাজি সায়েব কত সায়রি জানে, সায়রি হল কবিতা।

যার ভাষা তার কাছে সেরা, কলিম ফিরত আসবে।

কোথায় ফেরবে?

বাংলা ভাষায়। আমার মধুকবিও ফিরেছিল, যে স্বপ্ন দেখত পর্যন্ত ইংরিজিতে, কিন্তু নিজিই জানত না তাঁর রক্তের ভিতরে দিশি ভাষা, বাংলা।

হাবলু মাথা নাড়তে লাগল। এসব কথা শুনতে ভালো, কিন্তু বাস্তবে কি সব সত্যি হয়? কলিম কি ফেরবে? কলিম তাকে বলেছে করাচি চলে যাবে। আসল পাকিস্তান হল করাচি, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি। আসল ভাষা হল উর্দু। সে পাকিস্তান মিলিটারিতে ঢুকবে। তাহলে? নেতাজিও খাটল না, মধুকবিও না। পরে কলিম বদলে যাবে তা হতে পারে?

হাবলু বলল, দিদমা, ডলুরে এনে ভালো করেছি তো?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বীরাঙ্গনা, কী হয়ে গেল সব!

হাবলু বলল, আমার মন সব সময় খারাপ হয়ে থাকে।

কেন রে, ওই টিয়াও তো আছে মা বাপ ছেড়ে।

হাবলু বলল, একজনের সঙ্গে আর একজনের মেলে না দিদমা।

তাহলি করবি কী বল। বীরাঙ্গনা হাত রাখে হাবলুর পিঠে।

হাবলু বলল, দিদমা, তুমি কবে দিল্লি যাবা বলো, ঠিকানা দাও না হলি, আমি একা চলি যাব।

হারায় যাবি, এদেশটা খুব বড়।

হুঁ, হারাব কেন, আমি কি ছোট ছেলে?

তবু হারাবি হাবলু, আচ্ছা তুই বল দেখি হিন্দুস্থান পাকিস্তান এক থাকলি কত বড় দেশ আমাদের, করাচি লাহোর দিল্লি আগ্রা, কলকাতা খুলনা ঢাকা চাটগাঁ সব এক দেশে, তুই সেই দেশেই জন্মেছিলি, আমিও, এখন আর সে দেশ নেই।

হাবলুর এসব ভালো লাগছে না। সে স্পষ্ট কিছু জানাতে চায়। করতে চায়। ওসব কথা অনেক শুনেছে। কী ভালো লাগে শুনতে। এত ভালো ভালো কথা থাকে যদি জগতে তবে মানুষের এমন অবস্থা হয় কেন? কথাটা সেদিন বাসে শুনেছিল। দুটো বয়স্ক মানুষ বলছিল, হজরত মহম্মদ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি যিশুখ্রিস্ট, কেউ তো খারাপ উপদেশ দিয়ে যান নি মানুষকে, তবু মানুষ লড়ে যাচ্ছে মুখোমুখি, বোমা বন্দুক তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে লেগে গেছে, রায়ট হচ্ছে, মানুষ ভিখিরি হয়ে যাচ্ছে—ওফ! হাবলু বলল, কলকাতায় কিছু হবে না, যা হবে দিল্লি থেকে হবে, চলো দিল্লি যাই।

ফণিভূষণ হেসে বলল, নেতাজি বলেছিল।

তখন বীরাঙ্গনা বলল, কলকাতায় মধুকবির জীবন কেটেছে, কলকাতার চেয়ে বড় কী?

তখন কলকাতাই রাজধানী ছিল। হাবলু বলে।

রাজধানী না থাকলেও তো ওটা মুছে যায় না, হাবলু বেলগেছেয় নাট্যশালা ছিল শুনেছি, সিংহদের রাজবাড়ি, পাইকপাড়ার রাজা ছিল।

হাবলু অবাক, কই, তাতো জানি নে।

ফণিভূষণ বলে, এসব তো শুনি নি।

বীরাঙ্গনা বলে, মানুষ এসব খোঁজ রাখে না, আমি একদিন যাব নাট্যশালা দেখতি, ঈশ্বর সিংহর বাড়িতে নাট্যশালা, মধু ইংরিজি করল রত্নাবলী নাটকের, কলকাতাও কি কম নাকি, কলকাতা মধুরে নে সাগরদাঁড়ির মতো জায়গা, তীর্থস্থান।

সে তো রবিঠাকুরের জোড়াসাঁকো আছে।

বীরাঙ্গনা বলে, খিদিরপুরে রাজনারায়ণ দত্তর বাড়ি কবে যাবি?

কী হবে গিয়ে, আছে কারা?

তাতো জানি নে, কিন্তু বাড়িটা তো আছে, তিনি যত দুঃখ যত কষ্ট, যত আনন্দ, যত যশ—সব পেয়েছেন এই কলকাতায়। মেয়ে জামাই যদি কলকাতায় থাকত কত ভালো হত আমার, আমি থেকে যেতাম।

সে তো তুমি আমার কাছেও থাকতি পার মাসি। ফণিভূষণ বলে।

তোর কাছে, তোর তো সংসার হবে, কতজনরে নিবি তুই?

আমি তো একা।

হাসল বীরাঙ্গনা, বলল, কোনও মানুষ একা না ফণি, তার কেউ না কেউ আছেই, থাকেই, আর তাদের সংখ্যা দিনদিন বাড়ে-বুঝলি।

ফণিভূষণ চুপ। হাবলুও। হাবলু ভাবছিল কথাটা এবার স্পষ্ট করে হোক। কথাটা এবার উঠুক। দিদিটা কেমন আছে, কীভাবে আছে সে কিছুই জানে না। তার মতো দিদির গায়েও কি হাত তোলে জেঠার ছেলে অবনীদা, বড়দা?

তেইশ

মধুকবির কথা আবার তুলল বীরাঙ্গনা দাসী বিকেল বেলায়, সেই কথা আবার উঠল রাতে। হাবলুকে নিয়ে এসেছিল সে ফণিকে নিয়ে বনগাঁ যাবে হাবলুর বড় বোনকে দেখাতে। ফণিভূষণ পুরো জানে না যার কথা আগের দিন বলেছিল মাসি সে আসলে কে? হাবলুকে দেখে তার আন্দাজ ফুটছিল ধীরে ধীরে। তাই কিছুটা সংকোচে সে বীরাঙ্গনাকে বলে, তুমি তো বিদায়ঘাটের কথা শেষ কর নি সেদিন মাসি, আজ একবার বলো।

বীরাঙ্গনা বলে, ও কথার শেষ নেই ফণি, বলব সব বলব।

আজ বল, হাবলুও শুনুক।

বীরাঙ্গনা বলে, শুনাব হাবলুরে, কিন্তু আগে সেই কথাটা শেষ হোক।

ফণি বলল, ও কথা হবেখন, ফুরোয়ে তো যাচ্ছে না।

আমি হাবলুরে সব বলেছি, তোর পছন্দ হলি হাবলু ওপারে গে বাপ-মারে খবর দেবে, তারা আসুক।

তখন হাবলু বলল, তারা তো আসপে না দিদমা।

আসপে না, কেন আসপে না?

হাবলু বলল, কোথায় আসপে বলো, কোথায় ওঠপে?

ফণিভূষণ এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলো। নিশ্চিন্ত হয়ে প্রথমে চিন্তাগ্রস্তও হল, তাহলে হাবলুর দিদি! হাবলুরা সব ভেসে বেড়াচ্ছে। এক বোন এখানে তো অন্য বোন ওখানে, হাবলুরা দুই ভাইও দু'জায়গায়। ভাই বোন কেউ কাউকে দেখতে পায় না। মায়া হয় ফণিভূষণের। তারপর বুঝতে পারে এইসব ভার তাকে নিতে হবে। সে দমদমে বাসা নিয়ে থাকলে হাবলুও ঘাড়ে এসে চাপবে। খড়গপুর থেকে হাবলুর ভাইও এসে যাবে, বসিরহাট থেকে হাবলুর বোন ডলুও এসে যাবে। তাছাড়া তখন ওপার থেকে হাবলুর অন্য ভাই বোনদেরও হয়তো ওর মা বাবা পাঠিয়ে দেব। ফণিভূষণ ভবিষ্যৎ ভেবে গুটিয়ে গেল। এতজনকে সে বইবে কী করে? তার তো সামান্য চাকরি। পারবে? ফণিভূষণের মনে হয় পার্টিশনের গোটা ভারই তার উপর এসে পড়বে। শিয়ালদা স্টেশনে এসে পৌঁছবে বরিশাল এক্সপ্রেস। প্রতিটি কামরা থেকে যারা নেমে আসবে তারা সকলে কলকাতায় এসে খুঁজবে ফণিভূষণের বাড়ি কোথায়। কোথায় বাসা নিয়েছে ভৈরব নদের ওপারের ফণিভূষণ? ফণিভূষণের মনে হয় গোটা পূর্ববঙ্গের ভার তার কাঁধে এসে চাপবে। সে কি পারবে? এমনিতে ভার নেওয়ার কোনও অভ্যেস তার নেই। ওপারে তার দুই দিদি রয়ে গেছে শ্বশুরবাড়ি সংসার নিয়ে। জামাইবাবুরা এসে বলেছিল, ফণি তাদের যে কারোর কাছে থাকতে পারে। একা থাকা তার পক্ষে ঠিক না। ফণিভূষণ থাকেনি। সে কারোর আশ্রয়ে থাকতে চায় না। নিজে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু এতটা ভার চাপলে পারবে কীকরে?

বীরাঙ্গনা দাসী স্তব্ধতা ভাঙল, বলল, তোর পিসি তো বসিরহাটে, সেখেনে এসে উঠুক, একেবারে তো থাকতে আসছে না।

না, পিসেমশায় ভালো, পিসির সঙ্গে মার বনে না। হাবলু পরিষ্কার ভাষায় বলল, পিসির বাড়িতে মা আসবে না।

তোর জেঠার বাড়ি?

না, জেঠার বাড়িও মা আসবে না।

বীরাঙ্গনা বলল, তোর বাবা তো আসবে?

বাবা আসবে, কিন্তু মা না এলে বাবা একা আসবে না।

তোর মার সঙ্গে কি জেঠির বনে না?

হাবলু বল, হ্যাঁ, মা তো ওই জন্যি আরও এপারে আসতি চায় না।

তা বললি হবে, পাকিস্তান হয়ে গেছে, দেশ ভাগ করে গেছে ইংরেজ, এখন কি ওপারে থাকতি পারবে? বিড়বিড় করে বলে বীরাঙ্গনা, আসতি তো হবেই, মা বাপ না এলি বিয়ে হবে কী করে?

ফণিভূষণ নীরব শ্রোতা। বুঝতে পারছিল সমস্যা আর গভীরে। খুব জটিল। এসব সমস্যা তার কাঁধে এসে পড়বে। তাকে ভার নিতে হবে। ফণিভূষণ ভাবে বলে দেয় তার তেমন ইচ্ছে নেই বিয়ের। কথাটা সত্যিই। সে বিয়ের কথা ভাবেই নি। একা মানুষ কি নেই জগতে। তার এক মামা বিয়ে করেনি । সেই মানুষটা পার্টিশনের আগে মারা গেছে। দেশ ভাগ তাকে দেখতে হয় নি। এই যে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়, তিনি অকৃতদার। অকৃতদার মানুষ বলে এত মানুষের ভার নিতে পেরেছেন। এপারের মানুষ ওপারের মানুষ সবাই তো তার দিকে হাত বাড়িয়ে আছে। ফণিভূষণের মনে হয় যে ভার দিতে চাইছে তাকে বীরাঙ্গনা মাসি, সে ভার অকৃতদার হয়ে তবু বহন করা যায়।

হঠাৎ বীরাঙ্গনা বলে, ও ফণি তুই চুপ করে আছিস যে?

ফণিভূষণ বলল, আমি কিছু বুঝতে পারছি নে?

বীরাঙ্গনা বলে, হাবলুর মা বাবার কথা হচ্ছে।

আমি কী বলব?

না, অভিরামের ওখেনে ওদের উঠতি বলা যায় না।

না, মা বাবারে আমি বারণ করে দেব, মামা ভালো, মামি ভালো, তারা ডেকে নেবে, কিন্তু আমারই তো লজ্জা করে দিদমা, এর চেয়ে হিন্দু মুসলমান কোনওটাই যদি না হতাম কত ভালো হত?

তা হয় নাকি, একটা ধর্ম তো থাকবে। ফণিভূষণ বলে।

থাকতিই হবে?

হ্যাঁ তাই তো জানি, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ—কতরকম ধর্ম আছে, তোমারে কোনও না কোনওটা নিতি হবে।

হাবলু মাথা নাড়তে লাগল, তারপর বলল, আমি কোনওটাই না দিদমা, আমার কোনও ধম্মো নেই, এবার পাকিস্তানে গিয়ে বলব, বলে আসব হিন্দুস্থান পাকিস্তান কোনও দেশই থাকবে না।

বীরাঙ্গনা দ্যাখে কথা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। অসহিষ্ণু হয়ে উঠে বলল, ওসব রাখদিনি হাবলু, যা বলতিছি তাই শোন, তোর দিদির বিয়ে কোথায় হবে?

হাবলু বলল, মা বাবা কী বলে দেখি।

তাদের তো কোনও চিন্তা নেই, খস্টাঙ্গে বসে আছেন, এপারে বাচ্চাগুলোন পাঠিয়ে দিয়ে খালাস, তারা কী খাচ্ছে, কোথায় শোচ্ছে তা নিয়ে চিন্তা নেই, চিন্তা এই সাগরদাঁড়ির বীরাঙ্গনার।

ফণিভূষণ জিজ্ঞেস করল, হাবলুর মা বাবারে তুমি চেন না মাসি?

না, কী করে চেনব?

তবে যে—। কথা অর্ধসমাপ্ত করে নিশ্চুপ হয়ে যায় ফণিভূষণ।

বীরাঙ্গনা বলল, ওর যে পিসি বসিরহাট থাকে, সেখেনে তো ওর বুনও থাকে, তার নাম ডলু, পিসিই তো আমারে বলেছে।

হাবলু বলল, পিসি কী বলল?

ডলুর জন্যি ছেলে দেখার কথা, আমি বললাম বড়টার আগে হোক।

হাবলু চুপ করে থাকল। তা দেখে বীরাঙ্গনা একটু দম নিয়ে আবার বলল, তোর পিসি তো খারাপ না হাবলু।

হাবলু বলল, আমি জানি নে।

ডলুরে তো যত্ন করে।

আমি জানি নে দিদমা।

তোর মামাবাড়ি কোথায় হাবলু?

হাবলু বলল, যশোরে ছিল জানি।

মামারা কোথায়?

জানি নে, মামাবাড়ির খবর রাখিনে, বেলগেছের মামাই আমার মামা।

তোর পিসির সঙ্গে মার কেন বনে না?

পিসিরা বড়লোক বলে।

বীরাঙ্গনা হাসে, কত বড় জমিদারের সন্তান আমার শ্রী মধুসূদন, এম. এস. দত্ত, কত ধনরত্ন, জমিজমা, কত বড় দালান কোঠা, তিনি মাদ্রাজ গিয়ে প্রায় ভিখিরি হয়ে গেসলেন, তুই জানিস, বিলেতে থাকতি অন্ন জুটত না, এদেশ থেকে যদি দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর টাকা না পাঠাত, মানুষের ধন মান কতদিনির বল ফণি, এই যে দেশ কেটে দু'ভাগ করল, কত মানুষ ভিখিরি হয়ে গেল, ওপারে তারা ছিল জমিদার, তাস পাসা খেলত আর দুধ ঘি খেত, এসব কি আমি জানি নে, খুব জানি।

হাবলু বলল, এই ভয়ে মা বাবা আসবে না, এপারে এলি ভাত জোটবে না।

বীরাঙ্গনা বলল, যাক গে, সে পরের কথা, ফণি তুই তো বুঝতি পারলি তোরে ভার নিতি হবে, পুরুষমানুষ অকুতোভয় না হলি সংসার থাকে না।

ফণিভূষণ বলল, বলছি মাসি, আমি তো বিয়ে করব বলে ভাবি নি।

আর কবে করবি এখন যদি না করিস?

ফণিভূষণ ভাবল চুপ করে থাকাই ভালো। হাবলু কত ছোট। তাকে কাকা বলে। হাবলুর সামনে 'না' করলে ও দুঃখ পাবে। ফণিভূষণের মন খুব নরম। কাউকে কষ্ট পেতে দেখলে ও নিজেও কষ্ট পায়। এই ক'দিন আগে একটা লোক খুব বুড়ো পথের ধারে বসে ভিক্ষে করছিল। মন কী খারাপ হয়ে গেল। লোকটার মুখে ঢাকার কথা। খাস বাঙালের ভাষা। ফণিভূষণ বুঝতে পেরেছিল ভিখিরি হয়ে গেছে ওপার থেকে এসে। ইস! কথাটা আবার মনে পড়তে ফণিভূষণের বুক ভার হয়ে গেল।

হাবলু বলল, সে যা হয় হবে দিদমা, একটা কিছু হবে।

বীরাঙ্গনা মাথা ঝাঁকায়, তারপর জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ফণি তোর দিদি দাদাবাবুকে তো খবর দিতি হয়, তোর আপনার জন বলতি তো তারা।

তারা তো পাকিস্তানে রয়ে গেল।

সে তো হাবলুর মা বাপ ভাই বুনও রয়েছে, তা বলি কি পর হয়ে গেল।

ফণিভূষণ বলল, তারা বলেছিল, দু'জনাতেই বলেছিল তাদের কাছে গিয়ে থাকতি।

থাকলি নে কেন?

থাকলি তো তোমার সঙ্গে দেখা হত না মাসি।

না হত দেখা, কিন্তু এলি কেন?

ফণিভূষণ বলল, তোমার জন্যি মাসি, আমি মাইকেলের কথা এত জানতাম না।

বীরাঙ্গনা বুঝল ফণিভূষণ এড়িয়ে যাচ্ছে। তার মানে ওর ভিতরে এমন কিছু কথা আছে যা ওকে ভারী করে রেখেছে। কথার ভার, দুঃখের ভার, মনের ভার মানুষকে বোবা করে দেয়। তখন দরকার কথাগুলো কাউকে বলা। বলে ফেললে ভার কমে। আর সে যদি সহমর্মী হয় তবে অনেক দুঃখ চলে যায়। তেমন কে হতে পারে? সহধর্মিণী। বীরাঙ্গনার 'মাসসাই'— মাস্টারমশায় এই কথা বলেছিল। বলেছিল, অঙ্গনা এমন যদি কোনও কিছু হয়, তুমি কষ্ট পাচ্ছ, মনে ধরে রাখবানা, আমারে বলবা, কোনও কথা লুকোবা না, চেপে রাখবানা।

তুমিও তাই ক'রো।

হেসে 'মাসসাই' তার মাথায় হাত দিয়েছিল, তাতো করব অঙ্গনা, তোরে ছাড়া কারে বলব, তোর বুদ্ধি খুব তা আমি জানি, পড়ালেখা করলে অনেকদূর যেতে পারতিস।

যখন খুব আবেগ হত তখন তিনি 'তুই' তোকারি করতেন। সে অবশ্য নিভৃতে। তার চেয়ে ষোল বছরের বড়। তার নাম ছায়ারানি থেকে বীরাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা ভেঙে অঙ্গনা। নাম দিয়েই কত ভালোবাসা যে যায় তা জানতেন তিনি।

মাসি চুপ করে আছ যে? ফণিভূষণ ডাক দেয়।

তুই এত মন খারাপ করে থাকিস ফণি, মুখখানা আঁধারপানা হয়ে থাকে, তোর একজন সঙ্গী দরকার, যারে সব বলতি পারবি।

ফণিভূষণ হাসে, বলে, কই আমি তো বুঝি নে।

তোর ভিতরে অনেক কথা যা আমরা জানি নে।

কই মাসি, না তো।

তোর দুটো দিদি ডাকল তুই গেলি নে, কলকাতায় তোর কেউ নেই চলি এলি, এখনও তো পাকিস্তান সবাই ছাড়ে নি।

ফণিভূষণ বলল, সব কথা কি বলা যায়?

বলার মতো লোক হলি তো বলা যায়, দ্যাখ 'মাসসাই' এসে বলল অঙ্গনা, ওপাড়ার যোগেন সেন-এর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, অবস্থা খুব খারাপ, কী করা যায়, ছেলের বোতাম আংটি, মেয়ের গলার হার, দেবে কী করে, ওরা যে চেয়েছে।

তোমরা দিলে? হাবলু বলে ওঠে, অঙ্গনা কেডা, তুমি?

বীরাঙ্গনার দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে। মাথার কাপড় টেনে নিজের আনন্দের কান্না লুকোল বীরাঙ্গনা দাসী।

ফণিভূষণ বলে, তুমি বীরাঙ্গনা থেকে অঙ্গনা, তুমি মধুকবির বংশের মানুষ মাসি, তুমি দেবে ছাড়া কেডা দেবে, দিলে?

দিলাম তো, আমাদেরটা দিলাম।

বাহ্! এই না হলে তুমি বড় মানুষের ঝি।

বীরাঙ্গনা হাসে। ধীরে ধীরে বলে, মাসসাই না শিখালে আমি কি শিখতাম এত কিছু, মধুকবি আমার ঠাকুদ্দা হতি পারে, তাতে আমার কী হবে, আমি কী করে জানতাম ভালো করে, মাসসাই আমারে সব বলত, বলত মধুকবি কত বড় কবি তা কি বীরাঙ্গনা জানে? জানে না, জানতে হবে তো।

ফণিভূষণ বলল, তারপর কী হল বললে না তো, এইসব কথা তোমারে তোমার 'মাসসাই' বলেছিল।

কোন কথা?

মা জাহ্নবী আর মধুর দেখা হল কপোতাক্ষ তীরে।

মাথা নাড়ল বীরাঙ্গনা, বলল, না একথা সাগরদাঁড়ির সবাই জানে, সবাই বলে, এই যে ওইখানে দেখা হল মা আর ছেলের, শেষবারের মতো দেখা হল, ওই সেখেনে বুড়ো নিমগাছটা রয়েছে এখনও, গাছের ছায়া রয়েছে।

ফণিভূষণ বলল, জননী আর জন্মভূমি, জাহ্নবী আর সাগরদাঁড়ি এক, তাই তো শুনেছি মাসি, কবিরা তাই তো বলেন।

চব্বিশ

ফণিভূষণ ভাবল তার মালিককে জিজ্ঞেস করে নেবে। লোকটা খুব বাস্তববাদী। খুব ছোট অবস্থা থেকে বড় হয়ে উঠেছে। ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সে কী বলে শুনবে ফণিভূষণ। তারপর সিদ্ধান্ত। মাসিকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেবে। তাতে কি মাসি রাগ করবে? দূরে সরে যাবে তার মধুকবিকে নিয়ে? তখন ফণিভূষণ মাসির মান ভাঙাবে।

মাসি রাগ করে থাকতে পারবে না। আসলে এপারে কেউ নেই ফণিভূষণের। এই বীরাঙ্গনা দাসী, অভিরাম বোস এরাই তার আত্মীয় হয়ে উঠেছে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে হাবলুও তার আত্মীয়। চেনাজানা মানুষ তো বটে। তার মালিকও। ফণিভূষণ বলল, মাসি ওসব কথা থাক, তুমি তোমার মধুকবির কথা বলো।

দ্যাখ ফণি, মধুকবির কথা বারবার কেন বলি, বলার মতো আর কি কোনও কথা আছে তোর মাসির, কত মানুষ ভিখিরি হয়েছে, আবার কত মানুষ সব নিয়ে এসেছে, যাদের বুদ্ধি ছিল তারা পেরেছে, এই মাসি শুধু আনতি পেরেছে তার ঠাকুর্দা মধু কবিরে, আর সাগরদাঁড়ি, কপোতাক্ষ।

জানি মাসি, সেটা কম না, তুমি কিন্তু কথা অর্ধেক বলেছিলে সেদিন।

হবে, দিন তো পড়ে রয়েছে।

কই পড়ে রয়েছে, এরপর আগে যা বলেছিলে ভুলে যাব।

ভুলে যদি যাস তবে আর শুনবি কেন?

না মাসি, মধুর সামনে মা জাহ্নবী গেল, তারপর তো শুনলাম না কিছু।

শুনবি আগে এসব কথা হোক, আমার তো খুব সমিস্যে হয়ে গেল ফণি, হাবলুর মা বাপটা খুব ঠেঁটা, মার কারোর সঙ্গে বনে না, সব জায়গায় ঝগড়া করে বসে আছে অথচ ছেলে মেয়েগুলো সেখেনেই বড় হচ্ছে, কী হবে বলদিনি ফণি?

ফণি বলল, হাবলু সব কি জানে, ও তো ছোট।

হাবলু বলল, মা বাবা আসবে না, বাবা দেখে যাবে, মা ওপারেই থাকবে।

তবে বোঝ, আচ্ছা কবে বনগাঁ যাবি ফণি?

তাড়ার কী আছে? ফণিভূষণ জিজ্ঞেস করল।

আছে ফণি, যত তাড়াতাড়ি সব হবে, মেয়েটাও মুক্তি পাবে, সোমত্ত মেয়ে মা বাপ ছেড়ে জেঠার ঘরে বড় হওয়া কি আনন্দের?

ফণিভূষণ ভাবল বীরাঙ্গনা মাসি যেন জোর করছে। সে যখন না করবে তখন বীরাঙ্গনা মাসি মুখখানা কোথায় রাখবে? আর মেয়েটাকে দেখে এসে না করার পর যে বাড়িতে আছে সে বাড়ির লোক কি ভালো মুখ দেবে মেয়েকে? তাই তো হবে। ফণিভূষণ জানে তার মালিক না করবে। মালিক তো বলেছে ফণিকেও একটা ব্যবসা খুলতে হবে। চিরকাল কি সে তার কাছে কাজ করে যাবে? স্বাধীন হতে হবে। নিজের ব্যবসায় পাঁচটা লোকের ভাতের সংস্থান করে দিতে হবে। তবে না একটা কিছু হবে। এখন বিয়ে সাদি করে সংসারের জোয়াল কাঁধে নিলে তার ভবিষ্যত অন্ধকার। অবশ্য বয়স হয়ে যাচ্ছে। এরপর আর বিয়েয় বসা যাবে না। বিয়ের প্রতি তার কোনও আগ্রহই নেই। ফণিভূষণ বলল, ছুটির দিন ছাড়া হবে না।

তাহলে পরের হপ্তায় রোববার চ।

ফণিভূষণ বলল, যাদের বাড়ি যাব তারা কি ডেকেছে?

ওরা কি ডাকবে, বিনি মাগনায় কাজের লোক পেয়েছে মেয়েটাকে।

তখন হাবলু বলল, জেঠা দিদিরে খুব ভালোবাসে, জেঠার তো দুই ছেলে, মেয়ে নেই।

তাহলে অসুবিধে কী?

আমি জানি নে দিদমা, তুমি দিদির কাছে জিজ্ঞেস করো।

ফণিভূষণ একটা জায়গা পেয়েছে আপত্তির, বলল, ওরা যদি না ডাকে তবে কি আমরা যেতি পারি মাসি, আমরা অচেনা লোক, কী করতে যাব বলো দেখি।

কেন মেয়ে দেখতি।

কী করে হয়, ওর জেঠা কি জানে আগে?

জানবে, আমি পত্তর করে দিচ্ছি, হাবলু হাতে হাতে নিয়ে যাবে, কী হাবলু, পারবি নে?

হাবলু বলল, জেঠার দোকানে দিয়ে আসব।

কী দোকান?

হাবলু বলল, জামা কাপড়ের, খুব বড় দোকান, পার্টিশনের আগের।

বেঁচে গেছে। বীরাঙ্গনা বলল, যদি যশোরে করত সব ফেলে আসতি হত, দোকানও লুট হয়ে যেত।

হ্যাঁ হত, এখেনেও তাই হয়েছে মাসি, আমার মালিকের ভাই একটা বাড়ি পেয়ে গেছে ফ্রিতে, ধর্মতলায়, নীচে চালু দোকান।

ওরকম হয়েছে, হয়, রায়টে হয়ে থাকে। বীরাঙ্গনা বলে।

ফণিভূষণ এতক্ষণে প্রসঙ্গ বদলাতে পারল যেন। বলছে কত বড় বাড়ি ধর্মতলা স্ট্রিটে। মুসলমানের বাড়ি, তিনটেকে কেটে ছিল রায়টে, বাকিরা ভয়ে ঢাকায় চলে গেল, ওরা কিন্তু বিহারি মুসলমান ছিল, সেই সময় মালিকের ভাই পুরো বাড়িটা দখল নিয়ে নিলে, একতলায় তার একটা দোকান ছিল, ঝড়তি পড়তি স্নো পাউডারের, একটুখানি, তার কাছ থেকে সামান্য টাকা নিয়ে বাড়ির দলিল দিয়ে চলে গেছে ওরা।

হুঁ, এরকম ওপারেও হয়েছে অনেক, হাবলুর জেঠা বেঁচে গেছে, এই চব্বিশ পরগণা কলকাতা যদি পাকিস্তানে ঢুকে যেত তখন কী হত বল, দাবিতে তাও ছিল, যাকগে, এখন কী হবে?

হাবলু বলল, আমি জেঠারে বলে আসি রোববারে দিদিরে দেখতি যাবে কলকাতার লোক।

বলে আয়, দিদিরে ও বলে আয়।

দিদিরে জেঠা বলবে, আমি ও বাড়ি যাব না।

ওই দিনও যাবি নে?

ওই দিন যাব, না গেলি তুমাদের অসুবিধে হবে দিদমা।

কথা শেষ হচ্ছিল না। তবে রাত বাড়ায় কথা কমে এল। হাবলু আগে ঘুমোয়। তাকে মাঝখানে রেখে একদিকে বীরাঙ্গনা অন্যদিকে ফণিভূষণ শোয়। মেঝেয় বিছানা। প্রথমে একটা তক্তপোষ ছিল এই বাসায়। বাড়িওয়ালা তা নিয়ে গেছে। ফণিভূষণ ভেবেছিল তক্তপোষটা সে পেয়ে গেল। না হয় অর্ধেক দাম দিয়ে দেবে। কিন্তু তা হয় নি। এখন তাকে ভাবতে হচ্ছে তক্তপোষের কথা। মাইনে পেলে কিনবে। এসব ভাবতে ভাবতে ফণিভূষণ উঠে মাথার কাছে রাখা ঘটি তুলে জল খায়। তারপর আবার শোয়। তখন বীরাঙ্গনা ডাক দেয়, কী হল ফণি?

মাসি এত ভার আমি নেব কী করে?

পারবি, তুই-ই পারবি।

মাসি তুমি তোমার মধু কবির কথা শোনাও, ঘুম আসছে না।

বীরাঙ্গনা গুনগুন করল, বলছি, তাঁর কথা শুনলি তুই সাহস পাবি, সে মানুষ ছিল অকুতোভয়, তিনি কি লিখেছিলেন তাঁর বন্ধুকে—

এ ধরার কর্মভার মন বেদনিলে,
কার কর পদ্ম-স্পর্শে গায়ে সে বেদনা
বরদার দয়াসম? হাত বুলাইলে,
জননী, ব্যথিত দেহে, কোথা ব্যথা
থাকে?
এ কথা তোমার আছে অবিদিত নহে।

শুনতে শুনতে ফণিভূষণ বলে, তিনি কত বড়, সরস্বতীর বরপুত্র, আমার তো কেউ নেই মাসি, আমি এ ভার নেব কী করে, যদি ব্যর্থ হই?

তুই তা হবি নে, মানুষের উপর ভার না পড়লে মানুষ জানবে কী করে কতটা ভার সে বইতে পারে, মানুষ যদি ভার না নেয় তবে তার জীবন কী নিয়ে কাটে?

ফণিভূষণ দেখল আবার কথা ওইদিকে যাচ্ছে। কথা থেমে ছিল। সেই আবার তুলেছে।

ফণিভূষণ উঠে বসে বলল, ঘুম আসছে না, তুমি অশ্রুঘাটের কথা শুনাও দেখি।

উঠে বসেছে বৃদ্ধা বীরাঙ্গনাও, বলল, মা আর ছেলে মুখোমুখি হল। এমনিতে খ্রিস্টান হওয়ার পর মা-ই তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিল, গোপনে টাকা পয়সা পাঠাত কলকাতা গেলেই, এখন মধু যাবে মাদ্রাজ, মা দেখল ছেলে রোগা হয়ে গেছে। ছেলের দুটো চোখ কোটরে ঢুকে গেছে বুঝি। কিন্তু তার ভিতরেও সে চোখের দীপ্তি কম না। মা বলল, মধু তুই চলে যাবি, সত্যি যাবি?

জন্মভূমি যে আমাকে ত্যাগ করেছে মা।

আমি জানি নে মধু তোর কী হবে। অতদূর তুই একা চলে যাবি, ভয় করছে আমার।

মধু বলল, মা, তারপর আমি ইংলন্ড যাব, আমার লক্ষ্য তো জান তুমি।

জাহ্নবী জিজ্ঞেস করল, আমারে তোর ভালো লাগে না মধু? দেখতি ইচ্ছে করে না?

এ কী বল মা জননী, তবে এদেশ ইংরেজের শাসনাধীন, কিন্তু জাতি তার সুফলতা নিতে পারে নি। এদেশ আমার কাছে প্রবাস হয়ে গেছে, এদেশের মানুষ জানে না কীভাবে গুণীর সম্মান গুণীকে দিতে হয়, তুমি কী করবে মা?

পরাধীন জাতি সব জানবে কী করে মধু?

এ পরাধীনতা নিয়তি নির্দিষ্ট, ইংরেজের বিজয়ও তাই, আমাদের হিন্দু ধর্মও তার গৌরব হারিয়েছে মা, একটা জাতি ধ্বংস স্তূপের মতো টিকে আছে শুধু—

জাহ্নবী মা চোখে আঁচল চাপা দিল। এ ছেলেকে কে বোঝাবে? এদেশে কি তেমন কেউ নেই?

শুনতে শুনতে ফণিভূষণ বলে, জাহ্নবী মা হতভাগিনী—মায়ের কষ্ট বুঝল না কবি?

না বুঝল না, সে জানে ঘরে বসে থাকলে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না। খুব তেজ ছিল তো তার, ধর্মই ছেড়ে দিল, সে জানত ইংরেজ এদেশ এসেছে আমদের উদ্ধার করতে। ইংরেজের হাতে এ জাতির মুক্তি। এ কোন বিদেশি এসেছে আমাদের বাসভূমে। ইংরেজ জাতি অ্যাংলো-স্যাকশন জাতির উত্তর পুরুষ। তাদের নীলরক্ত তার ভিতরে প্রবাহিত। আমাদের এই দেশ ও তার আশ্চর্য রূপ নিয়ে ডেকেছে অ্যাংলো স্যাকশন জাতির সন্তানদের। এ দেশ এমনই দেশ যা শুধু সম্রাট নেপোলিয়ানের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকেই পূরণ করতে পারে—সমৃদ্ধ উপত্যকা, বিস্তৃত সমতল ভূমি, ঊর্বর কৃষিক্ষেত্র, অফুরন্ত খনিজ, গহন অরণ্য, পাইনে ঘেরা পাহাড় শ্রেণি, পর্বতমালা—এসব নিয়ে তো ভারতবর্ষ, তা ইংরেজেরই পদানত হতেই যেন প্রস্তুত হয়েছিল।

মা চুপ করে বসেছিল। মধু অন্ধকারে পায়চারি করছিল। মধু বিড়বিড় করছিল, হিন্দু! শত শত বর্ষের বশ্যতা, ক্রীতদাসত্ব নিয়ে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অভিশপ্ত এক জাতি, এ ধর্ম আর নতুন কিছু দেবে না, এই ধর্ম, এই জাতি আমার কাব্য সাধনার বিপক্ষে এসে দাঁড়াবে।

ধন্য আশা কুহকিনী। যশঃ লিপ্সা মধুকে দিয়ে এইসব বলাচ্ছে। মধু কি জানে না তার খুল্ল-পিতামহ মানিকরামের কথা? সে তো ধর্মরক্ষা করতে সংসার ত্যাগ করল। মানিকরামের সেই ছায়া কি মধুর উপরে নেই? সেই ছায়া চিনবে কে?

কে দেখেছে মানিকরামকে? না, জাহ্নবী দ্যাখে নি। তিনি তাঁর যৌবনকালেই নিরুদ্দেশ হলেন সাধু হয়ে। সেই আধো জ্যোৎস্নায় আবছা হয়ে ফুটে থাকা কপোতাক্ষ তীরে উবু হয়ে বসে পড়ল জাহ্নবী। সে টের পায় মানিকরামের ছায়া পড়েছে তার মধুর উপর। মধুর খুল্লতাত পিতামহ ছিলেন তিনি। তার কথা জাহ্নবীকে শুনিয়েছে মধুর বাবা রাজনারায়ণ। ভয় পাচ্ছিল জাহ্নবী। তিনি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে সাধু হয়ে হারিয়ে গেলেন।

তাঁর কবিতাও নাকি ছিল মনোমুগ্ধকর। কবিতাই তাঁকে ঘরছাড়া করল শেষপর্যন্ত। মধুরও তাই হল। শোনা যায় কোনও বাঙালি রেভারেন্ডের সুন্দরী কন্যার প্রেমে পড়েছিল সে। রাজনারায়ণ দত্ত এক জমিদার কন্যার সঙ্গে বিবাহের ঠিকঠাক করেছিলেন। মানিকরাম পারে নি, মধু ধর্মত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়ে শেষ অবধি কোনও আশাই পূরণ না হওয়ায় কালাপানি পার হয়ে যাবে মাদ্রাজ।

জাহ্নবী ডাক দিল, মধু, না গেলি হবে না?

না মা, কলিকাতা শহর আমাকে পরিত্যাগ করেছে।

জাহ্নবী বলল, সাগরদাঁড়ি ফিরে আয়, তুই আয়, তোরে যদি হিন্দুরা না নেয়, আমি তোর ধর্ম নেব। বলে জাহ্নবী আছড়ে পড়ল ধুলোয়, বলল, কী হবে ধর্মাধর্মে যদি মধু না থাকে।

নগেন এগিয়ে এসে জাহ্নবীকে তুলেছিল। জাহ্নবী স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। কপোতাক্ষ নদ, ওপারে গ্রাম, গভীর স্রোত, মধ্যরাতে পাখির ডাক, জোছনা অন্ধকার দেখতে দেখতে জাহ্নবী বিড়বিড় করে, হে মা বসুন্ধরা, তুমি এমন হলে কেন, এমন সুন্দর, তোমারে দেখে মধু আমার পাগল হয়ে ছুটছে কোথায় তা ও নিজেই জানে না, কে দিল ওরে কবিতা, কেন দিল? মানিকরামকে নিয়েছিল একবার, এবার আমার মধুরে নেচ্ছে, হে কপোতাক্ষী, শুনিস তুই আমার কথা, মধুরে তুইও রাখতি পারলি নে মা গো।

ফণিভূষণ শুনতে শুনতে বলে, মধু বড় নিষ্ঠুর।

বীরাঙ্গনা মাথা দোলায়, বিড়বিড় করে বলে, না রে, সাগরদাঁড়ি থাকলি মধুরে কেডা চিনত, মধুর কবিতা কি লিখা হত, কবি হত মধু?

কেন সাগরদাঁড়িতে হত না?

না রে না, ঘর থেকে না বেরুলি মানষের চোখ ফোটে না, ইংরেজ যদি ঘরে বসে থাকত, রাজত্ব করা হত তার, রাজা হত? ঘরে বসে হয় না।

ফণিভূষণ বলে, মার বুকে ফাটে, মার চোখে জল, তবু বলো মাসি?

হ্যাঁ বলি, অমন ছেলে পেটে ধরলি কষ্ট পেতি হয় মারে, মধু সাগরদাঁড়ি থাকলি তাস পাশা খেলে খেলে বুড়ো হয়ে যেত, গাঁ ছেড়ে বেরুতি হয়।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে ফণিভূষণের, বলে, আমরা যে গাঁ ছেড়ে এলাম।

গাঁয়ে থেকে কী হত তোর, চোখ ফুটত না, ঘর থেকে না বেরুলি মানষের দু'চোখ বুঁজে থাকে, মধু থাকে নি সাগরদাঁড়ি।

তবু মাসি, মা কি পারে?

পারে না, আমি হলি কপোতাক্ষয় ডুবে মরতাম রে, কিন্তু উপায় কী, মধুরে মা সরস্বতী তার রূপ দেখাতে নিয়ে যাবে কালাপানির ওপার, সে থাকবে কী করে? বলতে বলতে বীরাঙ্গনা থেমে যায়। অন্ধকার মুখে চুপ চাপ হয়ে যায়।

পঁচিশ

ফণিভূষণ জিজ্ঞেস করবে করবে করেও পারে নি। ভাবছিল এ সিদ্ধান্ত তার নিজের হবে। সে তো সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে এ প্রস্তাবে রাজি হবে না। তখন কাউকে জিজ্ঞেস করা মানে তার ভিতরে দ্বিধা আছে। যদি তার মালিক আগরওয়ালজি বলে, তুমি রাজি হয়ে যাও, সে কী করবে তখন? তার সমস্যা কি মালিক মেটাবে। মেটাতে পারবে?

ফণিভূষণ ঠিক করে নিয়েছে সে যাবে। ফিরে এসে জানিয়ে দেবে তার মত। বীরাঙ্গনা তাকে নিয়ে যেতে চায় যখন যেতে হবেই। কিন্তু ফিরে এসে না বললে ওরা দুঃখ পাবে। সেক্ষেত্রে ফণিভূষণের কিছু করার নেই। এর ভিতরে ফণিভূষণ একদিন সন্ধ্যের পর অভিরামের বাসায় গেল। সেখানে বীরাঙ্গনাকে দেখল না। হাবলুকেও না। বীরাঙ্গনা না হয় বসিরহাট গেছে। হাবলু? টিয়া বলল, দিদমার সঙ্গে সেও গেছে। ফিরবে কবে তা সে জানে না। প্রভাময়ী বলল, রবিবার, তুমি তো ওদের সঙ্গে বনগাঁ যাবে ফণি, তাই যেন শুনলাম।

ফণিভূষণ বলল, তেমন কিছু ঠিক নেই।

যাও দেখে এস।

ফণিভূষণ চুপ করে থাকল। চা খেয়ে ফিরল হাঁটতে হাঁটতে। ফিরে একা ঘরে বসে থাকল বিষণ্ণ হয়ে। মন খারাপ লাগছে। ভৈরবপারে ফেলে আসা পিতৃপুরুষের গ্রাম, মা দিদি জামাইবাবু মামা মাসি সবার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ভিতরটা আকুল হয়ে উঠল হঠাৎ। সে এল কেন? তার গ্রামটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে সব দিকেই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তার ভিতরেও তো ওপারে দুই দিদি রয়ে গেছে। জামাইবাবুদের ব্যবসা, তা ছেড়ে আসবে কী করে? এক মামা রয়ে গেছে। আর এক মামা এপারে এসে কোথায় যে গেল তার কোনও পাত্তা পায় নি ফণি। তার বিয়ে হবে, তার জন্যে কনে দেখার কথা তার দিদিদের। একবার দিদির এক পিসতুতো ননদের কথা উঠেছিল। তখন তার বিয়ের বয়সই হয় নি। হল এপারে এসে। ফণিভূষণ ভাবল, দিদিদের চিঠি লেখে। কী লিখবে? একবার যেতে হবে। পাসপোর্ট করে নিয়ে ঘুরে এলে হয়। ফণিভূষণের মনে পড়ে যাচ্ছিল তাদের ভিটেবাড়ি, উঠোন, সুপুরি বাগান, আম বাগান, ধানী জমি। মাকে মনে পড়ল। কত ভোরে উঠে উঠোন ঝাঁট দিয়ে গোবর ছড়া। ফণিকে ডেকে ডেকে তোলা যায় না। খুব খারাপ হয়েছে পার্টিশন হয়ে, হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয়ে। সে কোথায় ছিল, কোথায় এসে পড়েছে? এখন মনে হচ্ছে দিদি জামাইবুবর কাছে গিয়ে থাকলে—। ব্যবসায় জুতে দিত। তাইই বলেছিল। জমিজমা বেচে যা হয় নিয়ে ফরিদপুরে বড় জামাইবাবুর কাছে চলে যেতে বলেছিল। ফণি চিরকালই স্বাধীন চিত্তের মানুষ, কুটুম্ব ঘরে যাওয়ার কথা সে ভাবতেও পারে না। একজনের কাছে না যাওয়ার সিদ্ধান্তের পর অন্যজন ডেকেছিল যশোর থেকে। ফণি যায় নি। মনে হয়েছিল

অভিরাম বোস অনেক নির্ভরযোগ্য। অথচ লোকটা তার কে? কেউ না। খুলনা কালেক্টরিতে আলাপ। অমন অন্তঃকরণ ফণি দ্যাখে নি। বিয়ে নিয়ে তার তো অভিরামদাকে বলা উচিত। তিনি কী বলেন শোনা উচিত। এপারে তিনিই তো গার্জেন তার। এই যে কাজটা সে করছে এর মূলেও অভিরামদা। সে গেল, খোকনের মাকে তো বলবে। বউদি কী বলেন শুনত। ফণির মনে হল তার একটু ভুল হয়ে গেছে। আজ যখন গেল বেলগেছেয় অভিরামের বাসায়, অভিরাম বোসকে বলা উচিত ছিল। অন্তত প্রভাময়ীকে। অভিরাম তার বিয়ের কথা অন্যের মুখে শুনবে কেন? তার আশ্রয়দাতা। এপারে চলে এল গোঁয়ারের মতো, মায়ের মৃত্যুও তার বড় একটা কারণ, তখন তো ভরসা ছিল অভিরামই। অভিরামের ভরসাতেই এপারে এসেছে সে। অভিরামই তাকে কাজ দেখে দিয়েছে। এপারে তার আপনারজন কে আছে অভিরাম ব্যতীত। রক্তের সম্পর্কে কেউ এপারে আছে নিশ্চয়, কিন্তু সে জানে না। তার আর কোনও ভাই নেই। ছিল, অকালে মরে গেছে, মায়ের কোলেই। এটা সে মার মুখেই শুনেছিল। এই ঘটনা ঘরে ঘরে। প্রভাময়ীরও মেয়েটা মরে গেছে।

শুয়ে ছিল ফণিভূষণ। এমনিতে রাতে উনুন জ্বালায় না সে। জনতা স্টোভে সকালের তরকারি গরম করে নেয়। চালের দাম বাড়ছে দিন দিন। তাহলেও যে দু'বেলা ভাত খেতে পাচ্ছে, কারণ সে একা। নিশ্চিন্তে আছে। এপারে চালের দাম তো বাড়বেই। ওপার থেকে ধান পান মাছ ফেলে এপারে এসেছে যারা, তাদের সে সব আসবে কোথা থেকে? এপারে কিনে খেতে হয়। ধান চাল কিনতে হয় এ কি ফণিভূষণ জানত? বরং বেচতে পারত ধান। সে ধান তো কিনত কেউ না কেউ। তাদের তাহলে ভাত ছিল না ঘরে। হবেই তো। তাকে কর্জ দিতে হত না চাষাদের? ভাদ্র মাস থেকে অভাবটা জাঁকিয়ে বসত। সেই সময় বন্যাও হত। অতিবৃষ্টি। এই শহরে ভাদ্র মাস নেই, অঘ্রান পৌষও যেন নেই। ফণিভূষণ ভাবল সব কিছু বলবে অভিরামকে। অভিরামদা আপনি আমার গার্জেন। এপারে আমার কেউ আছে বলে জানি নে। একা বেশ আছি। দু'বেলা অন্ন জুটছে। মাছ খাই। মাংস খাই। ইচ্ছে করে ভালো মিলের ধুতি পরতে পারি, আদ্দির পাঞ্জাবি পরি, গায়ে এরপর সেন্ট লাগাব, মুখে হিমানি স্নো দেব। আমি কেন বিয়ে করে ঝামেলায় পড়তে যাব। আমার ওসব ইচ্ছে একদম নেই। তারপর বলছি, হাবলু ছেলে ভালো, কিন্তু পরিবারটা তো এপারে ভেসে আছে। চালচুলো নেই ছেলে মেয়েগুলোর। সব ভার আমার উপর পড়বে, আমি পারব না। আমার ভয় করে। দ্যাখো আমার একা থাকতেই ভালো লাগে। শুনে অভিরাম নিশ্চয় বলবে, তাহলে বলে দাও ফণি, তুমি না পারবে আমি বলে দিচ্ছি, তোমার যদি ইচ্ছে না থাকে কী করে হবে?

ফণিভূষণ ভাবল, অভিরামকে বলা দরকার। কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি উলটোটি হয়। সে তার নিজের মতো করে ভাবছে, অভিরাম তো বলতে পারে, তোমার কোনও ভয় নেই

ফণি, এরা খুব ভালো পরিবার, পার্টিশনে আতান্তরে পড়েছে। আর তোমারও তো কেউ নেই, এপারেই যখন থাকতে হবে, আত্মীয়তা করতে হবে তো ফণি।

হুঁ। ফণিভূষণ মাথা দোলায় একা অন্ধকার ঘরে। তাইই তো। দিদিরা ওপারে, ওপারটা এখন অন্যদেশ। অন্যদেশে মানুষ কি তার আত্মীয় হয়ে থাকবে? থাকতে পারে? কে জানে? ফণিভূষণ বুঝতে পারে, অভিরাম যদি হ্যাঁ বলে সে পিছিয়ে আসতে পারবে না। সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে। অভিরাম তো প্রথম প্রথম বলেছিল তুমি একা, না এলেই পারতে, দিদি জামাইবাবু তো আপনারজন, তার ডেকেছিল, তাদের সঙ্গে থাকতে পারতে ফণি, এপারে তোমার কে আছে?

ফণিভূষণ বলেছিল, আপনি আছেন।

আমি তো তোমার ওয়েল উইশার বলতে পার, কিন্তু আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?

ফণিভূষণ বলেছিল, সবাই বিপদগ্রস্ত, কার কাছে যাব?

না, না যাওয়ার কথা বলছিনে, যোগাযোগ রাখতে হবে তো।

জানি না কারা কোথা থেকে এসেছে, এসেছে কিনা, একা মানুষ সমাজে থাকতে পারে না?

তা পারবে না, সমাজ তো বহুজনকে নিয়ে, তাদের নিয়ে থাকবে।

ফণিভূষণ ভাবে যদি অভিরাম মত দেয় তাকেও মত দিতে হবে। ফেরার কোনও জায়গা থাকবে না তার। এখন কথা বলে লাভ নেই। হঠাৎ তার মনে হল ওপারে দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করলে হয়, গ্রাম মাধবপুর, জেলা ফরিদপুর, পূর্ব পাকিস্তান। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক কি উঠে গেল? সে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু যাওয়া হয় নি। যেতে ইচ্ছেও হয় নি। ওপার থেকে চলে এসেছে, তার অভিমান খুব তীব্র। কিন্তু সেই অভিমান আচমকা ধুয়ে জল হয়ে গেল যেন। মন খুব খারাপ হল। চোখে জল এসে যাচ্ছে। আর কি দেখা হবে না? এখন মনে হচ্ছে ওরা পাশে থাকলে ঠিক হত। কিন্তু কুটুম্বের সঙ্গে থাকবে কী করে সে? দুই জামাইবাবুই খুব চতুর, বুদ্ধিমান। রয়ে তো গেল ওপারে। আর তার গ্রাম খালি হতে লাগল, হিন্দুরা চলে আসতে লাগল, মুসলমান চাষিরা তাদের জমি দখলে নিয়ে নিতে লাগল কখনও অল্প টাকায় কিনে, কখনও জোর করে—এসবই তাকে দেশ ছাড়তে প্রবৃত্ত করল।

পরদিন ফণিভূষণ আচমকা তার মালিক আগরওয়ালজিকে বলল, ভালো লাগছে না, কী যে করি আগরওয়ালজি।

আগারওয়ালজি বছর ষাটের মতো। ধুতি পাঞ্জাবি, কপালে চন্দনের ফোটা, হেসে জিজ্ঞেস করল, কেন ফণিবাবু, কী হল?

ওপার থেকে না এলে হত।

এ কেমন কথা হল, পার্টিশন হয়ে গেল, থাকতে পারতে তুমি?

ফণিভূষণ বলল, আমার দিদিরা তো রয়েছে।

কী করে রয়েছে?

ফণিভূষণের কথা শুনে আগরওয়াল বলল, খুব রিস্ক হয়ে গেছে, ব্যাওসা বড় আছে ঠিক আছে, লেকিন ওখেনে হিন্দু ব্যাওসা করবে কী করে?

করছে তো, এপারে এসে কী করত?

ব্যাওসাই করত।

নতুন করে আরম্ভ করতে হত।

করত, ইনডিয়া তো নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

এদেশে ধান চাল পাটের ব্যবসা হত?

পাট এদিকে কোথায়, সব তো ওদিকে।

ফণিভূষণ বলে, জুটমিল সব এদিকে।

এটাই তো হয়েছে, সব ভুলভাল হয়ে গেছে ফণিবাবু, কিন্তু এর ভিতরেই থাকতে হবে, পাট এদিকেও হয়, কম হয় আরও প্রডিউস করতে হবে, তুমি হঠাৎ বলছ কেন?

ফণিভূষণ বলল, দিদিদের কথা মনে পড়ছিল।

হুঁ, সে তো হবেই, তবে দ্যাখো, হামরাও তো মাড়োয়ার থেকে এসেছি, হামাদের রিলেটিভ সব ওদিকে, বহিন, ভাতিজা—সব।

ফণিভূষণ বলল, কিন্তু সে তো একটাই দেশ আগরওয়ালজি।

আগরওয়াল বলল, একটাই দেশ বটে, কিন্তু কতদূর, তুমি ভাব ফণিবাবু, এদিকে বাতাস কত ঠাণ্ডা, মাটি কত ভিজা, নরম ওদিকে শুধু বালু ওড়ে, মরুভূমি, ডেজার্ট, ডেজার্ট বলে সব বেরিয়ে পড়েছে গাঁও ছেড়ে।

ফণিভূষণ বলে, আপনার সঙ্গে একবার যাব।

আগরওয়াল বলে, হামি ও তোমার সঙ্গে একবার ইস্ট পাকিস্তান যাব, তোমার দিদি জামাইবাবুর ব্যাওসা দেখে আসব, দ্যাখো ফণিবাবু, আমার এক রিলেটিভ কুষ্ঠিয়া থাকত, তারা পার্টিশনের পর করিমপুর চলে এসেছে।

ফণিভূষণের আশ্চর্য লাগল। আগরওয়ালজি বলছে কেন হবে না, ব্যাওসায়ী কি ঢাকায় ছিল না, রাজশাহী খুলনায় ছিল না, তারাও তো আসবে, পাকিস্তান ভাগ হল তো ওয়েস্ট পাকিস্তানের লোক বিজনেস করবে বলে, ঢাকায় তো ইস্পাহানির বড় বিজনেস আছে।

ফণিভূষণ শোনে। কিছু ধরতে পারে, কিছু পারে না। তবে এটা জেনেছে পার্টিশন ঠিক হয় নি। জুটমিল আর জুট একজায়গায় থাকল না। এক জায়গায় রাখতে গেলে চব্বিশ পরগণাও পাকিস্তানে ঢুকে যেত। নৈহাটি ভাটপাড়া, বারাকপুর, সোদপুর, পানিহাটি অবধি পাকিস্তান চলে আসত। তখন? মুসলিম লিগ তো কলকাতাও চেয়েছিল। কলকাতা

এপারে আসতে পূর্ব পাকিস্তান অনেক কিছু হারিয়েছে, আবার ঢাকা খুলনা ওপারে চলে যেতে ইন্ডিয়া, পশ্চিমবঙ্গ কি অনেক কিছু হারায় নি? হিন্দু মুসলমান—দু'পক্ষেরই ক্ষতি হয়েছে অনেক, তবে কেউ কেউ যে লাভ করে নি তা নয়। যারা জমি দখল করে নিয়েছে, যারা বাড়ি দখল করে নিয়েছে পার্কসার্কাসে ঢাকায়, তারা লাভ করেছে।

ফণিভূষণ বলল, আচ্ছা আগরওয়ালজি, আমার কি বিয়ে করা দরকার?

আগরওয়াল বিস্মিত দৃষ্টিতে ফণিভূষণের দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝতে চাইছে সে প্রশ্নটা। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, এটা তো তোমার ডিসিশন ফণিবাবু।

ডিসিশন নিতে পারছি না।

যা ইচ্ছে হয় করো, মানুষের তো একটা সাধ থাকে।

আমার কোনও সাধ নেই আগরওয়ালজি।

তবে এসব কথা বলছ কেন, সাধ না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারে?

প্রেপোজাল আসছে যে, কী করব?

আগরওয়াল হাসে, বলে, কত লোক তো শাদি না করে আছে, চিফ মিনিস্টারের বিয়ে হয় নি, পি. সি. সেন-এর বিয়ে হয় নি, এরা সব ফ্রিডম ফাইট করতে গিয়ে শাদি করতে পারে নি, তুমি যা ডিসিশন নেবে নিজে নিয়ো।

নিতে পারছি না।

তার মানে তুমি শাদি করতে চাও, লেকিন তুমি ডর খাচ্ছ, তোমার ভয় হচ্ছে ফণিবাবু, ভয়ের কী আছে?

ফণিভূষণ বলল, যদি মেয়ে দেখে পছন্দ না হয়।

হা হা করে হাসে আগরওয়ালজি, কী যে কথা তুমি বলো ফণিবাবু, তোমার কি আর কোনও কথা নেই।

লজ্জিত হল ফণিভূষণ। বুঝতে পারছে এই কথা আগারওয়ালজির কাছে বলা ঠিক হয় নি। ওরা খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যা করতে চায় তা করার জন্য ঝাঁপায়, আবার যা অপছন্দের, সিদ্ধান্ত নিয়ে সরে আসে তা থেকে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তার কম। মনের দিক দিয়ে দুর্বল হয়তো। কিন্তু তাও যে সত্য, তেমন নয়। এপার থেকে আসার সময় আনে নি, আনতে পারে নি কিছুই, তবুও তো এসেছে। সে টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছে। আসার সময় ভেবেছিল হাবড়া, মসলন্দপুর, বনগাঁর দিকে জমি কিনে ওপারের মতো এপারে বসতি গড়বে। কিন্তু কলকাতা শহর তাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত বদলের দিকে নিয়ে গেছে। গ্রাম থেকে বেরিয়ে আবার গ্রামে ফিরতে চায় নি সে। বীরাঙ্গনা মাসির কথাটি সত্য, গাঁ থেকে না বেরোলে চোখ ফোটে না। জমিজমা বসত ভিটে মায়ের আঁচলের মতো। মা জাহ্নবীর মতো। তার কোল বড় সুখের বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো একাই হতে হয়। সে কোলও সরে যায় একদিন। তার মাও গেছে। সে চুপ করে বীরাঙ্গনা মাসি, মা জাহ্নবী, মধুকবি, কপোতাক্ষতীরের কাহিনিটি স্মরণে আনতে লাগল।

ছাব্বিশ

ফণিভূষণ আর কোন কথাই বলতে পারল না। তার সংকোচ লাগছিল। কোন দূর মাড়োয়ার থেকে আগরওয়ালজির দূর সম্পর্কের দুটো লোক এসে পড়ে আছে তাঁর বাড়িতে। তাদের নাম বীরেন্দ্র আর সুরেন্দ্র। তারা দুই ভাই নয়, একই গাঁয়ের মানুষ। আগরওয়ালজি তাদের পরিচয় দিয়েছিল ফণিভূষণের কাছে। খুব গরিব লোক। আবার ওদিকে অনাবৃষ্টির জন্য দু'বছর 'খেতি'তেও কিছু সুবিধে হচ্ছেনা। পায়ে হেঁটে, মোটরে চেপে, তারপর ট্রেন ধরে তারা কলকাতা চলে এসেছে। গঙ্গায় ডুব দিয়েছে, আগরওয়ালজির কাছে এসে পড়েছে। এসেছে যখন তাকে ভরসা করে, ওদের বাঁচাতে হবে তো। ছ'মাসে তারা একটু একটু বাংলা শিখে গেছে, 'বাতচিত' করছে এখন। একজন শুধু এই বাজার থেকে জামাকাপড় নিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে হাওড়ার মঙ্গলা হাটে গিয়ে বেচে আসে। অন্যজন একটু সরল। তাকে দু'বার ঠকিয়েছে ঠগবাজ। কলকাতা শহরটা কি সিধা আছে আর?

কেন আগরওয়ালজি, ঠগবাজ কি নেই আর কোথাও, তোমার দেশে?

আগরওয়াল বলেছিল, ইয়ে ভি হামারা দেশ, দেখ ফণিবাবু, বাঙালি একটা ভুল করে, বাংলা ছাড়া আর কোথাও নিজের দেশ আছে তা ভাবতে পারে না, হামরা কিন্তু পুরা ইনডিয়া হামাদের দেশ ভেবে নিই।

ফণিভূষণ কথাটা স্বীকার করে নিয়েছিল। তারপর আগরওয়াল বলেছিল, বহুৎ জায়গায় বাঙালি আছে, এখন পার্টিশন হয়ে বাঙালি বুঝতে পারছে ওভাবে চলবে না।

ফণিভূষণ মাথা দুলিয়েছিল, হুঁ, দিল্লিতে কত বাঙালি।

দিল্লির বাঙালি বহুৎ পুরানো বাঙালি ফণিবাবু, যবে থেকে ক্যাপিটাল চলে গেল কলকাতা থেকে দিল্লি, বাঙালি কলম নিয়ে গেল দিল্লি, লিখে দেবে কে? সায়েবদের চেয়েও সায়েবদের ভাষা বাঙালি ভালো লিখে, বড়িয়া আদমি আছে, টেগোর, সুভাষ বোস...।

তারপর আগরওয়াল বলেছিল পার্টিশনের পর কলকাতা টাল খেয়ে গেছে ফণিবাবু। বেঙ্গল টাল খেয়ে গেছে। অত রিফ্যুজি এল, অত মানুষ গাঁ ছেড়ে, ঘরবাড়ি ছেড়ে, ব্যাওসা খেতি ছেড়ে চলে এল এপারে, তাদের বড় অংশ ঢুকল কলকাতায়, একটু গোলমাল হবেই, আবার বিহার, ওড়িশা মুলুক থেকে লোক তো আসেই, হামার মাড়োয়ার থেকে লোক আসছে, কলকাতায় আদমি শুধু এসেই যাচ্ছে।

হ্যাঁ এসে যাচ্ছে। কত দূর দেশ থেকে লোক আসছে তো আসছেই। যবে এল জোব চার্নক, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ইংরেজ, তারপর থেকে এসেই যাচ্ছে। যত জেলা আছে সব জায়গা থেকে আসছে তো আসছেই। একজন এলে তার পিছু পিছু দশজন আসে।

এমন এলে দু'পাঁচটা ঠগবাজ কি ঢুকবে না? ঢুকছে তাই। সুরেন্দ্র একেবারে বোকা বনে গেছে।

আগরওয়ালজি বলল, নিজে নিজে ডিসিশন নাও ফণিবাবু।

হ্যাঁ তাই নিতে হবে তাকে। তারজন্য যদি বীরাঙ্গনা মাসি মন খারাপ করে তাকে ত্যাগ করে, মানে তার দমদমের বাসায় আর না আসে? ফণিভূষণ ভয় পাচ্ছে অতবড় পরিবার তার কাঁধে এসে চাপবে তাই। মাসি তা বুঝবে না।

সন্ধেবেলায় কাজ থেকে বেরিয়ে এগোতে সুরেন্দ্রর সঙ্গে দেখা হল। লোকটার গা থেকে এখনও মাড়োয়ারের গাঁয়ের গন্ধ যায়নি। লোকটার বিস্ময়ও যায় নি। আগে তো একদম কথা বলত না প্রায় ছ'ফুট লম্বা শীর্ণকায় সুরেন্দ্র, এখন মুখ ফুটছে বাংলাটা বুঝে নিতে নিতে। সুরেন্দ্র তার সঙ্গে হাঁটছে, বলছে হামি যদি যাই, দেখে আসি আপকি ঘর, দমদমা তো?

ফণিভূষণ বলল, ফিরবে কী করে?

বস, বসে তুলে দিবে।

বস—বাস তো এখান থেকে সরাসরি নেই।

হ্যায়, আপতো একদিন বোলা, বলেছিলে না।

মনে রেখেছে। এগারো নম্বর বাস দমদম থেকে হাওড়া স্টেশন যায়। ওই বাসে করে চিৎপুর ট্রাম লাইন আর হ্যারিসন রোডের ক্রসিং-এ নেমে যেতে পারে সুরেন্দ্র। তারপর উত্তর দিকে হাঁটবে একটু। ফণি এই পথে আসে। তবে হাঁটতে হয় খুব বেশি। তার চেয়ে দমদম থেকে কোনাকুনি মিনিট কুড়ি হেঁটে বেলগেছে চলে এসে ট্রাম ধরা সুবিধাজনক। চিৎপুর দিয়ে ধর্মতলা আর ডালহৌসি স্কোয়ারগামী ট্রাম ধরে ঠুং ঠুং করতে করতে একেবারে কাজের জায়গায় নেমে পড়া কত সহজ। পথে রবিঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়ি পড়ে। ফণিভূষণ রোজ একবার করে নমস্কার করে। বোঝে, নমস্কার অথবা প্রণাম করার মতো জায়গাই বটে। বীরাঙ্গনা মাসি বলেছিল রবি ঠাকুরের বাড়ি দেখবে, বলেছিল তার ঠাকুর্দা। মাইকেল মধুসূদনের সমাধি দেখবে পার্ক স্ট্রিটে। ফণিভূষণ কথা দিয়েছে। কিন্তু মাসির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে মাসি কি তার সঙ্গে পার্ক স্ট্রিট যাবে? মাসি না গেলে মাইকেল মধুসূদনের কবরে গিয়ে সে কী দেখবে? খ্রিস্টানদের আর মুসলমানদের কবরস্থান কি সে আগে দ্যাখে নি? কেমন গা ছমছম করে, অস্বস্তি লাগে।

সুরেন্দ্র বলল, হ্যাঁ ফণিবাবু, কী ব্যাওসা করা যায় বলো।

ফণিভূষণ হেসে ফেলে, তোমরা বিজনেস করেই বিখ্যাত, আমার বাগেরহাটের গাঁয়ে পর্যন্ত মাড়োয়ারি দোকান খুলেছিল, আর বাঙালি তো ঘর থেকে বেরোয় না, কী বলব?

সুরেন্দ্র হাসল, কিছু না বলে চুপ করে থাকল, তারপর আচমকা জিজ্ঞেস করল, শাদি কোন মাহিনায়?

কেন? চমকে যায় ফণিভূষণ, জিজ্ঞেস করে, তুমি কী করে জানলে?

সুরেন্দ্র বল, শুনা হ্যায়, হামি শুনলাম, দেখ ফণিবাবু হামার তো বহু বেটা সব গাঁও তে রয়ে গেছে, হামি যদি ব্যাওসা ঠিক মতো করতে না পারি, হাম কেয়া করে গা বোলো, সুবিস্তা হচ্ছে না।

ফণিভূষণের মনে হল সুরেন্দ্র লোকটি ভালো। ওর সঙ্গের বীরেন্দ্র কিন্তু খুব চৌখশ, খুব চতুর। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যাবে। আচ্ছা চতুর, আর চৌখশ লোক কি ভালো হয় না? বেঁচে থাকতে হলে চৌখশ আর চতুর না হলে চলে? ব্যবসা করতে হলে তো তা হতেই হবে। না হলে এই সুরেন্দ্রর মতো ঠকতে হবে। কত লোক শুধু কথা বেচে মাথা বেচে খায়। তাকে বলে দালালি। বীরেন্দ্র লোকটা খুব কথা বলতে পারে। সুরেন্দ্র মুখ চোরা।

রাতে থাকল সুরেন্দ্র। বলল, দেখ ফণিবাবু, হামার বড়বাজার কী অর দমদম কী, সবই তো এক হল, বহুৎদিন হল কোনও খবর নাই, খত পাঠালাম, জবাব নাই, হামার মনে হচ্ছে ফিরে যাই।

কাজে এসেছ, ফিরে যাবে?

কী করব বলো, ফেমিলির জন্য মন খারাপ লাগে, বেটা বেটি বহু মা বাবা ভাই বহিন, খুব বড় ফেমিলি হামার।

ফণিভূষণ অবাক, বলল, কত ছেলে মেয়ে?

দুই লেড়কির পর দুই লেড়কা, এক লেড়কি মরে গেল, না হলে পাঁচ হত, মন ভালো লাগে না।

ক'ভাই?

হামরা পাঁচ ভাই চার বহিন, দো বহিনের শাদি হয়েছে, এখনও দো বহিন বাকি আছে, দো বহিনের শাদি হয়ে যেতে যেতে হামার লেড়কি বড় হয়ে যাবে।

তুমি বড় ভাই?

হ্যাঁ ফণিবাবু।

ভাইরা কী করে?

দোকান করে এক ভাই, খেতি করে দুই ভাই, পিতাজি হঠাৎ পড়ে গেল, এখন আর চলাফিরা হয় না, আর ভাইরা ছোট আছে।

বহিনরা লেখাপড়া করে?

নেহি ফণিবাবু, শাদির জন্য বসে আছে।

সব ভার তোমার উপর?

হ্যাঁ ফণিবাবু, লেকিন ই মুলুকে তেমন কিছু হচ্ছে না।

একেবারে ফেল মারছ?

সুরেন্দ্র বলল, বহুৎ কম, বীরেন্দ্র দশ রূপিয়া পেলে হামি এক রূপিয়া পাচ্ছি, হামার রূপিয়া চলে যাচ্ছে, ফেমিলিতে কী পাঠাব?

ফণিভূষণ বলল, ও মুলুকে কাম কাজ নেই?

মাথা নাড়ে সুরেন্দ্র, বলল, মেজভাই দুকান করল, হামি মুলুক ছাড়লাম, হামার তো ফেমিলি হয়ে গেছে, লেড়কা লেড়কি সব আছে, মেজভাই-এর শাদি হল সবে, মেজভাই তো গাঁও ছাড়তে পারে না।

বোঝা গেল। মেজভাই-এর সন্তানাদি হোক। বিয়েটা ভোগ করুক, তারপর সে বেরোবে, দু'তিন সাল লাগবে কম করে। সুরেন্দ্র বলল, দো তিন সালে কী হয় ফণিবাবু?

তোমার ক'সাল বিয়ে হয়েছে?

দশ সাল, হামাকে তো কতদিন মুলুক ছাড়ার কথা বলছিল সব, হামি তো ছাড়তে পারি নি, ফেমিলি ছাড়া যায়?

ফণিভূষণ অবাক হয়ে যাচ্ছিল। আশ্চর্য। সুরেন্দ্রকে দেখলে মনে হয়না লোকটার ভিতরে এত কথা আছে। ফণিভূষণ ওর মুলুক দ্যাখে নি। কোনও একটা সিনেমায় দেখেছিল বটে মরুভূমি, কিন্তু শুনেছে তার শ্যুটিং এদিকে সমুদ্রের ধারে বালি মাটিতে হয়েছে। বালিয়াড়িতে। মেদিনীপুরে অমনি আছে। ছবি তুললে মনে হব মরুভূমি। ফণিভূষণের মনে হয় ওর দেশে একবার যায়। উট আছে ওদের দেশে। সুরেন্দ্রদের একটি উট পড়ে মারা গেলে হঠাৎ। খুব ক্ষতি হয়ে গেছে। সুরেন্দ্রর দেশে ফসল বলতে জোয়ার, মকাই, গেঁহু খুব অল্প, অড়হরও তাই। ফণিভূষণের কাছে নিজের বুকের বন্ধ দরজা খুলে দিচ্ছিল সুরেন্দ্র।

আগে এলে তুমি এতদিনে দাঁড়িয়ে যেতে।

হুঁ, এখন তো রিফ্যুজি এসে গেছে বহুৎ।

আমিও রিফ্যুজি। ফণিভূষণ বলে। বলার পর সুরেন্দ্রকে বোঝাতে হয় রিফ্যুজি কী? পার্টিশন কী? সুরেন্দ্র শুনতে শুনতে বলে, আগে ই মুলুকে অনেক উপায় ছিল, এখন রিফ্যুজি এসে যাওয়া কাম কাজ নিয়ে টানাটানি পড়ে গেছে তো।

ফণিভূষণ বলে, ব্যবসায় তা হবে কেন।

হবে ফণিবাবু, তুমি ব্যাওসা করবে না?

দেখি কী করা যায়।

এরপর কবে করবে? সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করে।

ফণিভূষণ বলে, ভয় করে?

কিঁউ?

যদি ফেল মেরে যাই।

বাঙালি কি ব্যাওসা করে না?

কেন করবে না, আমার জামাইবাবু করছে তো, দুই জামাইবাবু।

তবে তুমি করলে না কেন?

ফণিভূষণ বলল, আমি অত ঝামেলায় যেতে চাই না।

ব্যাওসা কি ঝামেলা হল?

ফণিভূষণ বলল, আমার মন চায় না।

তুমি কুঁড়ে আছ? আইডিল ম্যান।

ফণিভূষণ বলে, আমাকে দেখলে কি তা মনে হয়?

নেহি, লেকিন তুমি যে ব্যাওসায়ীর করমচারি হয়ে থাকতে চাও, এইটায় হামি অবাক হয়ে যাই ফণিবাবু।

ফণিভূষণ বলে, ইংরেজ লেখাপড়া শিখিয়ে এই করে গেছে সুরেন্দ্র।

হামার মুলুকে লিখাপড়া করা আদমিও ব্যাওসা করে, ফিমিলিতে একজন ব্যাওসা, একজন গরমেন্ট সার্ভিস, এক আদমি আরমি—ইমন হয়।

শুনে অবাক হয়ে গেল ফণিভূষণ। ব্যবসা, সরকারি চাকরি, আরমি—সব দিকেই আছে। আছে বলে এইভাবে পারে। সে তো ছিল বাগেরহাটের গ্রামে, তার যাতায়াত বড় জোর খুলনা শহর অবধি, তার বেশি নয়। এতরকম ভাবত কী করে?

সুরেন্দ্র বলে, বঙ্গালি ঘর ছাড়তে চায় না।

হুঁ। মনে পড়ে গেল বীরাঙ্গনা দাসীর কথা। কথাটা সত্য আবার সত্যও নয়। ঘর কি ছাড়ে নি বাঙালি? বাঙালির ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়..., চাঁদ সওদাগর, ধনপতি সওদাগর? কিন্তু এসব সুরেন্দ্রকে বলে কী হবে? সে বুঝবে না। বাঙালির ছেলে মধু কবি? শ্রী মধুসূদন? ঘর ছেড়ে নিঃস্ব হয়ে কত বড় কাজ করে অনাহারে বিনি চিকিৎসায় মরে গেল? বাঙালি ঘর কেন ধর্মও ছাড়তে পারে। ফণিভূষণ বলতে চায়, বাঙালির চারপাশে কোনও দেওয়াল থাকতে পারে না সুরেন্দ্রবাবু, ঘর যে ছাড়ে একেবারে ছাড়ে, মাকে ছেড়ে কপোতাক্ষ সাগরদাঁড়ি ছেড়ে মধু যে গেল, আর কি ফিরেছিল? ফিরতে পেরেছিল? কিন্তু আর সবাই তো মুলুক থেকে বেরিয়ে মুলুকের কথা ভেবে রাতভর ঘুমোয় না। ফণিভূষণ হাত রাখল সুরেন্দ্রর পিঠে, বলল, চা, চা পিবে সুরেন্দ্রবাবু?

সাতাশ

সুরেন্দ্রর সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগছিল। মাড়োয়ারের খুব কাছে নয় রাণা প্রতাপের মেবার কিন্তু যতদিন যাচ্ছে কাছে এসে যাচ্ছে। এইরকমই তো হয়। মানুষ যত বুঝতে শেখে, লেখাপড়া শেখে, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করে, তত বোঝে কে তাদের

নিজের জন। ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ হয়ে থাকা রাজপুতানা এখন এক হয়ে গেছে। সুরেন্দ্র বলে, রাণা প্রতাপ তাদেরই রাণা ছিলেন। মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে সমস্ত জীবন যুদ্ধ করে গেছেন। তারা যোদ্ধার জাত। ব্যবসা যেমন করে, আর্মিতেও যায় কতজন। তার একটা ভাই যাবে আর্মিতে, তা ঠিক আছে। পিতাজি বলে দিয়েছে। তার বয়স এখন চোদ্দ, আঠেরো হলেই রওনা হবে। বারান্দায় বসে এই সব শুনতে শুনতে ফণিভূষণ বলে, আমরা কলম পেষার জাত।

হাঁ, হামি জানি। সুরেন্দ্র বলে, হামার পিতাজি বারাসত-এ সাত বছর ছিল, পরে বিমারিতে পড়ে গেল, দুকান বিক্রি করে মুলুকে ফিরে গেল, থাকলে এ মুলুকে হামাদের বড় ব্যাওসা হই যেত ফণিবাবু।

ফণিভূষণ বলল, ইংরেজ আমাদের লেখাপড়া শিখিয়ে এইসব করে দিল, কেউ কেউ অবশ্য আলাদা ছিল।

লিখাপড়া কি খারাব আছে?

না সুরেন্দ্রবাবু, কিন্তু আমাদের সব সাহস গিয়ে কলমের ডগায় জমা হল।

মতলব? সুরেন্দ্র কথাটা বুঝতে পারল না দেখে ফণিভূষণ তাকে বোঝাতে থাকে। শুনতে শুনতে সুরেন্দ্র বলে, যে আদমি কলম নিয়ে থাকে, ডর লাগে তাকে, কিঁউ, না, কলম দিয়ে কী লিখে দেবে, দশ রুপয়াকে বিশ রুপয়া করে দেবে, কেউ কিছু সমঝ্তে পারব না।

ফণিভূষণ হাসে, বলে, পার্টিশন আমাদের কোমর ভেঙে দিয়েছে।

মতলব?

বোঝায় ফণিভূষণ। খুব তাড়াতাড়ি বুঝে যায় সুরেন্দ্র। লোকটা একেবারে ভ্যাবলা নয়। দেখলে মনে হয় বোকা, তা নয়। বোকা হলে এতদূর আসতে পারত। ভীরুও নয়। ভীরু হলে অচেনা মুলুকে এসে পড়ে থাকত? বরং সাহস অনেক বেশি। বাঙালি এভাবে বেরোতে পারে না। পাটিশনের পর অবশ্য বাধ্য হয়েছে ঘরের বাইরে ঘর খুঁজতে যেতে, দণ্ডকারণ্য, আন্দামান— সব জায়গায় গেছে। ক্যাম্পে পড়ে আছে। রাস্তায় ফুটপথে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, রেল লাইনের ধারে, জলাজমি দখল করে মনুষ্যোপযোগী করে তুলে সেখানে—বাধ্য হয়েছে সাহসী হতে। পার্টিশন না হলে কী হত এ জাতির?

সুরেন্দ্র বলে, দেখো ফণিবাবু, হামাদের বহুৎ সাল ধরে যুধ করে যেতে হয়েছে। সেই মোগল আমল থেকে, তারও আগে থেকে নিজেদের ভিতর, পানি ক্ষেতির জন্য যুধ করতে হত, কোথাও যদি বেশি পানি থাকে, ক্ষেতির রকম জমিন থাকে, যুধ করে দখল নিতে যেত পিতাজি দাদাজিরা, সমঝতা?

হ্যাঁ, তোমরা পার, তোমাদের সাহস আছে বলে এতদূরে এসে বসে থাকতে পার ফ্যামিলি ছেড়ে, আমরা পারব না।

সুরেন্দ্র বলে, ই তো করনা হোগা ফণিবাবু, জীবন তো যুধই বটে, যুধের সময় কি আদমি ঘরে বসে থাকে, তাকে পাহাড় জঙ্গলে যেতে হয়, মরুদেশ পার হতে হয়, সমঝতা?

সুরেন্দ্রর কথা শুনতে শুনতে ফণিভূষণ শিহরিত হল। যে সুরেন্দ্রর মুখ দিয়ে বাক্য বেরোয় না তার ভিতরে এমন আশ্চর্য কথা। সুরেন্দ্র বলে, যারা যুদ্ধ করে, যুদ্ধই করে যেতে হয়, তারা যুদ্ধ থেকে ফেরে না কখনও না জিতে। ভয়ে পালিয়ে যায় না। তার দেশের মানুষ এইটাই জানে। জানে বলে ঘর ছেড়ে বেরোতে পারে। এইসব কথা তার পিতাজির। ছোটবেলা থেকে পিতাজির মুখে এই রকম কথাই শুনেছে সে। বড় ফ্যামিলির মাথায় থাকা মানে যুদ্ধের সেনাপতি হয়ে থাকা। শুনতে শুনতে ফণিভূষণ জিজ্ঞেস করে, এতগুলো মানুষ তোমার দিকে চেয়ে থাকে, তাতে তোমার চিন্তা হয় না?

সুরেন্দ্র বলে, জরুর হয়, লেকিন ওই সব নিয়ে থাকে যে তাকে তো ঘর গেরস্তি নিয়ে থাকতে হবে ফণিবাবু, ঘরে বসে থাকতে হবে, তাতে কি কোনও সুখ আছে? লেড়কা লেড়কি, বহু, ভাই বহেন পিতাজি মাতাজির জন্য গাঁও-এর জন্য মন খারাব হবে ঠিক, কতদিন তাদের সঙ্গে দেখা হয় নি, বাতচিত হয় নি।

তবে, দেশ থেকে ঘুরে এস।

নেহি, তা হয় না, অমন হলে ই মুলুকে হামার থাকা হবে না।

ফণিভূষণ যত কথা বলছে এই লোকটার সঙ্গে, তত অবাক হচ্ছে। অভিভূত হচ্ছে। কতবড় ফ্যামিলির ভার কাঁধে নিয়ে লোকটা চলে এসেছে এত দূরে। ব্যবসায় ঠিকঠাক দাঁড়াতেও পারছে না। কিন্তু দাঁড়াবে। সেই প্রতিজ্ঞা নিয়েই তো এসেছে। আশ্চর্য। সুরেন্দ্র তাকে হঠাৎ ধরল কেন পথে, সঙ্গে এলই বা কেন? এই লোকের সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য আছে। কিন্তু কোথায় যেন মিলও...। তা কী করে হবে? সুরেন্দ্রর পুরো পরিবার আছে, গাঁ আছে, জেলা আছে, তার এসব কিছুই নেই। তবে? সুরেন্দ্র বলছে, 'ই মুলুক, এই বেঙ্গল, বাংলাদেশ কত ভালো। কত পানি কত শব্জি, কত চাওল হয় ই মুলুকে। তার মুলুকে পানিই নেই। আশমানে মেঘই আসে না প্রায়। পিনে কা পানি আনতে চার মাইল যেতে হয়। যে মুলুক যেমন, কিছু করার নেই। এ মুলুক এমন হয়েছে গঙ্গা মাঈর কিরপায়। তাদের মুলুকে সরসোয়াতি (সরস্বতী) নদী বালুর নিচে চলে গেছে বলে এত পানির অভাব।'

শুনতে শুনেত ফণিভূষণ সুরেন্দ্রর হাত ধরে ফেলে, বলে, তুমি ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে, আমরা যুদ্ধ জানি না সুরেন্দ্রবাবু, তোমরা জান।

সব আদমি যুধ জানে, জানে না এ হতে পারে না।

ফণিভূষণ জিজ্ঞেস করে, তোমাদের দেশ দিয়ে সরস্বতী নদী গিয়েছিল?

হুঁ, শুনা যায়, মরুদেশে হারায়ে গেছে।

ফণিভূষণ বলে, যমুনা তো দিল্লিতে?

হাঁ, গঙ্গা হরদুয়ার, ইলাহাবাদে ভি আছে, ইদেশেও আছে।

ফণিভূষণ বলল, আমাদের যত নদী, বেশির ভাগ ইস্ট পাকিস্তানে ঢুকে গেছে, ভৈরব, রূপসা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, শীতলক্ষ্যা, এসব তো বটে, সঙ্গে কপোতাক্ষ নদ, কপোতাক্ষ নাম শুনেছ?

মাথা নাড়ে সুরেন্দ্র, নেহি।

ফণিভূষণ তখন বিদায়ঘাট আর কপোতাক্ষর কথা বলে। চুপ করে শুনতে থাকে সুরেন্দ্র। শুনতে শুনতে বলে, তাকে রাস্তার অনেকটা পর্যন্ত এসে বিদায় দিয়েছিল বউ বেটি বেটা, পিতাজি। তার সঙ্গে ভাই এসেছিল বাস রাস্তা পর্যন্ত। বাস আসতে দেরি করেছিল। তার দেশে নদী নেই। বিদায়ঘাট হবে না। আর কাম কাজে আসছে সে। আঁশু গিরলে হবে? চোখের পানি কেন পড়বে? পড়লে যে অকল্যাণ হবে।

ফণিভূষণ ভাবে কথাটা ঠিক। আর মধুর কথা এ বুঝবে না। ধর্ম ভীরু মানুষ সুরেন্দ্র। হিন্দু তার 'ধরম' ছেড়ে খ্রিস্টান হয়েছে শুনে দু কানে আঙুল দেবে। মানুষটা বেশ স্বাস্থ্যবান। ও দেশের মানুষ এমনিই হয়। ফণিভূষণ দেখেছে সে ঘাড়ে করে জামা কাপড়ের গাঁটরি নিয়ে যাচ্ছে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। সকালে প্রত্যেকদিন পুজো করে বেরোয়। এখানে এসে সিংহবাহিনীর ছবি কিনেছে। তাতেই সে ফুলচন্দন দেয়। ফণিভূষণ সুরেন্দ্রর মুখে যুদ্ধের কথা শুনে অবাক হয় বারবার। সুরেন্দ্র বলে, যুধ সবাই জানে ফণিবাবু, শিখাতে হয় না, তুমি কি লড়াই করো না?

কে জানে তার জীবন যুদ্ধের কিনা। নিশ্চুপ হয়ে ফণিভূষণ মনে মনে কথা বলতে থাকে। যুদ্ধ সে জানে না কিন্তু যুদ্ধ তো করছেই। সেই কবে থেকে। ঠিকই বলেছে সুরেন্দ্র, মা চলে গেলে মেজদি বাপের বাড়ি তাঁতিপাড়া গ্রামে তার খুড়তুতো ননদকে নিয়ে এসেছিল মায়ের কাজে। একটু মোটাসোটা আদুরে যুবতী সেই ননদ। খুব গায়ে পড়া। শুধু দুধ ঘি খায়, নড়ে বসে না। বস্ত্র ব্যবসায়ী বাপের বাড়ি। একটি মেয়ে তাদের। সে ফণিকে বলল, তুমি একা থাকবে ফণিদা, তোমার ভয় করে না, এ বাড়িতে তোমার মা মরল যে?

ফণিভূষণের মাথা নেড়া। সেদিন নিয়মভঙ্গে আত্মীয় স্বজন নিমন্ত্রিত। তারই ভিতর যখন আড়াল পায় সে বলে, তুমি এখেনে থেক না গো, যশোর চলো, ইস এই গাঁয়ে কেউ থাকে, আমি পারব না থাকতে।

ফণি তাকে যত এড়ায়, সে তত তাকে ঘিরে ধরে। মনে হয় মেজদি সব শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছিল। আর মেজদিকে চাপ দিয়েছিল দাদাবাবু। মেজদি তাকে বলল, ঠিকই তো বলছে মিনু, তুই এখেনে থাকবি কেন, যশোর চ সব বেচেবুচে।

তখনও পার্টিশান হয়নি। শ্রাবণ ভাদ্রে তা হল, এ হল আগের শীতের কথা। দেশ যে ভাগ হবে তা শোনা যাচ্ছিল। আর খুলনা যশোর ইন্ডিয়ায় থাকবে তাও বলাবলি

হচ্ছিল। মেজদি বলেছিল, থাকুক না থাকুক, তোরে সংসার করে দিই যশোরে, দিনকাল ভালো না, শহরে থাকলে ভয় কম, আর তোর দাদাবাবুদের ওখেনে খুব প্রতিপত্তি।

ফণিভূষণ এড়িয়ে যাচ্ছিল ক'দিন ধরেই। তার অবাক লাগছিল। দুঃখও হচ্ছিল মা উপরে গেছে তা নিয়ে কোনও কষ্ট নেই, ওই সময়ে তার বিয়ের ঠিক করতে এসেছে যেন মেজদি সুষমা। মেজদি বলছিল ওদের বড় ব্যবসা, সব ওই মেয়ে পাবে, ওর বাবা কাপড়ের মিল করবে বলছে, কাপড়ের অভাবের সময় খুব লাভ করেছে, ভাই-এর জীবন কেটে যাবে শ্বশুরের পয়সায়।

ফণিভূষণের মনে পড়ল, মুখ তুলে বলল, সুরেন্দ্রবাবু, একবার খুব কাপড়ের অভাব হয়েছিল এদিকে, তোমাদের ওদিকে হয়েছিল?

কাপড়ার অভাব, নেহি তো, কব?

সুতোর অভাবে আমাদের তাঁতিপাড়ার সব তাঁত বন্ধ হয়ে গেল।

সাচ্! কব হুয়া?

স্বাধীনতার আগে, ওয়ার এর সময়।

হামাদের তো জানা নেই।

চোখ বুঁজে আছে ফণিভূষণ। বছর চোদ্দ আগের কথা স্পষ্ট চোখের সামনে ভাসছে। সে বিড়বিড় করল, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ হয়ে গিয়েছিল।

মতবল?

ফণিভূষণ বোঝায়। মাথা দোলায় সুরেন্দ্র, বলে, বড় বাজারে তো কত কাপড়ার দু'কান, ছিল না?

খুলনা, বাগেরহাটে দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কিঁউ?

ফণিভূষণ বলল, কেউ বলে কাপড় সাপলাই ছিল না, কেউ বলে কাপড় সরিয়ে দিয়ে ছিল, ব্ল্যাকে বিক্রি হচ্ছিল, মোটা কাপড় ছিল না, খুব দামি কাপড় ছিল, কী হয়েছিল অত আমি জানি না।

কাপড়া সব গেল কুথায়।

মিলিটারি নিয়ে নিচ্ছিল বলে, শোনা কথা।

তাজ্জব! কলকাতায় ইতনা কাপড়ার স্টক, মঙ্গলাহাট দেখো, হরি সা'হাট, দেখো পুরা ইনডিয়ার কাপড়া সাপলাই হচ্ছে হরি সা' হাট মঙ্গলাহাট থেকে, ইদিকে ঘরে ঘরে কাপড়া অমিল, ক্যায়সে হুয়া?

ফণিভূষণ ধীরে ধীরে বস্ত্রের আকালের দিনগুলোর কথা বলতে থাকে। তার আগে দুর্ভিক্ষ গেছে। সেই দুর্ভিক্ষের সময় আশ্বিন মাসে মহাপুজোর দশমীর দিনে ঝড় গেছে। প্রলয় ঝড়। নদী উঠে এসেছিল গাঁয়ের ভিতর। একটা গাঙ আর একটা গাঙে ঢুকে

পড়ছিল। দুর্ভিক্ষ ফুরোতে ফুরোতে কাপড়ের আকাল এল। এসব কি সুরেন্দ্র জানে? জানে না। ফণিভূষণের সঙ্গে যার বিয়ের ঠিক করছিল তার মেজদি, যেখানে তার ঘর জামাই হয়ে থাকার কথা হয়েছিল, তারা ওই মন্বন্তরের সময়ে চাল আর কাপড়ের ব্যবসায়ে প্রচুর মুনাফা করেছিল। ওদের আসলে ছিল পাটের ব্যবসা। চালের কারবার করল তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়। আর কাপড়ের কারবার করল কাপড়ের আকালের সময়। মেজদি আর দাদাবাবু খুব রসিয়ে বলেছিল তাকে।

সুরেন্দ্র বলল, তোমার ঘরে?

বিধবা মা, তার কাপড় জোগাড় হয়েছিল, আমাদের অবস্থা ভালো ছিল আমাদের উপায় হয়েছিল, কিন্তু পুরো গাঁ ল্যাংটো হয়ে গিয়েছিল?

এ কী বলছ ফণিবাবু?

ফণিভূষণ বলল, এইটাই হয়েছিল সুরেন্দ্রবাবু, দুর্ভিক্ষ, কাপড়ের আকাল, সঙ্গে যুদ্ধ, তারপর পার্টিশান, ভিটে থেকে লাখো লাখো মানুষ উচ্ছেদ হল, সঙ্গে রায়ট লাগল—বুঝতে পারছ দশটি বছর ধরে কীভাবে কেটেছে আমাদের।

সুরেন্দ্রর দু'চোখ স্ফীত হয়ে যাচ্ছিল। সে ধরতে পারছিল না কী বলছে ফণিভূষণ। এই কলকাতার রাস্তায় নাকি দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ মরে পড়ে থাকত। মায়ের কোলে শিশু হাসছে, মা মরে গেছে। কী সাংঘাতিক। এমন কথা সে শোনে নি। এই একটা মুলুক, যে মুলুকে বারিষ হয় খুব, যে মুলুকে ধান হয় খুব, নারিয়েলের দেশ যে মুলুক, সে মুলুকে না খেয়ে মানুষ মরে পড়ে আছে কলকাতা শহরের পথে? হ্যাঁ ভাই। ফণিভূষণ সব শুনেছে এপারে এসে। বাগেরহাটেও ভাতের অভাব, কাপড়ের অভাব হয়েছিল, কিন্তু তাদের গায়ে লাগে নি। ধান চাল ছিল ঘরে। কষ্ট করতে হয়েছিল। আর তিন চারটে মানুষের ব্যবস্থা ছিলই ঘরে। তখন ফণিভূষণ কিশোর। কিন্তু সব বুঝতে পেরেছিল। গ্রাম ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল যে। কলকাতায় এসে সবটা জেনেছে ভালো করে। সুরেন্দ্রও তাই জানছে। ঘর না ছাড়লে জানত এসব? বীরাঙ্গনা দাসীকে মনে মনে গড় করে ফণিভূষণ। মাসি যা বলে তা সত্যি। প্রথমে বোঝা না গেলেও পরে ধরা যায়। মধু কবিকে দিয়ে ধরলেই সব সত্যি টের পাওয়া যায়। মাসি অনেক জানে। মধুকবিকে জেনেছে বলেই অনেক জানে, তাই-ই মনে হয় ফণিভূষণের। ঘর থেকে বেরিয়েছিল বলেই সাগরদাঁড়ির পুত্র কবি মধুসূদন হয়েছিল।

আটাশ

বীরাঙ্গনার সঙ্গে হাবলু গেল বসিরহাট। বীরাঙ্গনা ভেবেছিল হাবলুকে দমদম দিয়ে বনগাঁ পাঠাতে, কিন্তু হাবলু বলল, বসিরহাট ঘুরে যাবে, পিসিকে আর ডলুকে বলা তো দরকার।

প্রভাময়ী সব শুনে বলল, হারাবি নে পথে?

হাবলু বলল, এপার ওপার করছি মাসি আমি, হারানো এত সহজ।

হুঁ। প্রভাময়ী সম্মতি দিলে টিয়া বলল, শুভ কাজে যাচ্ছ, সাবধানে যেয়ো হাবলুদা।

হাবুল হাসে। হাবলু কেমন ঘোর ঘোর চোখে তাকায়। এক এক মুহূর্তে তার সব ভুল হয়ে যায়। এপার ওপার একাকার। টিয়া না সেই ময়রম? ময়রম না টিয়া? আসলে কে কোনজন তাও বোঝা যায় না। হাবলু বলল, তোরা সাবধানে থাকিস, তুই আর তোর বেড়াল, ওরে বেরুতি দিবি নে।

কথা শুনে প্রভাময়ী হাবলুর পিঠে হাত দেয়। কী রকম মায়া হয় ছেলেটার জন্য। মনে হয় নিজের ছেলের মতো। খোকনের উপরে আর একজন। প্রভা বলল, তুই যা।

বীরাঙ্গনার বাড়িতে দারিদ্র। ছেলে কোর্টের মুহুরি, তার তিন ছেলে আর তিন মেয়ে। এক্সচেঞ্জ করে কিছু জমি পেয়েছে আবাদে, নদীপথে যেতে হয়। সে জমির ধান চাষার উপর ভরসা। সেই মুসলমান চাষা। চাষটা তারাই করে, আর নমঃশূদ্র করে। ওপারে, এপারে ও। ওপারে পার্টিশনের আগে, যখন হিড়িক ওঠেনি হিন্দুস্থান পাকিস্তানের, কোনটা পাকিস্তানে যাবে, কোনটা থাকবে হিন্দুস্থানে সে কথাও লোকের মুখে মুখে ঘোরেনি, ধান পেতে অসুবিধে তো ছিল না। সব কিছু ভালোই ছিল। পাকিস্তান রটতেই সব বদলে গেল। এদিকে এসেও জমি ভাগে করাতে হয়। কী করবে, চাষবাসের অভ্যেস মুসলমান, নমঃশূদ্র ছাড়া আর কার আছে? বীরাঙ্গনার ছেলে, ছেলের বউ কিন্তু মুখ ভার করল না হাবলুকে দেখে। বীরাঙ্গনা ক'দিন বা থাকে ছেলের কাছে, বলল, আশাশুনি বাড়ি, সেই যে বলেছিলাম।

কানাই বলল, যদ্দিন পার ঘুরে নেও মা, এ এল কেন?

সব শুনে কানাই বলল, ভালো হলি ভালো, তবে ওর পিসে হারুবাবুর তো খুব বড় অবস্থা, গমগম করতেছে সব, পিসে পিসি ভার নিক বিয়ের।

বীরাঙ্গনা বলল, দেখা যাক কানু কী হয়।

দ্যাখো, ক'দিন থাকবা মা?

বীরাঙ্গনা বলল, কেন?

এমন করে ঘোরো তুমি, ভয় হয় যদি হারায়ে যাও, মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি সাগরদাঁড়ি গে বসে আছ, বুঝলে হাবলু।

হাবলু বলে, আমি নে যাব, আমার যাতায়াত আছে।

কোনো লাভ নেই, যা যায় আর ফিরে আসে না।

হাবলু বলে, যায় নি কিছু।

সব গেছে, আমার মা যা বলে বলুক, আমি তো জানি, তুমি সেদিনের ছাওয়াল, বড় হও আর একটু, বুঝবা।

আমি মানি নে হিন্দুস্থান পাকিস্তান।

তুমার মানা না মানায় কী যায় আসে। বলে কানাই গেল কাজে।

হাবলু টের পায় বীরাঙ্গনা দিদ্‌মা এবাড়ি আসে মাঝে মধ্যে। নিজের একটা খুপরি মতো ঘর আছে, সেখেনে ক'দিন থেকে আবার রওনা হয়। বীরাঙ্গনা দিদিমার আসা না আসায় এ বাড়ির কিছু যায় আসে না। তবে কানাই মামাকে ভালোই লেগেছে তার। বীরাঙ্গনার বাড়িতে দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে বিকেলে হাবলু যায় পিসির বাড়ি। বাড়ি চেনে সে। পিসি তাকে দেখে আঁতকে ওঠে, তুই!

হাবলুর পিসির গা দিয়ে ঘি দুধ মাখন ঝরে পড়ছে যেন। পিসির পিছনে ডলু দাঁড়িয়ে। পিসি যে শাড়ি ঘরে পরে সেই শাড়ি হাবলুর মার বাক্সয় তোলাও নেই। পিসির গলায় হাতে কানে যে সোনা, তা তার মার কিছুই নেই। হাবলু এসব জানে। তার মা আর পিসি প্রায় একই বয়সী। মা তো বুড়ি হয়ে গেছে, কিন্তু পিসিকে দ্যাখো। ডলু বলল, দাদা, তুই যে হঠাৎ?

কেন আসতি নেই? হাবলু রেগে গেল। ডলু কি জানে না কেন এসেছে সে। খুব জানে। কীরকম অবাক হওয়ার ভান করছে।

ডলু বলল, তুই জেঠার বাড়িতে তো নেই।

হাবলু বলল, কলকাতায় থাকি তা জানিস নে?

কী করে জানব, চিঠি দিয়েছিস কোনও?

ডলুও সেজে গুজে আছে। গোলাপি শাড়ি, হাত ভর্তি কাচের চুড়ি, পায়ে আলতা। পিসি মাটিতে বসল। লাল টুকটুকে মেঝে কী তেল তেলে! পিসির পিছনে ডলু বসল। হাবলু দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসল। পিসি বলল, তুই কোথায় থাকিস রে?

বললাম তো।

কলকাতায় কেন, বনগাঁ থেকে না বলে কোথায় গেলি?

বলছি তো কলকাতায়।

তোর জেঠা জেঠি তোর জন্য কেঁদে মরে, তুই কোনও খবরও দিস নে।

হাবলু বলল, মিথ্যে কথা।

শুনে পিসি থ। চুপচাপ হাবলুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে। তারপর বলে, তুই বাঁদর হয়ে গিছিস এপারে এসে, কলকাতা থেকে তাড়ায়ে দেছে তো।

আমি থাকতি আসি নি।

তবে এলি কেন? পিসি ক্রুদ্ধ হচ্ছে।

হাবলু বলল, ইচ্ছে হল তাই।

বাঁদর হয়ে গিছিস, তুই আশাশুনি ফিরে যা।

হাবলু বলল, যাই না যাই আমি ভাবব, জেঠি চেয়েছিল তাই চলে এয়েচি, ওরা বেঁচেছে।

ছি ছি হাবলু, গুরুজনের নামে এই সব বলছিস, তুই এত খারাপ হয়ে গিছিস।

হাবলু বলল, তুমি আমারে থাকতি দেবা, তুমি তো গুরুজন।

পিসি বলল, মেরে তোর গার চামড়া তুলে দিতে হয়, কথা বলতি জানিস নে?

হাবলু বলল, না জানি নে, হিন্দুস্থানও মানি নে, আমি আর আসব না, হল তো।

পিসি বলল, যেমন মা তেমনি ছেলে, ও ডলু এ কী বলে। পিসি উঠে দাঁড়ায় রেগে।

ডলু বলল, পিসি, দাদা ওই রকম, তারপর হাবলুকে বলল, ছিহ্ দাদা, তুই পিসির পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নে, এপারে জেঠাজেঠি পিসি পিসেই আমাদের আপনজন।

হাবলু বলল, আমি থাকতি আসি নি, আমার খোঁজ কেউ নেছে, আমি কুথায় থাকি, কী খাই, যে বাড়ি থাকি তারা নিজির ছেলের মতো আমারে রেখেছে।

ডলু বলল, আমিও তো মেয়ের মতো থাকি পিসির কাছে, তুই ক্ষমা চেয়ে নে।

এইসব কথা যখন হচ্ছিল পিসি তখন ভিতরে। হাবলু আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে এল। ইস! কেন গেল, পিসি তাকে কেন ওইভাবে বলল, সেই বা ঝগড়া করল কেন? মাথায় রাগ উঠে গেল হঠাৎ, তাই। এখন কি পিসি ডলুকে দিয়ে ঝিগিরি করাবে যেমন দিদি করছে জেঠার সংসারে। নাকি করছে বলেই তাকে ঢুকতে দেবে না পিসি তার বাড়িতে।হাবলু ছাড়বে না। কাউকে ছাড়বে না, হিন্দুস্থান পাকিস্তানওয়ালাদের যেমন, তেমনি জেঠি তার পিসিকে।

বীরাঙ্গনা দিদিমার বাড়ি সে দেরি করে গেল। ইছামতীর ধারে বসে থাকল অনেক সময় পর্যন্ত। ভোমরা বর্ডার দিয়ে আশাশুনি কলকাতার থেকেও কাছে। বসিরহাট ওপারেই চলে যেতে পারত। তখন কী হত পিসির? আশাশুনি যদি এপারে ঢুকে যেত তাহলে কি ডলু আর দিদিকে পিসি আর জেঠির কাছে পাঠাত বাবা? নাকি সে আসত আশাশুনি ছেড়ে? ময়রম অজেতরা যেমন থাকত থাকত। বনগাঁ নাকি পাকিস্তানে পড়েছিল তিনদিন, যদি সত্যি থেকে যেত, তবে জেঠি আর বড়দা অবনী তার গায়ে হাত দিত? সব হয়েছে হিন্দুস্থান পাকিস্তানের জন্য।

বীরাঙ্গনা বলল, তুই এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিল হাবলু?

শুনে বীরাঙ্গনা বলে, আমি ছুটে গেলাম তোর পিসির বাড়ি, তোর বুন বলল, দাদা তো এসেই চলে গেছে।

আর কী বলল?

কিছুই না, তোরে থাকতি বলল পিসি, থাকতিই পারতিস।

হাবলু চুপ করে থাকে। বীরাঙ্গনার ছেলে কানাই রাতে তাকে উপদেশ দেয়, তুমি কোর্টে কাজ করতি পার, তোমার জেঠা না উকিল।

হাবলু বলল, আমি কোর্টে কাজ করব না।

তোমার জেঠার সঙ্গে পরিচয় করতি হবে, আশাশুনির লোক তো, আমার মার পরিচয় দিলে চেনবেন তিনি?

কী জানি? কাল যাব বনগাঁ, জিজ্ঞেস করব।

হাবলুর কথায় উৎসাহ পায় কানাই, বলে, আমার ওকালতি পড়ার ইচ্ছে ছিল, হয় নি, কিন্তু মামলার অনেক কিছু জেনেছি কোর্টে গিয়ে গিয়ে।

রাতে বীরাঙ্গনা হেরিকেন জ্বালিয়ে তার বাক্স থেকে একটা পুরনো বই বের করে, বলে, এই দ্যাখ হাবলু, মেঘনাদ বধ কাব্য।

হাবলু দ্যাখে কত পুরনো সেই গ্রন্থ। বাঁধানো হয়েছিল বলে বেঁচে আছে, নতুবা কোথায় যেত এর পাতা? আর বীরাঙ্গনা খুব যত্নে রেখেছে। হাবলুর নাকে পুরনো গন্ধ আসে। এ গন্ধ তাদের গ্রাম আশাশুনিতেও বুঝি ছিল। বীরাঙ্গনা বলে, কলকাতার প্রেস থেকে নোতন একটা কিনে দিবি তুই আমারে, এটা তোর দাদুর।

দেব দিদমা।

কানাই তার বাপের মতো হল না, আমার মতোও না, লেখাপড়া করল না।

হাবলু বলে, উনি ভালো।

আরও ভালো ছিল, পার্টিশান হয়ে খারাপ হয়ে গেছে, স্বার্থপর।

হাবলু তখন জিজ্ঞেস করল, তারপর কী হয়েছিল দিদমা?

বীরাঙ্গনা চমকে যায়, কার পর?

ওই যে মা কাঁদে, মধু চলে যাবেই, সেই যে বলেছিলে?

বীরাঙ্গনা বইটা হাতে নিয়ে বুকে চেপে ধরে বলে, এই বই পড়ে পড়ে আমার শিক্ষা, তোর দাদুর নাম লেখা আছে, আমি লিখেছি, আর তিনি লিখেছিল, কল্যানীয়া বীরাঙ্গনা, কালি ঝাপসা হয়ে গেছে হাবলু।

হাবলু বলল, দেখি সে কেমন, তখন হিন্দুস্থান পাকিস্তান ছিল না?

বীরাঙ্গনা পা ছড়িয়ে বসে আছে। বুকের উপর দুহাতে চাপা বই সে বের করে না। নিঃশব্দে হাসে, বলে, নাহ্ থাক, তুই একটি নোতন কিনে দিয়ে লিখি দিস বীরাঙ্গনা দাসী কল্যানীয়াসু— বুঝলি।

হাবলু বলে, আমার বানান যদি ভুল হয় দিদমা?

হবে, হবে আমার হাবলু যেমন লিখে দেবে তেমনি হবে, শোন রে, মধু গেল, জোয়ার এল কপোতাক্ষয়, মধু নৌকা ছাড়ল, মা জাহ্নবী বলেছিল, কপোতাক্ষয় জোয়ার আসবে না, মধুর নৌকোও যাবে না, কিন্তু এল তা।

এল। হাবলু বিস্মিত হল, জোয়ার এল?

হ্যাঁ, এলরে, মার বুকির কান্না গাঙে পৌঁছল না।

মধু চলে গেল?

গেল চলে, ওই যে জোয়ারে ভাসল মধু, ভেসেই গেল।

দিদমা এসব সত্যি?

সত্যি তো বলে লোকে, ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি।

মারে ছেড়ে চলে গেল মধু, মা ডাকল তবু থাকল না, আমার মা তো বলে না যেতি, বুনদের দেখতি, আমি তাদের দেখতিও পাই নে।

বীরাঙ্গনা বলে, কষ্ট করছিস, ঠিক তোর ভালো হবে।

মধুর ভালো হয়েছিল?

বীরাঙ্গনার মুখ থমথম করে, মাথা নাড়ে, বলে, না, হয় নি।

তবে যে বলো কষ্ট করলিই ভালো হয়?

মধু তো কবি হয়েছিল, এই ডে তার ভালো, কবির আর কী ভালো হবে, কাব্য লিখল, তাতেই সে আনন্দ পেল, কিন্তু সে বড় কষ্টের জেবন গেল তার।

হাবলু বলল, দিদমা বইটা দ্যাও, দেখি।

এ বই আমি দেখাইনে। বীরাঙ্গনা বলে।

তবে বের করলে কেন?

কী মনে হল, হাবলু তোরে আমার খুব ভালো লাগে, মনে হয় তোর যেন খুব মঙ্গল হয়, তোর দাদু বলত লোকের মঙ্গল কামনা করলে নিজিরও মঙ্গল হয়।

হাবলু হাসে, বলে, কী সুন্দর কথা তুমি বললে ময়রম।

ময়রম। কী বলছিস তুই হতচ্ছাড়া।

হাবুল বলল, তুমি ময়রম, তোমারে দেখে ময়রম মনে হচ্ছে আমার, না হলি তুমি আমার মঙ্গল কামনা করবা কেন?

ওমা সেই জন্যি?

হ্যাঁ, ময়রম বলল, আমার যেন ভালো হয়।

কবে বলল তোরে?

যখন জানল আমি এপারে চলে আসব, পাকিস্তান শুধু মুসলমানের জন্যি, তখন কেঁদে বলল হিন্দুস্থানেরও যেন ভালো হয়, তুমি তা ভুলে গেলে ময়রম, আমি হাবলু, আমারে তুমি চেন না?

শুনে বীরাঙ্গনা হাবলুর পিঠে হাত রাখে, বিড়বিড় করে, আহারে বালক, মানুষ কেন দুঃখ পায়, দুঃখর কথা তিনি জানত, মধুকবি।

হাবলু চুপ করে আছে। হেরিকেনের শিখাটা ক্রমশ কমিয়ে দিল বীরাঙ্গনা, বলল, ঘুমো হাবলু, কাল তোরে বনগাঁ যেতি হবে।

উনত্রিশ

'ঘুমো হাবলু', বললেই কি ঘুম আসে? হাবলুর কয়েক হাত দূরে বীরাঙ্গনা দিদিমা শুয়েছে, তারপরে একটা মাঝারি আকারের জানালা, জানালা পেরিয়ে খেলার মাঠ। জানলা দিয়ে মৃদু বাতাস ঢুকছে ঘরের ভিতরে। মশারির ভিতরে সে হাওয়া কম ঢুকছে,

কিন্তু মশারি কাঁপছে। হাবলু চিত হয়ে শুয়ে। উপরে তাকালে খোলার চাল। বাঁশের আড়া। দেওয়াল এ বাড়ির পাকা, মেঝেও। হাবলু ধীরে ধীরে শ্বাস নিচ্ছে। কিছুই ভালো লাগছে না। উতুলি আশাশুনি বনগাঁ কলকাতা বসিরহাট সব একসঙ্গে মণ্ড পাকিয়ে যাচ্ছে। চোখ বুঁজলেই তার মনে হচ্ছে উতুলিতে শুয়ে আছে অজেত আলির বাড়ির হাতনেতে। ঘাড় ঘুরোলেই উঠোন দেখবে। উঠোনে ময়রম হাঁটবে। চাঁদের আলো পড়েছে হাবলুর বুকে। হাবলু ডাকল, ময়রম?

বুড়ি বীরাঙ্গনা বলল, কেন তুই বীরা বল।

হাবলু ডাকল, ময়রম ঘুম আসে না।

আবার বলিস, বীরা বলে ডাক, কতকাল কেউ অঙ্গনা ডাকে নি, বীরা ডাকেনি।

হাবলু তো চোখ বুঁজে। শুনল ময়রম বলছে, এ কি হতি পারে নাকি হাবলুদা, হিন্দুস্থান পাকিস্তান এক হয়ে যাবে।

রদ হবে বলছিস।

হবেই, এখন যাও, ঠিক ফিরে আসতি হবে, তুমি দাদার জন্যি একটু দেখ, কলকাতায় খেলে পরদিন সকালে বাড়ি ফেরবে।

হাবলু বলল, হ্যাঁ, সেদিন ফিরা যাবে না।

গাং পথ থাকলি হত।

অতখানি পথ গাঙে আসা যায়! জুয়ার ভাটা আছে, পথে চুরি ডাকাতি আছে, ঝড় বাদলা আছে, কলকাতায় বাসা নে থাকব আমি আর অজেত।

হুঁ, তবে তার খরচ অনেক, কী করে পারা যাবে, বসিরহাটে এসেও থাকতি পারে। ময়রম বলল।

পারে, বসিরহাটে সাইকেল রাখবে।

তাহলে ওর সাইকিল কিনতে হবে।

ওর ক্লাব দেবে সাইকেল, মো'নবাগান, ইজবেঙ্গল, ম'মেডান, বিয়েনার, উয়াড়ি, এরিয়ান, যেখেনে যাক পাবে, জার্সি বুট হোস সব পাবে।

ময়রম বলে, তুমি গিয়ে মো'নবাগান ঠিক করো।

ম'মেডান যদি নেয়।

না যাবে না, ওর ইচ্ছে মো'নবাগানের হয়ে খেলার, না হলি এরিয়ান, বলে এরিয়ানে গেলি নাকি খেলা শিখা যায়।

হুঁ, ওরা পেলেয়ার তোলে।

তাই করো হাবলুদা, একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে হিন্দুস্তান পাকিস্তান, তুমি কলকাতা যেতি পারছ।

যদি ফিরতি না পারি?

তাই কি কখনও হয়, হিন্দুস্তান পাকিস্তানে আমাদের কী?

তখন তার পাশে শুয়ে থাকা অজেত বলল, লোকজন খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে হাবলু, জোলা পাড়ার এমদাদুল বলে হিন্দু ভাগাতি হবে, এমন দাবড়ানি দিছি, কিন্তু এখন এমন চলবে ক'দিন, ওর পক্ষেও লোক আছে।

ময়রম বলল, চলবে বলেই না হাবলুদা ওপারে যাচ্ছে, না চললি যেত কিনা, আল্লারে ডাকি সব মিটি যাক, ঝগড়াঝাটি লাগল খামোকা, মাথা ঠাণ্ডা হলি সব আগের মতোন হই যাবে।

তুই কেমন পাকা বুড়ির মতো কথা বলিস ময়রম। হাবলু বলেছিল।

ময়রম বলে, এডা আমার কথা না, আম্মা বলে।

তখন ময়রমের তিনটে বেড়াল, আয়না, গয়না, রয়না ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পরপর লাফ দিল হাতনে থেকে উঠোনে। আর তা দেখে ময়রম বলে উঠল, একটা কথা বলা যাবে নিশ্চিন্তে? এই তুরা কেন এলি, রাত হয় নি? ঘুমুতি যা।

হাবলু মশারির জালের ভিতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। ময়রম পরে ছিল লাল কালো ডুরে শাড়ি, আর তার তিন বেড়াল দুধ শাদা, একেবারে চাঁদের আলোর মতো বর্ণ। তারা উঠোনে দৌড়োদৌড়ি করতে আরম্ভ করল। খিলখিল করে হাসতে আরম্ভ করল আয়না গয়না রয়না। হাবলু অবাক হয়ে তাদের হাসি শুনছিল, কথা শুনতে পাচ্ছিল। ময়রম দাঁড়িয়ে হাতছানি দিচ্ছিল, কিন্তু তারা শুনছিল না। তার পাশে অজেত ঘুমিয়ে পড়েছে। ও অমনি, পড়ে আর ঘুমোয়। হাবলু ও এমনি, ঘুম যে কখন আসবে তা ভগবানও জানে না।

ময়রম ডাক দিল, এই রাত হয়েচে, যা ঘুমুতি যা।

যাব না। আয়না লেজ ফুলিয়ে বলল, যা ভেবেছ সব ভুল।

কী ভুল রে? ময়রম তাকে ধরতে গেল, তোরা কথা শুনেচিস, তোরা কীরে, আমাদের কথা শুনতি যাস, তোদের কথা শুনি আমি?

গয়না লাফ দিয়ে বলল, ওই যে হাবলু যাচ্ছে—

এই হাবলু বলিস নে, বল হাবলুদা।

রয়না বলল, তোর হাবলুদা, আমাদের বয়েই গেছে আমার পাকিস্তানি।

ইস পাকিস্তানি, গাঙে দিয়ে আসব।

গয়না বলল, পারবি নে, তুইও পাকিস্তানি, হাবলুটা হিন্দুস্তানি।

ও হিন্দুস্তানে যায় নি, কী করে হয়?

হিন্দু হায় হিন্দুস্তানি, হাম হায় পাকিস্তানি। বলে গয়না বেড়াল লেজ তুলে নাচতে লাগল, মোন'বাগান, ইজ বেঙ্গল, ম'মেডান হবে নি, হাম পাকিস্তানি।

হবে না মানে, পাজি বেড়াল।

খিলখিল করে হাসল তিন বেড়ালে, শুনো বিল্লি পাকিস্তানি, উনকি মালকিন পাকিস্তানি, কলিকাতা চলবে নি, শাদা টোবি সবুজ টোবি, দো রঙ দো'স্তানি, আল্লা পাকিস্তানি কিষনো হিন্দুস্তানি—

ওরে ওরে থাম থাম, বেড়াল কি আর মানুষ হবে, যেমন মাথা তেমনি কথা, শোন, শোন বলছি।

কার কথা কে শোনে, তিনটি বেড়াল লেজ তুলে নাচতে লাগল। ময়রম তাদের ধরতে গিয়েও পারছে না। হাবলু উত্তেজনায় উঠে বসল। এমন বেড়াল কেউ পোষে? ওদের জন্য মাছের দাগা দুধ ভাত নাকি বরাদ্দ? খেয়ে খেয়ে লেজ মোটা হয়েছে আর ময়রমকে কাঁদাচ্ছে। ওই যে ময়রম উঠোনে উবু হয়ে বসে গালে হাত দিয়ে চোখের জল ফেলছে। কেউ তার কথা ভালো করে বোঝে না, পোষা বেড়াল তিনটেও না। দেব এবার দূর করে, ময়রম চাপা গলায় ধমকে উঠতেই আয়না বেড়াল বলে ওঠে, আমরা তুমার পিছু পিছু ঘুরে আসব, গাঙের পথ ধরে ধরে উতুলি।

পার করে দেব।

কুথায় পার করবা, গাঙের উপারে, নৈকোয় করে চলে আসব।

বডার পার করে দেব।

শুনে হাসি কী আয়নার, বলে ওঠে, আমাদের তো না, তুমাদের ইনডিয়া পাকিস্তান, এপারে চলে আসব ঠিক।

তখন না পেরে হাবলু বলে উঠল, এই বেড়ালের বাচ্চারা থামবি।

কী বলচিস রে তুই? বীরাঙ্গনা ঘুরে শোয়, স্বপ্ন দেখলি হাবলু?

না তো। চমকে ওঠে হাবলু, বলল, ঘুম আসতেছে না দিদমা।

যা কলে গে ঘাড়ে জল দে।

ওতে হবে না।

তবে কিসে হবে?

হাবলু চুপ করে থাকে। বীরাঙ্গনাও। হাবলুর চোখ অন্ধকার কড়িকাঠে। ময়রম কি বেড়াল পার করে দিয়েছে তাহলে? নাকি তিনটেই এখনও পুষছে, মাছের কাঁটা দুধ ঘি খাওয়াচ্ছে?

বীরাঙ্গনা বলল, কার বেড়াল।

তুমার বেড়াল।

না আমি কুকুর বেড়াল নিয়ে ঘুরি নে।

আমারে নে ঘুরছ তো।

কী বলিসরে হাবলু, তোর মাথা খারাপ, তুই হলি আমার হাবলু, আমি তোর বীরাঙ্গনা বীরা, শোন আমারে একখানা মেঘনাদ বধ কিনে দিস, লিখে দিবি বীরাঙ্গনা—

হাবলু বলল, পিসি কুকুর বেড়ালের মতো ব্যবহার করল।

ওতে কিছু হয় না, মানুষ মানুষই থাকে।

ইনডিয়ায় থাকতি আমার মা কারুর ঘরে যেত না।

ওপারেই তো আছে, ইনডিয়ায় কই?

তখন তো ইনডিয়াই ছিল সব দিদমা।

বীরাঙ্গনা বলে, মানষের কষ্ট হয় এমন, যদি তুই জানতিস তিনি কত কষ্ট পেয়েছিল, জমিদারি ছেড়ে, মার কোল ছেড়ে, বঙ্গভূমি ছেড়ে তিনি গেল বিদেশ বিভুঁই, মাদ্রাজ দেশে।

দিদমা তুমি মাদ্রাজি দেখেছ?

বীরাঙ্গনা বলল, দেখিছি বলে মনে করতি পারিনে।

আমি দেখেছি কলকাতায়, বুঝা যায় না একদম।

বীরাঙ্গনা বলে, মধু গেল জাহাজে চেপে, কুড়ি দিন লাগল, কম দামি জাহাজে উঠেছিল কিনা, ঘুরে ঘুরে যেতে লাগল, জাহাজের ডেকে বসে আমার মধুকবি কালাপানিতে ভেসে ভেসে যেতে লাগল, কী কষ্ট তার, খেস্টান হয়েছে তো, তখন কলকতায় শীত, বড়দিন চলছে, সায়েবপাড়া সেজেছে ফুলে পাতায়, ঘরে ঘরে বড়দিনের পিঠে পায়েস মিষ্টি মিঠাই, নাচ গান হচ্ছে, মধু তার ভিতরে একা একা চলল বিদেশ বিভুঁই, ডকের ঘাটে কেউ এল না, বিদায় হল এমনি করে।

হাবলু বলে, বিদায়ঘাট থেকে গেল?

বলতি পারিস, তবে কিনা আবার এলও তো, আবার আসবে কলকাতায়, বিদায়ঘাট হল না।

অশ্রুঘাট হল?

বীরাঙ্গনা বলে, তাও হল না।

কেন হল না?

ঘাটে কেডা ছিল যে চোখের জল ফ্যালবে, বিদেশ বিভুঁই থেকে যদি বিদেশ বিভুঁই কেউ যায় তবে ঘাটে কেউ থাকে না, বিদায়ও হয় না।

হাবলু চুপ করে থাকে। সবটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। বীরাঙ্গনা বিড়বিড় করতে থাকে, জাহাজ কুড়ি দিন ধরে গেল, কলকাতায় বড়দিন শেষ হয়ে গেল, নতুন বছর এল, কিছুই সে জানল না কেমন করে তা হল, শুধু জাহাজে ওঠা গরিব লোকগুলো, মাঝিমাল্লা, ভবঘুরে, ভাগ্যান্বেষীরা দিশি মদ খেয়ে হেপি নিউইয়ার করতে করতে ডেকের উপর চিৎপাত হয়ে গেল। মধু একা বসে আছে। সামনে অকুল সমুদ্র, তার দিশা নেই কোনও।

হাবলু বলল, থামো দিদমা?

কেন রে কী হল?

একা একা গেল, সাহস ছিল কত?

কষ্টও তো ছিল, একা মানুষের যে কত দুঃখ তা যে একা হয় সে বোঝে।

হাবলু বলল, আমার শুনতি ভালো লাগছে না।

কেন তুই তো বললি মধুর কথা শুনবি।

শোনবো তো, তারপর কী হল?

কী হবে রে হাবলু, জেবনটা অমনি সমুদ্রর মতো, কিছু বুঝলি?

না, মানে কী? হাবলু সরে এল দিদিমার দিকে।

দিদিমা তখন তার মতো করে বোঝায়। জীবনটা অকূল দরিয়ারে হাবলু। কলকাতায় আশ্রয় নেই, পেটের জোগাড় হয় না, কবি হওয়ার সাধ মেটে না, কিন্তু সে যে কপোতাক্ষ ধারের ছাওয়াল, যত খেস্টান হোক, যতই তার নামের আগে মাইকেল লিখুক, সে তো মা জাহ্নবীর ছাওয়াল, তার জেদ কত, রোষ কত, তার প্রতিজ্ঞা কত। তার যেন রাবন রাজার রোষ। সাগরে একা ভাসতে ভাসতে গঞ্জাম গেল, কলিঙ্গপত্তম গেল, বিশাখাপত্তম গেল—ছুঁয়ে ছুঁয়ে জাহাজ চলতি লাগল তার।

এসব কোথায় দিদমা?

উড়িশায়, তারপর তেলেঙ্গিদের দেশ অন্ধ্রয়।

জাহাজে উড়িশার লোক, তেলেঙ্গিরা সব উঠল নামল?

বীরাঙ্গনা বলল, হ্যাঁ, তাই হয়েছিল।

হাবলু বলল, আমি ওই রকম যাব, যেতি হবে।

কী বলিস তুই হাবলু? বীরাঙ্গনা তার হাত রাখল হাবলুর বুকে। হাবলুর দু'চোখ বন্ধ। চিৎ হয়ে সে যেন অন্ধকারে আকুল দরিয়ায় ভেসে আছে, নিম্ন স্বরে বলল, আশাশুনি গেলি আর আগের মতোন হবে না ময়রম, ওরা জেনে গেছে আমি ইনডিয়ার।

ও বাপ, তুই বীরা বলে ডাক আমারে।

হাবলু গুনগুন করে, আমি ইনডিয়ান, পাকিস্তানি নই, আবার এই ইনডিয়ায় আমি কেডা, এই ইনডিয়ার আমি কিছু চিনিনে ময়রম, তুই আছিস তবু আছি, আমি কুথায় যাব এই কলকাতা- ইনডিয়া থেকে, সাগরে ভেসে যাব একা একা।

কেন ভাসবি, ও হাবলু আমি তোর বীরা, বীরাঙ্গনা, আমার সঙ্গে থাকবি?

হাবলু চোখ খুললল, তারপর কী হল বীরা।

বীরাঙ্গনা বলল, আমি জানি নে, যত ভাবি মধুর কথা কেঁদে মরি, আমি সাগরদাঁড়ি থেকে কলকাতায় খিদিরপুরে এসে শুনলাম মধু নেই কলকাতায়, মধু চলে গেছে, সত্যি গেছে—কলকাতা যেন কবরখোলার মতো চুপ হয়ে গেছে রে হাবলু, কলকাতায় নতুন বছর পড়েছে, কিন্তু সব বোবা হয়ে রয়েছে, সে বছর আমার ঘরে, পিঠে পুলি হল না পোষ পাবনে—

হাবলু কেঁদে ওঠে, দিদমা, বীরা আর বলো না, আমার কষ্ট হয়, মনে হয় আমার মা ও আশাশুনিতে পিঠে পুলি পায়েস করে নি, দুটো ছেলে দুটো মেয়ে ভিন দেশে, কার জন্যি করবে?

তিরিশ

বসিরহাটের গাং ইছামতী পার হয়ে ওপার থেকে একটা লরির পিছনে চেপে ঘোজাডাঙা বর্ডার ফেলে তেঁতুলিয়া দিয়ে হাবড়া হয়ে যশোর রোড দিয়ে বনগাঁ। বনগাঁ থেকে আবার ওই পথে বসিরহাট। তারপর কলকাতা। এইরকম ছিল হাবলুর যাওয়া আসা।

বনগাঁ কোর্টে জেঠা কেস করে কালো কোট পরে। আগে বনগাঁ ছিল যশোর জেলার ভিতরে। এখন ২৪ পরগণার মহকুমা। যশোর অন্যদেশ। এইটেই অদ্ভুত লাগে হাবলুর। ভুগোলের মানচিত্রর ভিতরে দাগ টেনে নিয়ে দুটো দেশ। মানচিত্র থাকা ঠিক না। লোকের এত ভুগোল জানতে হবে না। যে দেশ যেখানে আছে ঠিক আছে। মানচিত্র থাকলেই কেটে দু'আধখানা, না হয় ম্যাপ দেখে দেখে সোলজার হাঁটবে, মানুষের দুর্গতির একশেষ। এসব কথা কাকে বলবে হাবলু? একবার জেঠার ছেলে অবনীদাকে বলতে গিয়েছিল, শুনে অবনী বলেছিল, তুই বেশি জেনিচিস, তুই খুব পাকা, মূর্খ কোথাকার।

হাবলু ঠিকই গিয়েছিল। কোর্টে জেঠাকে ধরে সব কিছু বলে ব্যবস্থা করে ফিরে আসবে। অবনীদা জানবে না, জেঠি জানবে না। জেঠা যদি দিদিকে বাইরে নিয়ে আসতে পারে, বনগাঁ স্টেশনে দেখানো যেতে পারে। তা হলে জেঠির অজ্ঞাতেই সব হল। জেঠি আর অবনীদার মুখোমুখি হতে চায় না হাবলু। ওরাও তাকে দেখে খুশি হবে না একটুও। বরং ধরে নেবে আবার থাকতে এসেছে হাবলু, বিনি পয়সায় অন্ন ধ্বংস।

হাবলুর কপাল খারাপ। কোর্ট বন্ধ ছিল সেদিন। কোন উকিল যেন মারা গেছেন। জেঠা নেই। কোর্ট চত্বর শুনশান। মুহুরি ভেন্ডারদের ঝাঁপ খোলা বটে, কিন্তু খদ্দের নেই। মিষ্টির দোকানও ঝিমোচ্ছে। কোর্টের ময়রার দোকানের রসগোল্লা খুব বড় বড়। হাবলু খেয়েছে। জেঠা তাকে মাঝে মধ্যে কোর্টে আসতে বলত, বলত, তোকে মুহুরির কাজটা শিখিয়ে দেব, সব বুঝে গেলে তোর পয়সা খায় কেডা?

কোর্টে এলেই রসগোল্লা। জেঠা বলত, ক'টা খাবি খা, ওর এই জায়গা নিয়ে মামলা চলছে,আমার কাছে মামলা।

লোকটা হাবলুকে চিনল না। হাবলুও চেনা দিতে চায় নি। কিন্তু দাঁড়িয়েছিল। আসলে পুরনো লোক তো। অনেকদিন দেখা হয় নি। দেখা করে দুটো কথাও বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল। এই ময়রার অন্য একটা দোকান, মানে ওর ভাই-এর দোকান এখনও যশোর পার হয়ে কেশবপুরে আছে। আছে না চলে এসেছে তারা? কত কথা জিজ্ঞেস করার

ছিল, কিন্তু হল না। লোকটা তাকে দেখে কেমন নির্লিপ্ত, যেন চেনেই না। তাহলে কি মামলায় হার হল? নাকি জেঠার হাত থেকে সে মামলা চলে গেল অন্য উকিলের হাতে? হাবলু বুঝতে পারছিল না কী করবে? বাড়ি যাবে? গেলে তো কতরকম জেরা? ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে। হাবলুর অন্তত তেমনই মনে হয়েছে। সে ভাবল যায় দোকানে। দূর থেকে দেখবে, অবনীদা যদি না থাকে, কর্মচারীর কাছে একটা চিঠি রেখে আসবে। জেঠা উত্তর দিলে, তারা আসবে বনগাঁ, সে, ফণিভূষণ দাদা আর বীরাঙ্গনা দিদিমা। কিন্তু হাবলুর ভাগ্যটি ভালো। দোকানে জেঠা ছিল। জেঠাকেই দূর থেকে দেখেছে সে। জেঠা থাকলে সে নিশ্চিন্ত। অবনীদা তাকে করবে কী? সে তো থাকতে আসে নি। তবে হ্যাঁ, অবনীদা না থাকলেই ভালো। তাই হল। ছিল না। সে গেছে রাণাঘাট মেয়ে দেখতে। সঙ্গে গেছে ক'বন্ধু। জেঠা যায় নি। ছেলের পছন্দ হলে দেনা পাওনা করতে দু'জনে যাবে।

জেঠা কিন্তু এসব কথার আগে প্রথমে তাকে চিনতে পারে নি। এমনিই ঠিক দুপুরে একটু ঝিমঝিমে ভাব এসেছিল। এ সময় খদ্দেরও থাকে না বড় একটা। হাবলুকে খদ্দেরই মনে করে জেঠা বলে উঠেছিল, বসুন।

কর্মচারী ভবসুন্দর, ভব বলে উঠেছিল, চেনা মনে হচ্ছে।

হাবলু দেখেছিল জেঠার বয়স যেন আচমকা বেড়ে গেছে। আগের চেয়ে বুড়ো। মাথার চুল অনেকটা পাকা। মাস আষ্টেক আগেও হাবলু এখানে ছিল। এই দোকানে অবশ্য বসে নি কোনওদিন। জেঠা বলত কিন্তু অবনীদার ভয়ে আসত না। সে তো একদিন বলেই দিয়েছিল, দোকানে ঢুকলেই ক্যাশ ভাঙবে ও, বিড়ি, সিগারেটে পয়সা লাগে তো।

হাবলু বলছিল, আমারে ভুলে গেলে জেঠাবাবু!

কেডারে, হাবলু তুই। জেঠা আবেগে উত্তেজিত হয়ে উঠে আসতে গিয়েছিল, বলল, তোর কথা ভাবিও নি, তুই আর আসবি নে এ মুলুকে তা আমি জানতাম, এলি যে হঠাৎ?

ভাব নি কেন আমার কথা, তুমি কি আমার জেঠাবাবু হও?

কী বলিস, তোর অনেকটা বদল হই গেছে।

কী বদল?

বলতি পারব না।

হাবলু জানে না কী বদল? রোগা হয়েছে? না লম্বা? নাকি জেঠা তাকে ভুলে গিয়েছিল সত্যি? যাই হোক, শেষ অবধি হাবলু তো জেঠার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। হাবলুর কাছে সবটা শুনে জেঠা বলল, তোর দিদি, তুই যদি বিয়ে ঠিক করিস আমি কী বলব?

জেঠাবাবু তুমি তো মাথার উপর।

বিমর্ষ খগেন উকিল বলেছিল, আমি মাথার উপর হলি তুই এর ওর ঘরে ভাত খেয়ে বেড়াস, তোর জায়গা হয় না আমার ভিটেতে।

তবু তুমি উপরে, দিম্মা তাই বলে দিয়েছে।

তোর জেঠিরে কি বলব?

হাবলু চুপ করে ছিল। তার মনে হয়েছিল জেঠি তো খুশিই হবে, ঘাড় থেকে নামবে। কিন্তু জেঠা যে অন্য কথা বলে। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, আমি কী বলব হাবলু, ওই ছাবাল আমার যা বলবে তাই হবে, তোর জেঠি কি রাজি হবে এখন বে দিতে।

কেন, বে হবে না?

সামনে অবনীর বে, কত কাম কাজ, করবে কেডা, বাইরির লোক দিয়ে তো কাজ হয় না, বুলু কাজ কম্মে পরিপাটি।

হাবলু অবাক হয়ে জেঠাকে দেখছিল। জেঠাও বদলে গেল নাকি? একবার সত্যি বলে দিচ্ছে আলাভোলার মতো, আর একবার কথা ঢাকতে গিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে ফেলছে। হাবলুকে খগেন উকিল বলল, অবনীর বে'টা হয়ে যাক, তারপর ভাবা যাবেখন, আছে তো ভালোই।

পাত্র কি অতদিন দেরি করবে?

পাত্র অনেক পাওয়া যাবে, তা টাকা পয়সা কেডা দেবে?

কিসের টাকা পয়সা?

বে কি এমনি হবে হাবলু, বে'র খরচ?

আগে তো পছন্দ হোক।

পছন্দ না হয় হল, বুলুর তো সম্বন্ধ দু'একটা এয়েছিল, দেখতি তো খারাপ না, কিন্তু পণের টাকা দেবে কেডা?

পণ! হাবলু অবাক হয়েছিল।

হ্যাঁ, এমনি বে হবে, অবনী পাবে দশ হাজার টাকা ক্যাশ, এবাদে গয়না পনের ভরি, খাট আলমারি সাইকেল, শ্বশুর সাত কাঠা জমিও রেখেছে মেয়ের জন্যি রাণাঘাট শহরের উপর।

হাবলু বিস্মিত হয়েছে, অবনীদাকে দশ হাজার দেবে?

আরও দেবে, খেপে খেপে দেব, তোর বুনির জন্যি টাকা দেবে কেডা?

হাবলু গা ছমছম করে উঠেছিল জেঠা মশায়ের কথা শুনে, বলেছিস, দেখি কী করা যায়।

আগে টাকার সংস্থান করে তো বে'দিবি, যার তার হাতে ধরে দিলি তো হবে না, পালটি ঘর লাগবে।

হাবলু বলেছিল, দিদির বয়স হয়ে যাচ্ছে জেঠাবাবু।

সে কী আমি জানিনে, কী করব?

শেষ অবধি দু'রোববারের মাথায় দিন ঠিক করে এসেছে হাবলু। জেঠামশায় গুনগুন করে আপত্তি জানিয়েছিল, আবার বলেছিল অবনীর বিয়ে হয়ে যাক, তখন ভাবা যাবে। কিন্তু হাবলু বলেছে, না, তুমি স্টেশনে নিয়ে এস, স্টেশনে দেখাব, তারপর খুলনার ট্রেনে তুলে দেব যদি পছন্দ না হয়।

পাগল নাকি, ট্রেনে তুলে দিবি মানে?

হাবলু বলল, দিদি ওপারে চলে যাবে।

তোর কথায় যাবে, একা একা।

হাবলুর খুব ভাগ্য জেঠাকে খালি দোকানে একা পেয়ে ছিল। কোর্টেও এত কথা বলা যেত না। সব সময় মক্কেলের ভিড়, জেঠা বলল, টাকা পয়সার জোগাড় কর, ওডা থাকলি কবে ওর বে' হয়ে যেত, বনগাঁয় কি ছেলের অভাব, তুই দেশে গে নিয়ে আয়, বুলু আমার মেয়ের মতোন।

হাবলু ঘাড় কাত করে আচমকা জিজ্ঞেস করেছিল, মেয়ে ঘাড়ে থাকতি ছেলের বে' দেয় কেডা জেঠাবাবু?

খগেন উকিল জবাব দেয় নি। অন্যদিকে চেয়েছিল। হাবলু তখন বলল, তোমার মেয়ের মতো যদি হয়, বিয়ের খরচ তুমি দেবা না?

খগেন উকিল বলেছিল, তোর জেঠিমা যা বলে তাই হবে।

জেঠিমা তো বলবে না, জেঠিমা কি পয়সা বের করবে?

খগেন উকিল বলেছিল, গুরুজনদের নিয়ে তোর এ কী কথা হাবলু?

আমি কী বললাম, তুমিই তো বলছ জ্যেঠিমা এখন তার ছেলের বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত, আমার দিদির বিয়েতে টাকা দেবে কেন?

কথার সত্যতা খগেন উকিল জানে। কিন্তু হ্যাঁ না বলতে সাহস হয় না। হাবলু জানে জেঠামশায় নয় জেঠিমাই ও বাড়ির কর্ত্রী। জেঠিমার কথাতেই সব চলে। তাকে যে অবনীদা পিটিয়ে ছিল সেও জেঠিমার সম্মতিতেই। তার সম্মতি ছাড়া ও বাড়িতে কোনও কিছু হওয়ার উপায় নেই।

খগেন উকিল বলল, হাবলু তোর জেঠিমাকে গিয়ে তুই বলবি।

তোমারে তো বললাম, তুমি বলো।

তবু তুই বললে সে হ্যাঁ করতেও পারে, তুই যে চলে গেলি না বলে তাতে তোর জেঠিমা কম কষ্ট পায়নি, কেঁদেছে পর্যন্ত?

ইস! হাবলু মুখ দিয়ে আওয়াজ করল, তারপর বলল, জেঠাবাবু, অবনীদাও কেঁদেছিল, আমার বড় ভাই?

হাবলু ওটা ভুলে যা, বড় ভাই এর হাতে চড়চাপড় খায়না কেউ?

ভুলেই তো গেছি জেঠাবাবু, আবার ফিরে যাব?

কোথায়, ওপারে?

না তুমার বাড়িতি, অবনীদার বিয়ে সামনে।

খগেন উকিল গম্ভীর হয়ে থাকে। হাবলু বোঝে কথাটায় বিপদে পড়ে গেছে তার জেঠামশায়। সে একটু বাদে মাথা নেড়ে বলল, না যাব না, আমি কলকাতায় খুব ভালো আছি, গড়ের মাঠে গে ঘুমোই, মো'নবাগান-ইজবেঙ্গল খেলা দেখি, ট্রামে চড়ি, ডবল ডেকার বাসে চড়ি—

খগেন উকিল বলল, চাকরি বাকরি?

করব না, কিন্তু পাকিস্তানও উঠে যাবে।

কেডা বলল?

খবরে কাগজে দিয়েছে। হাবলু অম্লান মুখে মিথ্যে বলল। শুনে খগেন উকিল বলল, খবরের কাগজে ওরকম লেখে, তাহলে কী হবে তোর, জেঠিরে বলবি নে?

তুমিই তো বলবা জেঠাবাবু, স্টেশনে মেয়ে দেখা হবে, জেঠিরেও আসতি বলবা, দিদির বিয়েটা অবনীদার বিয়ের আগেই হয়ে যাবে।

জেঠা কোন কথা বলেনি। হাবলু উঠেছিল। দোকানের বাইরে গিয়ে ভিতরে তাকাতে দেখে জেঠামশায় কেমন কুঁজো হয়ে বসে আছে। মনে হচ্ছে মাথার উপরে খুব চাপ। তার খুব মায়া হল। ইস্! জেঠামশায়কে ধরে আশাশুনিতে দিয়ে এলে হয়। ভাই-এর সঙ্গে থাকত। মনে হতেই সে কথাটা বলতেই আঁতকে উঠল খগেন উকিল, কী সব বলিস, তোর মাথার ঠিক নেই।

হাবলুর তখন রোখ চেপে গেছে, বলল, তুমি সাগরদাঁড়ি যাবা?

সে কোথায়?

যশোরের কাছে, সাগরদাঁড়ি গিয়ে থাকো আমার দিদিরে নিয়ে।

আবার আবোল তাবোল বলছিস?

আবোল তাবোল কেন হবে, সেখেনে কবির বাড়ি।

কবি, সে কেডা?

মাইকেল মধুসূদন, তুমি এডাও জান না জেঠাবাবু? মধুকবি, বিদায়ঘাট।

খগেন উকিল রেগে গেছে, এই তুই যা তো, আমি কেন যাব?

হাবলু বলেছে, তাহলে অবনীদা আর জেঠি টিট হবে, কপোতাক্ষ আছে সেখেনে, আমার দিদির বে দরকার হলি সাগরদাঁড়ি গে দেব।

হাবলু একটু এলোমেলো হয়ে এলোমেলো কথাই বলছিল। খগেন উকিল খুব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। সে বুঝে গিয়েছিল তার ভাইপো এই এপারে বিদেশ বিভুঁয়ে খড়কুটোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। সে তো রাখতে পারে নি তাকে। মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিলে খারাপ হয় না। কিন্তু তা সম্ভব হবে কিনা জানে না। আর হাবলু যে রকম কথা বলছে, কী

হবে তার কে জানে? হাবলু আবার বলল, বিদায় ঘাট জানো জেঠাবাবু, অশরুঘাট, দিদি তো তোমার অশরুঘাটেই বসে আছে, তুমি তা জানো?

খগেন উকিল হাত রাখে হাবলুর পিঠে। তার মুখখানি আঁধারে ভরে গেল। বলল, হাবলু মারধোর খেয়ে চলে গেলি, তুই এরকম আসিস, টাকা নিবি তুই, লাগবে?

হাবলু বলল, নাহ্, কী হবে, জমিদারি, বাবার অত টাকা, অমন গাং কপোতাক্ষ সব ছেড়ে দিল সে, চলে গেল মাদ্রাজ, কিসের টাকা?

খগেন উকিল হতভম্ব।

একত্রিশ

খগেন উকিল, খগেন্দ্রনাথ রায় বনগাঁয় অনেকদিন পশার করেছে। লোকটি এমনি খারাপ না, কিন্তু পরিবার যা বলবে তার বাইরে যাওয়া খগেনের সাধ্য নয়। না হলে খগেন তো চেয়েছিল তার দুর্বল ভাইটাকে নিয়ে আসে এখানে। কিছু একটা করে দেয়। সে আর এমন কি কঠিন ছিল? এপারের মুসলমান ওপারে জমি খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। কেউ যায় নি বটে, কিন্তু কিনে রেখেছে, যেমন ওপারের হিন্দু এপারে ব্যবস্থা করে, এমন কি বাড়ি ঘরদোর করেও ওপার ছাড়ে নি। ছেলেপুলেদের পাঠিয়ে দিয়ে ওপারে অপেক্ষা করছে। তেমন অসুবিধে না হলে যতদিন পারবে থাকবে। এইটাই বেশি হচ্ছে। খগেন চেয়েছিল মৃগেনের জন্য এখানে ব্যবস্থা করে দেয়। জমি কিনে বাড়ি তুলে এপারে তার একটা সংস্থান করে দেয়। তাহলে মৃগেন ধীরে ধীরে চলে আসতে পারত। তার দুটো মেয়ে আর একটা ছেলে তো এপারেই আছে, তারা এক জায়গায় থাকত। আপাতত একটা দোকান করে বসত। সেই মতো এগিয়েছিল খগেন, কিন্তু তার বউ অনিমা আটকেছে। কেন? যাদেরটা তারা বুঝুক।

অনিমার যুক্তি ছিল তার ছোট ভাই মৃগেনের কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। চোখও খারাপ। ভালো দ্যাখে না। এতদিন ধরে জমি নিয়ে থেকেছে, সে করবে ব্যবসা? এপারে এলে, আর বনগাঁ এলে পুরো ফ্যামিলিই বড় ভাই-এর ঘাড়ে এসে পড়বে। থাকুক ওপারে। জমির ভাগ তো ঠিক মতো পায় নি খগেন, বেশিটা তো মৃগেনই নিয়েছে, এপারে এলে ওই ভাগ দিতে হবে, অনিমা ছাড়বে না।

ভয় পেয়েছিল খগেন রায়। কথাটা সত্যিই মনে হয়েছিল। মৃগেন কতটা কী করে উঠতে পারবে সন্দেহ আছে। অনেকগুলো ছেলে মেয়ে। তার নিজের তো দুই মেয়ে এক ছেলে। মেয়ে দুটোর বিয়ে হয়েছে ভালো ঘরে। ছেলের ব্যবস্থা হচ্ছে। মৃগেনের চার মেয়ে দুই ছেলে কোনোটার কোনও ব্যবস্থাই হয়নি। মেয়েদের বিয়ে নিয়ে কোনও ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। মাঝে মধ্যে আশাশুনি থেকে পোস্টকার্ড আসে, তাতে সব কথা থাকে, কিন্তু কোন উদ্বেগ থাকে না।

অনিমা নিবৃত্ত করায় খগেন আর এগোয় নি। মৃগেনের এক ছেলে এক মেয়ে ঘাড়ে এসে উঠতে অনিমা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল। শেষে হাবলুকে তাড়িয়ে মেয়েটাকে রেখে দিয়েছে। কাজে লাগে মেয়েটা। খুব ভালো মেয়ে। কোন কাজে না বলে না। কাজের লোক ছেড়ে দিয়েছে অনিমা, সব কাজ সেই করে। সে নিজেও বলেছে শুধু শুধু একা বসে থাকবে কেন? সংসারে যদি কোনও সাহায্য করতে পারে তো ভালো।

হাবলু চলে গেল। খগেন তাকে একবার বলতেও পারে নি থেকে যেতে। তার বড় ভাই-এর বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে, হাবলু থাকুক ক'দিন। কিন্তু অনিমা কিংবা খগেনের ছেলে অবনী কীভাবে নেবে তা ঠিক করতে না পেরে খগেন কোনও জোর করে নি। বলেও নি। সন্ধ্যের কোথায় যাবি হাবলু? হাবলুটার মাথাও একটু কেমন যেন। এমনি সব কিছু স্বাভাবিক, কিন্তু আচমকা এমন সব কথা বলে ফেলে! শুনলে মনে হবে মাথায় গোলামাল থাকলেও থাকতে পারে। সে সব কথা কোনওটা সত্যি, আবার কোনওটা এমনই বিভ্রান্তিকর যে ধন্ধ লেগে যায় মনে।

হাবলু যদি তার নিজের ছেলে হত ডাক্তার দেখাত খগেন রায়। কিন্তু পরের ছেলেকে ডাক্তার দেখিয়ে পয়সা নষ্ট করতে দেবে না অনিমা। তাই সেই কর্তব্য ত্যাগ করেছে খগেন। পরে মনে হয়েছে হাবলুকে ডাক্তার দেখিয়েও লাভ নেই। ও ওইরকম। ও সব সারে না। শুধু শুধু পয়সা খরচ করে লাভ নেই। হাবলু চোরের মার খেয়েছিল অবনীর কাছে। তখন খগেন আটকাতে গিয়েও আটকাতে পারেনি। অনিমার চোখ দেখে টের পেয়েছিল অবনীকে নিবৃত্ত করলে মা ও ছেলে, দু'জনেই খুব অসন্তুষ্ট হবে। তার ফল ভালো হবে না। ছেলে যখন ছোট ছিল একরকম, বড় হয়ে গেলে তার কথা শুনতে হয়। আর অনিমার যুক্তি তখন ঠিক মনে হয়েছিল, বড় ভাই ছোট ভাইকে কি শাসন করবে না? করবে করবে। কিন্তু খগেন কি জানত না হাবলুকে একদম পছন্দ করে নি অনিমা। হাবলু কোনও কথা শুনত না। মুখে মুখে তর্কও করত। অনিমা চেয়েছিল হাবলুকে নিজের মতো করে চালাতে। হাবলু চলবে কেন? বরং তার দিদি বুলুকে দিয়ে অনিমা বাসন মাজা জল তোলা ঘর মোছার কাজ করালে হাবলু আটকাত। একদিন জেঠা জেঠির সামনেই বলে উঠেছিল, দিদি কি তোমাদের ঝি হতে এয়েচে, কাজের লোক ছেড়ে দিয়ে ওরে দিয়ে সব করাচ্ছ।

হাবলুর এই কথায় বুলু তাকে থামাতে চেয়েছিল, পারে নি। কিন্তু তারপরেই অবনী শাসন করল। অনিমা করাল অবনীকে দিয়ে। এমন মার মারল যে হাবলু পালাল। খগেন চুপ করে ছিল। খগেনের মনে হয়েছিল হাবলু কথাটা ঠিক বললেও, বলা উচিত হয় নি তার। সেই কারণে অবনীকে দিয়ে যা করিয়েছে অনিমা তাতে কোনও দোষ নেই। আর ছেলেপুলে শাসন করতে হয়। হাবলু তার আশ্রয়ে। হাবলুকে শাসন করতেই হবে। হাবলু পালিয়ে গেলে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল খগেন, তখন অনিমা তাকে শান্ত করেছিল,

বড় হয়েছে, ও ঠিক কোথাও না কোথাও গিয়ে পড়ব, আর যদি ঠেলায় পড়ে তো ফিরে আসবে, দুটো ছেলে মেয়ের পিছনে খরচ নেই, খাওয়া দাওয়া তো ভালোই, কতটা ভাত খেত হাবলু।

খগেন লুকিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিল আশাশুনিতে। তার জবাবও পেয়েছিল। মৃগেন বলেছিল, সে কী করবে, যার কপালে সে খাবে, তার চোখের জ্যোতি কমছে, সে কী করতে পারে, এখন সব আর দেখতে পায় না। হাবলু আর দুই মেয়েকে এ জীবনে আর দেখতে পাবে কিনা সন্দেহ। কোর্টের ঠিকানাতেই চিঠি এসেছিল ওপারের লোকের হাতে হাতে। এরপর খগেন তার হাবলুর খোঁজ করে নি।

খগেন বাড়ি ফিরে বুলুর হাতে ব্যাগ দিয়ে চাপা গলায় বলল, তোর ভাই এসেছিল দুপুরে, হাবলু।

বুলুর চোখে আচমকা জল এসে গেল, ভাই! কখন?

এসেছিল আবার চলেও গেল।

আমারে দেখি গেল না জেঠাবাবু?

খগেন বলে, না, ওর তাড়া ছিল, কতবার বললাম থাকতি।

বুলু আঁচলে চোখ মুছে বলল, ওডা ক্ষেপা, পাগল, জেঠাবাবু, খেয়ে এসেছিল, খেয়েচে?

হ্যাঁ, আমি হোটেলে ভাত খাওয়ালাম। খগেন মিথ্যে বলল।

ও কি খুব রোগা হয়ে গেছে?

না না, মাথায় আরও বেড়েছে, গালে পাতলা দাড়ি, পুরুষমানুষ।

ওর মাথা ঠিক আছে জেঠাবাবু?

আছে, তোর বিয়ে ঠিক করছে।

বুলু ঘাবড়ে গেল। কীর রকম যেন হয়ে গেল। তার বিয়ে! সে কী কথা? ভাই ঠিক করছে? ভাইটা সত্যি পাগল। তার কেন বিয়ে? আগে তো অবনীদার বিয়ে। সেইটা নিয়েই তো ভাবা দরকার এখন। কথাটা বুলু তার জেঠা মশায়কে সন্তুষ্ট করতে বলতে গিয়ে কেমন যেন গুডিয়ে উঠল। গলা বুঁজে গেল।

খগেন জিজ্ঞেস করে, তোর জেঠি কোথায়?

জেঠি গেছে সিনেমা, উত্তম সুচিত্রার বই।

এখন গেল, দুপুরে গেল না কেন?

খুব রোদ্দুর, রিকশায় যাবে আসবে, পাশের বাড়ির কাকিমা গেছে।

খগেন নিশ্চিন্ত হল। অনিমা যখন নেই অনেক কথাই বলা যাবে বুলুর সঙ্গে। বলল, অবনীর আগে তোর বিয়ে দরকার।

না, না বড়দার, জেঠি তাই চায়।

খগেন বলল, হাবলু ভালো ছেলে ঠিক করছে, আমি মত দিলেই হবে, আমার মত জানতে এয়েছিল।

তুমি মোটেই মত দেবা না জেঠাবাবু।

হেসে ফেলল খগেন, বুলুর মাথায় হাত রাখল, বলল, দেখি কেমন ছেলে, তোরে তো যার তার হাতে ফেলি দিতি পারি নে, তোর মা বাবা এখেনে নেই, আমার তো সব দায়িত্ব, আমিও তো খুঁজছি।

না খুঁজো না, আমি বিয়ে করব না।

তা বললি হয়, সে আমি দেখছি।

হাবলু আবার পাত্র আনবে, হাবলুর কথা মোটে বিশ্বাস করো না।

আসবে, পুন্নিমের দিন ছুটি আছে, রোববার পড়েছে।

তাতে কী, না জেঠাবাবু না।

খগেন বলল কী বলে গেছে হাবলু। শুনতে শুনতে শিহরিত হতে লাগল বুলু। জেঠামশায় তার সঙ্গে পরামর্শ করছে কী করে জেঠি আর অবনীকে না জানিয়ে দেখার কাজটা করে ফেলা যায় বনগাঁ স্টেশনে। বুলুর বুক কাঁপতে লাগল। হাবলু জন্য বুক ফেটে গেল। ভাইরে আমার ভাই। তুই আনবি কাকে? সে কেমন রে ভাই আমার?

খগেন বলল, চা কর, দেখি সে কেমন ছেলে, তারপর আমি মত দেব।

জেঠি? জেঠিরে তো বলবা?

পরে, আগে সব ঠিক হোক।

না, না জেঠির মত না নিয়ে করো না। বুলু বলল।

খগেন বলল, তোর মা বাবার মতও তো দরকার।

বুলু চুপ করে থাকলে। সে প্রায় বন্দিনী হয়ে আছে এখানে। তার যতটুকু মুক্তি তা এই জেঠা। কিন্তু জেঠার সঙ্গেই বা কখন কথা হয়? সব সময় তো এ বাড়িতে লোক। এই ক'দিন আগে জেঠির বোন আর ছেলে এসেছিল কৃষ্ণনগর থেকে। সে বেশ বড় ছেলে। কিন্তু মাথায় ছোট, চোখ দুটো কেমন ধূর্তামিতে ভরা। সাতদিন ছিল, সাতদিন খুব কষ্টে গেছে বুলুর। শুধু তাকে ডাকে, এই জল আন, এই চা করবি, এই বুলু সিনেমায় যাবি। এই করতে করতে যাওয়ার আগের দিন...। ওফ বুলু তা ভুলতে পারবে না। তাকে ধরেছিল মাসির ছেলে চপল। মাসি আর জেঠি নীচে, অবনীদা দোকানে, জেঠা কোর্টে। দোতলায় ঘুমোচ্ছিল সেই চপল। নীচে নেমে এসেছিল ঘুম ভাঙার পর। বাথরুমে গেল উঠোন পেরিয়ে কলতলার দিকে। টিনের দরজা খোলা রেখে ছরছর করে পেচ্ছাপ করে বেরিয়ে এসে বলল, এই জল ঢেলে দিয়ে উপরে আয় তো এক গেলাস জল নিয়ে।

বুলু জল ঢেলে দিয়ে চুপ করে কলতলায় বাসন ধুতে লাগল। তখন বারান্দা থেকে ডাকল চপল, জল দিলি না, তেষ্টা পেয়েছে।

যাই! বুলু উঠল। জেঠিও ঘর থেকে বলে উঠল, চপলদারে জল দে, শুনতে পাচ্ছিস নে বুলু!

ঘরে গিয়ে কলসি থেকে গেলাসে জল ভরে বেরোতে দ্যাখে সে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছে। জল, বলতে চপল বলল, দিয়ে যা উপরে। উপরে উঠে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে তাকে জাপটে ধরেছিল চপল, এই বুলু, এই।

কী ভীষণ তার পেষণ! ওইরকম ছোটখাটো যুবকের ভিতর যে ওইরকম শক্তি তা কল্পনার বাইরে। চাপা গলায় বলেছিল, খবরদার কথা বলবিনে, আমি তোরে বিয়ে করব, করবই, এখন দেখে নিই।

বুলু ছটফট করছিল। তাকে শোয়াতে চাইছিল চপল তক্তপোষের উপরে বিছানায়। সে শেষ পর্যন্ত ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। ততক্ষণে চপল তাকে প্রায় বেআব্রু করে ছেড়েছিল। ব্লাউজ ছিঁড়ে দিয়েছিল। চপল বলেছিল, যদি শোরগোল করিস, তোরে এ বাড়িতে রাখবে না—পাকিস্তানে গেলিও তোরে ওরা ছাড়বে না।

বুলু চুপ করে গিয়েছিল। নিঃশব্দে নেমে এসে জেঠার ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। পরদিন চপল আবার চেষ্টা করেছিল। সে যায় নি। তা নিয়ে জেঠির কাছে কথাও শুনতে হয়েছিল, জল দিতে পারিস নি তুই।

বুলু জিজ্ঞেস করল, জেঠা জল খাবে?

না, না, চা কর, অবনীর আগে যদি হয়ে যায় বিয়েটা, যাবে।

বুলু দাঁড়িয়ে থাকল। চোখ ছলছল করছে। তার তো এর ভিতরেই ভয় ঢুকেছে অবনীর বিয়ের সময় চপল আসবে। এলে যে কী হবে তখন। সে বলল, জেঠা বড়দার বিয়ের সময় আশাশুনি থেকে মা-বাবা আসবে?

তোর মা বাবা, পাকিস্তান থেকে, পারবে?

বাহ্, আসবে না। বড় ছেলের বিয়ে হবে, তারা থাকবে না?

থাকলি তো ভালো, কিন্তু পাকিস্তান তো আলাদা দেশ, পাসপোর্ট ভিসা, ওসব কেডা করে দেবে তোর বাবারে?

বুলু বলল, বেলাকে তো আসতে পারে।

পারে, কিন্তু ওভাবে আসা খুব ঝুঁকির, ধরা পড়লে একেবারে জেল হাজত।

বুলুর চোখে জল এসে যায়। মা এলে, বাবা এলে, হাবলু থাকলে সে নিশ্চিন্ত থাকতে পারত। না হলে ওই চপল। চপল এসে তার সব্বোনাশ করে দেবে। আর হাবলু যে সম্বন্ধ আনছে তা কি হবে? জেঠি যে মত দেবে তার বাইরে কি কিছু হবে? জেঠি কি মত দেবে? জেঠি তাকে সারা জীবনের মতো রেখে দেবে। এখেনে দাসী হয়েই থাকতে হবে। তার ছেলের বউ এলে যে কী হবে? বুলু কিছু ভাবতে না পেরে বলল, জেঠা আমি যদি পাকিস্তান থেকে ঘুরে আসি, এখন মা-বাবার জন্য মনটা খারাপ লাগে।

অবাক খগেন উকিল বলল, এ আবার কী কথা, হাবলু তোর বিয়ের ব্যবস্থা করছে, কিন্তু হাবলুর যা দেখলাম, ওর মাথার ঠিক নেই, কীসব কথা বলল, পাগল টাগল ধরে না আনে।

শুনে কপালে হাত দিয়ে বসে পড়ল বুলু। নিঃশব্দে অশ্রুপাত করতে লাগল। চোখের সামনে ধূ ধূ নদী, ধূধূ প্রান্তর, জন মানব নেই কোথাও, আলো নেই কোথাও। তা দেখে খগেন উকিল বলল, তোর কোনও ভয় নেই, আমি সব দেখে তবে মত দেব, যার তার হাতে তোকে কি তুলে দিতে পারি?

বত্রিশ

হাবলু বসিরহাট থেকে ফিরেছে। বসিরহাটে কি পিসির বাড়ি গিয়েছিলি? হাবলু মাথা নাড়ে, না দিদমার বাড়ি।

প্রভাময়ী বলে, কতবার আমাকে বলেছে মাসি, যাওয়া হয় নি।

হুঁ, আমাকেও বলেছে দিম্মা, তুমি যখন যাবে আমিও যাব। বলল টিয়া।

হাবলু বাঁকা চোখে টিয়ার দিকে তাকায়। শাড়ি পরে খুব বড়ো হয়ে গেছে ময়রম মানে ময়না মানে এই টিয়া। তার সেই আয়না-গয়না বেড়াল গেল কোথায়? চঞ্চল হল হাবলুর চোখ। বেড়াল আছে কোথাও ঘাপটি মেরে। হাবলুর সামনে আসতে চাইছে না ঠিক। আসলে ও তো পাকিস্তানের চর। এদিকের খবর দেয় ওদিকে। কী করে দেয়? হাবলু জানে। ও পারে থাকতে শশধর দত্তর বই পড়েছিল। খবর একজনের কাছ থেকে আর একজনের কাছে যায়। সে দেয় আর একজনকে, এইভাবে দূরে চলে যায়। আমার এমনও হতে পারে খবর সব খবরের কাগজে ছাপা হয়ে জনে জনে চলে যায়। তবে যে খবর গোপন, সেই খবর কাগজে ওঠে বলে জানা নেই। হাবলু তেমন পড়ে না খবরের কাগজ। পড়লেই মাথা গরম, তার পর মন খারাপ হয়ে ওঠে। শুধু রিফ্যুজি ক্যাম্পের খবর। কতরকম খবর ক্যাম্পের। পড়তে একদম ভালো লাগে না। তার মা-বাবা এলে কি রিফ্যুজি ক্যাম্পে উঠবে? তারা আছে বলে মা বাবা দুইবোন তো অন্য লোকের বাড়িতে থাকতে পারবে না। হাবলু কথা বলছে না দেখে টিয়া বলল, বসিরহাট কেমন লাগল হাবলুদা?

বলবিনে তো আর কাউরে?

টিয়া হেসে ফেলে, ও মা, বললে কী হবে?

তাহলে শুনতি হবে না।

প্রভাময়ী উঠতে উঠতে বললেন, তুই বিশ্রাম কর, রোদে ঘুরেছিস খুব, চোখমুখ বসেও গেছে, বাসে কত সময় লাগল।

পাকা তিনঘণ্টা, বিমান ঘাঁটির পাশ দিয়ে গেল।

বিমান ঘাঁটি! কোথায়?

বসিরহাটের রাস্তায়, বারসতের আগে।

বিমান, এরোপ্লেন দেখলে।

হাবলু বল, হ্যাঁ, ঈগল পাখির মতো।

ঈগল পাখি। তুমি দেখেছ?

বই-এ ছবি দেখেছি, একেবারে ঈগল পাখি, কত বড়।

শুনতে শুনতে প্রভাময়ী বেরিয়ে গেল। এখন মাদুরে হাবলু আর টিয়া মুখোমুখি। টিয়া বলল, আমি বিমানঘাঁটি দেখি নি।

আমি দেখলাম, প্লেন তখন নামল, কী বড়, কী শব্দ।

রূপোর মতো চকচক করে?

হ্যাঁ করে।

আমারে একদিন নিয়ে চল না।

হাবলু বলল, বিমান ঘাঁটি তোরে নিয়ে যাই, তোর পাকিস্তানি বেড়াল জেনে যাক, খবর পাঠিয়ে দিক ওপারে।

টিয়া হাসল, আবার কপট রাগও করল, নিয়ে যাবে না তাহলে?

নিয়ে যেতি পারি, কিন্তু ওই গয়না বেড়াল যাবে না।

গয়না না, ওর নাম লীলাবতী।

হাবলু বলল, লীলাবতী তো তুই রে ময়না।

ময়না কে হল?

কেন তুই।

আচ্ছা আমি ময়না, নিয়ে যাবা কি না বলো।

যাব, কিন্তু ওই বেড়াল বাদ।

বেড়াল নিয়ে যাবে কে?

ও নিজে যাবে, বেড়াল কোথায় না যায় বল।

শুনে হাসল টিয়া। হেসে লীলাবতী হয়ে উঠল যেন। হাবলু অবাক হয়ে দেখল তাকে। বাহ দেখতে তো বেশ লাগে। ওপারে অজেত আলির বোন ময়রমকে সে পছন্দ করত। বড্ড গায়ে পড়া ছিল মেয়েটা তবু ও। কে বলেছে কাঁচা আমা জারাতে, কে বলেছে ছড়া তেঁতুল দিতে, কে তাকে বলতে, বেশি করে ভাত খেয়ো হাবলুদা, এমন ফুটবল মারো, ওতে শক্তি কম ক্ষয় হয়, ভাত ডিম সেদ্ধ খাও, সকালে ফেনা ভাতের সঙ্গে ঘি খাও, আলাদা করে দুধ ছানা খেও, ঘি দেব নে যাবা?

টিয়া জিজ্ঞেস করল, কখন খেয়ে বেরোলে হাবলুদা?

তোর কী দরকার?

বাব্বা তুমি যেন সব সময় তেতে পুড়ে থাকো, না খাও তো না খাবা।

হাবলু বলল, আমি খাই না খাই আমি জানি, তুই শুধু বলিস কেন আমার শক্তি ক্ষয় হচ্ছে, সেদ্ধ ডিম ঘি ফেনাভাত খেতি, আমারটা আমি বোঝবো।

কী বলি? ভ্রু কুঁচকে যায় টিয়ার। কথাটা শুনে ভিতরটা ঈষৎ কেঁপেও যে যায় নি তা নয়। তবু কথাটা ভালো করে শুনতে আবার জিজ্ঞেস করতে হাবলু বলল, কানে কম শুনিস, আমারে বলিস কেন এটা খাই যেন ওটা খাই যেন, ডিম দুধ ছানা, ঘি মাখন, আমার শক্তি ক্ষয় হচ্ছে, হচ্ছে হচ্ছে।

শুনতে শুনতে টিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে হাবলুর খোলা বুকের দিকে তাকিয়ে থাকল। গরমে জামার সব বোতাম খোলা। ইচ্ছে হচ্ছে ওই চওড়া বুকে নখের আঁচড় টেনে দেয়। হ্যাঁরে, কী বলছিস তুই হাবলুদা, আমি একথা কখন বললাম। ইস! কী লজ্জার কথা। আমি এসবের কী জানি? এ কথাটা আমি শুনে ছিলাম এই রকম নাকি হয়। কিন্তু কার হয়? কার হয়? তোর হবে কেন?

হাবলু জিজ্ঞেস করে ওঠে, কী দেখিস?

কই কী দেখি?

দেখিস তো।

কই দেখি?

হাবলু বলল, আমি দেখলাম তুই দেখিস আমারে।

টিয়া রাঙা হয়ে উঠল আচমকা, বলে উঠল, বেশ করি।

বেশ করলি হবে, আমার উপর চোখ দিবি নে।

দেব, দেব, বেশ করব দেব।

এপারে এসে তোর সাহস কত বেড়েছে টিয়ে না ময়রম।

আবার ওই নাম?

তাহলে কী বলব?

আমার নাম নেই, আমি টিয়া, টিয়া বলতি পার না।

না পারি নে, আমি একটা নামই জানি।

তাহলে আমারে ডাকবা না, তুমি বসে থাক, আমি যাই। বলে মুখ অন্ধকার করে মুখ ভার করে টিয়া বসে থাকল। উঠবে উঠবে করেও উঠতে পারল না। হাবলু দেখল তার চোখ টলটল করছে। এইটাই হাবলুকে খুব বিপদে ফেলে। ময়রম ঠিক এইটাই করত। আমি তাহলে যাই এবার ময়রম।

আজই বাড়ি, মামা বাড়ি থাকবা না?

না বাড়ি যেতি হবে।

ইস! চলি যাবা, না গেলি হয় না?

না হয় না, তিনদিন আছি, বাবা রাগ করবে, চাদ্দিকে গোলমাল লেগেছে টের পাচ্ছিস।

গোলমাল তো অনেকদিন লেগেছে, জম্মের সময় থেকে।

পার্টিশনে জম্মো। হাবলু বলে।

না মন্বন্তরে, মা বলে ওই জন্যি আমি জম্মের পর থেকে শুধু খাব খাব করি।

সত্যি?

না সত্যি না, মা বলে। ময়রম স্তিমিত গলায় বলে।

ওই জন্যি তুই খাওয়াতি চাস আমারে।

জানি নে।

আমি তাহলি যাই।

যাবা, যাও। বলে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ময়রম। চোখ টলটল করতে লাগল। এই যে চেয়ে আছে। সেই থেকে চেয়ে আছে। চোখের জল সেই থেকে ধরে আছে। পড়ছে না। আর চোখে জল দেখে হাবলু যে কেমন হয়ে গেল, এই এই, তুই কানছিস নাকি, চোখে পানি এসে গেল এর ভিতরে।

ঝটকা দিয়ে উঠল টিয়া, না কানছিনে। বলে সে চোখে আঁচল দিল, বলল, কানছি তো তোমার কী, তুমি যাও না গড়ের মাঠে গিয়ে ঘুমাও, এরোড্রোমে গিয়ে ঈগল ছানারে ইঁদুর ধরে দাও।

হেসে উঠল হাবলু, কী বললি, ইঁদুর ছানা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, না খেলি ঈগল পাখি ওড়াবে কী করে?

তেল খায়, পেট্রল তা জানিস?

না জানিনে যাও। বলে আবার চোখে আঁচল দিতেই হাবলু এসে তার হাত থেকে আঁচল টেনে দিয়ে বলল, কানছিস কেন?

এমনি।

আচ্ছা নিয়ে আয়, মন্বন্তরে তোর জম্মো, না খাওয়ালি তোর কষ্ট যাবে না, আমারও শক্তি ক্ষয় হবে, যা নিয়ে আয়।

ঝপ করে উঠে পড়ল টিয়া। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, একদম নড়বে না, আমি নিয়ে আসছি, বসে থাকো।

হ্যাঁ মন্বন্তরের সময় ময়রমের জন্ম। মন্বন্তরের আগে হাবলু হয়েছিল। মন্বন্তরে ডলু। মেয়েরা নিজে না খেয়ে পুরুষ লোককে খাওয়াতে চায়, মন্বন্তরের কথা মনে রেখেছে বলে? শুনেছে বলে?

ক'দিন আগে ফণিভুষণ এসেছিল, বলছিল, কী খারাপ সময় গেছে।

অভিরাম মামা মাথা দোলাচ্ছিল। কথাটা সত্যি। হাবলু শুনছিল। ফণিভূষণ বোঝাচ্ছিল

বাঙালির যা হয়েছে, পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গে যা হয়েছে ভারতের আর কোথাও তা হয় নি। দেশভাগ হয়েছে কিন্তু তার আগে দুর্ভিক্ষ, প্রলয় ঝড়, কাপড়ের অভাব—এসব তো হয় নি। রায়ট হয়েছে অবশ্য নানা জায়গায়, এই পূর্ব সীমান্তের মতো পশ্চিমেও, কিন্তু বাকিটা তো দ্যাখে নি তারা।

হাবলু শুনতে শুনতে বলেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

আর সে জন্যই তো হয়েছে এসব, এদিকে না হয় বোমা পড়েনি, কিন্তু না খেয়েই কত মানুষ মরেছে, কাপড়ের অভাবে গলায় দড়ি দিয়েছে কতজন—এসব তো যুদ্ধের চেয়ে কম কিছু না।

অভিরাম বলেছিল, তুমি তো ভালো কথা বলেছ ফণি, একেবারে সত্যি কথা, যুদ্ধের চেয়ে বেশি, কত মানুষ ভিটে ছাড়া হল।

ফণিভূষণ বলে, আমি মাড়োয়ারিদের বলেছি, বঙ্গালি লড়াই করতে পারে না তবে কী করছে এতদিন ধরে, এখনও তো লোক আসছে ওপার থেকে, এপার থেকে যাচ্ছে কিনা জানি না।

তুমি তো আগে এমন কথা বলতে না ফণি। অভিরাম বিস্ময় প্রকাশ করে।

এই জন্যে শহরে আসা দরকার দাদা, বুঝতে পারছি তাঁতিপাড়া, বাগেরহাট-এ থাকলে কিছুই জানতাম না, কলকাতায় না এলে কত কিছু জানতাম না।

অভিরাম বলে, তা তো ঠিক, গ্রাম তো কুয়োর মতো।

পার্টিশন আমাদের এক ধাক্কায় সাবালক করে দিয়েছে দাদা।

হাবলু অবাক হয়ে কথাগুলো শুনতে শুনতে ভাবছিল, তাহলে তো পার্টিশন ভালোই।

না ভালো না। মাথা নেড়েছিল ফণিভূষণ এবং অভিরাম, ফণিভূষণ বলেছিল, ভালো হবে কেন, তবে হ্যাঁ, গরিব মুসলমান চাষিরা চাইত তাদেরও কিছু হোক, তা আমরা জানতাম না সত্যি।

অভিরাম বলেছিল, জানলাম দেরিতে, আগে জানলে এত মানুষ মরত না রায়টে, তবে পাঞ্জাবিরা ইস্ট পাকিস্তানে যাচ্ছে, তোমার নৈমদ্দি, কলিমদ্দি হাফিজদ্দিরা কেমন থাকবে বলা যায় না।

ফণিভূষণ বলেছিল, কলকাতায় না এলে সবটা বুঝতে পারতাম না দাদা।

টিয়া ঢুকল, একটা ডিসে দুটো ডিম সেদ্ধ করে এনেছে। সঙ্গে মরিচ গুঁড়ো আর নুন, বলল, খাও, পুরুষ মানুষরে না খেলি চলবে কেন?

তুই খাবিনে?

ও মা, আমরা তো ভাত খেয়ে উঠলাম এই, তুমি খাও।

হাবলুর খিদে পেয়েছিল। সে হাত বাড়াল ডিমের দিকে। তার সামনে বসে টিয়া তাকে দেখেই যাচ্ছে। কী দ্যাখে পাকিস্তানিটা এত?

এই কী দেখিস রে তুই? হাবলু আচমকা জিজ্ঞেস করল।

চমকে যায় টিয়া। সে মুগ্ধ হয়ে হাবলুকে লক্ষ করছিল। অনাবৃত বুক পাতলা ঘামে চকচক করছে। জামাটা খুলে ফেলেছে এরই ভিতর। টিয়ার ইচ্ছে হচ্ছে আঁচল দিয়ে মুছে দেয় বুকের ঘাম। বেশ পেটানো শরীর। চওড়া বুক। বুকের উপর হাল্কা রোম। চওড়া কাঁধ। টিয়ার মনে হচ্ছিল দু কাঁধ দু হাতে চেপে ধরে। ঠিক সে সময় হাবলুর ওই জিজ্ঞাসায় মাথা নিচু করল, তার মনের কথা বুঝতে পারল নাকি হাবলু? ইস! হাবলুটা কী? কী দেখছে সে তা টের পাচ্ছে না? গায়ে অন্যের চোখ পড়লেই তো টের পাওয়া যায়। রোঁয়া কাটে। টিয়া বেশ বুঝতে পারে রাস্তায় বেরোলে, ইস্কুল থেকে ফেরার পথে। হাবলু কি বুঝতে পারে না, তার বুকে, কাঁধে চোখ পড়েছিল টিয়ার। কী সুন্দর চেহারা হাবলুর। সে মাথা নামিয়ে বিড়বিড় করে, বলব না, তুমি খেয়ে নাও।

বলবি নে কেন, না বলবি তো দেখবি নে।

দেখব, দেখব, দেখব।

অ্যাই, খবদ্দার না, আমার উপর চোখ দিবি নে, চোখ দেওয়া ভালো না।

ইস্! হাবলু না হাবলা। কিছুই বোঝে না। চোখ দেবে কেন? চোখ দিলে তো রোগা হয়ে যায়। হাবলু হাবলু, তুমি কিচ্ছু বোঝ না, তোমার মাথায় ভুত ঢুকেছে। চাপা গলায় বলতে বলতে টিয়া উঠে পালায় ঘর ছেড়ে।

তেত্রিশ

টিয়া এঘর ওঘর করছিল। একদিন এমন এমন হয়। মন বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেন ব্যস্ত তা ধরা যাবে না। কিন্তু ব্যস্ত তো। ব্যস্ত হচ্ছে সে হাবলুর জন্য। হাবলুদা কেন চাকরি করবে না? এই মেসো মাসির কাছে কতদিন পড়ে থাকবে? টিয়ার বাবা টাকা পাঠিয়েছিল, যাদবপুরের সমীর মামা দিয়ে গেছে তার মাসি প্রভাময়ীর কাছে। দু'শো টাকা। মাসি বলল, তুই রেখে দে।

এত টাকা! আমি টাকা কী করব মাসি?

মাসি প্রভাময়ী বলল, তোর বাবা তো পাঠিয়েছে।

টিয়া বলল, তোমাদের কাছে থাকি, মেসোকে পাঠিয়েছে বাবা।

হ্যাঁ. কিন্তু তোর কিছু লাগবে না?

লাগলে চেয়ে নেব।

এখন মনে হচ্ছে মাসির কাছ থেকে কুড়ি টাকা যদি নিয়ে নিত, কী ভালো হত। কুড়ি টাকার পাঁচ টাকা সে রেখে পনের টাকা হাবলুদার হাতে দিত। হাবলুদা বোনের বিয়ে দেবে। বোন না দিদি। সেই কথা সে শুনেছে মাসিকে যখন হাবলুদা জেঠা মশায়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের কথা বলছিল। শোনার পর থেকেই মনে হচ্ছে হাবলুদাকে তার কিছু

দেওয়া উচিত। বাবা তো তার খাওয়া থাকা পড়ার খরচ পাঠায়। কতদিন মাসি মেসো তাকে টানবে? মাসি মেসো অবশ্য এনিয়ে কোনওরকমেই ভাবিত নয়। মাসি এক এক সময় তাকে আঁকড়ে ধরে বিনবিন করে না! মাসির যে মেয়েটা অকালে চলে গেছে, সে বড় হলে টিয়ার চেয়ে দু'বছর বেশি হত। দুবছর বেশি মানে আর কত বেশি, তাকে মাসি সাজাত। কতরকম কাটের ফ্রক সেলাই করে দিত। হলি ডে অন আইস ফ্রক পরিয়ে বলত, ঘোর, ঘোর দেখি ডিলডিল।

ডিলডিল। ওইটা নাম ছিল তার। মাসি তাকে বুকে আঁকড়ে ধরে বলে, টিয়া তুই আমার ডিলডিল, পেটের মেয়ে গেছে, তুই এয়েচিস।

কিন্তু এখন কী করে টিয়া? হাবলুদাকে যে মাসি জিজ্ঞেস করল, বিয়ের কথা তো বাবা মাকে জানাতে হবে, বিয়ের খরচ নেই?

হুঁ! হাবলুদা শুনেও কিছু করেছে বলে জানা নেই। তার এখন মাথায় রয়েছে ফণিভূষণ কাকাকে নিয়ে যাবে বনগাঁ। ফণিভূষণ কাকার সঙ্গে হাবলুদার দিদির কত তফাৎ বয়সে। দশ বছর তো হবে। নাকি তার বেশি? হাবলুদাকে কিছু দিতে চায় টিয়া। পনের টাকা কেন কুড়ি টাকাই যেটা মাসি নিতে বলেছিল তাকে।

হাবলুদা শোনাচ্ছে তার বৃত্তান্ত খোকনকে। বলছে বনগাঁ অবধি যাও, বনগাঁ টাউন থেকে একটু গেলেই বর্ডার। বর্ডার পেরলে পাকিস্তান। পাকিস্তান সে মানে না। কোনও দেশই থাকার দরকার নেই খোকন। পশু পাখির দেশ আছে? আকাশের মেঘের দেশ আছে, বল।

টিয়া কতবার এঘর এসেছে ওঘর গেছে, হাবলুকে যে কথাগুলো জিজ্ঞেস করবে তার উপায় নেই। খোকন মুর্তিমান বসেই আছে। কারোর সামনে বলার চেয়ে, আলাদা করে বলাই তো ভালো। তাহলে হাবলু তার মনের ইচ্ছেটা যদি ভালো করে বোঝে। খোকনকে যখন হাবলু বর্ডার তত্ত্ব বোঝাচ্ছে টিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল, ওসব ফালতু কথা, মানুষ আর পাখি এক হল?

হাবলু তার কথায় বাধা পেয়ে বলল, হল, যার বোঝার সে বোঝবে।

না বোঝবে না, তা'লে আর হিন্দুস্থান পাকিস্তান হত না।

হাবলু বলে, আমি খোকনরে বলতিছি, তোরে তো বলছি নে ময়রম।

টিয়া কুঁকড়ে গেল হঠাৎ। যখন ময়রম বলে ওঠে হাবলু, গলার স্বর কত বদলে যায়। কী রকম গাঢ়, চিনির রসের মতো থকথকে হয়ে ওঠে যেন। খুব মিঠা। আগে খুব খারাপ লাগত। এখন তো লাগে না। ভালোই লাগে। টিয়া বলল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে হাবলুদা।

বল, এখেনেই বল।

এখেনে বলা যাবে না।

তাহলে কোথায় বলবি গড়ের মাঠে গিয়ে।

টিয়া বলল, হ্যাঁ।

শুনা যাবে না ময়রম।

কেন যাবে না? গড়ের মাঠ শুনে খোকন উৎসাহিত হয়ে উঠল।

হাবলু বলল, কথা উড়ে যাবে, অতবড় মাঠ, যার আরম্ভ নেই শেষ নেই, যদি শেষও হয় গঙ্গায় গিয়ে পড়বে মাঠ হুড়হুড় করে।

টিয়া ছটফট করল ভিতরে ভিতরে। খোকন তো এখন উঠে যেতে পারত। তাহলে সে হাবলুকে বলতে পারত তার মনের ইচ্ছাটি। হাবলু হ্যাঁ বললে সে মাসির কাছে চলে যেত। কিন্তু খোকন উঠছে না। টিয়া দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। হাবলু আর খোকনের কথা শুনতে লাগল।

খোকন বলল, আমারে গড়ের মাঠে নিয়ে গেলে না?

যাব, সময় হোক নিয়ে যাব।

কবে সময় হবে তোমার?

হাবলু বলল, তোরে তার চে বড় জায়গায় নিয়ে যাব।

গড়ের মাঠের চেয়ে বড় মাঠ আছে নাকি?

হাবলু বলল, আছে শুনেছি।

তখন টিয়ার মনে একটা কথা জেগে উঠছিল ভুস করে, আবার ডুবেও যাচ্ছিল ভুস করে। চলন বিলের কথা বলবে নাকি হাবলুবাবু! তার বাবা বলত খুলনা থেকে তার শুরু। আর নাটোরের কাছে গিয়ে শেষ। মাইলের পর মাইল বিল। বাবা ওদিকে যেত মাঝে মাঝে। তাদের আবাদ ছিল ওদিকে। ঠাকুর্দার কিনে রাখা সম্পত্তি। ঠাকুর্দা ছিল দারোগা। টিয়া কতদিন আগে শুনেছে সেই বিলের কথা। পৃথিবীতে অতবড় বিল নাকি আর নেই, নেই যেমন এই টালার ট্যাঙ্কও আর পৃথিবীর ভিতরে। টিয়ার মনে পড়ে যেতে বলে উঠল, চলন বিলের কথা বলছ?

হাবলু হাঁ করে টিয়ার দিকে চেয়ে থাকল, এক দৃষ্টিতে। দু'চোখ থেকে যেন গোলাপি আলোর রেখা বিচ্ছুরিত হয়ে টিয়ার চোখের উপর পড়ছে। টিয়া মুখ নামিয়ে নেয়। ঠিক বলছে না ভুল বলছে সে বুঝতে পারছে না। হাবলু খুশি হল না রেগে যাচ্ছে একটু একটু করে তাও ধরতে পারছে না। হাবলু একটু সময় নিয়ে বলল তুই চলন বিলের কথা তো জানিস ময়রম, কেডা বলিলো তোরে?

টিয়া কথা বলল না। তখন হাবলুই বলল, আমিই তোরে বলিছিলাম ময়রম, এখম আমার কথা আমারে শুনাস।

টিয়া জবাব দিতে গিয়ে থেমে যায়। যা বলছে বলুক পাগল। তার তো শুনতে ভালো লাগছে। সে ধীরে ধীরে ময়রম হয়ে যাচ্ছে। কে ময়রম, না জমিদার কন্যা, নদীঘাটে বসে থাকে মানিকরামের জন্য। কে ময়রম, না উতুলি বাড়ি। উতুলিতে হাবলুর মামা বাড়ি। ময়রমের দাদা অজেত আবার হাবলুর বন্ধু। অজেতের পায়ের শটে খুব জোর...পরপর মনে পড়ে যাচ্ছে টিয়ার।

হাবলু বলল, চলন বিলের কথা তো আমিই বললাম তোরে।

কবে বললে? খোকন জিজ্ঞেস করল।

সে ওপারে, এপারে না, কী বুঝলি?

খোকন বলল, তারপর কী হল?

হাবলু হকচকিয়ে যায়, কিসের পর?

কিসের পর তা খোকন জানে না। জানে অথচ ভুলে গেছে এর ভিতর। চলন বিল এসে সব চাপা দিয়ে দিল। হাবলু বলল, চলন বিলে আমাদের গাঁর জুড়োন আলির শ্বশুর ঘর ছিল।

এ মা জলের ভিতরে, বিলে তো জল থাকে। খোকন বলল।

না জল না, ডাঙা আছে, ডাঙায় গ্রাম আছে, নৌকোয় করি যেতি হয়, তো জুড়োন আলি নাটোরে গে তারপর পিছনে এয়েছিল ঘুরে।

তারপর? খোকন আবার জিজ্ঞেস করে।

তারপর কী? বে'র গল্প যখন করল তখন তো চলন বিলের কথা জানা গেল, আমি ময়রমরে বলেছিলাম তারে চলন বিলে বে দিয়া হবে, চলন বিলে তার শ্বশুর ঘর, বাপের বাড়ি ফেরা কঠিন হবে।

টিয়া চুপ করে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে শুনছে হাবলুর কথা। শুনতে শুনতে ভাবল বলে, শুধু কি চলন বিল, গৎখালির কথাও তো বলত বাবা, গৎখালির কথা কি জানে হাবলু?

হাবলু বলল, খোকন জল আনবি এক গেলাস।

খোকন উঠে যেতেই টিয়া যেন মাথা বের করল জলের ভিতর থেকে। মুখময় গভীর জলের প্রলেপ। কী ঠাণ্ডা তার মুখখানি, চোখের চাহনি কী নরম, বলল, কবে তোমার দিদির বিয়ে হবে হাবলুদা?

হাবলু বলল, মেয়ে দেখা হোক।

টিয়া বলল, আমার কিছু কথা আছে।

কী কথা রে, তোর আবার কী কথা হবে?

টিয়া বলেই ফেলল। শুনে হাবলু মাথা নাড়তে লাগল, এমা তা হয় নাকি, আমার দিদির বিয়ে, তুই কেন টাকা দিবি, ইস। তুই বললি এটাই কত বড় কথা।

টিয়া বলল, না এটা নিতিই হবে, হাবলুদা তুমি না বড় ভাই?

না ছোট, দিদিই তো বড়।

টিয়া বলল, তুমি তো বাবা মার বড় ছেলে?

হুঁ। হাবলু ঘাড় কাত করল।

টিয়া বলল, বড় ছেলেই বড় ভাই হয়, ছেলের উপরই তো সংসারের সব ভার পড়ে, তুমি দিদির বিয়ের টাকার কথা ভেবেছে?

হাবলু বলল, হয়ে যাবে।

আমিও দেব, আমারও তো দিদি।

হাবলু অবাক হয়ে টিয়ার দিকে তাকিয়ে। প্রায়ই শাড়ি পরে পরে মেয়েটা কত বড় হয়ে গেছে। ময়রম তুই এই জন্যি পাকিস্তান থেকে এদিকে এলি? ময়রম তুই এসব বলছিস, কিন্তু আমি তো অজেতের ব্যবস্থা করতি পারলাম না নিশীথ সাধুর যুগের যাত্রীতে। অজেতের অমনি শটের জোর, এক এক শটে গোল পোস্ট ভেঙে যায়। আমি তো সে ব্যবস্থা করতিই এপারে এলাম, কিন্তু হল না। অজেতকে ঢাকা যেতি হবে। পদ্মা পার হতি হবে। সে কতদূর। তার চেয়ে সাতক্ষীরে থেকে কলকাতা কত কাছে। সকালে বেরিয়ে ম্যাচ খেলে আবার ফিরেও যেতি পারে যদি বাসটাস তেমন পায়।, যদি কলকাতা হাসনাবাদের মতো কলকাতা সাতক্ষীরে বাস হয়। কত সুবিধে, এদিকে একটা বাসাও নিত না হয়। আমি আর অজেত আসতাম। কিন্তু সে সব কিছুই হল না। নিশীথ সাধু বলেছে পাকিস্তানের প্লেয়ার নেবে কী করে? অথচ নিশীথদা হিন্দুস্থান পাকিস্তান মানে না, বর্ডার মানে না। এসব বলবে আবার অজেতকে নেবে না। তুই এলি টাকা দিতে, আমি দিতে পারলাম না কিছুই।

ওম্মা, তুমি কী দেবে গো?

তুই যেটা চেয়েছিলি।

এই এসব কী বলছ তুমি হাবলুদা, ইস। চাপা গলায় গরগর করল টিয়া।

হাবলু বলল, সত্যিই তো আমি পারি নি, অথচ তুই দিদির বিয়েতে টাকা দিবি বলছিস, এডা আমি কী করে নিই?

খোকন দরজায় দাঁড়িয়ে। সে ভিতরে ঢুকতে পারে নি। দুটো পা ভার হয়ে গেছে। হাবলুদা আর টিয়া দিদির কথা শুনছে সে। শুনছে আর অবাক হয়ে যাচ্ছে। টিয়া দিদি হাবলুদার মাথার চুলে হাত দিয়ে বিলি কাটছে, বলছে, আমার কিছু চাই না হাবলুদা।

আমি সব জানি?

কী জান তুমি? টিয়ার গলার স্বর গাঢ় হয়ে ওঠে।

ময়রম তুই সব ভুলে গেলি।?

কী ভুলে গেলাম।

হাবলু ছটফট করে উঠল, বলল, আমি নিতি পারব না, লজ্জায় পড়ি যাব, সব লোক হিন্দুস্থান পাকিস্তান মানে, শুধু তুই মানিস নে, আমি মানি নে,—তুই কত ভালোরে,

কত ভালো। হাবলু হাত রাখল টিয়ার মাথায়।

টিয়া বলল, তোমার জান্যি আমি ময়রম হবো হাবলু, আমি কপোতাক্ষ ঘাটে গিয়ে বসে গাঙের নৌকোরে জিজ্ঞেস করব, তোমরা দেখেছ মানিকরাম হাবলুকে, তোমার জন্যে আমার ঘুম হয় না হাবলু।

হাবলুর কী রকম ঘোর ঘোর লাগছিল সব। কী বলছে মেয়েটা। ঘুম না হলে অন্ধকারে শুয়ে শুধু তার কথা ভাবে। হাবলু, তার ভাইবোন, বাবা মার কী হবে? কখনও ভাবে হাবলু তাকে ছেড়ে গেলে কী হবে? সে তখন গাঙের ঘাটে বসে থাকবে ঠিক। হাবলু হাবলু, তোমার কথা বলো, চুপ করে আছ কেন?

হাবলু চুপ করে আছে। তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি টিয়ার অন্তরাত্মাকে দেখতে পাচ্ছে যেন। টিয়া মুখ নিচু করল। ঠিক একেবারে নিচু হয়, আনত করে হাবলুর ঘামে ভেজা বুকের দিকে চোখ রাখল। এখন তার ইচ্ছে করছে ওই বুকে মাথা রাখে। ইচ্ছে করছে—। কেঁপে ওঠে টিয়া। সমস্ত শরীর যেন ঝনঝন করে ওঠে, হ্যাঁ, এখনই। কেউ নেই তাই এখনই হবে। হাবলু তুমি আমার মানিকরাম। আমি তোমার ময়রম। টিয়া চোখ বুজল, বিনবিনে স্বরে বলল, তুমি যেও না হাবলু, অমি তখন কাঁদব শুধু, কেঁদেই যাব বিদায়ঘাটে বসে—।

হাবলু বলল, তুই এমন করছিস কেন, টিয়া, ও ময়রম টিয়া, আমি যাব কুথায়, ওপার বন্ধ, এপার ছেড়ে কোন পারে যাব, গাঙের তো দুই পার থাকে।

টিয়া চোখ খুলল, ঠোঁট ফোলাল, বলল, না যদি যাবে তো দাও, না যদি দেবে তো আমি দিই, চোখ বোঁজ, এই হাবলু—।

হাবলু চোখ বোঁজে আবেশে। কী দেবে ময়রম? এপারে কী নিয়ে এসেছে যে দেবে? হাত বাড়িয়ে থাকল হাবলু। আর বাড়ানো হাত দেখে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে টিয়া তার ফোলান ঠোঁট এগিয়ে আনছে, চাপা গলায় ফিসফিস করছে, নাও, নাও।

চৌত্রিশ

ধোঁয়া উড়োতে উড়োতে ঝিকঝিক করতে করতে ট্রেন চলেছে বনগাঁর দিকে। মাঝে মধ্যে কু-কু-ডাক ছাড়ছে। ট্রেনের চলন ঢিমে তালে। একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আর নড়তে চায় না যেন। ভাবখানা এমন, যেন স্টেশনে এসে বাঁচল এ গাড়ি। জল খেয়ে রওনা হবে, না হয় ওদিকে থেকে যে গাড়ি আসবে তাকে পার করাবে। তারপর চাকা টেনে টেনে চলতে আরম্ভ করবে মধুকবি, সাগরদাঁড়ি, রাজনারায়ণ আর জাহ্নবী মা'র কথা নিয়ে। কথা বলছে বীরাঙ্গনা দাসী। গুনগুন করে যাচ্ছে এক নাগাড়ে।

এ সময়ে রেলগাড়িতে ততো ভীড় নেই বনগাঁ যেতে। ভীড় যত বনগাঁ থেকে এদিকে আসার। আসছে, এখনও আসছে। ওপারে ভিটে মাটি ফেলে রেখে আসছে। আর এপার থেকেও কি যাচ্ছে না? ওই যে তিনটে বাচ্চা, ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢাকা বিবি আর যার গায়ে সাদা পাঞ্জাবি পায়জামা, বাক্স প্যাটরা নিয়ে যে উঠল বিরাটি থেকে তার বোধহয় জন্মের শোধ একেবারে যাওয়া। দক্ষিণ পুবের জানলার দিকে তারা, উত্তর পশ্চিম জানালার দিকে ফণিভূষণরা।

বীরাঙ্গনা গাড়িতে উঠতে উঠতে বলেছিল, এতো আমার যশোর চলল রে হাবলু, যাবে না?

না এটা বনগাঁর গাড়ি।

বুড়ির এখনও কত উৎসাহ, বলল, বনগাঁ থেকে সোজা হাঁটলে, যশোর রোড ধরে যশোর, যশোর গিয়ে আমার মধুকবির ঘর আর কতদূর।

এদিকে দে তুমি গেছ মাসি? ফণিভূষণ জিজ্ঞেস করে।

না যাই নি, আমি তো ভোমরা বডার দিয়ে পার হইলাম।

এবার এদিক দে পার হয়ে যাবা। হাবলু বলে।

কী করে হবে?

হবে, হিন্দুস্থান, পাকিস্তান রদ তো হবেই।

কথাটা বলতে বীরাঙ্গনা চুপ। কিন্তু ওধারের জানলা অধিকার করা মুসলমান যাত্রী চমকে উঠল। হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে হাবলুকে। লোকটা জিজ্ঞেস করল, খবর হয়েছে, রদ হচ্ছে?

হাবলু বলল, একদিন না একদিন হবে।

হবে! সত্যি বলছ?

হাবলু বলল, না হয়ে উপায় নেই।

উপায় নেই! লোকটা অবাক হয়ে হাবলুকে দেখতে লাগল, তারপর জিজ্ঞেস করল, পাকিস্তান যাচ্ছ নাকি?

মাথা নাড়ল হাবলু, আমরা পাকিস্তান মানি নে।

তা বললি হবে কী করে, সবটা হিন্দুস্থান? জিজ্ঞেস করতে করতে বছর চল্লিশের মধ্য বয়সী মুসলমান পুরুষ সরে এল এধারে, তবে মুসলমানের কী হবে?

হাবলু বলল, আমরা হিন্দুস্থানও মানি নে।

তবে কোনটা মানা হবে?

যেটা ছিল সেইটা।

সেটা তো হিন্দুস্থান।

না সেটা ইনডিয়া।

ইনডিয়ারে হিন্দুস্থানই তো বলত।

শুনে বীরাঙ্গনার দিকে তাকায় হাবলু। বীরাঙ্গনা মাথা গলায় দু'জনের আলাপে বলে, হ্যাঁ, বলত আবার বলত না ও, ইকবাল কবি, পাকিস্তানের জাতীয় কবি হয়েছে এখন, সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দু স্তাঁ হামারা... লিখেছিল, ও হিন্দুস্থান হিন্দুদের না, সবার, পশ্চিমি সিন্ধু নামে নদী আছে, সে নদী পাকিস্তানে গেছে, তা থেকে।

হ্যাঁ হ্যাঁ। হাবলু বলল, ইতিহাসে আছে।

শুনে লোকটা বলল, তাহলে কী করা হবে?

কী? অবাক হয় বীরাঙ্গনা, তুমি ওপারে যাচ্ছ?

হ্যাঁ চাচি যাচ্ছি পাকিস্তানে, মুসলমানের দেশ হয়েছে, ভালো থাকব শুনি।

একেবারে যাচ্ছ?

আবার ফেরব কী করে, সব দিয়ে থুয়ে যাচ্ছি।

বীরাঙ্গনা বলে, কোথায় যাচ্ছ, মানে কোন জেলায়?

লোকটা বলল, যশোর টাউন থেকে পাঁচ মাইল দশ মাইল হবে।

কী নাম সে গাঁর?

লোকটা বলল, যশোরে আমার মামা ঘর আছে চাচি, তিনি লিয়ে যাবে, দেশডা কেমন?

ফণিভূষণ একটাও কথা বলে নি এই আলাপের ভিতর। বরং সে উদ্বিগ্ন ছিল আসন্ন মুহূর্তটির জন্য। সে কেমন হবে? তার রূপ কেমন? কেমনভাবে কথা বলে, ফণিভূষণকে সে কি প্রসন্নভাবে নিতে পারবে? বছর বারোর তফাৎ হবে দু'জনের। অনেক ছোট। কিন্তু এমন তো ছোট নয় যে বিয়ে হয় না, হতে পারে না। ফণিভূষণ মনের ভিতরে দক্ষিণ বাতাস নিয়ে খেলা করছিল একা একা। একবার দেখল বনগাঁর অচেনা সহযাত্রীকে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকল বাইরে। রৌদ্রালোকিত মাঠ পড়ে আছে একা একা। মাঠ একেবারে শূন্য। নো-ম্যানস ল্যান্ডের কথা মনে এল। বর্ষা নামল বলে। নামলেই মাঠে লোক চলে আসবে। ফণিভূষণের চোখ জুড়োল অনেকদিন বাদে। এত মাঠ-জমি দেখলে নিজেদের মাঠ-জমির কথা মনে পড়ে যায়। পাকিস্তানে সব অন্যের হেফাজতে চলে গেছে। ঠাকুর্দার বেড়, মেজ ঠাকুর্দার বেড়-কতটা না ছিল তার বিস্তার। সব এখন পাকিস্তানে। পাকিস্তান থাকবে। পাকিস্তান সত্য। তার আর জন্মভিটেয় যাওয়া হবে না।

বীরাঙ্গনা তখন লোকটাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম?

আমার নাম সফি, সফিউদ্দিন মন্ডল।

বাড়ি?

আঁজ্ঞে খোলাডাঙা, নিমতের কাছে।

চলে যাচ্ছ?

জে, হিন্দুস্থানের চেয়ে পাকিস্তানে আমাদের সুবিধে বেশি।

কেডা বলল একথা?

আমার মামা এসে বলে গেল, তিনি ওদিকিই থাকেন, অনেক সম্পত্তি করেছেন পার্টিশনের পর, এখন খুব বড়লোক।

বীরাঙ্গনা জিজ্ঞেস করে, হিন্দুর সম্পত্তি ধরে, দখল করে?

সফিউদ্দিন মাথা নাড়ল, তার চোখ মুখে ভয়ের ছায়া ভেসে উঠল। এখনও তো এপারেই আছে। আগে এটা তারও দেশ ছিল, এখন নানা রকম শুনছে। মুসলমান নিজেদের দেশ পেয়েছে, যাবে না কেন? তার মামা মুসলিম লিগ পার্টিও করে, বলেছে, 'জগৎ একদিন মুসলমানের হয়ে যাবে, সেই কাজ হাসিল করতে হবে পাকিস্তানকে ধরে।' মামার কথা তার ভালো লাগে নি। জগৎ শুধু মুসলমানের হবে কেন, শুধু হিন্দুরই বা হবে কেন, জগৎ সবার। সফিউদ্দিন লোকটি কবি প্রকৃতির। অন্তর্মুখী। তার চুপচাপ হয়ে যাওয়া দেখে বীরাঙ্গনা বলল, আরে হিন্দুও নেছে অমন, এপারে মোছলমানের সম্পত্তি নেয় নি?

এই তো হচ্ছে চাচি।

বীরাঙ্গনা বলল, ঠিক হচ্ছে না।

সফিউদ্দিন বলল, আমার মামা খুব গরিব ছেল, ভাত জুটত না, এখন সে পাকা দালান পর্যন্ত পেয়েছে, বলছে পার্টিশন হয়ে এটা হল।

তুমি মানো তা?

সফিউদ্দিন বলল, আমার মানা না মানায় কী যায় আসে চাচি, সত্যি তো আগে কিছু ছেল না মামার, মামা এসে আমার কাছ থেকে টাকা নে গেছে কতবার, পাটির্শন হয়ে তাঁর লাভ হয়েচে।

বীরাঙ্গনা বলল, আসলে সবার ক্ষতি।

সফিউদ্দিন কেমন ভরসা পাচ্ছিল বীরাঙ্গনায়, চাপা গলায় বলল, আচ্ছা চাচি, বলেন দেখি মুসলমান এত গরিব হয় কেন?

বীরাঙ্গনা হাঁ করে নতুন আলাপ হওয়া লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে। ট্রেন গতি নিচ্ছে না। কোনোক্রমে টেনে টেনে চলছে, যেন বনগাঁ, বর্ডার এসবে তার কোনও কৌতূহলই নেই। বীরাঙ্গনা বলল, কথাটা বেঠিক না।

সেই জন্যি মুসলমান হামলে পড়ে পাকিস্তান নেচ্ছে।

হতি পারে বাপ, কিন্তু তুমি কি ওপারে গে হিন্দুর সম্পত্তি দখল করবা?

সবাই কি তা করে, আপনারা করেন?

বীরাঙ্গনা জিভ কাটল, ইস! ভুল হয়ে গেছে, কী নাম বললে যেন?

নাম শুনে বীরাঙ্গনা বলল, শোনো সফি আমি খুব ভাবি এ নিয়ে, পাটির্শন সবাই মেনে নিল, রায়েট হল খুব, নোয়াখালি কুমিল্লা ফরিদপুর ঢাকা ময়মনসিং—সব জায়গায়, এদিকিও হল, ভাগলপুরে হল, কলকাতায় হল, আরও হচ্ছে এখেনে সেখেনে, কেন হল?

কেন চাচি?

মুসলমান গরিব বলে, তবে হিন্দুও তো গরিব কত, গরিব গরিবই।

সফিউদ্দিন বলল, মুসলমান জমিদার বিগ-রায়ত ক'টা? মামা তাই বলে, আমার তাই মনে হয়, দ্যাখো চাচি যত হাভাতে, ভিখিরি সব পেরায় মুসলমান।

কিন্তু পাকিস্তান যে হল এতে গরিব বড়লোক হয়ে যাবে?

সফিউদ্দিন বলল, আমি তো জানি নে, দেখি কী হয়?

ট্রেন চলছিল গুনগুন করতে করতে। ট্রেনের যাত্রী ফণিভূষণ মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠছিল। আর কতদূর? আর একটু পরে হলে তো যশোর। ফণিভূষণ চোখ বুঁজে ছিল। তার কানে বীরাঙ্গনা আর সফিউদ্দিন মন্ডলের কথা ভেসে আসছিল। ফণিভূষণ ভাবছিল এসব কথা আর ভেবে কোনও লাভ নেই। রিফ্যুজি হয়ে কত মানুষ ভেসে গেল, সেসব হল কি মুসলমানের গরিবি দূর করতে? গরিব হিন্দু, পোদ, চাঁড়াল মরল, তাকে কি গরিব মুসলমান পেটে ভাত পাবে? সেই রানাঘাট, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর থেকে কত দূরের দণ্ডকারণ্য, আন্দামান পর্যন্ত চলে যাচ্ছে মানুষ সাতপুরুষকে ত্যাগ করে প্রথম পুরুষ থেকে আরম্ভ করতে, এতে গরিব মুসলমান বাঁচবে?

সফিউদ্দিন বলল, না চাচি বাঁচবে না।

তবে?

কেউ কেউ বড়লোক হবে, এপারেও হচ্ছে, গরিব মানুষ কি বড়লোকের সম্পত্তি দখল করার সাহস দেখাতি পারে একা একা? পারে না চাচি, গরিবের ধম্মে ভয় বেশি।

তবে কী হবে ওপারে গিয়ে?

পার্টিশন হল তো তাই, ফণিভূষণ চোখ খোলে, হিন্দু একদিকে, মুসলমান আর একদিকে, উনি তো ঠিকই যাচ্ছেন।

গিয়ে কোন লাভটা হবে ফণি? বীরাঙ্গনা জিজ্ঞেস করে।

ফণিভূষণ বলল, আমাদের যেমন হয়েচে, তবে উনি তো আটঘাট বেঁধে যাচ্ছেন, ওঁর লাভ হবে।

সফিউদ্দিন মাথা নিচু করে বসেছিল। তার মনে হচ্ছিল যে লোকটি কথা বলল, সে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। সে মুসলমান বিদ্বেষীও হতে পারে। আবার নাও পারে। বোঝা যায় না সবটা, তার মামা আজগার আলি খুব হিন্দু বিদ্বেষী। কী সব কথা বলে, আবার এপারে যে হিন্দুরা চলে এসেছে তাদের সঙ্গে দেখা করতে যায়। সফিউদ্দিনকে নিয়ে

গিয়েছিল যাদবপুর। সেখানে নলপুর গাঁয়ের বোসবাবুরা বাড়ি করেছেন। পাকা দোতলা। আজগার আলি তাদের জমি বেঁচে টাকা এনেছিল। সেখানে কী কথা। সবটা কেমন গোলমেলে লাগে সফিউদ্দিনের। মামা বলেছিল, না করে উপায় নেই, বোসবাবুদের যাতায়াত আছে ওপারে, এপারে এসেও ওপারে ক্ষমতা ধরে। কী করে ধরে? না টাকাকড়িতে হয় এসব।

সফিউদ্দিন জিজ্ঞেস করে, চাচি আপনারা কি রিফ্যুজি?

হ্যাঁ, তুমিও হতি যাচ্ছ।

চাচি তুমাদের দেশ ছিল কোথায়?

বাপের বাড়ি যশোর জিলা, শ্বশুর ঘর খুলনে জেলা।

সফিউদ্দিন বলে, আমি যশোর জেলায় যাব।

বীরাঙ্গনার বুকের ভিতর রক্ত চলকে ওঠে। এতক্ষণে যেন ধরতে পারে লোকটা যাচ্ছে যশোর জেলায়। কবি মধুসূদনের দেশে। কপোতাক্ষর কূলে। বীরাঙ্গনা বলে ওঠে, যশোরে সাগরদাঁড়ি কবতক্ষ-তীরে/জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি/রাজনারায়ণ নামে জননী জাহ্নবী।

লোকটা মানে সফিউদ্দিন শুনতে শুনতে বলে, কুথায় যেন দেখেছি।

কী দেখেছ? বীরাঙ্গনা জিজ্ঞেস করে।

দেখেছি মানে পড়েছে।

কোথায় পড়লে, কবরখানার সামনে?

ঠিক বলেচেন চাচি, এটা যশোরের কবি মধুসূদনের কবরের সামনে, মানে ফুটপাথে, কবরখানায় ঢোকার মুখে দেখেছি আমি।

পার্ক সার্কাস?

হ্যাঁ, আমার মামু আজগার আলি দেখাল, মামু ওপারে থাকে তো, মামু আমারে দেখাল সেবার, কলকাতায় আসা যাওয়া করে তো।

তাঁর জন্মভূমি ওপারে কর্মভূমি এপারে, মরণও এপারে, তোমার মামু তোমারে দেখাল, মামু তো তাহলি ভালো মানুষ বলতি হবে।

হুঁ। খুব আস্তে জবাব দেয় লোকটা, আসলে যশোরের লোক কিনা, মামু বলে যশোর জেলার সন্তান, কিন্তু খেস্টান হয়ে সব্বোনাশ করেচিল।

বীরাঙ্গনা সফির কথা শোনে আর কাঁপে। কোনও রকমে বলল, কত বড় কবি, ধম্মো দিয়ে কী হয় বলো দেখি।

কথাটা ধরে নিয়ে হাবলু বলল, কেন হিন্দুস্থান পাকিস্তান?

বীরাঙ্গনা বলল, হ্যাঁ তাই, ধম্মো দিয়ে মানুষ ভাগ হয়ে যায়।

তখন সফিউদ্দিন নিম্ন স্বরে বলে, না চাচি, আমি তা মনে করি নে, আমি শুনলাম

ওপারে গেলি জীবনে দাঁড়াতি পারব, তাই যাচ্ছি, এদিকি এত রিফ্যুজি, কার কী হবে, তা কেউ জানে না, পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমান নাকি বাঁচবে।

।। ৩৫ ।।

সফিউদ্দিন জিজ্ঞেস করে, পূর্ব পাকিস্তান অনেক বড়?

হ্যাঁ বড় তো, অনেক। ফণিভূষণ বলল। সে তার উদ্বিগ্ন মনকে শান্ত করতে চাইছিল অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে। একা নিজের ভিতরে ডুব দিয়ে শুধু তার চেয়ে বারো বছরের ছোট একটি অদেখা অচেনা মেয়ের কথা ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কেমন হবে সে? বারো বছর তো অনেক। তার সঙ্গে কি মনের মিল হবে, হতে পারে?

সফিউদ্দিন বলল, আমার এক খুড় শ্বশুর ঢাকা গেছেন, তাঁর শালা গেছেন ময়মনসিং, ও সব কোনদিকে জানা আছে?

ফণিভূষণ বলল, অনেক দূর।

চাটগাঁ নাকি ভালো জায়গা?

সূর্য সেনের দেশ, অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কথা শোনেন নি?

হ্যাঁ শুনেছি, তবে ওদিকির ভাষা বোঝা যায় না।

ফণিভূষণ বলল, না একদম না।

সফিউদ্দিন বলে, তার এলাকায় অনেকগুলো ফ্যামিলি আছে চাটগাঁর, তারা যখন কথা বলে নিজেদের ভিতর, কিছুই ধরা যায় না। আশ্চর্য লাগে তারা যখন অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলে, একেবারে পরিষ্কার বাংলা।

ফণিভূষণ বলে, নোয়াখালি সিলেটের ভাষাও বোঝা কঠিন, ওরা খাঁটি বাঙাল।

সফিউদ্দিন জিজ্ঞেস করে, পদ্মার ওপারেই অমনি সব ভাষা?

হ্যাঁ অনেক অনেক, আমরা কোনওদিন যাই নি।

সফিউদ্দিন তখন বিড়বিড় করে, তাহলে আমাদের বাংলাদেশটা অনেক অনেক বড়, ভাগ করে ছোট হয়ে গেল দুটোই।

বীরাঙ্গনা বলল, হ্যাঁ, তাই হল, জমি ভাগ করলে যেমন হয়।

ভায়ে ভায়ে ভাগ হয়ে যায় তো ?

বীরাঙ্গনা বলল, তাইই হয়েছে।

সফিউদ্দিন চুপ করে থাকল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, আমার বড় ভাই থাকে বারুইপুর, সে রয়ে গেল, মামু তারে বলেছিল কিন্তু সে আসবে না।

বীরাঙ্গনা বলল, তোমরা একজন পাকিস্তানি আর একজন ভারতীয় হয়ে গেলে।

কী করে যে এটা হয় আমি বুঝতে পারছি নে, বড় ভায়ের সঙ্গে আর দেখা হবে না, ইচ্ছে হলেও আসা হবে না।

এ তো হয়েছে, এই ফণির দুই দিদি ওপারে, এই হাবলুর...। বীরাঙ্গনার কথা শুনতে শুনতে সফিউদ্দিন বলল, এ বড় খারাপ হল, সবাই তো আত্মীয় স্বজন নিয়ে পার হবে না।

বীরাঙ্গনা তখন বিড়বিড় করে, আমার কপোতাক্ষ, সাগরদাঁড়ি ওপারে, আমি এপারে, ধরো গে মধু কবির জন্মভিটে পাকিস্তানে, কলকাতার খিদিরপুরে তাঁর আর এক বাড়ি, তাঁর সমাধি কলকাতায়, সব ছেড়াভেড়া হয়ে গেল যে।

তা গেল যে বুঝতে পারছি, আমি ভাবতে পারছি নে কলকাতায় আর আসতে পারব না, কলকাতায়, নিমতায় আমার কত চেনা মানুষ। বলতে বলতে সফিউদ্দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিল। কথা থামিয়ে চুপ করে কয়েক হাত দূরের জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকল। রেলগাড়ি ছুটছে। গাছপালা মাঠ বাড়ি ঘরদোর সব পিছনে চলে যাচ্ছে। সফিউদ্দিন বিড়বিড় করল, দ্যাখেন চাচি, সব পিছনে ছুটছে, আমার কাছ থেকে পিছনে চলে যাচ্ছে সব, একেবারে চেরকালের মতো।

তখন বীরাঙ্গনা বলল, অত যদি তোমার কষ্ট, যেও না।

না এখেনে কিছু করা যাচ্ছে না, আমার একটা দোকান ছিল, ভালোই চলত, বই খাতা কলম মণিহারি দ্রব্য খেলনাপাতি, আয়না চিরুনি স্নো পাউডার—সব ছিল।

চলছে না দোকান?

রিফ্যুজি এসে গেছে, তারা দোকানপাট লাগাচ্ছে, দ্যাখেন চাচি, কিছু মনে করার নেই, রিফ্যুজিরা কেউ আমার দোকানে আসে না, তাই দেখে অন্য হিন্দুরাও আসছে না।

ফণিভূষণ বলল, এটা হবে, তারা সব ফেলে এয়েচে ওপারে।

জানি, তাহলে আমারও তো থাকা চলে না।

বীরাঙ্গনা চুপ করে কী যেন ভাবছিল, বলল, আস্তে আস্তে এটা কেটে যেত ঠিক, এরকম ভাবে চলতে পারে না।

আর চলছিল না দোকান একদম।

হিন্দুরা সব হিন্দুর দোকানে যাচ্ছে, ফণিভূষণ বলল, ভিতরের ঘা শুকোতে অনেকদিন লাগবে, শুকোবে না হয়তো।

থাক ওসব কথা। সফিউদ্দিন বলল, ওপারে গেলে আবার দোকান লাগাব, জমিজমা কেনব, এপারের জমি যা ছিল, তার ব্যবস্থা করে ওপারে জমি কেনা হয়ে গেছে, মামু করেছে।

তাহলে দুঃখ কেন?

দুঃখ হবে না। চাচি ওপারে নাকি চাকরিও খালি হয়েছে অনেক, তাও পাওয়া যাবে।

যাও, আমরা এসেছি তোমরা যাও। বলল বীরাঙ্গনা।

তখন হাবলু বলল, চাগরি-বাগরি তো ঢাকায় হবে তাই না

সেটা জানিনে, যা জানি মামুর কথায়।

ঢাকা রাজধানী হয়েছে, কতদিন ঢাকা যাব যাব যাব করে যাওয়া হয় নি, আপনি ঢাকায় গেলেন না কেন, রাজধানীর কাছে থাকতেন, নিমতে তো গাঁ, আবার গাঁয়ে যাচ্ছেন।

মামু যে ব্যবস্থা করে দিল।

হাবলু বলল, আপনার মামু আপনারে ঠকাবে না তো?

এটা কী বলছ তুমি?

হাবলু বলল, হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয়ে এসব যে কত হচ্ছে, আপনি রাজধানী গেলে ভালো করতেন।

না গেলেই বা কী হবে? সফিউদ্দিন বিরক্ত হচ্ছে।

সব সময় রাজধানীর কাছে থাকতি হয়।

সফিউদ্দিন বলল, পদ্মার ওপারে যেতি ভয় করে।

কেন, সবই তো পাকিস্তান।

বাঙাল ভাষাটা জানি নে, লোক ধরতি পারত আমি এদিক থেকে গেছি, যশোরে তা হবে না, ধার কাছের ভাষা।

বীরাঙ্গনা বলল, তাতে হত কী?

রিফ্যুজি তো।

আমরাও তো।

সফিউদ্দিন বলে, আমি তো ঘটি, আমি এপারের কাছে থাকলাম চাচি, এপারে আমার আত্মীয়স্বজন তো থেকি গেল, আসতি হবে, তারাও যেতি পারবে, আর ধরেন একটা কথা সত্যি, রিফ্যুজিদের জায়গার লোক ভালো চোখে দ্যাখে না।

বলতেছ?

হ্যাঁ চাচি, দেখতি পাচ্ছি তো হিন্দুদের ভিতরে, রিফ্যুজিদের সহ্য করতি পারে না কত জন, আমারেই বলে বাঙাল এসে সব্বোনাশ করে দিল, সব ওরা নিয়ে নেবে, আমার সঙ্গে সেই কথা বলত আবার আমার দোকানে মাল কিনতে আসত না, যে আসত সে রিফ্যুজিদের সহ্য করতে পারত না বলে।

বীরাঙ্গনা বলল, আমি তো এমন শুনি নি।

এটা সত্যি চাচি।

ওসব হয়, ও সবের কোনও মানে নেই।

নেই তা জানি, তবে পদ্মার ওপারে যাবার কথাও হয়েছিল, আমার খুড়শ্বশুর বলেছিল, আমি বললাম অতদূর যাব না।

বীরাঙ্গনা শোনে। চুপ করে থাকে। সফিউদ্দিন চুপ। আর কেউ কোনও কথা বলছে না। বীরাঙ্গনার মনে পড়ে যাচ্ছে ওপারের কথা। চোখ মুখে যেন মেঘ এল।

দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে। আর কি হে হবে দেখা? —যতদিন যাবে, কপোতাক্ষ, স্টিমারের ভোঁ, অন্ধকার নদীর ছলচ্ছল। বীরাঙ্গনা মুখ নিচু করে নিল। মনে হল এই যে এই সফিউদ্দিন—এ কত সৌভাগ্যবান, একে যেতে হচ্ছে যশোর জেলা, কপোতাক্ষ কূলে। আর সে মধুকবির ভাগ্য ধারণ করেছে যেন। নির্বাসিত হয়েছে কপোতাক্ষ তীর থেকে। বীরাঙ্গনার দুচোখ জলে ভরে উঠেছে। দুচোখের কোল ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল বীরাঙ্গনা। ঘোমটার আড়ালে তার মুখ। কান্নার কোনও শব্দ নেই। যেন ভাঁটিতে চলেছে কপোতাক্ষর স্রোত। চলেছে তো চলেছে। যত সময় আবার ফেরার ডাক না আসে নিঃশব্দে চলতেই থাকবে। শুধু এক একবার জল ছলছল করে উঠছে তীরে ছুঁয়ে যেতেই। সফিউদ্দিন টের পেল, চাপা গলায় বলে উঠল, ও চাচি তুমি কি কানছ চাচি, কী হল চাচি?

বীরাঙ্গনা স্থির। কোনও জবাব দিল না। তখন সফিউদ্দিন বলল, আমার বিবি, ওই রেহেনা। ও কি কম কাঁদল চাচি, কানতে কানতে ভিটে ছাড়লাম আমরা, এই দ্যাখো আবার শুরু হয়ে গেল, এডা সংক্রামক ব্যাধি, তোমারে কানতে দেখে রেহেনা কানতেছে।

ফণিভূষণ চোখ খুলল। হ্যাঁ, বীরাঙ্গনা মাসি কাঁদছে। হাবলু অবাক। কোনওদিন এ দৃশ্য দেখেছে কি? দিদিমা কাঁদছে, লোকটার বিবিও কাঁদছে, তার তিনটে ছেলে মেয়েও চোখ মুছছে। ইস্। হাবলুরও যে চোখ দুটো কেমন করছে। ভার ভার লাগে। কেমন ভার। নোনাজলের ভার। ও দিদমা, দিদমা, তুমার ওই কপোতাক্ষর জল কি লোনা? বীরাঙ্গনা দাসী বিড়বিড় করল, লোনা কিন্তু তাই কত মিঠা। হাবলু শুনতে শুনতেও যেন শুনতে পায় নি। তার মনে পড়ে যাচ্ছিল আশাশুনি বাবা মা ভাইবোনদের কথা। মনে পড়ে যাচ্ছিল ময়রম-এর কথা। ময়রম না গো, মরিয়ম। সেই যে উতুলি থেকে এল, আর কি যাওয়া হল? দিদিমা কীরকম বলে, দুগ্ধস্রোতরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে, আর কি হে হবে দেখা?—যত দিন যাবে, —শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে হাবলুর। আর কি হবে দেখা? আশাশুনি গেলেও কি ফিংড়ি যেতে পারবে? দেশটা তো আর সে দেশ নেই। দেশটা এখন বিদেশ। পাকিস্তান। সে এপারে চলে এসেছে মানে ওদেশ ত্যাগ হয়ে গেছে। এখন আশাশুনি গেলে কি নিশ্চিন্তে একা একা খাল পেরিয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই উতুলি যেতে পারবে হাবলু? পথে যদি কেউ ধরে, এ বেটা কাঁহা সে আয়া, কাঁহা যা রহা? কলিমও কেমন হিন্দি না উর্দু বলতে চায়। কতজন চায়। উর্দু না জানলে পাকিস্তানে টিকে থাকা কঠিন। হাবলুর চোখে জল এসে গেল। আর যাওয়া হবে না। বাবাও আসবে না। চোখে ভালো দ্যাখে না। গাঁয়ে থাকলে আন্দাজে ঠিক চলাফেরা করতে পারে। আশাশুনির সব যে বাবার চেনা। রাস্তাঘাট পুকুর ডোবা আমবাগান, খড়বন, কালীতলা, পীরতলা, মসজিদ, শিবমন্দির—সব জানে বাবা। বাঁশবন, সুপুরিবন, ধানের মাঠ, টাকির জমিদারদের ফেলে যাওয়া বাগানবাড়ি—সব। টাকি আর কতদূর হবে? টাকি এপারে, আশাশুনি ওপারে। হাবলুর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। বাবা আসবে না, মা আসবে না, ময়রম আসবে না, তার বেড়ালগুলো, আয়না গয়না, রয়না আসবেনা। এলেও লুকিয়ে থাকবে। সে নাম আর করবে না। পাকিস্তানি বলে পরিচয় দেবে না। বলবে না তার নাম ময়রম। ময়রম? তাহলে কি তুই মুসলমান? মুসলমান হলে ওপারে যা, যেমন এই যে যাচ্ছে সফিউদ্দিন মন্ডল। হাবলু কাঁদতে লাগল ওপারের জন্য, মা বাবা ভাই বোনের জন্য। এপারে বনগাঁর দিদি, বসিরহাটের বোনের জন্য। তার চোখে জল দেখে ফণিভূষণ অবাক। এ কী হচ্ছে? সে যাচ্ছে একটা শুভ কাজে। মন বিচলিত হয়ে আছে, চঞ্চল হয়ে আছে। কেমন হবে সে মেয়ে? দুধে আলতায় রং আর মাথা ভর্তি চুল। টানা টানা চোখ। এ সময় এত কান্না কি ভালো? ট্রেনের কামরার সবাই কাঁদতে আরম্ভ করেছে। ইস! এ কি অলক্ষণ! ফণিভূষণ বলে উঠল, কী হচ্ছে কী হাবলু, এ কী, যাচ্ছি তো শুভ কাজে।

ছত্রিশ

ফণিভূষণের বিরক্তিতেও থামে না রোদন। কিন্তু তারও তো একটা আয়ু আছে। ধীরে ধীরে তা ফুরিয়ে যেতে থাকে। ফণিভূষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। কী হয়েছে, সে সফিউদ্দিন লোকটাকে প্রথমেই পছন্দ করে নি। লোকটা এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে। এপারে কি সে খারাপ আছে? মনে তো হচ্ছে না। খারাপ হলে এত আয়েশ করে যেতে পারত? সে কি আয়েশ করে এসেছিল? না বরিশাল এক্সপ্রেস ট্রেন বোঝাই হয়ে যারা এসেছিল, তারা? যারা এসেছে তারা কি ভালো আছে? স্টেশনে, ফুটপাথে, রেল লাইনের ধারে, ট্রেন বোঝাই হয়ে পশ্চিমে জঙ্গল পাহাড়ের দেশে চলে যাচ্ছে তো যাচ্ছে। তাহলে? সফিউদ্দিন বউ বাচ্চা নিয়ে তার মামার ডাকে যশোর যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে না ঢাকা, পদ্মার ওপারে? না তাহলে এপারের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ থাকবে না। ফণিভূষণ ভাবে সে এপারে এসেছিল কি ওপারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দেবে মনে রেখে? পদ্মার ওপারের লোক কী করছে।

সফিউদ্দিন জিজ্ঞেস করল, আপনাদের জমিজমা কী হল ওপারে?

ফণিভূষণ ঘাড় বেঁকিয়ে জবাব দেয় অযাচিতভাবে, নিয়ে আসতে পারি নি।

না না আনবেন কী করে, তা আমি জানি, এক্সচেনজ হল?

না, জলের চেয়ে কম দরে দিয়ে এসেছি।

সফিউদ্দিন বলল, আমার মামু তো ওইরকম জমি ধরে ধরে খুব সম্পত্তি করেছে, সব দলিল করে নেছে যাতে পরে লিটিগেশন না হয়।

আপনিও তাই করতি যাচ্ছেন?

না আঁজ্ঞে, আমি আমারটা এদিকে জলের দরেই ছাড়লাম।

ফণিভূষণের মুখ অন্ধকার, বলল, এদিকে ওরকম হচ্ছে?

হবে না কেন, যার হয়েছে সে টের পাচ্ছে, আমাদের মুসলমান ক'ঘর সব চলে গেছে, লাস্টে আমি।

কেন গেল?

যে জন্যি আপনারা এয়েচিলেন?

তখন বীরাঙ্গনা বলল, থাক এসব কথা, এসব তো হচ্ছে জানি।

এদিকে তো কিছু হচ্ছে না মাসি। মাথা নাড়তে লাগল ফণিভূষণ।

হচ্ছে না? হচ্ছে নিশ্চয়, না হলি যাচ্ছে কেন? বলছি তুমি যশোরে কুথায় যাবা বাবা? বীরাঙ্গনা জিজ্ঞেস করল।

মামু জমি বাড়ি কিনেছে, হিন্দুর সম্পত্তি।

ফণিভূষণ হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে ফেলল, এসব রাখ তো মাসি, আমার একদম ভালো লাগছে না, যাচ্ছি শুভ কাজে।

আমার দেশে যাচ্ছে, তাই একটু কথা বলছি।

ফণিভূষণ বলল, কথা বলার কিছু নেই, আমরা সব দিয়ে এয়েচি মাসি, তা নিতে যাচ্ছেন ইনি, হিন্দুর সম্পত্তি মামু ধরেছে, তা নেবেন ইনি, কথা বলার কী আছে?

সফিউদ্দিন মন্ডলের মাথাটা নিচু হয়ে গেল। তার সঙ্গে বীরাঙ্গনাও মাথা নিচু করল। এটা কী করল ফণি? একটা পরিবার দেশ ছেড়ে বিদেশ বিভুঁয়ে চলে যাচ্ছে, এইভাবে এখন বলে। সফিউদ্দিন খুব অপমানিত হল। বীরাঙ্গনা এই ঘণ্টা দুয়েই সফিউদ্দিনের খুব কাছাকাছি চলে গেছে। এটা তার অভ্যেস। লোকটাকে তার ভালো লেগেছে। কত নম্র। নিচু গলায় কথা বলে। এপার থেকে ওপারে যে যাচ্ছে, তার জন্য কষ্ট কি পাচ্ছে না, আনন্দে যাচ্ছে? তা কখনও হতে পারে?

ফণিভূষণ বুঝল তার মেজাজ হারানো ঠিক হয় নি। কিন্তু কী যে হয়েছে? লোকটা ফ্যামিলি নিয়ে বর্ডার পার হয়ে যাচ্ছে শোনার পর থেকে ফণিভূষণ ওকে সহ্য করতে পারছে না। আবার বলছে হিন্দুর সম্পত্তি কিনে দেবে মামা। সস্তায়। কী করে সহ্য করবে ফণি? তাকে আগরওয়ালজি বলেছে, যা ঘা খেয়েছে বাংলা পাঞ্জাব, উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হবে, বাংলা তো অনেক টাইম নেবে, বাঙালি লেবার দিতে পারে না, শুধু কাগজ কলম জানে, এত রিফ্যুজি নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল কী করে উঠে দাঁড়াবে? আগরওয়ালজি কথাগুলো মিথ্যে বলে না। ফণিভূষণের কথা শুনে, ওপারের গ্রাম জমি জমার কথা শুনে আগরওয়াল বলে, ফণিবাবু, পার্টিশন হয়ে হিন্দুর সব্বোনাশ ঘটে গেছে।

ফণিভূষণ তখন বলতে গেছে, মুসলমানদের কিছু ছিল না, সব বড় গরিব, আমাদের জমিতে চাষা হল মুসলমান আর নমঃশূদ্র।

আগরওয়ালজি বলেছে, ভগওয়ান যেমন দিয়েছেন ফণিবাবু, ওদের ভাগ্য এটা, আমি তুমি কী করব, আমাদের যে অনেকে প্রচুর ওয়েলথ করেছে, সব ভগওয়ান দিয়েছে, হিন্দুরা গ্রেট।

ফণি তখন মানে নি। এখন মনে হচ্ছে আগরওয়ালজির কথা বেঠিক নয়। ফণি চুপ করে থাকল। কথাটা কি ঠিক বলে নি সে? যত হিন্দু চলে এসেছে, ততো মুসলমান তো যাচ্ছে না। ওপারটা খালি হয়ে গেছে। এখন যারা খবর পাচ্ছে, যাচ্ছে। যেমন এই সফিউদ্দিন যাচ্ছে। ফণিভূষণ মুখ গম্ভীর করে বাইরে তাকিয়ে আছে।

হাবলু সব দেখছিল, এবার বলল, পার্টিশন যদি উঠে যায় তখন কী হবে বলুন দেখি সফিভাই?

উঠবে সত্যি?

উঠবে তো বটে, আমরা চাই না এসব।

সফিউদ্দিন বলল, আমিও চাই নে, কিন্তু আমার পাড়ায় আর কেউ নেই, একা থাকা যাচ্ছিল না, রাতে বাড়িতে ঢিল পড়ছিল।

হাবলু বলল, পড়ে, ওপারেও তা হয়।

শুনা যাচ্ছিল, অ্যাটাক হবে।

এমনি অ্যাটাক?

হ্যাঁ, তাই ভয় হচ্ছিল। সফিউদ্দিন নিম্নস্বরে বলল।

হাবলু বলল, ওপারেও এমন হয়, তবে রয়েছে তো অনেক।

আমাদের সাত পুরুষির ভিটে, নাম হয়েছিল পাকিস্তান বাড়ি।

ওপারেও তাই, আমাদের বাড়ি হিন্দুস্থান বাড়ি, ইনডিয়া বাড়ি।

তাহলি কি থাকা যায়?

হাবলু বলল, একমাত্তর উপায় হিন্দুস্থান পাকিস্তান না মানা।

সফিউদ্দিন জিজ্ঞেস করে, তুমি তো কচি বালক, জানলে কী করে এসব, বোঝো কী করে?

হাবলু জিজ্ঞেস করে, কচি বালক মনে হয় আমারে?

না তা না, তবে বয়স তো কম, ছোট বটে।

হাবলু বলল, আমি হিন্দুস্থান পাকিস্তান যাতায়াত করি, আমি এবার দিল্লি লাহোর, করাচি যাব, আমি ছাড়ব না, রদ করাবই।

হলি তো ভালো হয়, বিদেশ বিভুঁই যেতি কার ভালো লাগে, তারপর শুনিচি সব গাঁ গেরাম আর ওদেশে নদী খুব বেশি, আমাদের তো নদী বলতে গঙ্গা, ও ছাড়া আমি নদী দেখি নি।

তখন বীরাঙ্গনা বলল, আমাদের খুলনা যশোরে কপোতাক্ষ, বেতনা, সোনাই, ভৈরব, রূপসা, চিত্রা, মধুমতি....আছে, আর যদি উত্তরপূবি যাও, পদ্মা মেঘনা যমুনা, শীতলক্ষ্যা—কত নদী, গুনে শেষ করতি পারবা না।

সফিউদ্দিন বলে, ওই জন্যে ভয় লাগতেছে।

ভয়ের কী আছে, বাবা, তুমি সাগরদাঁড়ি চলে যাও, মামুরে গে বলো সাগরদাঁড়িতে জমি কিনি দিতি।

সে কি আপনার গাঁ?

তা হবে কেন, ওই যে তুমি পার্ক সার্কাস কবরখানার সামনে দেখেছ, ওই জনের, মহামতি মধুকবির। বলে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকায় বীরাঙ্গনা দাসী। ওখেনে তাঁর ভিটে আছে, কপোতাক্ষ তীরেই জমিদার বাড়ি, রাজনারায়ণ আর মা জাহ্নবীর দালান কোঠা—যাও।

মধুকবির বাড়ি। তাই তো! যশোর জেলার লোক বলেছিল মামু, কিন্তু খেস্টান, হিন্দু না, আমি ওর একটা না দুটো কবিতা পড়েছি চাচি। রসাল কহিল উচ্চে... আর হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন...ইস্কুলের বইয়ে ছিল।

তুমি যাও সাদরদাঁড়ি, গিয়ে বিদায়ঘাটে, অশ্রুঘাটে বসো।

কী অদ্ভুত! চাচি ওই সাগরদাঁড়ি কদ্দুর হবে?

যা দূর হয় হবে, কেশবপুরি মটোর যায় কিনা জানি নে, কী হয়েছে এখন তাও জানি নে। কেশবপুর গিয়ে গোরুর গাড়ি পাবা, আর এদিকিও ঝিকরগাছায় গে তুমি নৌকো পেতি পারো, একেবারে কপোতাক্ষ ধরে চলি যাবা সাগরদাঁড়ি, গিয়ে দ্যাখো তুমি, মনে করবা তুমার কোনও ক্ষতি হয় নি, তুমি মধুর কবির দেশে যেতি পারলে।

তখন ফণিভূষণ বলল, তাঁর দেশ তো এদিকটাও।

ঠিক ফণি, কিন্তু জন্মভূমির চেয়ে আপন কোনও মাটি হয় বল।

ফণিভূষণ বলল, পার্টিশনের পর আর জন্মভূমি! ওদিকি জার্মান দেশও ভাগ হয়েছে তা জানো, পাঁচিল উঠে গেছে দুই দেশের ভিতর।

তোরে কেডা বলল

দ্যাখো মাসি, কলকাতা শহরটা আশ্চর্য রকমের, পথে ঘাটে ঘুরলিও কত খবর জানা যায়, এসব আমাদের বাগেরহাট খুলনায় হত না।

যশোরে? জিজ্ঞেস করল সফিউদ্দিন।

উঁহু! ফণী বলল, যশোরে তো আমার দিদির বাড়ি, যশোরে আমি থেকিচি, কলকাতা একেবারে আলাদা।

বীরাঙ্গনা জিজ্ঞেস করল, ঢাকা?

ঢাকা হতি পারে, ঢাকা বড় শহর, পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীও বটে।

হাবলু সব কথা শুনছিল। শেষে বলল, তুমি সাগরদাঁড়ি গিয়ে কী বুঝবা চাচা, তুমি বরং আশাশুনি যাও, সেখানে আমার মা বাবা ছোট বুন দুটো রয়েছে, তুমি আশাশুনি গে হাতেবর চাচার সঙ্গে যোগাযোগ করো।

তিনি কে?

তিনি ভালো মানুষ, দ্যাখো সাতক্ষীরে থেকে আশাশুনি কাছে, আবার সাতক্ষীরে থেকে বসিরহাটও কাছে ভোমরা বডার দিয়ে। হাবলু বলতে লাগল। শুনতে শুনতে সফিউদ্দিন বলল, তুমারে যত ছোট ভেবিচি, তুমি তা নও, আশাশুনি গেলি আমার কী সুবিধে?

মৃগেন রায় আমার বাবা। বাবা চোখে দ্যাখে না ভালো। বাবা গাঁ ছাড়তি ভয় পায়। গাঁর রাস্তাঘাট সব চেনা তো। বলতে বলতে হাবলুর গলা ভার। সে গলা নামিয়ে বলে। তোমার কী সুবিধে হবে চাচা, হবে আমার, আমার মা বাবা তো থাকবে, আমি এপারে না থাকলি হবে না, বুনিরা এপারে, ছোট দুটারেও নিয়ে আসতি হবে, তুমি এটটু দেখ ওদের।

সফিউদ্দিন বলে, যারা বডার পেরুয়ে আসে তারা কি এসব করতি পারে, তারা তো ভাববে ওই হিন্দু কিংবা মোছলমানের জন্যি দেশ ছাড়তি হল, ও কেন রয়েচে, বডারের ওদিকে যাক।

তুমি কি তাই হবা? হাবলু জিজ্ঞেস করে।

কী হব বলতি পারি নে, মানুষ কবে কী হয় কে জানবে?

তবু তুমি আশাশুনি যাও, খবর নে যাও যে দিদির একটা ব্যবস্থা হচ্ছে, মা বাবারে চিন্তা করতি বারণ কর, ভালো খবর শিগগির পাবে।

আমি যদি আশাশুনি নাও যাই বাস করতি, আমি খবর দেব। সফিউদ্দিন বলে।

কী করে দেবে? বীরাঙ্গনা জিজ্ঞেস করে।

চিঠি করে দেব, ঠিকানা দাও তুমি আর তুমার নাম ধাম লিখে দাও।

হাবলু বলল, আশাশুনি গিয়ে খবরটা দিতি পারবে না?

সফিউদ্দিন বলল, দেখি ওপারে গিয়ে, আমি তো মামুর অধীন।

ফণিভূষণ শুনে বলল, মামু তো ভালো মানুষ না বললেন—

না না তা কেন হবে, বিষয় সম্পত্তির উপর শুধু লোভ, আর মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে থাকে, সুবিধে পেলি জমি কেনে, ওই নিয়ে আছে।

হাবলু বলল, চাচা তুমি আশাশুনির কথা বলো তোমার মামুকে, ওখেনে ক'ঘর আছে হিন্দু, জমি পাবে, তারা তো চলে আসবে ওপারে।

সফিউদ্দিন বলল, আমি তোমার মা বাপরে দেখব তো, এই কথা বলছ?

হ্যাঁ, আমার মাঝে মধ্যি ভয় তো করে।

তোর ভয় করে হাবলু? ফণিভূষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, বলিস নি তো।

করে তো, মনে হয় সব দু'ভাগ হয়ে যাবে। হাবলু বিড়বিড় করে।

তার মানে? ফণিভূষণ জিজ্ঞেস করে।

তার মানে সব গাঁ গেরাম, টাউন, সিটি সব, একভাগে হিন্দু অন্যভাগে মোছলমান, হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, তারপর মানুষগুলোরে কেটে দু'ভাগ করা হবে, একটা দিক হিন্দুস্থান, অন্যদিক পাকিস্তান, তারপর...।

থাক থাক, আর না। সফিউদ্দিন হাত তুলে থামায়, আমি খোঁজ নেব আশাশুনি গিয়ে, ঠিক নেব দেখ। তুমি ভয় পেয়ো না, মোটে ভয় পেয়ো না, আমি ওপারে গিয়ে সব খোঁজ নেব। আর চেষ্টা করব তোমার মতো হিন্দুস্থান পাকিস্তান যেন রদ হয়, ঠিকানাটা দাও।

সাইত্রিশ

সফিউদ্দিন নামবে চাঁদপাড়ায়। এখানে তার ফুফুর ঘর। ফুফুও এদেশ ত্যাগ করে পাকিস্তান যাচ্ছে। চাঁদপাড়ারই একটা লোক সন্তোষ মন্ডল তাদের পার করিয়ে ওপারে মোটরে তুলে দেবে। পাসপোর্ট ভিসা তো নয়, বর্ডার পার হয়ে ওপারে গিয়ে মিশে যাওয়া। পাকিস্তান হয়েছে বলে মানুষের গায়ের রং, চুলের রং, চেহারা উচ্চতা তো বদলে যায় নি। চব্বিশ পরগণার লোকের যশোর খুলনায় যাওয়াই ঠিক। কে বুঝবে? মুখের ভাষাও পর্যন্ত এক। আর বুঝলেও তো কিছু করার নেই। পাকিস্তান হল মুসলমানের ভালোর জন্য, মুসলমানের সম্মান ফেরাবার জন্য, পাকিস্তানেই তো মুসলমান যাবে। তেমনি ইনডিয়া—হিন্দুস্থানেই তো আসবে হিন্দু।

বীরাঙ্গনার চোখে জল। চাঁদপাড়া আসছে। বীরাঙ্গনা বলল, যাও ভালো ভাবে থেক, মধুকবিরে দেখ, মৃগেন রায়, আশাশুনি, তাদের খবর নিয়ো, তাদেরও দেখ। সব হিন্দু যেমন এপারে আসবে না, সব মোছলমানও ওপারে যাবে না, মনে হিংসা এনো না, লোকের উপর দয়ামায়া দেখিয়ো, দুর্বলের পাশের দাঁড়িয়ো, তোমার ভগবান তোমার ভালো করবে।

হাবলু বলল, আল্লা, খোদা।

সফিউদ্দিন বলল, আপনারাও ভালো থাকবা চাচি, কী যে হল, সব ভেন্ন হয়ে গেলাম, হাড়ি আলাদা ছিল, তারপর ভিটেও আলাদা হল।

বীরাঙ্গনা বলল, তোমরা বরিশাল এক্সপ্রেস ট্রেনে গেলে না?

সফিউদ্দিন বলল, ব্ল্যাকে যাচ্ছি, ওতে তো যাওয়া যাবে না চাচি।

হাবলু বলল, একেবারে যশোর হয়ে খুলনা যেতে পারতে।

সফিউদ্দিন চুপ করে থাকে। তার কাছে এই যাত্রা তো সুখের নয়। এখন পৌঁছতে পারলে হয়। সামনেটা অনিশ্চিত অন্ধকার। মামুর ঘর সে যায় নি কখনও। আসলে তারা এপারের লোক। মামুর শ্বশুর ঘর ওদিকে। শ্বশুর ঘরের সম্পত্তি পেয়ে পার্টিশনের আগে থেকে লোকটা ওপারে। দেশ দুই খণ্ড হওয়ায় সে এপারের আত্মীয় স্বজনকে ওপারে টানছে। এই করে—বসত করিয়ে, জমি বিনিময় করিয়ে তার মামু পয়সা করেছে প্রভুত।

হাবলু বলল, বরিশাল এক্সপ্রেসে গেলি পাশপোর্ট লাগবে।

সফিউদ্দিন বলল, গাড়িটা দেখে কেমন যেন মনে হয়।

কী মনে হয়? ফণিভূষণ জিজ্ঞেস করে।

সফিউদ্দিন চুপ করে থাকে আবার। কতবার দেখেছে সে ওই গাড়ি। তার মামু আসে ওতেই। আবার অন্যভাবেও আসে। নামে বরিশাল এক্সপ্রেস, কিন্তু যায় খুলনা শহর পর্যন্ত। সফিউদ্দিনের মনে হত সবুজ রেলগাড়ি কোন দূরদেশে চলে যাচ্ছে। বরিশাল হল নদীনালার দেশ। সফিউদ্দিনের খোলাডাঙায় বরিশালের কিছু লোক আছে। তারা বলে তাদের ঘরে ঘরে নৌকো ছিল। বর্ষার সময় এ বাড়ি ও বাড়ি করতে হত নৌকোয়। তাদের মুখের ভাষাও কত দূরের মনে হয়। সফিউদ্দিন সেই দেশে যাচ্ছে, খোলাডাঙা ফেলে। মসজিদ। শিবমন্দির, ধানখেত, হোগলা বন, খেলার মাঠ, হাই ইস্কুল, রেলের লেভেল ক্রসিং সব ফেলে যে দেশে যাচ্ছে তা আলাদা। একেবারে আলাদা। এই টাকাও ওদেশে চলবে না। মামু বলেছে বিনিময় করিয়ে দেবে। আর বর্ডার এলাকায় চলে। পাকিস্তানে হিন্দুস্থানের টাকা, হিন্দুস্থানে পাকিস্তানের টাকা, যাওয়া আসা চলে তো খুব।

সফিউদ্দিন বলল, বরিশাল কতদূর?

তুমি কি বরিশাল যাবা? ফণিভূষণ বিরক্তির সঙ্গে বলল। আসলে লোকটা চাঁদপাড়ায় নেমে গেলে আর সময় থাকবে না। যে কাজে যাচ্ছে, সেই সব নিয়ে দুটো কথা তো হবে। তার মন যে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। এমন যে হয় তা সে কোনওদিন বোঝে নি।

সফিউদ্দিন বলে, না বরিশাল যাব না, কিন্তু যেতি তো হতি পারে।

হাবলু বলল, আইতে শাল যাইতে শাল, খুলনা থেকে স্টিমার ধরে যেতি হয় শুনিচি, শুধু গাং আর গাং।

সফিউদ্দিন বলে, মাধবপাশা বলে একটা জায়গা আছে?

আছে। বীরাঙ্গনা বলল।

সেই মাধবপাশা থেকে সাত মাইল পুবে শোলনা বলে একটা গেরাম।

থাকতি পারে, জানি নে, মাধবপাশাতে কুকরুলির নরেন সেনের মেয়ের বিয়ে হয়েছিল, সে জামাই অবশ্য খুলনায় থাকত, পরে এপারে চলে এয়েচে।

কেডা নরেন সেন? হাবলু জিজ্ঞেস করে।

ও তুই চিনবিনে, কুকরুলি বাড়ি, কুকরুলি চিনিস?

হ্যাঁ চিনি। হাবলু বলে।

গিছিস কোনওদিন?

না যাই নি।

তবে আর কী, বীরাঙ্গনা বলে, মাধবপাশায় কী দরকার?

সফিউদ্দিন বলে, খোলা ডাঙায় একটা ফেমিলি এয়েচে, বামুন, চক্রবর্তী, তাদের কারা কারা রয়ে গেছে এখনও ওপারে, খবর নিতে বলেছে আমারে।

কোথায় যশোর আর কোথায় বরিশাল। হাসল বীরাঙ্গনা, অত সহজ।

বরিশাল শহরে যেতি বলেচে একজন, সব আমার ডায়েরিতে লেখা আছে, তুমাদেরগুলোও লিখে রাখি।

শুনে হাবলু বলল, হ্যাঁ লিখে রাখ চাচা, না হলি তো ভুলি যাবা?

সফিউদ্দিন হাসে, বলে, হ্যাঁ, এত নাম মনে থাকবে কী করে, ওই জন্যে লিখে রাখার ব্যবস্থা, আমি সব লিখে রাখি।

বীরাঙ্গনা বলে, কতজনের ঠিকানা লিখে এনেছ?

সে জনা পঁচিশ হবে, সব ফেমিলিই দেছে, চাচি একজন বলেছে তাদের একটা বেড় আছে, সে অবিশ্যি খুলনার কাছে খলসেখালির লোক, বেড়ে অনেক আম কাঁঠালের গাছ, কেমন আম কাঁঠাল হল এ সালে তা জানাতি।

কী হবে জেনে?

বুড়ো চাচা বলল, তাঁর বাপ ঠাকুর্দার হাতে বসান গাছ, ফেলে এয়েচে, আমি খোঁজ নিয়ে যেন চিঠি লিখে জানাই।

বীরাঙ্গনা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, জন্মজন্মান্তরে এসব থেকে যায় বাপ, তুমিও ভুলতি পারবা না, তোমার বিবিও না, ছেলেপুলে বড় হয়ে ইনডিয়ায় নিজেদের ভিটে গ্রাম দেখতি আসবে, দেখ এই রকম হবে একদিন।

সফিউদ্দিন বলে, তা যেন হয় চাচি, আমি ভুলতি চাইনে।

ফণিভূষণ বলে, আমি ভুলতি চাই।

কেন, কী হয়েচে? আলটপকা জিজ্ঞেস করে সফিউদ্দিন। ফণিভূষণের কণ্ঠস্বরের কর্কশতা তার কান এড়ায় না।

ফণিভূষণ বলে, কী হবে মনে রেখে, মনে রেখে কী সুখ হবে, কষ্ট পেতি শুধু শুধু মনে রাখব কেন, একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি বুঝি সব ভুলি গিছি, তার চে আনন্দের কিছু হবে না।

এ আপনার রাগের কথা মশায়।

ফণিভূষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। জবাব দেয় না। যাচ্ছিল বেশ, এই উটকো লোক তার মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে। এখন চাঁদপাড়ায় নেমে গেলে পরের স্টেশনই তো বনগাঁ। এর ভিতরে বীরাঙ্গনা মাসির সঙ্গে তার কিছু কথা হতে পারত, হল না।

বীরাঙ্গনা বলে, ফণি তোর ঠিকানাটা ওরে দে, যদি খোঁজ দেয়।

কী খোঁজ দেবে? ফণিভূষণ ঘুরে তাকায়।

এই যে একজন দিয়েছে, নোয়াখালি জেলার দত্তপাড়া গাঁর ঠিকানা, একজন বলেচে খুলনার দক্ষিণ ডিহি-পয়োগ্রামের ঠিকানা—এসব জানা আছে?

ফণিভূষণ বলে, নোয়াখালিতে বড় দাঙ্গা হয়েছিল।

আমি জানি, গান্ধিজি গিয়েছিল। বলল সফিউদ্দিন।

গান্ধিজি তো আর ওপারে জাতির জনক থাকবে না।

না। বলে মাথা নামায় সফিউদ্দিন বেলেঘাটাতেও উনি অনশন করেছিলেন, উনি মহাত্মা ছিলেন।

ফণিভূষণ বলে, ওপারে এসব বলবে না, বললে মার খাবে।

সফিউদ্দিন বিড়বিড় করে, ওপারের লোক খারাপ?

তখন হাবলু বলে, ওটা অন্যদেশ তো, ওটা পাকিস্তান, ওর আলাদা ফ্ল্যাগ, আলাদা টাকা আলাদা গান্ধীজি, কায়েদ ই আজম মহম্মদ আলি জিন্না আছে, আলাদা দেশে আলাদা নিয়ম, আমি এসব মানি নে।

সফিউদ্দিন বিড়বিড় করে আবার, নোয়াখালিতে হিঁদু মরেছে, কলকাতায় বিহারে মুসলমান, গান্ধি দু'জায়গায় গিছলেন।

তুমি তো সব জান বাপ, সাগরদাঁড়ি যেয়ো।

সফিউদ্দিন বলল, যাব, নতুন দেশ, সব ঘুরে দেখতি হবে তো।

তখন হাবলু বলল, উর্দু জানা আছে?

কেন?

উর্দু জানলি চাকরি হবে, সুবিধে হবে। যেমন এদিকি হিন্দি?

কই হিন্দি, অভিরাম মামা কীরকম হিন্দি জানে তা যদি শুনতে। হাবলু বলল, ওদিকি বলছে উর্দু জানতিই হবে।

তার মানেডা কী?

কী আবার ঘরেও উর্দু বলো, বাইরেও। ফণিভূষণ শোনায়।

কেন মধুকবির ভাষা! না পেরে মধুকবিকেই আঁকড়ে ধরল সফিউদ্দিন।

এই হাবলু দেখে এসেছে, গভমেন্ট বলেছে উর্দু না জানলে চাকরি হবে না।

সফিউদ্দিনকে বিপন্ন দেখায়, সে তবু বলে, আমার মামুতো জানে না।

জানতে হবে। হাবলু শোনায়।

কী যে বলছ তোমরা, ওদিকি সব তো আমার মতো, সফিউদ্দিন বিড়বিড় করে, আমি উর্দু আরবি জানি, জানি নে।

ফণিভূষণ, হাবলুকে থামতে বলে। বীরাঙ্গনা উঠে দাঁড়িয়ে সফিউদ্দিনের পিঠে হাত দেয়, বলে, মোছলমান ছুঁলি চান করতি হয়, কেন করতি হয় জানি নে, কিন্তু পারলাম না বাপ, তুমি যাও, ভয় নেই, তুম মধুকবির যশোর জেলায় যাচ্ছ, তাঁর কথা প্রচার করো, বলো, 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন, তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি,

পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ...।' সফিউদ্দিন শুনতে শুনতে উঠে দাঁড়িয়ে ঢিপ করে প্রণাম করল বীরাঙ্গনা দাসীকে। বলল, আমার বিবি রেহেনা আর ছেলেমেয়ে দুটোরে আশীর্বাদ করো চাচি, হিঁদুতে মোছলমান ছোঁয় না, এই জন্যি দেশ ভাগ হয়ে গেছে, ছোঁয়াছুঁয়ি না থাকলি তো তফাতে থাকাই ভালো।

হ্যাঁ ভালো। বলে বীরাঙ্গনা চোখে আঁচল চাপা দিল, বলল, জন্ম ইস্তক এইডা শুনচি বাপ, হাজার রকম ঠাকুর দেবতা নাকি এই বলেচে, ভিতরে ঢুকে গেছে এডা, কিন্তু এই যে এখন তুমারে ছুঁয়ে দিলাম, বেশ করিচি, কোনও ভয় নেই, ওদিকি যারা আছে হিন্দু তাদেরও দেখ।

দ্যাখব। বলে সফিউদ্দিন তার বিবিরে ডাক দেয়, চাচিরে প্রণাম করো, তুমার দাদি বুড়ির মতো লাগে তো?

ট্রেনের গতি প্রায় শূন্য হয়ে আসছিল। তখন হাবুল উঠে বলল, এদিকি এস সফিদাদা, দাদা না চাচা যা হয় হবা, বলছি আমার আর একটা ঠিকানা আছে।

কী ঠিকানা? সফি অবাক, তুমার মা বাপেরটা নিছি তো।

না, সে তো যাবা আশাশুনি, এ হল উতুলি, অজেত আলি, ভালো ফুটবল খেলে, আর ময়রম। হাবলুর গলা বুঁজে যায় মরিয়ম—ময়রম উচ্চারণ করতে, বলল, শাদি হল কিনা এর ভিতরে, খোঁজটা নিয়ো।

নেব, কী করে খবর দেব, কলকাতার ওই ঠিকনায়?

না না, খবর দিতি হবে না, খবরটা নিয়ো, চলন বিলে শাদি হলে খুব কষ্ট হবে ময়রমের, দেখা হবে না—খোঁজ নিবা তো।

ট্রেন থামল চাঁদপাড়ায়। সব হুড়মুড় করে নেমে যেতে লাগল।

সফিউদ্দিনও ঘাড় কাত করে তার হোল্ড অল, বাক্স নামাতে লাগল। বাচ্চা দুটো নেমে দাঁড়িয়েছে নিচু প্ল্যাটফর্মে। সফিই নামিয়েছে পাদানিতে দাঁড়িয়ে।

চাঁদাপাড়া থেকে ট্রেন ছাড়তে সব শূন্য হয়ে গেল যেন আচমকা। বীরাঙ্গনা মুখ অন্ধকার করে বসে থাকল। ট্রেন খুব ধীরে ধীরে চলছে। সিগন্যাল না পেয়ে একটু এগিয়েই দাঁড়াল। ফণিভূষণ ভাবল, কেন সে বারবার রুষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, লোকটার দোষ কী? এতদিন বাদেও তো যেতে হচ্ছে ওপারে। হাবলু আচমকা বলল, বুঝা যাচ্ছে পাটিশন কী?

কী? ঘুরে তাকায় বীরাঙ্গনা দাসী।

এইরকম, কীরকম ঠাণ্ডা মেরে গিছি আমরা।

হুঁ।

মনে হচ্ছে ট্রেন খালি হয়ে গেছে, তাই না দিদমা?

বীরাঙ্গনা তাকে আঁকড়ে ধরল বুকের ভিতর।

আটত্রিশ

বনগাঁ, বনগ্রাম যখন পৌঁছল গাড়ি, বেলা ঝুঁকে এসেছে। বনগাঁ স্টেশনে নেমে বোঝা গেল স্টেশন চত্বর রিফ্যুজিতে ভর্তি। রীতিমতো সংসার পেতে বসেছে হোগলা দর্মা দিয়ে ঘর তুলে। বড় শিরীষ গাছের নীচেও বসে আছে দিশাহীন মানুষ মানুষী। তারা ট্রেন ধরে কলকাতার দিকে যাবে। বীরাঙ্গনা নেমে হকচকিয়ে গেছে। এ কেমন দৃশ্য। হবেই তো, একেবারে বর্ডারের কাছে যে। কিন্তু বসিরহাটে এমন নেই, যেমন রয়েছে বনগাঁয়। বীরাঙ্গনা বলল, জিজ্ঞেস করে আসি কোন জেলা থেকে আসছে।

ফণিভূষণ বারণ করল, না মাসি, এখন থাক।

থাক। বীরাঙ্গনা ঘাড় ঘুরিয়ে ফণিভূষণের দিকে তাকিয়ে বুঝল এখন যে কাজে এসেছে সে কাজে মন দেওয়া ঠিক। তবু সে বলল, পাটিশনের আগে যশোর জেলায় ছিল বনগাঁ, পরেও তিনদিন ছিল যশোরে, তিনদিন বাদে আঠেরো তারিখে এখেনে ইন্ডিয়ার ফ্লাগ ওঠে।

তাতে হল কী মাসি, খুলনাও তো ইন্ডিয়ায় আগে পড়ে উলটো হয়েছে।

ফণিভূষণের কথার জবাব দেয় না বীরাঙ্গনা। হাবলু খুঁজছে জেঠা আর দিদিকে। তাদের থাকার কথা। কই? বীরাঙ্গনা বিড়বিড় করছে, ওপার ওপার গন্ধ এখেনে, এরকম যে হতি পারে তা কেউ বিশ্বাস করত না।

ফণিভূষণ শুনেছে কিনা ধরা যায় না। তার মন অন্যদিকে। হাবলুর মতো সেও খুঁজছে যাদের তাদের চেনে না। চেনে না কিন্তু আন্দাজ করতে পারছে একরকম। বীরাঙ্গনা দাসীই তো বলেছে, মেয়ে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, সংসারী, যে ঘরে যাবে সে ঘর আলো করে দেবে, তাদের উন্নতিও হবে। সেই মেয়ে কই? মাথাভরা চুল, মুখে সবসময় হাসি, কোথায় কোথায় সে?

বীরাঙ্গনা বলল, তখন কী করে কলকাতা যেত ফণি?

চমকে যায় ফণিভূষণ, কখন?

সেই তখন, আমার মধুকবি, আমার মধু যখন সাগরদাঁড়ি থেকে গেল মা জাহ্নবীরে শেষ বারে মতো দেখে।

ফণিভূষণ বলল, একশো দশ বছর আগে, তখন কি বনগাঁ ছিল?

কী জানি, যশোর তো ছিল জানি, যশোরেই তো রাজনারায়ণের বড়ভাই রাধামোহন সেরেস্তাদার হয়েছিল।

তবে বনগাঁও ছিল। ফণিভূষণ অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দেয়। এদিক ওদিক তাকায়। হাবলু গেল কোথায়? টিকিট ঘর দিয়ে বাইরে। বুক ভার হয়ে গেছে ফণিভূষণের। বীরাঙ্গনার কথায় মন দিতে পারছে না, অথচ কথা তো খারাপ না, শুনতে ভালো লাগে।

যতই বলুক ওপারের কথা সব ভুলে যাবে, ভুলতে কি পারছে? স্টেশনের গায়ে যে শিরীষ না মেহগনি গাছ, ওর বয়স তো একশো বছর হবে, তাহলে? অবশ্য বয়স তার অনুমান। তখন তো রেলগাড়ি ছিল না। যশোর এসে ঘোড়ার গাড়ি করে মধু চলেছে যশোর কলিকাতা রোড ধরে কলিকাতার দিকে? নাকি নৌকোয় করে কপোতাক্ষ ধরে অন্য নদী, বেতনায় পড়ে, নদীপথে কলকাতা?

বীরাঙ্গনা বলল, মধুর বড় জ্যেঠা, রাজনারায়ণ দত্তর বড় ভাই যশোরে সেরেস্তাদারি করে কত আয় করেছে তার ঠিক নেই, সাগরদাঁড়িতে একবার একশো আট কালীপুজো করেছিল, তাতে একশো আট মহিষ, একশো ভেড়া আর একশো আট ছাগল বলি দিয়েছিল, একশো আটটা সোনার জবা ফুল দিয়েছিল মায়ের পায়ে।

মাসি হাবলু কই? ফণি কথাটা শুনলই না, উদ্বিগ্ন হচ্ছে বারে বারে।

তুই আমারে দিদমা বল ফণি।

কেন, মাসি বলতি ভালো লাগে যে।

মাসি তো আমি অভিরামের, তোর বয়স কি তার মতো?

আমি তো ওঁরে দাদা বলি।

দাদা বলবি কেন, মামা বলবি, মেসো বলবি।

হেসে ফেলল ফণিভূষণ, বলল, তা কী করে হয়?

হয়, হবে, শুধু শুধু নিজিরে বুড়ো করে তোর লাভ?

ফণিভূষণ বুঝল। বুঝতেই তার হৃদস্পন্দন দ্রুত হল। হ্যাঁ বটে। হাবলু যদি হয় তার সম্বন্ধী, বীরাঙ্গনা দাসী তার দিদিমাই হবে। না হলে ঝপ করে তার বয়স অনেকটা বেড়ে যাবে। হাবলুর দিদি বুলুর সঙ্গে বয়সের তফাৎটা বেশি হয়ে যাবে। সে চুপ করে থাকল। প্রসঙ্গ বদলে দিচ্ছে, কেননা ওই যে হাবলুকে দেখা গেল নিচু প্ল্যাটফর্মের শেষ দিকে। সঙ্গে একটা লোক। মোটাসোটা, মাথায় চুল নেই তাই একটা বিলিতি হ্যাট লাগানো। ফণিভূষণ তা দেখে বীরাঙ্গনাকে বলল, মাসি, সাগরদাঁড়ি আমি যাব একবার।

আবার তুই মাসি বলিস?

ও হবে হবে বলছি যশোর থেকে গরুর গাড়ি মিলবে তো।

মেলবে, কিন্তু কী করে যশোর যাবি?

পাশপোর্ট করে। বলতে বলতে দেখল হাবলু আর তার সঙ্গের লোক দাঁড়িয়েছে। পান গুমটি থেকে পান কিনছে লোকটা। কিন্তু হাবলুর দিদি বুলু কই? তার ও তো স্টেশনে আসার কথা। ফণিভূষণ হতাশ ও বিষণ্ণ হল আচমকা। তখন একটি লুঙ্গি আর লংক্লথের পাঞ্জাবি পরা লোক এসে জিজ্ঞেস করল, বেলাকে যাবেন, বেলাকে, পাকিস্তানের মটোরে তুলে দেব।

ফণিভূষণ তার কথা শুনতেই পায় না, কিন্তু বীরাঙ্গনা বলল, কত করে নেবা, যশোর যদি যাই।

যাবে তো বলো ঠাকমা, টাকা পয়সায় আটকাবে না।

ফণিভূষণ হাত তুলল। হাবলুও হাত তুলল। ফণিভূষণ আকাশের দিকে তাকায়, তারপর ঘুরে গিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞেস করে, লাস্ট ট্রেন ক'টা?

সাতটা বাইশ, পাকিস্তান পাকিস্তান পাকিস্তান।

ফণিভূষণ বলল, না আমরা যাব না, চলে যাও।

যাবে না তো দাঁড়িয়ে আছ কেন?

ফণিভূষণ রেগে যায় হঠাৎ, বলে, সে জবাব তুমি নেবে নাকি?

পাশপোর্ট না থাকলি ধরছে আর যশোরের জেলে ঢুকোয়ে দেচ্ছে, তারপর চালান করে দেচ্ছে পদ্মাপারে, ঢাকায়।

ফণিভূষণ বলল, ওসব আমাদের শুনাচ্ছ কেন, আমরা কলকাতা থেকে আসছি।

কলকাতা থেকে ওপারে যাচ্ছে কতজন, যাচ্ছে আসছে, হিন্দু, মুসলমান দুই, আপনারাও তাই এসেছ।

তুমি জেনে বসে আছ, এই যা দেখি।

যাবেন তো বলো, কমে হয়ে যাবে।

না যাব না, দিদমা এসো তো। ফণিভূষণ হাত ধরল বীরাঙ্গনার, বলল, ওই তো হাবলু, এসব ব্ল্যাকের দালাল, না কথা বলাই ভালো।

বীরাঙ্গনাকে টানতে টানতে এগোতেই হাবলুকে চোখে পড়ে আবার। লোকটা হাবলুকে কী যেন দিল। হাবলু পকেটে রাখল। এবার বীরাঙ্গনার চোখে পড়ল লোকটাকেও। কিন্তু হাবলুর বড় বোন কই? আসে নি তো। তারা দাঁড়িয়ে পড়তে হাবলু তার জেঠা খগেন রায়কে নিয়ে এগিয়ে এল, হাবলু বলল, আমার জেঠা, বাড়িতি যেতি হবে দিদমা, স্টেশনে কি ওসব হয়?

বীরাঙ্গনা বলল, বাড়ি হলি তো ভালো হবে।

হ্যাঁ, জেঠি বলেছে বাড়িতেই হবে। বলে হাবলু বিষণ্ণ হয়ে গেল। হাবলুর কথার ভিতরে ও বিষণ্ণতা ছিল যে তা বীরাঙ্গনা টের পেয়েছে। বীরাঙ্গনা তো হাবলুর সব কথা জানে। হাবলুর জেঠি, জেঠা, জেঠতুতো বড় ভাই—সবার কথা, তাহলে কী হতে পারে? খগেন রায় হাত জোড় করল বীরাঙ্গনা আর ফণিভূষণকে, আপনারা আমার বাড়িতে চলুন, আমার পরিবার বলেছে স্টেশনে মেয়ে পাঠাবে না, ওতো আমাদেরই মেয়ে।

ফণি আর বীরাঙ্গনা ঘাড় কাত করল। স্টেশনের বাইরে থেকে রিকশা নেওয়া হল। ফণিভূষণ আর বীরাঙ্গনা একটিতে, হাবলু আর তার জেঠা অন্যটিতে। রিকশা চলল মহাশিরীষের ছায়ায় ঢাকা পথ দিয়ে।

বীরাঙ্গনা পৌঁছে গেল। এই পথটুকুতে ফণিভূষণ আর বীরাঙ্গনা, দুজনেই চুপচাপ। ফণিভূষণের সঙ্গে বীরাঙ্গনার হৃদস্পন্দনও বেড়েছে। তার এতকালের জীবন, এত দেখেছে সে, গন্ধ পায় যেন। এখন ভালোয় ভালোয় মিটলে হয়। বীরাঙ্গনা রিকশা থেকে নেমে হাবলুকে ডাকে, বলল, তাড়াতাড়ি করবি হাবলু, ফিরতে হবে তো।

ফণিভূষণ অনুসরণ করল ওদের দুজনকে। তার গায়ে শার্ট, ধুতি, পায়ে কোলাপুরি চপ্পল, হাতে একটি রেক্সিনের হাত ব্যাগ। যে ঘরটিতে তাদের বসিয়েছে সেই ঘরটি অবিন্যস্ত। একধারে তক্তপোষ, বিছানায় কেউ শুয়েছিল, উঠে গেছে। হাবলু ভিতরে। ভিতরে কথা হচ্ছে। খগেন রায় ঘরে এল, বলল, একটু বসতে হবে।

আমরা ফেরব।

হুঁ, জানি, কিন্তু না বলে তো আসা।

বীরাঙ্গনা বলল, হাবলু বলে গিছিল তো।

ও তো বালক, ওর বয়স হয়েছে যে ওর কথা বিশ্বাস করতি হবে। বলে চলে গেল।

তাহলে ডেকে আনলেন কেন, আমরা চলি যেতাম স্টেশন থেকে। বীরাঙ্গনা একটু রাগ প্রকাশ করল। এ কেমন কথা, ডেকে এনে কী কথা বলছে তাদের।

খগেন রায় হাত জোড় করে বলল, না, না তা না, আসলে মেয়েডারে নিয়ে ওর জেঠি সুন্দরপুর গেছে, ফিরে আসবে।

বাড়ি নেই?

না নেই। বলে ঢোক গিলল খগেন রায়।

বীরাঙ্গনা বলল, আমরা আসব জানা সত্ত্বেও মেয়েরে অন্য জাগায় পাঠিয়ে দিলেন?

আসবেন তো জানা ছিল না।

জানা ছিল না তো স্টেশনে গিছলেন কেন?

খগেন রায় বলল, ওরা এসে যাবে, সন্ধের আগেই চলে আসবে।

আমাদের তো ফিরতে হবে। এবার ফণিভূষণ কথা বলল, ওঠো, আগের ট্রেন ধরি, হাবলু কি যাবে?

খগেন রায় হাত জোড় করল, না না বসুন, ওরা এসে যাবে।

ফণিভূষণ হতাশা ও ক্ষোভে বিরক্তিতে দরজার কাছে। তখন হাবলু ঢুকে পড়ল ঘরে, বলল, জেঠা তোমারে বলে যাই নি?

খগেন বলল, তোর দিদি এসে যাবে, তোর বড়দার তো বিয়ে সামনে, সেই ব্যাপারে তোর জেঠি গেছে সুন্দরপুর, বুলুরে নিয়ে গেল।

জেঠি কি জানত?

হ্যাঁ, জানত। বলে মাথা নিচু করল মধ্যবয়স পার হওয়া খগেন।

জেঠিরে জানালে কেন?

জেনে গেল। বলে কী রকম কুঁজো মতো হয়ে গেল খগেন রায়, বলল, তোর জেঠি যে কী করে জানল, তোর দিদি বলতি পারে।

দিদি বলবে না।

বলেছে, না হলে জানবে কী করে?

হাবলু বলল, আমার দিদি, আমি তার বিয়ে দেবই, জেঠি তারে নিয়ে গেল কেন, আমরা তো এখেনে আসব বলি নি।

খগেন রায় মিনমিনে গলায় বলল, আহ হাবলু, এঁরা সব বাইরের লোক, ঘরের কথা বলছিস কেন।

এরা আমার আপনার লোক, জেঠা এই যে ফণিভূষণ দাস, এঁর সঙ্গে দিদির বিয়ে হবে। গমগম করে ওঠে হাবলুর কণ্ঠস্বর। মুহূর্তে তার বয়স বেড়ে গেছে। সে বলল, দিদি কি ঝি গিরি করবে এখেনে?

এ কী বলছিস হাবলু! আর্তনাদ করে ওঠে যেন খগেন রায়।

ঠিক বলছি জেঠাবাবু, আমি তুমারে বলি গিলাম, এই দিদমা কেডা জানো তুমি, মধু কবির নাতনি, সাগরদাঁড়ির মধুসূদন, মাইকেল মধুসূদনের নাম জানো তুমি, আর ইনি হলেন ফণিদাদা, তুমি দিদিরে আটকাতি পারলে না?

তোর জেঠিরে তুই চিনিস নে?

হাবলু বলল, জেঠিরে বলতি গেলে কেন তুমি?

ও গন্ধ পায় রে হাবলু। বলে নুয়ে গেল খগেন রায়। তা দেখে বীরাঙ্গনার মনে কষ্ট এল, বলল, ছবি আছে কোনো, ওর পাসপোর্ট নেই?

না বেলাকে পার হয়েছিল, তবে ছবি বোধহয় আছে একটা, গ্রুপ ছবি। বলে খগেন রায় ভিতরে গেল। তার পিছু পিছু হাবলু। ফণিভূষণ আর বীরাঙ্গনা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেই বুঝতে পারল আসল ঘটনা কী? হাবলুই ছুটে ভিতরে এল, হাতে বাঁধানো ছবি। এই যে এই যে আমার দিদি! বলতে বলতে হাবলু বীরাঙ্গনার হাতে ছবিটা দিল, দ্যাখো দিদমা দ্যাখো।

বীরাঙ্গনার পাশে দাঁড়িয়ে ফণিভূষণ দেখল প্রায় লুকিয়ে। এই বাড়িতেই তোলা ছবি। মুখখানিতে দুঃখ আছে। টের পায় ফণিভূষণ। মাথায় কত চুল? না দেখে ধরা যাবে না। হাবলুর দিদি বেশ সুন্দর ছিল বছর দুই আগে। এখন?

হাবলু তাকিয়ে আছে ফণিভূষণের দিকে। খগেন রায়ও। অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত হয়ে ফণিভূষণের পাশে এল খগেন, বলল, লক্ষ্মী প্রতিমা, কী কাজ না করতে পারে! ওর জেঠি তো ও ছাড়া এক পা চলে না।

হাবলু বলল, জেঠা তুমি দিদিরে নিয়ে কলকাতা আসবা, অভিরাম মামার বাড়ি, বেলগেছে, ঠিকনা দিয়ে যাচ্ছি।

ঊনচল্লিশ

ফেরার সময় তিনজন চুপচাপ। কী হল? কিছুই হল না। ফণিভূষণ চুপ করে গেছে একেবারে। বীরাঙ্গনাও। ফণিভূষণ হয়তো অপমানিত হয়েছে, বীরাঙ্গনার তাই মনে হচ্ছে। এত যে ঢাক বাজিয়ে যাওয়া হল, পাঁচজনে জানল, তো হল কী? মুখটা নিচু করে বসে আছে হাবলু। ঘাড় ভেঙে গেছে যেন। বীরাঙ্গনার মুখখানি ছোট হয়ে গেছে। এই ঘটনা যে শুনবে সে তাকে দুষবে। তার কী দরকার ছিল? মেয়ের জেঠা আছে জেঠি আছে, তাদের কি মাথায় নেই ওই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে? মেয়ের বাবাই বা কী রকম, এরকম একটা আধ পাগলা ছেলেরে উপর ভার দিয়েছে মেয়ের বিয়ের? আর বীরাঙ্গনাও তাকে নিয়ে ছুটেছে বনগাঁ?

ফণিভূষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। ট্রেন হুইসল মারতে মারতে দৌড়চ্ছে মাঠ গ্রাম ভেদ করে। যখন তারা বনগাঁ গিয়েছিল, কত কথা সেই সফিউদ্দিন নামের লোকটির সঙ্গে। এখন তারা ফিরছে একেবারে বোবা হয়ে, যেন সব কিছু রেখে এসেছে বনগাঁয়। যেন তারা সব কিছু রেখে ওপার থেকে আসছে এপারে। ফণিভূষণ খুব গম্ভীর হয়ে গেছে। আসলে শেষ মুহূর্তে ছবিটি দেখে ফণিভূষণের মুখ আরও অন্ধকার হয়ে গেছে।

বীরাঙ্গনা হাত রাখল হাবলুর পিঠে, ঘুমুচ্ছিস?

মাথা নাড়ে হাবলু কিন্তু মাথা তোলে না উপরে। বরং দু'হাত দিয়ে মুখ চাপা দিয়ে রাখে। তখন বীরাঙ্গনা বলে, মন খারাপ হচ্ছে?

ঘাড় কাত করে হাবলু। মন তার খারাপ হয়েছেই। দিদিকে কতদিন দ্যাখে নি। মনে হচ্ছিল ফণিভূষণের সঙ্গে বিয়ে হলে আর কিছু না হোক, দিদিকে তো ইচ্ছে মতো দেখা যাবে। আর ভাইফোঁটার দিন ফোঁটা নেওয়া যাবে। দিদি ওপারে পয়সা জমাত ভাইদের ফোঁটা দেবে বলে। সব তার নিজের। তাই দেখে ডলুও করত। হাবলু মাথা তুলে বলল, বিহিত করতি হবে এর।

ফণিভূষণ উঠে গেল সিট থেকে। খুব গম্ভীর তার মুখ। গম্ভীর তার চলন। তার দিকে তাকিয়ে বীরাঙ্গনা দাসী একটু কুঁকড়ে গেল। জিজ্ঞেস যে করবে ফোটোতে মেয়ে পছন্দ হল কিনা সে ফাঁকটুকুও দিচ্ছে না তারপর থেকে। রিকশায় একা এসেছে, বীরাঙ্গনা আর হাবলুকে অন্য রিকশায় উঠতে বলেছিল। বনগাঁ স্টেশনের নেমে দুই রিকশার দাম মিটিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে তার অসন্তুষ্টি কমে নি একটুও। বোঝা যায় নি তা।

হাবলু চাপা গলায় বীরাঙ্গনাকে বলল, তিনজনে গিছি বলে এই হল।

বীরাঙ্গনা চমকে ওঠে, বলে, কিন্তু আমরা তিনজন একসঙ্গে তো তোর জেঠার বাড়ি ঢুকি নি, তোর জেঠারে নিয়ে চারজন হল।

হাবলু বলল, আমি দিদিরে নিয়ে আসব, তুমি খোঁজ নিয়ে দ্যাখো বিয়ে হবে কিনা।

কোথায় আনবি?

হাবলু চুপ করে থাকে। আনবে কোথায়? ইস! তার মুখে আরও অন্ধকার ভরে যাচ্ছে। অভিরাম মামা যদি রাজি না হয়? সে ব্যাপারে কি তার সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে যে বলবে দিদির কথা? তিনিই বা অত ভার নেবেন কেন? হাবলু চুপ করে গেল। এখন তার মনে হচ্ছে পাকিস্তান রদ করার চেয়েও একাজ আরও কঠিন হয়ে গেছে। কঠিন করে দিয়েছে তারাই। হাবলু মাথা ঝাঁকাতে থাকে। একদিন এক চায়ের দোকানে শুনছিল, সরকার পাকিস্তান রদ করতে চাইলেও মানুষ আর যাবে না ফিরে।

কেন যাবে না? হাবলু ঢুকে পড়েছিল তাদের কথার ভিতরে।

হাবলুকে দেখে অবাক হয়েছিল আধবুড়ো লোকগুলো। তারা ওপার থেকে এসে কোনও কলোনি, কোনও বস্তির ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। কাজ কম্মো করছে ছোটখাটো। যে চায়ের দোকানে বসেছিল, সেই দোকানিও এসেছে বরিশাল থেকে। দোকানিই বলল, আজ রদ হবে কাল আমরা যাব, পরশু ওরা আবার মেরে তাড়াবে।

হাবলু বলেছিল, না তা হবে না।

তুমি কী বোঝ হে ছোকরা, কোথায় বাড়ি ছিল?

হাবলুর সেই থেকে একটা চিন্তা হয়ে আছে, যদি পাকিস্তান রদ হয় তবে কি যে যার জায়গায় ফিরে যাবে? লুডোর এক গেম শেষ, পরের গেম যেভাবে আরম্ভ হয় নতুন করে, লাল নীল হলুদ সবুজ ঘুটি যে যার ঘরে যায়, তেমনি হবে? কী করে হবে? টিয়াও তো বলেছে কলকাতা ছেড়ে যাবে না। মেয়েটা যদি সত্যি সত্যি ময়রম, মরিয়ম হয়, তবেও সে যাবে না উতুলি ফিরে। যে যেমন হয়ে গেছে সে তেমন থেকে যাবে। এই যে সফিউদ্দিন গেল, সে ও কি আর ফিরবে যশোর থেকে? মানুষই চাইবে না ফিরতে, রদটা শেষে মাঠে না মারা যায়। সব রিফ্যুজি হয়ে না এসে যদি হিন্দু মুসলমান যে যার গাঁয়ে ভিটেয় থেকে যেত। হাবলু মাথা নাড়ে, তা হয় না। হিন্দুরা বলে মুসলমান খুব কেটেছে ওদের। মুসলমানদের সঙ্গে থাকা যাবে না। ওপারে গিয়ে ওই একই কথা শুনে এসেছে। মুসলমান যারা গেছে তারা আলাদা কিছু বলছে না। হিন্দুর সঙ্গে থাকা যাবে না, পাকিস্তান হয়েছে মুসলমানের জন্য। মুসলমান বাঁচবে পাকিস্তানে।

হাবলু বুঝতে পারছে এসব ভেবে নিয়েই পাকিস্তান রদ করতে হবে। কিন্তু তাতে আসলে কী হবে? সে কি কলকাতা ছেড়ে যাবে? টিয়ার কথা কি সত্যি নয়? খুব জট পাকিয়ে গেছে সবটা, যেমন তারা জট পাকিয়ে এসেছে বনগাঁয়। এখন জেঠা কী করবে জেঠি কী করবে তার উপরেই সব নির্ভর। হাবলু জিজ্ঞেস করল, ফণিকাকার কি পছন্দ হয়েছে?

কাকা না দাদা বল।

বলছি, কিন্তু আমার দিদি তো সুন্দর, তারে কি বিয়ে করবেন উনি?

বীরাঙ্গনা বলল, পরে জিজ্ঞেস করব।

হাবলু বলল, আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেছে দিদমা, আমি ভেবেছিলাম বিয়ে হোক না হোক দিদিরে তো দেখা হবে।

কতদিন দেখিস নি?

অনেক দিন।

যেতি পারিস তো।

না জেঠি আর বড়দা অবনীদা আমারে দেখলিই মার মার করে তেড়ে আসবে, ঢিলোবে।

কেন রে তুই কী করেছিস?

জানিনে, পথের কুকুররে যেমন ঢিলোয়—

আহ, তুই থাম হাবলু, এরম করে বলতি নেই, মানুষ হয়ে তোরে এর শোধ নিতি হবে, পারবি নে?

বনগাঁ তো পাকিস্তানেই ঢুকি পিছল, যশোর জেলা ছিল ওডা, তাই যদি হত অবনীদা আর জেঠি বুঝতি পারত কত ধানে কত চাল।

ভালো হত? বীরাঙ্গনা জিজ্ঞেস করে।

খুব ভালো হত, পাকিস্তান রদ যদি হয়—উফ! হাবলু দু'হাতে মাথা চেপে ধরে, বলে, বনগাঁ বাদ দিয়ে করা হবে।

বনগাঁ কী দোষ করল?

আমার দিদি আর আমি ডলু, ডাবলু কী দোষ করল, আমার মা বাপ কী দোষ করল?

ডাবলু থাকে খড়্গপুর কোন জ্ঞাঁতির বাড়িতে। সে কী রকম আছে তা হাবলু জানে না। চিঠি দিয়েছিল, জবাব আসে নি। খড়্গপুর যাবে যে, কোথায় যাবে, কোন বাড়ি? চিনতে যদি না পারে? ঠিকানা অবশ্য আছে।

বীরাঙ্গনা বলে, তুই বড় হবি হাবলু, কষ্ট না করলি দুঃখ না পেলি কেউ বড় হয় না, এই দ্যাখ মাইকেল কবি, তারেও তো বাপ মা ছেড়ে গাঁ ছেড়ে চলি যেতি হল।

হাবলু বলল, তিনি কত বড়, তাঁর কথা মিলোও কেন আমার সঙ্গে?

মিলোব কেন হাবলু, কারোর সঙ্গে কারোর মেলে না, বড়মানুষের সঙ্গে সাধারণ মানুষের মেলে না, সাধারণ মানুষের সঙ্গেও মেলে না বড়মানুষের, সবাই আলাদা আলাদা, কিন্তু কখনও দুঃখটা মিলেও যায়।

হাবলু হাঁ করে বীরাঙ্গনা দিদিমার দিকে তাকিয়ে আছে। বীরাঙ্গনা গুনগুন করে বলছে, মধুকবি তো ছেড়েছিল মা বাপ, না ছাড়লি উপায় ছিল না।

কেডা বলল উপায় ছিল না?

সে তো সাগরদাঁড়িতে থাকতি পারে না হাবলু, তার জন্যি সমুদ্দুর, পাহাড় সব বসে আছে।

কী বললে আবার বলো।

বীরাঙ্গনা বলল, সাগরপারের দেশ, বড় বড় কবির দেশ তারে যখন ডাক দেয় সে কী করে জননী জাহ্নবীর কাছে থাকে?

তাঁর দুঃখটা তাঁর নিজির করা, না গেলিও পারতেন।

তুই ও তো না এলি পারতিস।

দিদি বুনদের দ্যাখবে কেডা?

দেখতি পাচ্ছিস?

হাবলু মাথা নাড়ে, তারপরে বলে, মধুকবি খুব কষ্ট করেছে?

খুব, কষ্ট তার হবেই মারে কষ্ট দিয়ে গেল।

দিদমা তারপর কী হল?

চমকে ওঠে বীরাঙ্গনা, কারপর বলিস?

সেই যে সাগরদাঁড়ির নদীঘাটে?

শুনবি, তালে তো ফণিরে ডাকতি হয়।

না ডেক না, ফণিদাদার মন খারাপ।

বীরাঙ্গনা বলল, আমি ফণির কাছে যাই।

বীরাঙ্গনা উঠে রেলগাড়ির দুলুনিতে দুলতে দুলতে ফণিভূষণের কাছে পৌঁছয়। ফণিভূষণ জানালার ধারে বসে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। বীরাঙ্গনা গিয়ে বলল, কী হল তোর ফণি?

ফণি চুপ করে থাকল। অপমানটা হজম করতে পারছে না। হাবলু মাথার ঠিক আছে? হাবলু থাকে লোকের বাড়িতে। একদিন বলছিল না বেড়ালের মতো। তবে কিনা এঁটোকেঁটো খেতে হয় না। অভিরাম বোস ওরকম মনের মানুষ নয়। কিন্তু হাবলুর কথায় বিশ্বাস করা ঠিক হয় নি। বিয়ে ঠিক করে উপযুক্ত গার্জেন। এদেশে ওর জেঠামশায়, জেঠি মা। তাঁদের একজন কে গোপন করে, একজনকে সবটা খুলে না বলে হুট করে চলে গেলে তাঁরা কেন মেয়ে দেখাবেন? কিন্তু হাবলুর দিদির মুখখানি বড় মায়াময়। ওই গ্রুপ ছবিতেই যা দেখা গেছে তাতে মনে হয়েছে সেই রকম। চোখ দুটো বড় সুন্দর। কিন্তু একথা ফণি কাকে বলে। বীরাঙ্গনা মাসি কে? কী করে বলবে? বলা যায়? কিন্তু ফণি নিস্তব্ধ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মুখটিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিচ্ছিল।

বীরাঙ্গনা তার পিঠে হাত দিল, ও ফণি, রাগ করলি।

ফণিভূষণ ঘুরে তাকায়, বলে, না মাসি রাগ করব কেন, তবে ভালোরকম অপমান তো হয়েছে আমার, কেন যেতি গেলাম।

বীরঙ্গনা বলল, তুই না গেলি কেডা যাবে?

কেন যাওয়ার কী দরকার ছিল, কী হল বুঝলে তো?

বীরাঙ্গনা বলল, ওরা ঠিক করে নি।

তাই বা কী করে বলি, তোমারে চেনে না, আমারও না, বয়স্থা মেয়েকে এনে বসাবে কেন সামনে হাবলুর কথায়, হাবলু কি গার্জেন হতে পারে?

বীরাঙ্গনা বলল, হাবলু কাঁদছিল।

কেন, কী হল?

ও দিদিরে কত দিন দ্যাখে নি।

মাঝেমধ্যে যেতি পারে তো।

বীরাঙ্গনা তখন হাবলুর কথা বুঝিয়ে বলতে ফণিভূষণ মাথা নাড়তে লাগল, বলল, এডা খুব অন্যায়, তুমি জেঠা তুমি ওরে এরকম ভাসায়ে দিলে, ভেসেই তো আছে ওরা, ভাই বুনরা।

বীরাঙ্গনা বলল, তুই রাগ করিস নে ফণি, ভালে কাজে গিছিলি, এতে যদি তুই সফলও না হস তার মানে কিন্তু অপমান না, মান অপমান অত গায়ে মাখলি জগৎ চলে না, আমার মধুকবির কথা ভেবে দ্যাখ, বিলেতে গিয়ে টাকা চেয়ে পাঠাচ্ছে জমিদার রাজনারায়ণের ছেলে মধু দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের কাছে।

মাসি তাঁর দুঃখ তাঁর উপায় করে আনা, দুঃখ পাওয়ার কথা তো ছিল না।

বীরাঙ্গনা বলল, কবিদের অমনি হয়, তারা হল পতঙ্গের মতো...। পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি অবোধ, হায়! না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে।

ফণিভূষণ বলল, কী জীবন! বলছি মাসি, ওদের কী হবে?

কাদের কথা বলিস?

হাবলুদের। ফণিভূষণের গলা জড়িয়ে গেল দেখে বীরাঙ্গনা মনে মনে প্রসন্ন হল, বলল, কারোর কারোর কোনও কোনও ফেমিলির জীবনে এমন হয় ফণি, দুঃখ আর যায় না, আসলে তারা দুঃখটারে মেনে নেয়।

বুঝা গেল না।

ওর বাপ মা এমনি হবে জেনেই মেনে নিয়েছে সব, অন্যের ছেলেপুলে কেউ পুষতে চায়, হাবলুটা শুধু মানতে চায় না।

কিন্তু ওর মাথায় যেন—মাসি ওকি স্বাভাবিক?

স্বাভাবিক, ওর ও সব মেনে নিয়ে জেঠার বাড়ি থাকা উচিত ছিল, তা হয় নি, পাকিস্তানও মানে না আর সবার মতো, তাই মনে হয় সৃষ্টি ছাড়া, ও মাছের মতো স্রোতের বিপক্ষে যেতে চায়, আবর্জনা নয় যে ভেসেই চলবে।

ফণিভূষণ ঘাড় নাড়ল না। হাঁ কিংবা না কোনোটাই বলল না এই কথায়। সে ধীরে ধীরে উঠে হাবলুর সিটের দিকে এগিয়ে যায়। এখন বীরাঙ্গনা একা বসে। বীরাঙ্গনা ভাবে মধুকবি, মধু, সাগরদাঁড়ির মধুসূদন ও জাহ্নবী মার সৃষ্টি ছাড়া ছেলে, সৃষ্টি ছাড়া কি অস্বাভাবিক হয়?

চল্লিশ

দুঃখের বোধহয় সেই শুরু হল। কবে শুরু হল বীরা, বীরাঙ্গনা। কেন সেই যে মধু খ্রিস্টান হল তারপর থেকে। তাই কি, ভেবে বল। না তা নয়, যবে সে ভেবেছিল কবি হবে। কবিরাই জগতের যত দুঃখ, যত আনন্দ তা গ্রহণ করতে পারেন। দুঃখ, আনন্দে অবিচল থাকেন। আর সব মানুষ তো দুঃখ নিয়েই জীবন পার করে দেয়।

কেন বীরা, যার অনেক আছে তার কিসের দুঃখ? হাবলু জিজ্ঞেস করে।

বীরাঙ্গনা বলল, আরও চায়, পায় না বলে দুঃখ।

যাদের দেশ ভাগ হয়নি বীরা, মানে এপারের হিন্দু, ওপারের মুসলমান, তাদের কী দুঃখ?

দুঃখ ছাড়া মানুষ বাঁচে না হাবলু, দুঃখকে ডেকে নেয় মনের ভিতরে।

বলছ বীরা?

হ্যাঁ বলছি, মানুষ তার দুঃখকে নিজে বরণ করে নেয়, যার দেশ ভাগ হয়নি, যে রিফ্যুজি হয় নি, তার যদি দুঃখ হয় এপারে তারা ছিল কত সুখে, ওপারের লোক এসে তাদের দুঃখের কারণ হল, তবে?

হাবলু বলে, বটেই তো, লোক যে বেড়ে গেল।

বীরাঙ্গনা মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে, তাহলে ওপারের আমরা যাব কোথায়, ভেসে যাব সাগরে?

হাবলু তখন নরম গলায় বলে, সাগরের কথা বল।

সাগরে ভাসল মধু, কিন্তু সে তো এইরকম চেয়েছিল, কবি হবে, কেমন কবি হবে, না বিলেতের কবি বায়রনের মতো হবে, মিল্টনের মতো হবে, ভার্জিল নামের কবির মতো হবে।

তুমি পড়েছ ওসব?

বীরাঙ্গনা বলল, না পড়িনি, তোর দাদামশায়, আমার মাসসাই বলত, সে যা বলত সব মনে আছে রে হাবলু।

হাবলু বলল, তুমি যা বলবে সব আমি মনে রেখে দেব।

হ্যাঁ রাখবি, তাঁর কথা মন দিয়ে শুনে রাখিস, তখন এ দুঃখ দুঃখই নয়, জগৎটা হল দুঃখের সাগর, ওই কালাপানির মতো তার বিস্তার, একূল আছে কিন্তু ওকূল নেই, কোনওদিক তার দেখা যায় না, মনে হয় সব দিকে অন্ধকার, উপরের আকাশও নেমেছে সেই অন্ধকারে।

তুমি কি সাগরে গেছ কোনওদিন বীরা?

বীরাঙ্গনা পা মেলিয়ে বসে আছে। হাবলু দেওয়ালে পিঠ দিয়ে। খোকন আর এক দেওয়ালে। ঘরে ডিম লাইট জ্বলছে। খোকন বড় অবাক হয়ে যাচ্ছে হাবলুদার কথা

শুনে। বীরা নামে ডাকছে দিদিমাকে। আর দিদিমাও বেশ খুশি মনে উত্তর দিচ্ছে। আশ্চর্য! টিয়া দিদি যদি শোনে খুব রেগে যাবে, বলবে তোর হাবলুদা খুব পাকা, ইচ্ছে করে এসব বলে, আমি কি ময়রম, কে ময়রম তা তুই জানিস খোকন? পাকিস্তানের মুসলমান ঘরের মেয়ে, সে কি আমার চেয়েও সুন্দরী, সে কি আমার চেয়েও বেশি বই পড়েছে, দেবদাস আমি সাতবার পড়েছি, সে ক'বার পড়েছে রে?

খোকন বলল, আমি কি জানি?

ময়রম তো জমিদারের মেয়ে, রাজকন্যে বলা যায়, সেই যে মানিকরামের ময়রম, হাবলুদা, হাবলুবাবু কি তার কথা বলে?

বলতি পারে।

তুই জিজ্ঞেস করবি, আমি কে ওর কাছে।

তুমিই করো, আমি পারব না।

আট আনা দেব।

দিয়ো, দিলে জবাব আনব।

টিয়া তখন বলেছে, আগে খবরটা নিয়ে আয়, তারপর পয়সা, ছেলেদের আমার বিশ্বাস নেই, পয়সা নিয়েই খরচ করে বলবে ফুরিয়ে গেছে।

যখন কথা হয়েছে গত পরশুদিন তখন হাবলুদা নেই। আজ দুপুরে দিদিমাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দমদম থেকে ফিরেছে। খুব গম্ভীর। কেমন যেন হয়ে গেছে হাবলুদা। টিয়াদিদি দু'বার 'কী হয়েছে' জিজ্ঞেস করে জবাব পায় নি। খোকন জেগে আছে অতি কষ্টে। ঘুম পাচ্ছে বটে, কিন্তু দিদিমা আর হাবলুদার কথা শুনতেও খুব ইচ্ছে করছে যে।

বীরাঙ্গনা বলল, গঙ্গাসাগর গিয়েছিলাম নৈকোয় করে, তোর দাদা মশায় নিয়ে গিয়েছিল, তখন একদিন দুপুরে দেখলাম চারদিকে গোল করে জল, থল আর নেই, মাসসাই বলল আমরা সাগরের ভিতরে।

হাবলু বলল, আমি যাব।

তুই তো সাগরপারে যাবি মধুকবির মতো।

অমি তো কবিতা জানিনে বীরা।

না জানবি, কিন্তু বল দেখি আমি যখন মেঘনাদ বধ বলি, তোর কি ভালো লাগে তা, মনে হয় বীরা বলে যাক।

হাবলু বলল, হ্যাঁ।

ও খোকন তোর?

খোকন বলল, হ্যাঁ, তবে বুঝতেও তো পারি নে দিদমা।

বড় হতি হতি বুঝবি সব, সাগরে ভেসে যাওয়ার দুঃখ।

খোকন এবার আচমকা জিজ্ঞেস করল, দিদমা ময়রম কে?

কে ময়রম! হতচকিত হয়ে গেল বীরাঙ্গনা দাসী, বলল, কেডা তো আমি জানি নে, ময়রম আসে কোথা থেকে, মেঘনাদ বধে তো ময়রম নেই।

হাবলু চুপ করে আছে, হাবলু দেখছে বীরাঙ্গনা দাসীকে। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, সে চুলে পাক ধরেছে বেশিরভাগ। দাঁত পড়ে গেছে উপর নীচে চারখানি। ফোকলা লাগে হাসলে বড় ভালো লাগে। তুমি ছাড়া তাহলে কে হবে ময়রম? কোন ময়রম? পাকিস্তানে যাকে রেখে এসেছে হাবলু, সে? নাকি মানিকরামের সেই ময়রম। হাবলু চুপ করে শোনে খোকন আর বীরাঙ্গনা দাসীর কথোপকথন। খোকন বলল, তুমি না দিদমা, টিয়া দিদি জিজ্ঞেস করলে সেও কি ময়রম?

হাসল বীরাঙ্গনা, বলল, মনে করলিই তাই, তুমি যদি মনে করো তুমি হলে মধুকবি, তবে তাই, কিন্তু সেডা হতি হলি তার মতোই হয়ে উঠতে হবে।

খোকন বলে, ময়রম আসলে কেডা বলো দেখি দিদমা।

তোর শুনতি হবে না। হাবলু অধৈর্য হয়ে ওঠে, ওসব নবেল পড়া মাথায় ঢুকবে না, বীরাঙ্গনা দাসীর কাছে মাইকেলের কথা শোনে খোকন।

আবার আরম্ভ হল। মধু ছেলেবেলায় বাল্মিকীর রামায়ণ পড়ে শোনাত মা জাহ্নবীকে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে মেঘনাদের মৃত্যুর জায়গায় এসে বালক দুঃখে চোখের জল মুছত। আর সব গাঁয়ের বউ ঝিরা যখন ভাবছে, যাক মেঘনাদ শেষ পর্যন্ত গেল, এবার শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা বিজয়ের আর কোন বাধা থাকল না। মেঘনাদ কে? না স্বয়ং ইন্দ্রজিৎ। ইন্দ্রকে জয় করেছিল। মেঘের আড়ালে থেকে যুদ্ধ করে, তাকে দেখবে কে, কে মারবে?

মেঘনাদ যদি লুকায় মেঘের আড়েতে।
সহস্র চক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে।।
ইন্দ্রে বেঁধে এনেছিল লঙ্কার ভিতরে।
ব্রহ্মা আসি মাগিয়া লইল পুরন্দরে।।

তো সেই মেঘনাদ, ইন্দ্রজিৎ তো বধ হল। সবাই তখন আনন্দ করে। ইন্দ্রজিৎ বধে পুলকিত চরাচর, গন্ধর্ব কিন্নর নর,/জয় জয় শব্দ মাত্র শুনি।। রণে মৈল ইন্দ্রজিৎ, সকলেতে আনন্দিত/ধন্য বীর ঠাকুর লক্ষ্মণ।

গুনগুন করে বীরাঙ্গনা কৃত্তিবাসী রামায়ণ উচ্চারণ করে। বলে, ইন্দ্রজিৎ বধে কবি কৃত্তিবাসও আনন্দ পেয়েছিল রে হাবলু, অমন কবি কৃত্তিবাস, রামায়ণ লিখল বাংলায়, তার চোখে জল এল না এমন বীরের মরণ কথা লিখে—

কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
ইন্দ্রজিত-বধ গীত গান রামায়ণ।।

হাবলু বলে, কবি যদি দুঃখ পাবে তো লিখবে কী করে?

দুঃখের কথা লিখবে।

তা কেন বীরা, তিনি তাঁর মতো লিখুন, যে পায় দুঃখ সে তা পাক, যে না পায় দুঃখ, আনন্দ পায় মেঘনাদের মরণে, আনন্দ পাক।

বীরাঙ্গনা আধো অন্ধকারে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ফিসফিস করে, তুই যে মাসসাই-এর মতো কথা বলিস হাবলু, কিন্তু এটাও তো ঠিক মেঘনাদ বড় বীর ছিল, লক্ষ্মণ আর রামচন্দ্র ওর কাছে কিছু না, যে দেবরাজকে বেঁধে লঙ্কাপুরীতে নিয়ে যায় তার শক্তি কত বোঝ, তারে মারতে কত ছল, কত চাতুরি, এতে দুঃখ হবে না কেন?

বাল্মিকী যা লিখেছিল তাই লিখল কৃত্তিবাস।

তাই কি লিখেছে, না, তেমন লেখেনি, কিন্তু মেঘনাদের মরণে তাঁর তেমন দুঃখ ছিল না, যেমন ছিল না মহাকবির, অথচ সাগরদাঁড়ির মধু রামায়ণ পড়তে পড়তে মেঘনাদের মৃত্যুতে কাঁদতে লাগল, সবাই, মা কাকিমারা অবাক, কী হলো রে, মধু কী হল?

মধু বলে, দুঃখ হচ্ছে মা, কষ্ট হচ্ছে।

মা জাহ্নবী জিজ্ঞেস করে, কেন রে কিসের কষ্ট, রাম এবার রাবণ বধ করে সীতা উদ্ধার করে আনবে। ছিল বাধা ওই ইন্দ্রজিতের। মেঘের আড়ালে গিয়ে যুদ্ধ করত কিনা, তাকে যখন বধ করা গেছে, আর কোন দুঃখ নেই কারোর।

মধু বলল, মেঘনাদের জন্য আমার দুঃখ হয় মা, তোমার হয় না?

মা জাহ্নবী কী বলবে? তার ছেলে যে রাক্ষসের জন্য কাঁদে। বলে, যে বীর সে যদি না জয় করে ফেরে তবে বীরের সম্মান হল কী করে?

জাহ্নবী বলে, ও তো বাল্মিকীর রচনা, তারপর কবি কৃত্তিবাস। তাঁরা যেভাবে লিখেছেন সেই রকম হয়েছে সব, কোনও কোনও বীর তো ব্যর্থও হয়।

হাবলু বলল, তা ঠিক, মহাবীর কর্ণ যেমন, কিন্তু বীরাঙ্গনা বাল্মিকী না লিখলে কৃত্তিবাস লেখে কীভাবে?

বীরাঙ্গানা বলে, বাল্মিকী লেখে নি, ঠিক লিখেছে, কৃত্তিবাসও লিখেছে, না লিখলে কী করে জানা গেল মেঘনাদের যজ্ঞ ভঙ্গ করে তবে তারে মারল লক্ষ্মণ, ব্রহ্মার বরে মেঘনাদ যদি অমরত্ব পেত, মরণ হত না, কিন্তু বীরের মৃত্যু ওইভাবে হয়, সম্মুখ যুদ্ধে না পেরে যজ্ঞ ভঙ্গ করতে হয়, যজ্ঞ ভঙ্গ করে তার শক্তি ক্ষয় করে দিতে হয়।

হাবলু বলল, বোঝা গেল না ঠিক মতো।

বীরাঙ্গনা বলে, যিনি যুদ্ধ করেন, যিনি মহাবীর তিনি কিন্তু একা, তাকে ঘিরে ধরে আর সবাই, ঘিরে ধরে মারে, শেষ করে, তিনি একা যুদ্ধ করতে শেষ হন, তাঁর মরণের ব্যবস্থা পাকা করা ছিল ব্রহ্মার হাতে।

হাবলু বলল, একা মেঘনাদ আর বিপক্ষে রাম লক্ষ্মণ বানর সেনা আর আকাশের দেবতা?

হ্যাঁ, ইন্দ্রজিত-মেঘনাদেরে সকলে মিলে মারল—শোন তা হলে,

পড়িল মস্তক সহ মুকুট কুণ্ডল।
ইন্দ্রজিতের মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতল।।
ইন্দ্রজিতের কাটা মুণ্ড উপরেতে চড়ি।
কোন কপি লাথি মারে কেহ মারে বাড়ি।।
কিল লাথি মারিয়া মস্তক করে গুঁড়া
জীয়ন্তে না পরে কপি মড়ার উপর খাড়া।।

মরণের পর বীর ইন্দ্রজিতের মুণ্ড নিয়ে এই করল রামের সেনা। দুঃখ না হয়ে যায়। বীরের মান দেবে না তুমি? রামচন্দ্র না মহাপুরুষ। তিনি আনন্দ করেন বীরের এমন মৃত্যুতে? মৃত্যুর পর ও প্রতিহিংসা যা না। বরং তা বেড়ে যায়।

হাবলু বলল, কৃত্তিবাস তো লিখেছে এটা?

হ্যাঁ লিখেছে।

তাহলে তো তিনি মধুর মনে দুঃখও লিখে দিলেন।

বীরাঙ্গনা অবাক হয়ে অন্ধকারে বসা হাবলুর দিকে তাকিয়ে থাকে। বনগাঁ থেকে আসতে আসতে হাবলু বড় হয়ে গেল যেন। হাবলু যা বলছে একথা বীরাঙ্গনার স্বামী বলতেন। সে ডাক দিল, ও হাবলু, তোরে এসব কে বুঝাল?

কে বোঝাবে বীরা, বোঝা যায়।

খোকন চাপা গলায় বলল, বীর থেকে বীরা, বীর মেঘনাদ, বীরা দিদমা।

হ্যাঁ। বলে হাবলু বলল, তুই ঘুমো খোকন, ঢুলছিস তো।

খোকন বলল, না, আমি শুনব মেঘনাদের কথা।

শোন, শোন কীভাবে একজনেরে সবাই মিলে মারে। গরগর করে ওঠে হাবলু, ফেলে মারে কীভাবে তা শোন তুই, আমারে আমার বড়দা, জেঠাবাবুর ছেলে অবনীদা মেরেছিল মাটিতে ফেলে, লাথি মেরেছিল পরের পর, দিদি দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে, জেঠি তাকে বলছে, যা বুলু পান সেজে নিয়ে আয়, জেঠি বলছে ভালো করে মার, শাসন কর, একেবারে বয়ে গেছে ও, ওরে মেরে তাড়া, ঠ্যাং ভেঙে দে যাতে ভিক্ষে করেও না খেতি পারে।

থাম থাম থাম। বীরাঙ্গনা বলে, আমি সহ্য করতি পারছিনে।

তুমি যে বললে বীরা, বানর সেনার দল কিল লাথি মারল মহাবীর মেঘনাদের মুন্ডুতে, এতে কি রামচন্দ্রর সায় ছিল না?

বীরাঙ্গনা বলে, কৃত্তিবাস পষ্ট করে লেখেনি, কিন্তু সায় তো ছিল, আকাশের সব দেবতার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র আনন্দ করেছিল অন্যায় যুদ্ধে মেঘনাদকে মেরে, কৃত্তিবাস কবি তা লিখেছিল, মধু তা পড়ে মনে মনে ভেবেছিল কবি হবে মেঘনাদের মরণ কাহিনি লিখে, কে কবে ভেবেছেরে বীর মেঘনাদ হবে মধুর স্বপ্ন, রাম লক্ষ্মণ না।

হাবলু বলল, ওই জন্যে দুঃখ ছাড়ল না।

কী বলিস রে তুই হাবলু! কী বলিস! কে শিখাল এমন কথা?

হাবলু কেমন ঘোরের ভিতর বলে, বীরা তুমি? তুমি না ময়রম আমি তা ঠিক করতি পারি নে, তবে বুঝতি পারি মধু যা লিখেছিল ঠিক লিখেছিল, মধুর দুঃখ যাবে না কোনওদিন। আকাশের দেবতা আর শ্রীরামচন্দ্র মধুরে মারবে, মেরে ফেলবে বীরা, তুমি মধুরে সাবধান করো, জানাও বীরা, সকলে শোধ নেবে বলে বসে আছে।

বীরাঙ্গনার দু'চোখে তখন জলের ধারা। ডাকছে, আয় তোরা দুটিতে কাছে আয়, আমি একটু শান্তি পাই, আমার মধু গেছে আমারে ছেড়ে...।

একচল্লিশ

বীরা তুমি একা একা কাঁদ কেন, মা বাবার জন্য মন কেমন করে?

বীরা লজ্জায় মাথা নামায়। ইস! তার চোখের জল দেখতে পেয়েছে মাস্টার মশায়। স্বামীকে মাস্টার মশায় ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না সে? কিন্তু সেই মাস্টার মশায় বড় স্নেহময়। সুযোগ হলে বীরাকে বলে, তুমি যদি বই পড়ো বীরা, দেখবে তোমার পৃথিবীটা কত বড় হয়ে গেছে, কুলকিনারা পাবে না।

সাগরের মতো মাসসাই?

হেসেছিল মানুষটি, তার পিঠে হাত রেখে বলেছিল, না বীরা, আকাশের মতো, আকাশের চেয়ে বড় কিছু নেই।

হুঁ। ডাগর চোখ মেলে সদ্য যুবতী বধূ স্বামীর দিকে তাকিয়ে। গায়ে চাদর। বুকখানি কত চওড়া। ওই বুকে মাথা রেখে কত সুখ। কিন্তু কখন রাখবে সে? ভয়ও করে। মাসমাই যখন পড়ার কথা বলে তখন ওই পড়া ছাড়া আর কোনও কিছুতে মন দেওয়া চলবে না। ধুতির খুঁট থেকে একটি হলুদ দুয়ানি বের করে মাসসাই বলল, তুমি না পয়সা চেয়েছিলে বীরা?

মাথা নিচু করে সে বলেছিল, হুঁ, বাগদি বউ এর খুব অভাব, তার স্বামী কোথায় গেছে আর ফিরে নি।

হুঁ, অভাব যাচ্ছে সব দিকে, দু'আনায় হবে?

বীরা মাথা নামিয়ে বলেছিল, এক সিকি।

এক সিকি বাগদি বউ এর হাতে দিয়ে কী আনন্দ! তখন, আর দু'তিন বছর বাদে বঙ্গভঙ্গ হল। বঙ্গভঙ্গ হল বটে কিন্তু তা এমন হল না যেমন হয়েছে এখন। বঙ্গভঙ্গ হল বটে, হিন্দু মুসলমান কিন্তু একসঙ্গে দোষ দিল ইংরেজকে। বীরা সব জানল তার মাসসাই-এর কাছ থেকে। লোকটা সেই গাঁয়ে বসে কত খবর রাখত। বলেছিল, বীরা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি রবীন্দ্রনাথ, পাবনার ওদিকে তাদের জমিদারি, কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির মানুষ তিনি লিখেছেন কী, শোনো—বাংলার মাটি বাংলার জল...। 'মাসসাই' তা কাগজে লিখে এনেছে। কোথা থেকে লিখলে তুমি? মাসসাই বলে, হাটে গেলাম না, হাটে মাগরোর অনিল দত্তর হাতে একটা পত্রিকা দেখলাম, তার ভিতরে এই কবিতা ছাপা হয়েছে। ওঁর কাছে ডাকে আসে। উনি জানেন আমার এসবে উৎসাহ আছে। ওনারে বলেছিলাম আমি যে ঘরে বিয়ে করেছি, সেই ঘরের সঙ্গে সাগরদাঁড়ির মধুকবির সম্পক্কো আছে, শুনে উনি আমারে এখন বেশি খাতির করেন। ডেকে বললেন, এই দ্যাখো, রবিবাবু, কবি রবি ঠাকুর কী লিখেছে, তুমি পড়ে শোনাও দেখি বীরা।

আহা সে কী মধুর দিন গেছে! বীরা পড়ছে, স্বামী শুনছে। শুনতে শুনতে বলছে, তোমার গলাটি কত সুন্দর বীরাঙ্গনা, তোমার গলায় এ কবিতা শুনলে চোখের সামনে সোনার বাংলার সবটা ভেসে ওঠে বীরা।

বীরাঙ্গনার চোখে জল এল। হাবলু ঘুমিয়েছে কিনা ধরা যায় না, কিন্তু খোকন ঘুমিয়েছে। হাবলু আচমকা জেগে উঠে বলবে, দিদমা, মধুকবির কী হল?

মধুকবির জন্যই কি বীরার চোখে জল এসেছিল? কবিতা শেষ হওয়ার পর আবার জিজ্ঞেস করে মানুষটা, কাঁদছিলে কেন, বললে না, সাগরদাঁড়ি যাবে?

বীরা মাথা নেড়েছিল।

আচ্ছা পোষ সংক্রান্তির পরে মাঘে যেও।

তাই যাবে সে। মাথা কাত করেছিল সম্মতি দিয়ে। তখন 'মাসসাই' জিজ্ঞেস করল, বল দেখি এ কবিতা কেন লিখেছে রবিবাবু?

বীরাঙ্গনা বলেছে, বঙ্গভঙ্গ হয়েছে, তাই।

হুঁ. আজ হাটে মিটিং হল, বলছে হিন্দু মোসলমান ক্রিশ্চান বৌদ্ধ এক হয়েছিলাম আমরা, ইংরেজ ভাগ করে দিতে চাইছে।

বীরাঙ্গনা জিজ্ঞেস করেছিল, কী হবে?

কী হবে, খুব খারাপ হয়েছে বীরা, মুসলমান তো চায় নি, কিন্তু ইংরেজ তাকে ভিন্ন করে দিয়ে বলতে চায় হিন্দুর সঙ্গে থেক না।

তা কী করে হয়, যে চায় না তারে ভেন্ন করে দেবে?

হয়েছে তো, হাটে মিটিঙের পর রাজনগরের তায়েব আলি মাস্টার, সে আমারে বলল, কিন্তু এডা তো মোসলমানের পক্ষে ভালো হয়েছে, ভালো যদি হয় মোসলমান ছাড়বে কেন এমন মওকা।

বীরাঙ্গনা বলল, আমরা না থাকলি ওরা থাকতি পারবে মাসসাই?

মাসসাই! স্নেহে গলে গিয়েছে মানুষটা। বীরাঙ্গনার মাথায় হাত দিয়ে বলেছে, আমরাও কি ওদের বাদ দিয়ে থাকতি পারব?

না, পারব না, শুধু শুধু ভাগ হতি যাব কেন?

ইংরেজ করেছে, ইংরেজরে এ দেশ থেকে উচ্ছেদ করতে বাঙালিরাই তো উঠে পড়ে লেগেছে সব চেয়ে বেশি, ইংরেজ বুঝেছে হিন্দু মোসলমান ভাগ করে দিলে বাঙালির জোর কমে যাবে, শাসন করতি সুবিধে হবে।

বীরাঙ্গনা চুপ করে শোনে। স্বামী মানুষটা তাকে বঙ্গভঙ্গ বোঝায়। বুঝিয়ে বলে, বেশিরভাগ হিন্দু চায় না, মোসলমানও চায় না, বঙ্গভঙ্গ একদিন রদ হবে।

বীরাঙ্গনা বলেছিল, মাসসাই তুমি আমারে এমনি করে সব বুঝায়ে দিয়ো, আমি বেশ বুঝতি পারছি মাসসাই।

বাহ! বুঝার তো দরকার বীরা, ঘরে বসে হেঁসেল ঠেলে ঠেলে বুড়ি হয়ে যাবা! অমি তুমারে সব বুঝায়ে দেব, হ্যাঁ কানছিলে কেন বললে না।

বীরাঙ্গনা জবাব না দিয়ে বলেছিল, তায়েব আলি না কেডা সে অমন বলল কেন, রবি ঠাকুর যখন অমন কবিতা লিখেছে।

বলল কেন কেডা জানে, সুবিধে পাবে হয়ত ইংরেজের কাছে, হাটের সভায় তো ছিল মোসলমান বেশি, তারা রব তুলল বঙ্গভঙ্গ মানি নে, মানি নে, হিন্দু মোসলমান ভাই ভাই, বঙ্গভঙ্গ নাহি চাই।

বাহ, কেমন সোন্দর বলেছে, কেডা বলল এডা?

সবাই মিলে বলল।

তুমিও বললে মাসসাই?

বললাম, না বললে হয়!

কেমন করে বললে?

লোকটা দু'হাত উঁচু করে বলল, হিন্দু মোসলমান ভাই ভাই—বঙ্গভঙ্গ নাহি চাই।

সঙ্গে সঙ্গে গলা মেলাল বীরাঙ্গনা, হিন্দু মোসলমান ভাই ভাই...।

সে গলা মেলাতেই স্বামী মানুষটা তার দু কাঁধে হাত দিল, তুমি যখন বলছে হবে।

কী হবে গো মাসসাই?

বঙ্গভঙ্গ রদ হবে, হবেই হবে।

বিড়বিড় করল বীরাঙ্গনা দাসী, বঙ্গভঙ্গ রদ হবেই হবে। আর তা হয়েছিলও। যবে সে খবর এল হাটে মিঠাই বিলি হয়েছিল। দানাদার। তার দুটো নিয়ে এসেছিল স্বামী। এসে বলেছিল, এই নাও বীরা, যা বলেছিলাম, আবার কী হল কানছ কেন?

আমার তার কথা মনে পড়ছে।

থাকার জন্যি আসেনি সে।

কে আসেনি, না প্রথম সন্তান। দেড় বছরের মাথায় জ্বর হল। ম্যানেনজাইটিস হয়ে গেল নাকি। যশোর থেকে ডাক্তার এসেছিল ঘোড়ায় চেপে। রক্ষে হল না। তারপরে

আর একজন। সে দেড় মাসের মাথায়। বড় দুঃখে ছিল সে। ছেলে যে গেল দেড় বছরের মাথায় তার গায়ের রং ছিল কালো। তাকে দেখে তার বাবা বলল, তোমার দাদু এয়েছে।

কে, কার কথা বলছ তুমি?

মধুকবি, এর নাম দিলাম আমরা মধু, মধুময় মধুসূদন।

মধুসূদন, আমি বলব মধুকবি।

তখন মাসসাই বলল, মেঘনাদ দিতে পার, ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ।

বীরাঙ্গনা বিড়বিড় করে, মেঘনাদ নাম দিল, থাকল না, মধুকবি নাম দিলাম, থাকল না, চলে গেল, তাকে তার স্বামী বলেছিল, মেঘনাদ যে দেবরাজের যত বিক্রম সব ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছিল বীরা, কোমরে দড়ি বেঁধে লঙ্কাপুরীতে নিয়ে গিয়েছিল তাকে মেঘনাদ-ইন্দ্রজিৎ, তারপর থেকে আকাশের দেবতাদের খুব রাগ ছিল তার উপর, রাক্ষসেরা মাথা নত করে না।

বীরাঙ্গনা জিজ্ঞেস করেছিল, দেবতারা যুদ্ধ করে কেন, যুদ্ধ তো ভালো না।

রাক্ষসদের ঠেকাতে।

রাক্ষসরা দেবতাদের মানে না কেন

দেবতারা তাদের সব স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি দখল করে নিত।

সীতা হরণ তো রাক্ষসরাজ করেছিল।

হ্যাঁ, ওইটা রাবণের অন্যায়, তাতে লঙ্কাপুরী শেষ, কিন্তু গাভী আর রমণী হরণ করতে দেবতাদের ন্যায় পারঙ্গম কেউ ছিল না, এমন কত করেছে তারা।

রাক্ষসরা দেবতাদের মানলেই হয়।

কেন মানবে, রাক্ষসদের যে বঞ্চিত করে তারা।

আমি এটা বুঝতি পারি নে মাসসাই।

তখন সেই মানুষ যে কথা বলেছিল তা বড় কঠিন হয়ে গিয়েছিল প্রথমে। কিন্তু পরে তা ধীরে ধীরে সহজ হয়ে গেল। রাক্ষস কারা বীরা? গাঁয়ে গঞ্জে, জঙ্গলে পাহাড়ে যে মানুষ থাকে, কিন্তু রাক্ষসরা কি মানুষ? কেন মানুষ হবে না, দেবতারাও মানুষ।

তা কী করে হয় মাসসাই?

যেমন হয় ইংরেজ, শ্বেতাঙ্গ জাতি, তারা কালো মানুষের কাছে দেবতা হয়ে থাকলে ভালো, তুমি কলম্বাসের কথা জান?

কে তিনি, না বললে আমি জানব কী করে?

তখন সেই মানুষ কলম্বাসের কথা বলল। শ্বেতাঙ্গ জাতির মানুষ কলম্বাস যখন আমেরিকার একটি দ্বীপে নামে, রেড ইন্ডিয়ান উপজাতিরা ভাবল আকাশের দেবতা নেমে এসেছে। কিন্তু কলম্বাস আর স্পেনের সেই সমস্ত নাবিকরা দেবতা হয়ে ঢুকে

শেষ করল উপজাতিদের। শিশু নারী কেউ রেহাই পেল না। যারা জঙ্গলে পালাল, বাঁচতে পারল, তারা দেবতাদের ঘেন্না করতে লাগল। দেশে দেশে দেবতা রাক্ষসদের এই যুদ্ধ আমরা জানি বীরা।

বীরাঙ্গনা বলে, আমি যে কিছুই জানি নে।

তুমি তো মেঘনাদ বধ জেনেছ, রামায়ণ জান।

রামচন্দ্র, তিনি তো আদর্শ পুরুষ।

মেঘনাদের মৃত্যু তোমার মধুকবিকে কষ্ট দিয়েছিল খুব, আর মধু কবির জীবন হয়েছিল বুঝি আরও কষ্টের, তা জান তুমি বীরাঙ্গনা?

শুনেছি, কী হয়েছিল?

কালো মানুষ সে খ্রিস্টান হলেও তো কালো, সে কীভাবে দেবতাদের সঙ্গে একাসনে বসে, ব্ল্যাক নেটিভ, বুঝলে?

বীরাঙ্গনা বলে, বুঝলাম, তুমি বুঝালে বুঝব না কেন?

সে আবার লিখেছিল মেঘনাদের কথা, রামচন্দ্রর কথা নয়।

হুঁ, কী হল আমার মধুকবির?

কী হল তা শুনাব তোমারে বীরা, চুপ করে শোনো। বলে সেই মহাপুরুষের মতো স্বামী, মধুকবির মতো তেজিয়ান মানুষটি তার মাথাটি কোলের উপর রাখতে বলে। কোলে মাথা রেখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বীরাঙ্গনা। চুপ করে অপেক্ষা করে লোকটা কী বলে। লোকটা যা জানে সে তার এক বিন্দুও জানে না। জানে না বলে তার কথা বলতে ভয় হয়। কিছু জিজ্ঞেস করতেও ভয় হয়। অজ্ঞতা ধরা পড়বে। কিন্তু এও জানত, সে কিছু জিজ্ঞেস করলে ভারী খুশি হত মানুষটা। বীরাঙ্গনার চোখে জল চলে এল কতদিন বাদে। মনে পড়তে লাগল তার কথা। কেন সে কাঁদছিল একা একা, যতবার জিজ্ঞেস করেছে এড়িয়ে যেতে যেতে একদিন ধরা পড়ে গেল, বীরা মনে হয় তুমি মেঘনাদের জন্য কাঁদো।

জানি নে। সে মাথা নত করে।

মধুকবির জন্য কাঁদো?

হতে পারে, তাও কিন্তু জানি নে আমি, পড়তে পড়তে চোখে জল এসে যায়।

হ্যাঁ, মধুকবির জন্য কেঁদ না, সে ক্রন্দনকে ঘৃণা করতে শিখেছিল।

কিন্তু বালক মধু যে রামায়ণ পড়ে শোনাতে শোনাতে কেঁদে উঠত।

মানুষটা বলে, বালক যখন বড় হয়, বোঝে এ জগতে জাহ্নবী মা ছিল একজন, আর কেউ ক্রন্দন বোঝে না তাই তার কষ্টও বুঝবে না, তুমি সফল হও বা ব্যর্থ হও, তুমি কাঁদবে কেন?

তুমি বলছ মাসসাই, কিন্তু মানুষ যে কেঁদে কেঁদে তার কষ্টের ভার লাঘব করে, না কাঁদলে গুমরে গুমরে মরে, সে বড় বেশি কষ্ট। ধীরে ধীরে বলে বীরাঙ্গনা।

তুমি বলছ! অবাক মাসসাই তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কী মুগ্ধ তার দৃষ্টি! মনে পড়ে, সে তার মুখখানির উপরে তর্জনীর অগ্রভাগ ছুঁইয়ে যাচ্ছিল ক্রমাগত। সে কী সুখ তার! বীরাঙ্গনা তখন বলে, বর্ষা হলে মেঘের গুমরি ভাব যায়।

বাহ! প্রশংসা আর মুগ্ধতা দুইই ছুঁয়ে গেল বীরাঙ্গনাকে।

মানুষের কান্না কখনও দেখা যায়, কখনও যায় না, সে ভিতরে ভিতরে কাঁদে।

কী সুন্দর বলছ তুমি বীরাঙ্গনা, সার্থক তোমার নাম দেওয়া, তোমার ভিতরে মধু কবি এসেছে বীরাঙ্গনা।

যাহ! তিনি সমুদ্দর মতো, আমি তো ডোবা।

বাহ! বলে মাসসাই তার মাথার তলায় হাত দিয়ে একটু তুলে ধরল মুখখানি, বলল, তুমি একটু একটু করে বড় হবে বীরা, ডোবা থেকে পুষ্করিনী, সেই পুষ্করিনী থেকে দীঘি, দীঘি থেকে সায়র, সায়র থেকে হ্রদ, তোমার ভিতরটা খুব নরম, সবার এমন হয় না, তুমি লোকের ভালো চেয়ো সমস্ত জীবন।

আমি তো মধুকবির কেউ না কেউ, পারব?

পারবে।

আশীর্বাদ করো।

মাথায় হাত রেখে চোখ বুঁজল মাসসাই। তারপর হাতটি মাথা থেকে সরিয়ে তাকে টেনে নিল বুকের উপর। বীরাঙ্গনা ফিসফিস করল অন্ধকারে, আমি পারব রে হাবলু, পারব।

বিয়াল্লিশ

হাবলু জেগে উঠে বলল, তুমি সত্যিই পারবা বীরা?

ওমা তুই জেগে আছিস?

হাবলু বলল, তুমি জেগে থাকতি আমি ঘুমাই কী করে বলো।

বীরাঙ্গনা দাসী শিহরতি হলো যেন। তারপরই তার মন মায়ায় ভরে গেল। সে বলল, কী করে ঘুম আসে বল, কী করে আমি ঘুমোই?

তারপর, কী হলো বলো বীরাঙ্গনা।

বীরাঙ্গনা চমকে ওঠে, তারপর?

যে অবধি হলো?

কোন অবধি হলো, কিছুই তো হয় নি।

তাই হয় নাকি। হাবলু গাঢ় স্বরে বলল, না হলে কেউ জেগে থাকে, এমনি এমনি কেউ জেগে থাকতি পারে বীরাঙ্গনা, আর একজন না থাকলি হয়।

আবার কেঁপে ওঠে বীরাঙ্গনা। এ তো ক'দিন আগে, এই বনগাঁ যাওয়ার আগেও ছিল বালক, সেই বালক এখন পুরুষমানুষ হয়ে উঠেছে বুঝি। বীরাঙ্গনা উঠে বসে অন্ধকারে তার মাথার কাপড় টানল, বলল, আমার সব মনে নেই হাবলু।

অনেক কথাই তো মনে রেখেছ, মেঘনাদ বধ মনে রেখেছ।

বীরাঙ্গনা বলল, তুই কি সব শুনলি হাবলু?

হাবলু বল, হ্যাঁ, তারপর কী হলো?

তুই আমার মনের কথা শুনতি পাস?

হাবলু বলল, পাই, তুমারে আমি চিনে গেছি বীরা, তারপর কী হলো, বলো, বলে যাও।

কী সব্বোনেশে ছেলে রে তুই! বীরাঙ্গনা আরো টানল মাথার কাপড়। হয়ে গেল অবগুণ্ঠনবতী। বিনবিনে গলায় বলল, সব কথা শুনতি নেই।

এমন কথা কি তুমার আছে যা আমি শোনবো না?

এ কেমনভাবে কথা বলে হাবলু নামের ভেসে বেড়ান ছেলেটা? এ যে একেবারে মাসসাই। মাসসাই তার নিঃশব্দ কান্না দেখে মাথায় হাত রেখে ঠিক এই রকম কিছু বলেছিল না! তাই তো মনে আছে বীরাঙ্গনার। সে বলল, তুই আমার মামসাই-এর মতোন কথা বলিস কেন?

তিনি কেডা?

তোর সব শুনতি হবে না।

কিন্তু তারপর কী হলো বলো তাহলি।

বীরাঙ্গনার মনে হয় তার আর 'মাসসাই'-এর ...... কথা সব শুনেছে এই পাগল ছেলেটা। তাদের ভিতর যখন কথা হচ্ছিল তখন ওই হাবলু সেখানে দাঁড়িয়ে। হাবলু সব দেখেছে! কী লজ্জা! ও জেগে আছে জানলে কে 'মাসসাই'-এর কথা মনে করতে যেত। এতকাল পরে হঠাৎ হঠাৎ মানুষটা যে কেন এসে দাঁড়ায়? কী সুন্দর গোঁফ ছিল লোকটার। মাথা ভর্তি চুল। বড় বড় চোখ। বুকখানি রোমে ভরা। বীরাঙ্গনার চোখে অবগুণ্ঠনের আড়ালে আবার জল এসে গেল। কীরকম ডাকত, বীরা, বীরা তুমি কাঁদো কেন, কান্নার কোনো দাম নেই এ জগতে।

নেই যে এখন বোঝা যাচ্ছে ভালরকম। সেই যে কাঁদল একবার মা জাহ্নবী, মধু ভাসল জোয়ারে, কালাপানি পার হয়ে একা চলে গেল বিদেশ বিভুঁই। তার কান্নায় কি মধু ফিরেছিল? মধু ফেরে নি। আবার মধু যে সেই তামিল দেশে, মাদ্রাজে তার প্রথম পক্ষ রেবেকা আর চারটি সন্তানকে ফেলে কলকাতায় ফিরল, কত কাঁদল রেবেকা, ফিরেছিল মধু? ফেরে নি। অথচ মধু কী ভালই না বাসত রেবেকাকে, লেখে নি মধু—তুমি আমার মধুর স্বপন, তুমি আ-মা-র। —যে কাব্য লিখল মধু ইংরেজিতে, তার ভিতরে রেবেকাকে ভালবাসার কথা কতরকম ভাবে যে ছিল। 'মাসসাই' সব জানত, সব বুঝিয়ে দিত। কী লিখেছিল মধু সেই ক্যাপটিভ লেডি কাব্যে... তোমার নয়ন জোগাবে আমার প্রেরণা;/কেবল তোমায়, পরাব আমার মালা, প্রেমের মালা...। সেই মধু রেবেকার কান্নাতে ফিরল না। চারটি সন্তানের মুখ চেয়েও ফেরে নি। বড় নিষ্ঠুর ছিল মধু। মধুর এই কথা শুনে কি রেবেকা আর তার সন্তানদের জন্য কান্না আসে নি বীরাঙ্গনার দু'চোখে। এসেছিল, তাতে ভার কমেছিল হয়ত। কিন্তু দুঃখ তো যায় নি। পরেও কি আবার রেবেকার কথা শুনে কাঁদে নি বীরাঙ্গনা?

বীরাঙ্গনা চুপ করে রয়েছ যে? হাবলু ডাকে।

তুই শুনতে পাচ্ছিস নে হাবলু?

হাবলু বলল, পাচ্ছি, কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে থেমে যাও কেন বীরা?

বীরাঙ্গনা বলে, একটা বাচ্চা মরেছিল, আর তিনটে বেঁচে ছিল, কালো বাচ্চা নিয়ে, তার মেম মা রেবেকা কিন্তু মধুরে ভোলেনি। মধু বড় নিষ্ঠুর ছিল, মা জাহ্নবীরে যেমন দুঃখ দিয়েছিল, তার চেয়ে বেশি দুঃখ দিয়েছিল রেবেকাকে। পুরুষ মানুষ বড় নিষ্ঠুর হয়, যদি সে তাই হয়, মাসসাই-এর মতো না হয় নরম মনের।

হাবলুর কাছে এসব নতুন কথা। কোথা থেকে আরম্ভ করল বীরাঙ্গনা তা ধরতে পারছে। মাদ্রাজে গিয়ে মেমে বিয়ে করে সেই মেম বউকে ছেড়েও এসেছিল মধু। আর যায় নি কখনো। মাকে যেমন কাঁদিয়েছিল, তেমনি কাঁদালো রেবেকাকে। ভুলেই গেল। আর সেই রেবেকা মধুর মৃত্যুর কুড়ি বছরের মাথায় মৃত্যুর সময়ও নামের পাশে রেবেকা টমসন ডাট—মধুকে সে মনে মনেও ত্যাগ করে নি।

মধু ভাল ছিল না বীরা। হাবলু বলে ওঠে।

বীরাঙ্গনা বলল, মধু কী ছিল তা আমরা বুঝতি পারব না হাবলু, এক একটা মানুষের জীবন এইরকম হয়, এতে ভালমন্দ ধরা যায় না, ওই যে আমরা বলি মা জাহ্নবী কাঁদলো, বউ রেবেকা কাঁদলো, মধু কি তাহলে কাঁদে নি বলিস, কবির কান্না কি এমনি এমনি দেখা যায়?

যায় না বীরা, তাহলে বোঝা যাবে কী করে?

তাঁর কাব্যের ভিতরে, সৃষ্টির ভিতরে।

চুপ করে থাকে হাবলু। বীরাঙ্গনা যা বলছে অন্ধকারে বসে তা সে ধরতে পারছে না ভাল করে। টিয়া হলে পারত বোধহয়। টিয়া নভেল পড়ে, পড়তে চোখের জল মুছছে এও দেখেছে হাবলু। তাহলে কি টিয়া সেই কবি বলো, লেখক বলো তার কান্নায় কাঁদল? হতে পারে। হাবলুর টিয়াকে সব বলা দরকার। টিয়াই পারবে এসব বুঝতে। পুরুষ মানুষের মাথায় সব ঢোকে না, সে আচমকা বলল, দিদমা, ও আমারে কুড়ি টাকা দিতি চেয়েছিল।

কোন কথা থেকে কোন কথা!! চমকে ওঠে বীরাঙ্গনা, বলে, কার কথা বলিস, কে টাকা দেবে, কেন দেবে?

হাবলু বলেই টের পায় কথাটা ঠিক হয় নি। টিয়া যে দিতে চেয়েছে তার দিদির বিয়ের খরচের জন্য তার জমান টাকা থেকে তা শুধু টিয়াই জানে, আর জানে সে। খোকন পর্যন্ত জানে না, টিয়া বলেওছে পাঁচকান না করতে। একথা শুধু হাবলু আর তার ভিতর, তাহলে হাবলু প্রকাশ করে দিল কেন? কেন দিল কে জানে? দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল, তাই বলে ফেলল। কিন্তু টিয়া যদি শোনে রেগে যাবে, তুমি কী গো হাবলুদা। তুমি কি কিছুই বোঝ না, কোনো জ্ঞান নেই, তোমারে আমি দেবদাস দেব, পড়ে নিয়ো, চরিত্রহীন দেব পড়ে নিয়ো।

হাবলু প্রসঙ্গ বদলে নিল, বলল, কেউ না দিদমা।

কেউ না তবে বললি কেন?

এমনি বললাম।

এমনি কেউ কোনো কথা বলে?

হাবলু বল, ওডা ময়রমের কথা।

ময়রম ময়রম, সেডা কে বল দেখি, কেন বলিস?

হাবলুর তখন মাথা খুলছে। ম্যানেজ করতে পারছে কথা বানিয়ে নিয়ে, বলল, ময়রম আমার দিদির বে তে দেবে বলেছিল।

বীরাঙ্গনা অবাক। সে তো পাকিস্তানে থাকে, কী করে বলল? দিদির বিয়ে হবে তা ভেবে নিয়ে বলল। বিয়ের কারণেই তো দিদিকে এপারে নিয়ে চলে আসা। হাবলু বলল, দিদমা, বীরাঙ্গনা, ময়রম খুব ভাল, মনডা খুব নরম, কাদামাটির মতো বলতি পার।

বীরাঙ্গনা বলল, মেয়েদের মন ওরকম হয়, পুরুষমানুষ নিষ্ঠুর হয়।

হাবলু বলল, ময়রম কী বলবে শুনে, বলবে, না, তাদের মন ও যে নরম তা লেখা থাকে তাদের বই-এ। ময়রম বই পড়তে পড়তে কাঁদে, কাঁদতে কাঁদতেই বলল, হাবলুদা, তোমার দিদির বিয়েতে আমি দেব, এপারে মা বাবা নেই, টাকার জোগাড় হবে কোথা থেকে।

হায় হায়! সব যে বুঝতে পারছে বীরাঙ্গনা। ধরতে পারছে। ময়রম ওপারে বসে বলল কখন? হাবলু কি স্বপ্নের ভিতর শুনল, ও হাবলু হাবলু?

হাবলু বলল, হ্যাঁ দিদমা, স্বপ্নের ভিতরে ঠিক বলেছ স্বপ্নের ভিতর, আমিও তাই ভাবি কখন বলল ময়রম, যখন আমি ওপারে গিছি, তখন তো দিদির বিয়ের কথা হয় নি।

বীরাঙ্গনা বল, আমি ও তাই ভাবি কী করে একথা হলো?

হাবলু বলল, স্বপ্ন দিদমা, তোমার বাড়িতে রাত্তিরে ঘুমের ভিতর এল, বসিরহাট থেকে আশাশুনি আর কত দূর বলো দিদমা, আসতিই পারে।

হুঁ পারে, মন্তব্য করে বীরাঙ্গনা চুপ। সে কি ধরতে পারছে না কিছুটা? পারছে। পারছে তাই মন গুমরে যাচ্ছে নাকি? তা কেন হবে? মন কি দুঃখে ভরে যাচ্ছে? তাই বা কেন হবে? কে কুড়িটা টাকা হাবলুকে দিতে চাইল, তা নিয়ে কি তার মাথা খারাপ করা উচিৎ? সে ঝুপসি অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল। ওই যে তার 'মাসসাই' কে দেখা যাচ্ছে। 'মাসসাই'কে নিয়ে সে গিয়েছিল কপোতাক্ষ ধারে বিদায়ঘাটে। বিদায়ঘাট না বীরা, ও হলো অশ্রুঘাট— 'মাসসাই' বলেছিল। নদীঘাট অশ্রুঘাটই হয়। আর যে কথা সাগরদাঁড়ির মানুষে বলে, তা যদি সত্যি হয় তবে তো ওইখানে বসে চোখের জল ফেলেছে মা জাহ্নবী আর সাগরদাঁড়ির মানুষ।

বীরাঙ্গনা দেখতে পাচ্ছে সেই ঘাট। ঘাটে বসে চোখে জল এল তার। হায় রে! ওই ঘাট দিয়ে কি শুধু মধু গেছে, কত মানুষ গেছে আর ফেরে নি, আত্মীয় কুটুম্ব স্বামী পুত্র, আমি নিজে। —সবাই ওই ঘাট দিয়ে গাঙে ভেসে গেছে। ভৈরব রূপসা কপোতাক্ষ, বেতনা, চিত্রা, পদ্মা মেঘনা যমুনার ঘাটে ঘাটে লোক জমা হয়েছে। যাবে চলে। দেশ ছাড়বে।

বীরাঙ্গনাকে ডাকল হাবলু, চুপ করে গেলে যে?

মন খারাপ লাগতেছে।

হাবলু বলল, মধু কবি খুব নিষ্ঠুর ছিল দিদমা।

নিষ্ঠুর কে না জগতে, কিন্তু নিষ্ঠুরতা করে পরে যখন অনুতাপে দগ্ধ হয়, সে কি কষ্ট তা জানিস?

না দিদমা, কিন্তু আমারে জেঠামশায়ের বাড়ি থেকে মেরে তাড়াল ওর ছেলে, আমার বড়দা অবনী, ওর কি অনুতাপ হয়েছে?

সবার কেন হবে, যার হবে সে খুব বড় হয়, জীবনে কতকিছুর জন্যি মানুষ নিষ্ঠুর হয়, ঘোরের ভিতরে থেকে মনে করে ওইটেই হলো ঠিক কাজ, পরে যখন বোঝে তখন আর ফেরবার উপায় থাকে না, ভিতরটা দুঃখে কেঁদে মরে।

তোমার মধুকবি কেঁদেছিল?

হ্যাঁ কেঁদেছিল।

কোথায় লিখা আছে তা?

মধুকবির কাব্যে কবিতায়, জীবনে যা করেছিল ভুল করেছিল আবার সেই ভুল করেছিল বলে যে অনুতাপ হয়েছিল তার সেই অনুতাপে লেখা হয়েছিল কবিতা, পড়লি বুঝতি পারবি।

কবিতা কি ওইভাবে লিখা হয় দিদমা?

হ্যাঁ, যদি জীবনে দুঃখ না থাকে, কষ্ট বেদনা না থাকে কী লেখবে কবি, কোন কথা লেখবে?

কবিরা তাহলে দুঃখী হয়?

হয়রে হয়। বড় কবি বড় দুঃখী হয়। রবি ঠাকুর। নজরুল এরা সবাই বড় দুঃখী ছিলরে, তবে আমার মধুর মতো দুঃখী কেউ ছিল না। কথাটা বলে বীরাঙ্গনা চোখের জল মুছল থান কাপড়ের খুঁট দিয়ে, বিনবিনিয়ে বলল, দুঃখ কবির অন্তরে সাহস আনে, অন্তর মানে হৃদয়, হার্ট, সাহস না এলে কবি লেখে কী করে মেঘনাদ বধের মতো কাব্য।

হাবলু টের পায় দিদমা কাঁদছে। বীরা, বীরাঙ্গনা নয়, ও যেন মা জাহ্নবী। হাবলু দেখতে পাচ্ছে মা জাহ্নবীকে, বলল, কানছ কেন, আমারে আর দিদিরে মাছ দিত না জেঠি তা জান? এখন দেয় কিনা দিদিরে তা আমি জানি নে।

বীরাঙ্গনা চোখ মুছে বলল, হাবলু যে মানুষ দুঃখ পায়, তার অন্তরে সাহস হয়, তার মাথা সবার উপরে ওঠে। হাবলু, অত নিষ্ঠুর হয়েছিল মধু, কবি হলো, আবার নিষ্ঠুরতার জন্য যে অনুতাপ হলো তা থেকে মধু শুধু কান্নার কথাই লিখে গেল।

কোথায় লিখেছে?

ওইজন্যে বলি পড় মধুকবির কবিতা, কোথায় নেই রে, সেই আত্মবিলাপ, বঙ্গভূমির প্রতি থেকে মেঘনাদ বধ, মেঘনাদ বধে যে রাবণরাজার হাহাকার, কান্না, প্রমীলা, মন্দোদরির হাহাকার, কান্না এসবই মধুর নিজির কান্না, মা জাহ্নবীর কান্না, হ্যাঁ রাজনারায়ণেরও কান্না নিশ্চয়, হ্যাঁ রেবেকা বউ-এর কান্না, হেনরিয়েটা বউ-এর ও কান্না।

তোমারে এসব কেডা শিখাল, বলল, মাসসাই?

হ্যাঁ মাসসাই। কপোতাক্ষর ঘাটে বসে 'মাসসাই' আমারে বলত, শোনো বীরা, শুনবা, রক্ষোরাজ রাবণ কীভাবে হাহাকার করে। মধু লিখেছিল তা—

''অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে,
ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা!....''

বিন বিন করে বলে যাচ্ছে বীরাঙ্গনা অন্ধকারে। তার দুচোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা। মাসসাই-এর সঙ্গে সে বসে আছে অশ্রুঘাটের অন্ধকারে।

তেতাল্লিশ

মাসসাই বলল, বীরা কাঁদ কেন, আবার তো আসব।

বীরাঙ্গনা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলে, ভয় হয়, এটি বিদায়ঘাট যে মাসসাই।

চুপ করে থাকে মানুষটা। মাসসাই-এর সঙ্গে বীরাঙ্গনা বাপের বাড়ি থেকে রওনা হল বুধা হাটার পথে। নৌকোয় আগমন, নৌকোয় বিদায়। নৌকোয় বসে সে শুনছে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছে। মাঝি ইউসুফ মিঞা বলছে, হল তাহলি?

মাসসাই বলল, হ্যাঁ, বড় ভালো খবর, হিন্দু মুসলমানরে আলাদা করতি পারলি ইংরেজদের সুবিধে হত ইউসুফ চাচা।

বুড়ো চাচা বলল, ও চালাকি খাটল না, কত্তা তুমার মনে আছে সেই আরম্ভ হল আশ্বিন সংকেরান্তি না কাত্তিকির পেথমে।

হ্যাঁ, ১৬ অক্টোবর ছিল, বীরা মনে আছে তুমার?

বীরাঙ্গনা ঘাড় কাত করেছিল। সেদিনও তারা নৌকোর ভিতরে ছিল। বুধাহাটা থেকে সাগরদাঁড়ির পথে। সেই বঙ্গভঙ্গ হল যখন তখন সে কতটুকু, তা জোড়া লেগেও আবার ভাঙল। হিন্দুস্থান পাকিস্তান হল। হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন...। দেশটা ভাগ হয়ে গেলে ধরা যাচ্ছে মধুকবির কান্না। সে সব দুঃখকে নিজের কাছে আবাহন করেছিল, সেই দুঃখ তার কবিতায় জড়িয়ে গিয়েছিল।

বীরা তোমার কান্না এল, দুই বঙ্গ জুড়ে গেছে আবার।

বীরাঙ্গনা বিনবিন করেছিল, ভাগ হয়েছে যে তাও তো বুঝি নি।

ঠিক বলেছ বীরা, মধুকবির দেশ ভাগ হবে কেন?

দুই ধারে নিবিড় শ্যামলিমা। গ্রামগুলি নিস্তব্ধ। ঘাটে ঘাটে স্নানরত পুরুষ ও নারী। নদীর পাড়ে গৃহস্ত গরুর দড়ি হাতে দাঁড়িয়ে। নৌকোর মাথায় মাথায় গাংচিল উড়ছিল। বীরা যত দ্যাখে তত তার চোখ দিয়ে জল ঝরে। নদীর বাঁকে বিদায়ঘাট সরে গেছে। বীরাঙ্গনা বলল, ওই ঘাটের থেকে না এলেই হত, ওই ঘাটে মধুকবির নৌকো ছেড়েছিল বলে।

হুঁ, তাতে হল কী? বীরা সব ঘাটই বিদায় ঘাট, গাঙ পাড়ে দু'ধারে কত ঘাট বলো, ঘাটে ঘাটে নৌকো বাঁধা।

তারপর আর মাসসাইকে নিয়ে যাওয়া হয় নি। মাসসাই ম্যালেরিয়ায় পড়ল। কতদিন ভুগল। ভুগতে ভুগতে মাসসাই চলে গেল। বীরার কোলে তখন ছেলে। মেয়েটা তিন বছর। বীরার তখন পঁচিশ হয়নি। বীরা তারপর থেকে মাসসাই আর মধু কবিকে নিয়ে আছে। লোকটা ক'বছরেই তাকে চিনিয়ে দিয়েছিল, তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল মধু কবির বৃত্তান্ত। তা নিয়ে চলছে।

হাবলু বলছে, তখন যদি রদ হয় দিম্মা, এখন হবে না কেন?

বীরাঙ্গনা চাপা গলায় বলল, তুই আমারে বীরা বলবি নে?

হাবলু বলল, ইচ্ছে হলি বলব, তুমি বলো তখন যদি হয়ে থাকে এখন হবে না কেন?

বীরাঙ্গনা বলে, তখন দেশবাসী এর বিপক্ষে ছিল হাবলু, এখন সবাই মেনে নিল, হিন্দুস্থান পাকিস্তান মানি নে একথা বলবে কেডা, কারোর সাহস নেই, আর মোসলমান ভাবছে পাকিস্তানে তার সুরাহা হবে, হিন্দুরা তো সব ফেলে এল, তা পাবে।

এইসব কথার ভিতর ফণিভূষণ ঢুকেছে। ফণিভূষণের পিছু পিছু টিয়া। টিয়া গিয়ে বসল দেওয়ালে পিঠ দিয়ে, হাতে একখানি সাহিত্য চয়ন, ক্লাসের বই। খোকন অন্য ঘরে তার বাবার কাছে পড়া বুঝছে। প্রভা আছে রান্না ঘরে। ফণিভূষণ আসায় কথা সাময়িক থামল, সে হেসে বলল, ভাবলাম তুমি চলে গেছ মাসি।

যাই কী করে, না এলি কাল আমি দমদমায় যাতাম। বীরাঙ্গনা বলে।

ফণিভূষণ মেঝেয় বীরাঙ্গনার পাশে বসল, বলল, বৃষ্টি নেই, অনাবৃষ্টি।

হুঁ, শাবনের তো শেষ হতি গেল পেরায়।

ফণিভূষণ বলল, কোথাও বৃষ্টি নেই, বনগাঁ বসিরহাটে হয়েছে জল?

হাবলু চুপ করে থাকল। বীরাঙ্গনা বলে, বসিরহাটে হয় নি।

ফণিভূষণ আবার জিজ্ঞেস করে, বনগাঁয়?

চুপ করে থাকল বীরাঙ্গনা, হাবলু। দেওয়ালের গা থেকে টিয়া বড় বড় চোখে তাকায়। ফণিভূষণ দু'বার বনগাঁর কথা জিজ্ঞেস করল, এর মানে? টিয়ার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা। বই পড়া, নবেল পড়া মন, সে ঠিক ধরতে পারে। বনগাঁয় বৃষ্টি দিয়ে তোমার কী হবে ফণিকাকা?

হাবলু বলল, ওপারে হয়ত হচ্ছে জল, পাকিস্তান জল টেনে নেছে।

ফণিভূষণ হাসে, বলে, বনগাঁও যা, যশোরও তা, আগে তো যশোর জেলার ভিতরে ছিল বনগাঁ, স্বাধীন হলও পরে, বনগাঁ তিনদিন ওদিকে ছিল, ১৮ আগস্ট ইন্ডিয়ায় এসেছিল।

হুঁ। টিয়া মনে মনে আবার হাসে। এখন ফণিকাকার বনগাঁ নিয়ে কথা বলতে খুব ইচ্ছে হবে। বারবার বনগাঁর কথা তুলবে। সে হাবলুর দিকে তাকায়। চকচকে চোখে তাকে দ্যাখে। হাবলু তাকে দেখেও দ্যাখে না। হাবলু নড়ে বসে, বলে, তুমি বঙ্গভঙ্গের কথা জান ফণিদা?

'ফণিদা' সম্বোধনে ফণিভূষণ নিশ্চিন্ত হয়। তার বুক দুরুদুর করে। তাহলে কি বনগাঁ থেকে হাবলুর দিদি আসছে। নাকি এসে গেল? ছবিতে তাকে দেখেই ফণিভূষণের শয়নে স্বপনে সে ঢুকে গেছে। ফণিভূষণ এসেছেই তো খবর নিতে। কী হল তারপর? হাবলুর জিজ্ঞাসায় সে বলল, 'শুনেছি সিরাজস্যারের কাছে, তিনি এখন বেঁচে নেই, আমাদের ইস্কুলের হেডস্যার ছিল।' ফণিভূষণ থামে।

তারপর কী হল ফণিদা?

চমকে ওঠে ফণিভূষণ। তারপর? কিসের পর? সে জিজ্ঞেস করল, কিসের কথা হচ্ছে দিদমা?

না মাসি বলল না। টিয়া তা লক্ষ করল। মুখ টিপে হাসল। হাবলুটা কি কিছু বুঝছে না? যাক! টিয়া নিশ্চিন্ত হল। ফণিকাকার পছন্দ হয়েছে। কাকা না দাদা। হাবলু যখন ফণিদা বলল, সেও বলবে, দাদা থেকে দাদাবাবু।

হাবলু বলল, মাদ্রাজের কথা?

কেন, মাদ্রাজে কী? সে তো অনেক দূর।

হাবলু বলল, রেবেকাকে রেখে মধুকবি কলকাতা চলে এল?

টিয়া সিধে হয়ে বসল। দিদিমা আগের দিন বলে নি রেবেকার কী হল। মধুর সঙ্গে হেনরিয়েটার তখন প্রেম! ইস! গা কেঁপে যায়। মধুকবিটা কেমন, যে তাকে এত ভালোবাসল, তিনটে ছেলে মেয়ে, সব রেখে চলে গেল? এইরকম নাকি হয়। পুরুষমানুষের মন চারদিকে ছোটে। তাকে ভালো করে বাঁধতে হয়। এমন ভাবে বাঁধতে হবে যে সে তার অন্য কোনওদিকে যেন তাকাতে না পারে। হাবলুর দিকে আবার তাকায় টিয়া। পরিপূর্ণ দৃষ্টি। সে হাবলুকে সরে যেতে দেবেই না। যতই হাবলু অন্যদিকে তাকাক, তার দিকে ফিরতেই হবে। হাবলু তার হবে। আর কারোর নয়। টিয়ার বুক দুরদুর করে ওঠে। সে মনে মনে বলল, রেবেকা হতভাগিনী শ্বেতাঙ্গিনী, তোর রূপে ঝলসে দিতে পারিস নি মধুকে, মধু তোকে ফেলে চলে গেল, জাহাজে চাপল কী করে, জাহাজ ঘাটায় এসে প্রিয়তম প্রিয়তম বলে ডাক দিলি নে কেন, সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লি নে কেন? তাহলে মধু ফিরত, ফিরতই।

ফণিভূষণ জিজ্ঞেস করল, দিদমা রেবেকার কী হল?

তুই জানিস নে, বলি নি বোধহয়, না বলেছি তোর মনে নেই।

বলো নি তুমি, মধু কবি কলকাতায় চলে এল, রেবেকা কি কলকাতায় এল না, এটা কেন হবে?

বীরাঙ্গনা বলে, মধুর মন গেছে তখন, হেনরিয়েটা এসে গেছে।

ইস! টিয়া সশব্দে বইটা রেখে দিল মেঝেয়, তারপর বলল, ও দিদমা তুমি মানিকরাম আর জমিদারের মেয়ের গল্পটা পুরো বল নি।

যা বলেছি, ওইটুকু শুনা যায়, বেশি জানি নে।

মানিকরামের সঙ্গে তার দেখা হয় নি?

না হয় নি। হাবলু বিরক্তি প্রকাশ করে, হচ্ছে রেবেকার কথা, তুই সেই আগের জন্মের গল্প নিয়ে এলি।

বাহ্! শুনতে হবে না, পরে তো আমাকেই জিজ্ঞেস করবে তুমি।

কেনরে, কেন, বীরা থাকতে—। হাবলু আচমকা থেমে যায় টিয়ার চোখে চোখ পড়তে। ভর্ৎসনায় ভরা মুখ। মাথা নাড়ছে ধীরে ধীরে, যেন বলছে ছি? হাবলু, দিদমাকে নাম ধরে ডাকছ, বললেই ডাকবে, এটা দিদমার ঠিক হয় নি, হাবলু এদিকে এলে মাথায়

তিন গাঁট্টা মারব। আর বীরাঙ্গনা দাসীই বা কী রকম? এত বয়স, বুড়ি থুত্থুড়ি হয়ে গেলি দিদমা, হাবলু তোর নাম ধরবে কেন? এরপর কি ওগো— ! টিয়া মাথা নেড়েই চলে।

বীরাঙ্গনা বলে, রেবেকা অভাগী, অথচ মধুরে সে কত ভালোবাসত, মধু তো ছিল কালো, ওই আমার হাবলুর মতো, হাবলুর গালে দাড়ি হোক, ওই রকম সুট প্যান্ট পরুক, হাবলু ঠিক মধুর মতো হয়ে যাবে।

টিয়া বলে উঠল, না দিদমা, অমন হওয়ার দরকার নেই।

কেন দরকার নেই, মধু কত বড় কবি, বঙ্গ ভাণ্ডারে অমন রত্ন নেই আর।

থাকার দরকার নেই। টিয়া বলে ওঠে, 'রেবেকা হতভাগিনী কী দোষ করল যে মধু তাকে ছাড়ল, পুরুষ মানুষ খুব নিষ্ঠুর হয়।' টিয়া মনে মনে বলে। হাবলুকে বলে, তুমি কিন্তু খবদ্দার হাবলুদা, মধুকবি হবে না।

হাবলুর জবাব শোনে মনে মনে, না, মধুকবিই হব, হব, হব।

না, না, না হাবলু, আমি বলছি হাবলু সোনা, তুমি হবে না। মনে মনে কথা বলতে টিয়ার বুক দপদপ করতে থাকে।

টিয়া মুখ নিচু করল, একজনরে বঞ্চিত করে, কি সুখী হওয়া যায় হাবলু? তাই মধুও সুখী হয় নি, হেনরিয়েটাও না। আমি রেবেকা, আমি সেই ময়রম, জমিদারের মেয়ে যে মানিকরামের জন্য বসে থাকে কপোতাক্ষর ঘাটে, সেই যে গেল কবি আর ফিরল না। মুখ তুলল টিয়া, বলল, দিদমা, কবিরা খুব নিষ্ঠুর হয়, ধর সেই ময়রম বসে থাকল, মানিকরাম ফিরল না, রেবেকা থাকল, মধু ফিরল না, আবার ধর মা জাহ্নবীও থাকল, মধু আর মায়ের কাছে ফিরল না।

ওফ! হাবলু তার বাইসেপ ফোলায়, তারপর বলে, তোর কাজ হল গিয়ে কে কার জন্য কাঁদল সেইটা মনে রাখা, বেশি নবেল পড়লি, দেবদাস পড়লি এই হয়, হচ্ছিল পার্টিশনের কথা, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, তুই কিনা ওসব তুললি।

না, মাদ্রাজের কথা হচ্ছিল। টিয়া বলল।

হচ্ছিল হচ্ছিল, সে তো বনগাঁর কথাও হচ্ছিল। হাবলু আবার বাইসেপ ফোলায়, বলে, কবিটবি হলে পার্টিশন রদ হয় না বুয়েছ!

তোরে বলেছে! বীরাঙ্গনা বলে, বঙ্গভঙ্গর সময় রবি ঠাকুর বাংলার মাটি বাংলার জল লিখেছিল, সেই কবিতা গেয়ে গেয়ে পার্টিশন রদ করাল মানুষ।

কেডা বলেছে?

কেন মাসসাই! বলে বীরাঙ্গনা ঘোমটা টানে। টিয়া দেখছে, শুনতে, মনে মনে রেগে যাচ্ছে। হাবলুর যত কথা সব দিদিমার সঙ্গে। তার সঙ্গে না কেন? টিয়া ভাবল দিদিমাকে বলে, তুমি হাবলুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও দিম্মা, আমার খুব হাবলুর ঘাম মুছিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় । হাবলুর সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে হয়। তুমি শুধু ধরে রাখ ওকে।

ফণিভূষণ ডাকল, তুই দূরে কেন টিয়া, এদিক আয়।

না এখেনে থাকি, আমি কবি টবি বুঝিনে ফণিকাকা, মধুকবি যা করল তা ঠিক না, সমস্ত জীবন কত কষ্ট পেল তার মা, তার বউ রেবেকা।

ফণিভূষণ বলল, থাক ওসব কথা, বলছি কোথাও জল নেই, ওপারেও যদি জল না হয় তবে ধান রোয়া বোনা হবে না।

তাতে তোমার কী ফণিকাকা? টিয়া বলে।

বাহ, চাষ মার খাবে।

ওপার থেকে চলে এয়েছি, ওটা অন্য দেশ, আর আমরা ওপারে যাব না, কলকাতা অনেক ভালো, পার্টিশান রদ হবে না, হবে না। বলে টিয়া মুখ টিপে হাসতে লাগল, তারপর আচমকা সুর বদলে বলল, হাবলুদা, তোমার দিদি, বুনরে আনবা না?

কোথায় আনব? হাবলুর গলার স্বরে মন খারাপ করা ভাব।

কেন এখেনে?

হাবলু বলল, এটা কি আমার বাড়ি, আমি আছি মামার ঘরে।

টিয়া চুপ করে গেল। ঘর মুহূর্তে থমথম করতে লাগল। ফণিভূষণ ঘাড় নিচু করে ভাবছিল, যদি বিয়ে হয় তবে তার আশ্রয়েই থাকবে হাবলু আর তার বোন। ফণি তার জমানো টাকা একটিও খরচ করেনি। ওপারে যাবে একবার। যদি টাকা পয়সা আরও কিছু পায় ভূ-সম্পত্তির নিয়ে আসবে। মায়ের গয়না আছে ফণিভূষণের। খুব মিতব্যয়ী। দিদিদের ঘরে যশোরে বরিশালে না গিয়ে এপারে চলে এল একরোখে। থাকবেই না দেশে। থাকা যেত হয়তো। আবার না থাকাও যেত। আস্তে আস্তে পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছিল। ফণিভূষণ মুখ তুলে বলল, মাসি, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

আবার মাসি, দিদমা বল ফণি, তোর বয়েস বেশি না। বীরাঙ্গনা বলে।

হ্যাঁ, শোনো তুমি কি যাবা আমার সঙ্গে এখন?

বীরাঙ্গনা মাথা নাড়ল, বলল, কাল বিকেলে যাব।

আমার তো ফিরতি রাত হয় মাসি।

অনেক কথা, অনেক টায়েম লাগবে।

তুমি চল না আমার সঙ্গে।

না, আমি বরং রোববার ভোরবেলায় যাব দমদমায়, কাল বেলগেছের নাট্যশালা দেখতি যাব ফণি, মধুর নাটক শর্মিষ্ঠা এই বেলগেছেতে হয়েছিল, তা জানিস, যাব একবার তার সমাধি দেখতি—।

ফণিভূষণ মন খারাপ করে উঠে যেতেই টিয়া বলল, বিয়ে হবে না দিম্মা?

গালে হাত দিল বীরাঙ্গনা। হাবলু ঘাড় হেট করে বসে থাকল, তারপর আচমকা মুখ তুলে বলল, হবে, আলবত হবে।

চুয়াল্লিশ

ফণিভূষণ চলে যেতে বীরাঙ্গনা বলল, দিনটা দুঃখের ছিল হাবলু, আমরা তো ২৯শে জুন গিছি বনগাঁয়, আমি ভুলি গেলাম কী করে?

২৯শে জুন কী দিন? টিয়া এগিয়ে আসায় তিনজনের একটি বৃত্ত রচনা হয়েছে। তিনজনই অপর দু'জনের পাশাপাশি। হাবলুকে জিজ্ঞেস করে টিয়া, তুমি জান?

না, আমারে তো বলে নি।

ওদিন আমার উপোস করার কথা, আমার চোখের জল ফেলার কথা, আমি অনন্দ করতি মেয়ে দেখাতি নিয়ে গেলাম, তাই সব গোলমাল হয়ে গেল। বলে বীরাঙ্গনা নিশ্চুপ হয়ে থাকল কিছু সময়। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কী করে বিয়েটা হবে হাবলু, ফণির তো পছন্দ হয়েছে মনে হয়, কিন্তু তোর জেঠা জেঠি তো গার্জেন, তারা কি বিয়ে দেবে?

দিদিতো দেখবে। বলল টিয়া।

পছন্দ না হওয়ার কিছু তো নেই, দশ বারো বছর তফাৎ কী হয় না, ফণির মতো ছেলে কি হয়, সহায় হতো হাবলুর।

হাবলু তখন জিজ্ঞেস করে, ২৯শে জুন কী ছিল দিম্মা?

মধুর প্রাণবায়ু গেল ওই দিন, অনাথের মতো আতুরের মতো, ভিখিরির মতো মরে গেল সাগরদাঁড়ির মধু, বঙ্গকুল তিলক, দত্ত বংশে জন্ম তার, দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে...। বলতে বলতে বীরাঙ্গনা মুখ নিচু করল।

টিয়া বলল, কেউ তো জানে না দিম্মা, বাইশে শ্রাবণ রবিঠাকুরের মৃত্যুদিন, সবাই জানে, কিন্তু এ দিনটা সবাই ভুলে গেছে মনে হয়।

ভুলে গেছি বলেই তো ফণিরে নে বনগাঁ গেলাম, বরং ওইদিন আমি পার্ক স্ট্রিট কবরথানে যাব ভেবেছিলাম। সব ভুল হয়ে গেছে আমার, এতদিন আলাম মধুর কবরথানে আমার যাওয়া হল না!

টিয়া বলল, অন্য দিন চলো দিম্মা, আমারে নিয়ে যেও।

তুই! কেন? হাবলু জিজ্ঞেস করে।

তুমিই বা কেন?

দিম্মা কি একা যাবে, আর মধুকবিরে আমি এখন চিনতে পারি।

কী চেন, তুমি তো পড়ই না কিছু।

নবেল, কেন পড়ব, নবেল পড়লি পার্টিশন রদ হবে?

টিয়া বলল, হবে।

কী করে হবে?

টিয়া বলল, তোমারে আমি বুঝিয়ে দেব, দিম্মা কবে যাবা বলো।

যাব যাব। বীরাঙ্গনা বিড়বিড় করে, বলে, দ্যাখ এই বেলগেছেয় ছিল নাট্যশালা, সেই নাট্যশালায় শর্মিষ্ঠা অভিনয় হয়, কোথায় নাঠ্যশালা জানি নে। আমি সেদিন জনে ক'জনরে জিজ্ঞেস করেছি, কেউ জানে না, লোকে কোনো খোঁজ রাখে না, দ্যাখ খিদিরপুরে যদি যাই কোনটা কবির বাড়ি, কেউ বলতি পারবে বলে মনে হয় না, মধু যতটা সাগরদাঁড়ির কলকাতার তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। কলকাতায় তার সব, কপোতাক্ষ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছিল। মধু, মা জাহ্নবী, সাগরদাঁড়ির হিন্দু মুসলমানকে কাঁদিয়ে মধু চলে এসেছিল। সাগরদাঁড়ির সঙ্গে ওই যে বন্ধন টুটল, আর জোড়ে নি, কলকাতা তাকে আশ্রয় দিল।

হাবলু বীরাঙ্গনার কথার মধ্যেই জিজ্ঞেস করল, আমি কী করব তাহলি?

আমাদের পার্ক স্ট্রিট নিয়ে যাবে তুমি হাবলুদা? টিয়া বলল।

না না ও কথা না, বিয়ে তো হবে, কী করে হবে?

তুই বনগাঁ যা, বলে আয়। বীরাঙ্গনা বলে।

জেঠারে বললি কী হবে দিম্মা, জেঠি যদি না বলে? হাবলু জিজ্ঞেস করে।

বীরাঙ্গনা বলে, তাহলি ওপারে যা, মা বাপরে বল, ছেলে মেয়েগুলোরে কি ভাসাই দেছেন তাঁরা, তাদের ভবিষ্যৎ নেই, বড় বুন কি ঝি গিরি করবে এপারে, ছোটটা কী করে তা জানি নে।

হাবলু বলল, তাহলি আগে কি ওপারে যাব, না বনগাঁ যাব?

বনগাঁয় যাও। টিয়া বয়স্কা রমনীর মতো উপদেশ দিল, ওপারে মা বাবা কী করবে, যা হবার এপারে হবে।

বীরাঙ্গনা মাথা নাড়ে, তারপর বলে, আমারে বনগাঁ নে চল।

গেলে তো সেদিন।

তোর জেঠির সঙ্গে কথা বলি, তোর তো একটা সহায় দরকার হাবলু, তোর একটা সম্বন্ধ থাকা দরকার কুথাও, বড় সম্বন্ধ জেঠা জেঠির, তা তো আর থাকতেছে না, এপারে একা একা কী করে থাকবি?

হাবলু বলল, ও জন্যি না দিম্মা, আমি খুব পারব, জেঠার বাড়ি থেকে মার খেয়ে আমি ক'দিন পথে পথে ঘুরিছি, মুড়ি বাতাসা আর জল খেয়ে কাটাইছি, তখনই মনে পড়ল বেলগেছেয় থাকে মামা, বলে দিয়েছিল বাবা মা, ঠিক্‌না অর্ধেক মনে ছিল অর্ধেক ছিল না, নম্বর জানি, রাস্তা জানিনে, এসে তো পড়লাম, সব রাস্তায় এই নম্বর খুঁজে তবে পেলাম।

বীরাঙ্গনা বলল, তুই জেঠাজেঠির মত শুনে আয়, দরকারে আমিও যাই, একটা কিছু হোক, ফণির মত হয়েছে মনে হয়।

তাই হবে। হাবলু বলল, যাব দিম্মা, তারপর আমি ফণিদারে জিজ্ঞেস করব, হবে, ঠিক হবে, বিয়ে আলবৎ হবে।

বীরাঙ্গনা উঠল। ওঘরে গেল। টিয়া উঠতে উঠতে উঠল না, বলল, ভাড়ার টাকা নিয়ে যেও আমার কাছে থেকে।

তুই দিবি?

হ্যাঁ দেব, তোমার জন্য আমার খুব ভাবনা হয় হাবলু! চাপা গলায় বলল টিয়া। স্বর একেবারে বদলে গেল।

এতো অনেকবার বলিছিস।

কই কবে বললাম?

বলেছিলি মনে করে দ্যাখ তুই!

বলেছিলাম তো ভাল, আবার বলছি হাবলু, তুমি যাও।

হাবলু অবাক হয়ে টিয়াকে দ্যাখে। দেখতে দেখতে ঘোর আসে তার দু'চোখে, তাকিয়েই থাকে টিয়ার দিকে। ঠিক এইরকম কথা কি শুনেছিল উতুলির অজেত আলির বোন ময়রম-এর কাছ থেকে? কীরকম ডেকে উঠল, হাবলু শোনো! হাবলু তুমার জন্যি আমার ভাবনা হবে খুব, ওপারে কোন বিদেশ বিভুঁয়ে গে পড়বা তুমি, কী খাবা, কুথায় শুবা, জ্বরজারি হলি কেডা দ্যাখপে—

হাবলু আচমকা বলে উঠল, জ্বর হলি তোর কাছে চলি আসব।

চমকে যায় টিয়া। হতচকিত হয়ে হাবলুর কপালে হাত দেয়, ফিসফিস করে, জ্বর, কই জ্বর, গা তো ঠাণ্ডা তুমার হাবলু।

হাবলু বিড়বিড় করল, জ্বর বাঁধায়ে তোর কাছে ফেরব ময়রম।

এসো, তাই এস, কী হলো এডা, আমার ঘুম হবে না হাবলু, ওপারে ইন্ডিয়ার তুমি কী চেন, মা বাপ ও থাকল এপারে, তুমি ও থাকো হাবলু।

না, ইন্ডিয়া পাকিস্তান হয়েছে আমারে ভাসাবার জন্যি ময়রম, আমি জানি নে কী হবে ময়রম, জানি নে কার কাছে আমি থাকব, আমারে কেউ পছন্দ করে না।

কী বলতেছ হাবলু!

হাবলু বলল, ভেসেই যাব।

টিয়া বলল, ছি? এসব কেউ বলে!

না বললি কি এডা হবে না?

না হবে না। টিয়ার ঠোঁট ফুলে উঠল, সে হাবলুর মাথার চুল ধরে নেড়ে দিল, চাপা গলায় বলল, কী বললে তুমি, তুমার জন্যি আমার ঘুম হবে না হাবলু, জেগে থেকে তুমার কথা ভাবব।

যদ্দিন ইন্ডিয়া পাকিস্তান না ওঠে, তদ্দিন কাউর ঘুম হবে না, আগে আমি কী করি বল দেখি তুই।

বনগাঁ যাও, ওপারে তোমারে কলিম ফাঁসাবে। টিয়া বলল।

কেডা আমারে ফাঁসাবে, তুই আমারে চিনিস নে ময়রম, অমি যা ভাবব তা করব, কলিম আমার কাছে শিশু।

দিয়েছিল তো ফাঁসিয়ে, কী ভয় পেয়েছিলে।

ভয় আমি পাই নি, শুধু ভাবছিলাম এডা কী হলো, দুটো দেশের মানুষ নে ঝাঁকানো হয়ে গেছে, এবার ইন্ডিয়া পাকিস্তান উঠে যাক, কিন্তু কলিম যে তা চায় না সেডা জানব কী করে?

যাক গে, তুমি ওপারে যেয়ো না, গেলে আমি শুধু ঘরবার করব।

এই তুই যা দেখি, কেন আমি কি ছেলেবিলে, ছেলেধরা আমারে নে যাবে ছালায় পুরে যে তুই ঘর বার করবি, যা খোকনরে বল গিয়ে।

টিয়া ঝপ করে উঠে দাঁড়ায়, তারপর বলে, তুম একটা নিরেট, তুমার মাথায় কিছু নেই হাবলু। হাবলু সত্যিই হাবলু, হাবলু হাবলু হাবলু।

টিয়া দমাদ্দম পায়ে ঘর ছাড়তে হাবলু একা হয়ে যায়। বড় ঘরটির ষাট ওয়াটের আলোর নীচে হাবলু নিস্তব্ধ হয়ে আছে নিজে। বনগাঁ যাবে। গিয়ে বলবে দিদির বিয়ে দেব, জেঠা তুমি তার ব্যবস্থা করো, দিদি আর কত দিন আইবুড়ো হয়ে থাকবে বলো, ফণিদা খুব ভাল, দিদিরে খুব যত্নে রাখবে, কোনো কষ্ট হবে না দিদির। তুমার ঘরে তো ঝিগিরি করে দিদি, বিনি পয়সার ঝি, তুমি এবার জেঠিরে বলো।

কী বললি তুই হাবলু! খগেন রায় আচমকা তার স্বভাব বিরুদ্ধ হয়ে গরগর করে ওঠে, বুলুরে ঝি গিরি করাই?

হাবলু বলল, তাইই তো, অমি জানি নে?

তোর বড় বাড় বেড়েছে হাবলু, তুই বললিই বুলুর বে দেব, আমাদের না বলে তুই পাত্র নিয়ে এলি কেন?

তুমারে আমি বলি নি, মিথ্যে কথা বলছ?

কী বললি আমি মিথ্যে বলছি, আমি মিথ্যেবাদি?

হাবলু দেখল ভাঙা বিকেলে আদালত চত্বরের দুচারজন মুহুরি তাদের দিকে তাকিয়ে। খগেন রায়কে ঠাণ্ডা মাথার মানুষ বলে জানে সবাই। সেই খগেন তার ভাইপোর সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। খগেন বলছে, বলে গিয়েছিলি, কিন্তু আমি কি হ্যাঁ বলেছিলাম।

না ও তো বল নি।

'না' না বলার মানে কি হ্যাঁ বলা? পাত্র আমার পছন্দ হয় নি, কী করে ও, এপারে বাড়ি নেই, কোথায় গে উঠবে মেয়ে?

আছে, পাত্রর সব আছে তুমি জান না।

না হবে না, তুই চলে যা, এখন অবনীর বে, তা নিয়ে ব্যস্ত সবাই, অবনীর বে'র পরে

বুলুর কথা ভাবা হবে, তুই এসে থাকবি তখন, অনেক খাটাখাটনি আছে। উত্তেজনা পরিহার করে খগেন রায় নরম হয়ে হাবলুর পিঠে হাত রাখে, বলে, রাজভোগ খাবি, কাঁচাগোল্লা?

হাবলু ঝটকা মেরে সরে যায়, বলে, বিয়েতে চাকরগিরি করব?

কী বলছিস তুই হাবলু, এ কি হয়েচিস তুই, তোর বড় ভায়ের বে, তুই আসবি, পরের ভাইডারেও আনবি খড়্গাপুর থেকে, বসিরহাট থেকে ডলুরে ও আনবি, সব তোরে করতি হবে।

হাবলু জিজ্ঞেস করে, জেঠি বলেছে?

আমি তো বলছি।

জেঠি যদি না বলে?

পাকামি করিস নে, তোরে ওপারে ও যেতি হবে, তোর মা বাবারেও আনতি হবে, পারবি নে?

হাবলু বলল, আগে জেঠি মত দিক, এতগুলো ঝি চাকর কি লাগবে বিয়েতে, জেঠা তুমি ভাল করে বোঝ?

খগেন রায় উত্তেজিত হতে গিয়ে আবার তা পরিহার করল, বলল, তুই যে ভাষায় কথা বলছিস সেডা ভাল না, লোকে শুনলি কী বলবে? আমি তোর জেঠা, আমি তোর বাবারও গার্জেন, আমি যা বলব তা মাথা নামিয়ে শুনিস যদি তোর ভাল হবে হাবলু।

হাবলু গুম মেরে থাকল। শেষ পর্যন্ত এসেছে তো বনগাঁ। কলকাতায় সবাই অপেক্ষা করে আছে হাবলু কী খবর নিয়ে যায়। ফণিভূষণ শেষ পর্যন্ত বীরাঙ্গনাকে বলেছে, ছবি দেখে মেয়ে পছন্দ হয়েছে, হাবলু যাক বনগাঁ।

জেঠা বলল, চ, বাড়ি চ।

কেন, কী করতি?

বুলুর সঙ্গে দেখা করবি নে?

গিয়ে তো দেখব হয় বাসন মাজতেছে কলতলায়, না হয় ঘর মোছতেছে, বেশি হলি জেঠির পা টিপতেছে, ওডা দেখতি কেন যাব জেঠাবাবু?

খগেন ম্লান মুখে হাসল, তুই খুব রাগী, দুর্বিনীত হয়ে গিছিস, বাড়ির মেয়ে বাড়ির কাজ করবে না, ও আশাশুনিতে করত না?

হাবলু বলল, মা করতি দিত না।

কাজ করা খারাপ?

আমি জানি নে জেঠাবাবু, কিন্তু দিদির বিয়ে দিতি হবে, ফণিদা তাহলি আমার ভগ্নিপতি হবে, এপারে আমাদের কেউ নেই জেঠাবাবু, তুমি ছিলে কিন্তু জেঠি আর বড়দা তুমারে থাকতি দেচ্ছে না, আমি আবার আসব জেঠাবাবু।

হাবলু আচমকা এসে আচমকা চলে যেতে মন খারাপ করে খগেন উকিল বাড়ি ফিরতে তার বউ সন্দেহ করেছে, বলল, কী হয়েছে তোমার, ওই হাবলুটা এয়েছিল?

হ্যাঁ। খগেন উকিল বলল, পাত্রর মত হয়েছে।

বনগাঁ এলি এবার ঠ্যাং ভেঙে দেবা ছাওয়ালডার, কতবড় মাতব্বর হয়েছে ও যে বুলুর সম্বন্ধ দেখছে।

জেঠির কথাটা বুলু ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে শুনল। গরগর করছে জেঠি। জেঠামশায় কুঁকড়ে গেছে ভয়ে। মিনমিন করে কী বলছে ধরা যাচ্ছে না।

পঁয়তাল্লিশ

তোর মা বাপ খুব আত্মসুখী লোক হাবলু, না হলে ছেলেমেয়েগুলোকে এ ভাবে ভাসায়ে দেয়, তাঁরা ওপারে আছেন কী সুখে? বীরাঙ্গনা বলল।

হাবলু গুম মেরে গেছে। বনগাঁ থেকে ফেরার পর তার সমস্ত তেজ যেন নিঃশেষিত। বুঝতে পারছে না কী করবে। সব যতটা সহজ ভাবা গিয়েছিল, তা নয়। হিন্দুস্থান পাকিস্তান জোড় লাগানোর মত কঠিন। সে বিড়বিড় করল, তাহলি পাকিস্তান যাই।

টিয়া বলল, পোস্ট কার্ড ছাড়ো, চিঠি লেখ।

চিঠিতে কিছু হবে না, কবে পৌঁছবে কবে তার উত্তর আসবে, বছর ঘুরে যাবে।

টিয়া মাথা ঝাঁকায়, বলে, ওপারে গেলি যদি তোমারে পুলিশে ধরে।

ধরে ধরবে, আমি কি ভয় করি নাকি।

টিয়া হেসে ফেলে, বলে, তাতে কী লাভ হবে তোমার, পাকিস্তানের জেলে বসে দিদির বিয়ে দিতে পারবা?

মাঝখানে বীরাঙ্গনা, দু পাশে হাবলু আর টিয়া। তারা এখন চলেছে বেলগাছিয়ার নাট্যশালা দেখতে। কোথায় সেই নাট্যশালা তা এদিককার কেউ জানে না। জিজ্ঞেস করতে বলেছে, নাটক তো হয় হাতিবাগানের স্টার রঙমহল, বিশ্বরূপা, আর বিডন স্ট্রিটের মিনার্ভা থিয়েটারে, আর মিনার্ভা ছাড়িয়ে গেলে চিৎপুরের যাত্রাপাড়া, কত অপেরা। সব খবর নিয়ে এসেছে হাবলু, বলেছে, এখেনে নেই দিদমা, বেলেগেছেয় কেন মধুকবি আসতে যাবে?

মুখ্যু, আসতে যাবে মানে, এসেছিল, বেলেগেছের নাট্যশালার কথা আমারে মাসসাই বলত, তিনি না বললে আমি জানব কী করে, নাটকের নাম শর্মিষ্ঠা, মধুর প্রথম নাটক, তার আগে হলো কুলিন কুলসর্বস্ব, ওটা অবিশ্যি মধুর নাটক না, বেলগেছের নাট্যশালা না হলি বাংলা নাটক হত না, মাসসাই বলেছিল।

হাবলু জানে অনেক কথা, টিয়াও জানে তাই। অনেক কথা হয়েছিল বলেই না মধু হয়েছিল কবি মধুসূদন, শ্রী মধুসূদন। তারা শুনেছে সব বীরাঙ্গনার কাছে। খোকন আসছিল,

কায়দা করে তাকে রেখে এসেছে টিয়া, বলেছিল পরে নাট্যশালায় নিয়ে গিয়ে নাটক দেখিয়ে আনবে। খোকন থাকলে তাদের অসুবিধা হত না কি? তারা কি কখনো এক সঙ্গে বেরিয়েছে? হাবলু হাবলু! আমি তোমাকে ভালবাসি হাবলু, এই কথাটা যে বলবে তাকে স্পষ্ট করে, তার সুযোগই হচ্ছে না। হাবলু এত মন খারাপ করে আছে যে বলবে কী করে? হাবলু হাবলু, আমাদের দুজনের মা বাবাই ওপারে, তুমি আমি ভালবাসা না পেলে এপারে থাকব কী করে? খোকন থাকলে এ সব বলা হত না।

হাবলুর দিকে তাকিয়ে টিয়া জিজ্ঞেস করল, এখনো নাটক হয় নাট্যশালায়?

সে তো একশো বছর আগের কথা। বীরাঙ্গনা বলল, তখন হতো।

নাটক যদি না হয়, তবে কী হয় সেখেনে? টিয়া জিজ্ঞেস করল।

কী হয় তা গিয়ে দেখলে বোঝা যাবে। বীরাঙ্গনা বলল, পড়ে আছে এমনি।

এখন যদি নাটক হত, কী ভাল হত, তাই না হাবলুদা?

তা হলে ত একশ বছর আগে গিয়ে বসে থাকতে হয়। হাবলু বলল।

বীরাঙ্গনা বলল, তাই যদি হত, সে জীবন ধন্য হয়ে যেত, দ্যাখ বড় বড় মানুষ সবাই আগে জন্মে গেছে, আমাদের ভাগ্য খারাপ, মধুকবিরে দেখতে পাইনি।

হাবলু বলে, তখন হিন্দুস্থান পাকিস্তান দেখতি হতো না।

টিয়া আড় চোখে হাবলুর দিকে তাকায়, মনে মনে বলে, দেশভাগ না হলে তো কলকাতায় আসা হতো না, কিন্তু পার্টিশনে তাঁর কী হতো, তিনি তো এমনিই আসতেন, দেশেই তো থাকতেন না, সাগরদাঁড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলেন, গাঁর উপর তাঁর কি মায়া ছিল দিদমা?

বীরাঙ্গনা বলল, বড় হলে বুঝবি, মানুষের জীবনে এ রকম হয়, ওই বয়সে ওরকম ঘটে, যেমন তোর হয় হাবলু, হিন্দুস্থান-পাকিস্তান মানিসনে, দেশ-মার উপর যদি টান না থাকবে তবে মধু নীলদর্পণ অনুবাদ করতে গেল কেন, ইংরেজ কি তাতে খুশি হয়েছিল বল।

রেবেকার উপরও খুব নিষ্ঠুর ছিল মধুসূদন। কথাটা বলে টিয়া বীরাঙ্গনাকে দেখল।

এই কথায় বীরাঙ্গনা খুব অসন্তুষ্ট হলো, মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে, যা জানিস নে তা নিয়ে কথা বলিস কেন, কথা হচ্ছে এক রকম, তুই তার ভিতরে রেবেকার কথা তুলিস কেন?

টিয়া গম্ভীর হয়ে যায়। মনে মনে বলে, সে তুমি যাই বল না কেন, তোমার মধু ঠিক কাজ করে নি, নিষ্ঠুর! আমি হলে ক্ষমা করতে পারতাম না, রেবেকার অভিশাপ লেগেছিল মধুর জীবনে।

শেষের বাক্যটি খুব আস্তে শোনা গেল তার মুখে। তবু বীরাঙ্গনার কানে গেল, ঘুরে তাকায় বীরাঙ্গনা, তার চোখ জ্বলে ওঠে, বলল, তোর এই তো বয়স, অভিশাপ কারে বলে রে?

হাবলু লক্ষ করল বীরা আর টিয়াতে লেগেছে। বীরাঙ্গনার মুখ ঝামটায় গুটিয়ে গেল টিয়া। বীরাঙ্গনা গজগজ করতে লাগল, অভিশাপ বলে কিছু হয় নাকি, হলে এত লোকের অভিশাপে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান থাকত, কম অভিশাপ দেছে লোকে, আর মেয়েমানুষের অভিশাপে কী হয় রে।

টিয়া জবাব না দিয়ে দাঁড়ায়। বীরাঙ্গনার যে খুব লেগেছে তা ধরা যাচ্ছে। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, রাগ করলে দিদমা? দু হাতে বীরাঙ্গনাকে বেড় দিল টিয়া।

বুড়ি তার গা ছাড়িয়ে নিল, বলল, জড়াস নে তো আমার ভাল লাগছে না।

আর বলব না দিদমা। বলে টিয়া আবার জড়ায় বীরাঙ্গনাকে। টিয়া বুঝতে পারছে সে যতটা বোঝে ততটা তার বলার কথা নয়। সে যা জানে, সে যা ভাবে তা কি বলা যায়, শোভন? আর মধুকবি হল বীরাঙ্গনার প্রাণ, সহ্য করবে কী করে? কিন্তু তার কথা তো সত্য। রেবেকার কষ্ট কে বুঝল, মধু কলকাতায় চলে এল, বাচ্চাগুলোকে নিয়ে রেবেকা মাদ্রাজে পড়ে থাকল। ওই কথা শোনার পর থেকে তার মন একেবারে বিষিয়ে গেছে যেন। যদি অন্য কেউ হত, হেনরিয়েটাকে দেখে নিত। ভালবাসার কোন দাম নেই!

আমি যে তোমার জন্য ত্যাগ করে এলাম সব। তুমি কৃষ্ণাঙ্গ, তোমার না ছিল আর্থিক সঙ্গতি, অভাবী কৃষ্ণাঙ্গকে বিয়ে করে কোন শ্বেতাঙ্গিনী? তুমি কালোমানুষ, আমি শ্বেতাঙ্গিনী। অনাথিনী হলেও আমি তো নীলনয়না শ্বেতাঙ্গিনী। তোমার পাণি গ্রহণ করায়, শ্বেতাঙ্গ সমাজ কম নিন্দা তো করেনি। অনাথিনী রেবেকা ভেবেছিল ওই কালোমানুষ তার বড় সহায় হলো। কী সুন্দর ওই মানুষটি। কী রোমান্স ওর ভিতরে! কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র। মধুর বাবা মধুকে ত্যাগ করেছে, মধুর বাবা দেওয়ানি আদালতের সাধারণ উকিল। রেবেকা তা জানত না। না জানলেই বা কী, কৃষ্ণাঙ্গ মধুকে সে ভালবেসেছিল। মধুর কাছে সে শুনেছিল হিন্দুদের প্রেমের দেবতা কৃষ্ণের কথা। মধু তার কৃষ্ণ হয়েছিল। রেবেকা ছিল ভালবাসার কাঙাল। মধুর কাছে অনাথিনী ভালবাসা পেয়েছিল। সেই ভালবাসার কি মর্যাদা দিল মধু? কোথায় গেল ক্যাপটিভ লেডির সেই প্রেমের সম্ভাষণ, 'ওই নয়নে নয়ন রাখা কতই মধুর, ও নয়নে মিলেছে ওগো কোমল প্রেমের আলোকঝরা।'

মেয়েদের জানতে হয় পুরুষমানুষকে বাঁধতে। দেবদাস তো নিজের জীবন শেষ করে দিল পার্বতীকে ভালবেসে। পুরুষমানুষ তো সেইরকমই হবে। এ কথা টিয়াকে কেউ বলে দেয় নি, সে নিজে নিজে জেনেছে। রেবেকা তা জানত না। চার সন্তানের মা

হয়ে ভেবেছিল মা হয়েই থাকবে, মধুর ভালবাসা চিরকাল তার উপরেই থেকে যাবে। জানলে কি হেনরিয়েটা কালনাগিনী ঢুকতে পারত ওই সংসারে? এসব তো বলা যাবে না বীরাঙ্গনাকে। শুনলে রেগে যাবে। মধুকবি যেন তার কোলের ছেলে, তার কোনও নিন্দাই কানে শুনতে পারবে না। নিষ্ঠুর পুরুষ, নিষ্ঠুর পিতা, নিষ্ঠুর স্বামী। অমন সংসার ফেলে মধু চলে এল কলকাতায়! আর খোঁজই করল না ছেলেমেয়েগুলো বাঁচল না মরল, রেবেকা বাঁচল না মরল? যদি বলে মেয়েমানুষের অভিশাপে কিছু হয় না, কান্না তো হয়, মা জাহ্নবীর কান্নার কি কোনো দাম ছিল না? মা জাহ্নবী কি মধুর জন্য বুকভাঙা কান্নায় কপোতাক্ষ তীরে আছড়ে পড়ে নি? মধুর তখন মন টলে নি, কী বলেছিল তখন, 'কাব্যদেবীর সাধনার জন্য দরকার হলে মা বাবাকে ত্যাগ করতে হয়।' বোঝা গেল, কিন্তু যে তার জন্য অমন ত্যাগ করল, সেই নীলনয়না, চার সন্তানের মা আর চার সন্তানকে কি ছাড়তে হয় ওই কারণে? নিষ্ঠুর পুরুষ কী করে কবি হয়? দয়া নেই মায়া নেই যার তার কী করে কবিতা হয়? মাদ্রাজ ছাড়ার সময় ছোট ছেলে মাইকেল জেমস-এর বয়স দশ মাস। দশমাসের শিশুকে ফেলে রেখে সকলকে অনাথ করে পালিয়ে আসতে বুক কাঁপে নি? সেই মাইকেল অবশ্য বাঁচে নি, মাস তিনের মাথায় মায়ের কোল খালি করে কবরে গিয়ে শান্তির ঘুম ঘুমোল। অনাথিনী রেবেকা আবার অনাথিনী।

হাবলুকে যদি শোনান যেত কথাগুলো? তাহলে ঠিক বুঝতে পারত ও সব। জানতে পারত টিয়া কী চায়। হাবলু, হাবলু, ও সব কথা শুনো না। কেউ যদি খারাপ কাজ করে সে যতই বড় মানুষ হোক, তার নিন্দা হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না, ভগবান তার শোধ নেবেই, না হলে মধুর কষ্ট হবে কেন?

বীরাঙ্গনা বলল, তাদের ভিতর কী হয়েছিল তার আমরা কী জানি, না জেনে কি বলা ঠিক? বলতে বলতে বীরাঙ্গনা তাকায় টিয়ার দিকে, তাকে দেখতে দেখতে বলল, বড় মানুষের কথা আমাদের মতো হয় না।

বড় মানুষ কি দোষ করতে পারে না?

কিন্তু দোষের কথাই যদি মনে রাখ তুমি, তোমার চোখ তা হলে শুধু ওই দিকে, ভালটা তুমি দেখতি পাও না।

টিয়ার মুখ অন্ধকার, কথাটা খুব শান্ত হয়ে বলল বটে বীরাঙ্গনা, কিন্তু এ কথা তো শান্ত হওয়ার কথা নয়। কথাটা সত্যি। এর বিপক্ষে কি কিছু বলা যায়? বলবেই তো দিদিমা, এ যে মধুর কথা। কিন্তু দিদিমা কি জানে না রেবেকার কান্নার কথা। জানে না, টিয়া কেন হেরিয়েটার কথা একদম পছন্দ করে নি। হাবলুকে কি দ্যাখে না দিদিমা? হাবলু না হয় রাজনারায়ণ দত্তর ছেলে নয়, হাবলু না হয় কবি হবে না কোনওদিন, কিন্তু হাবলুকে সে ভালবাসে তা তো সত্যি,হাবলু আর তার ভিতরে যদি আর একজন এসে ঢোকে, কালনাগিনী, তবে কি সে মেনে নেবে? এই জন্য তো সে হাবলুকে ওপারে

যেতে দেবে না। ওপারে বসে আছে ময়রম হাবলুর জন্য। ধরে নেবে। এই রকমই হয়। রেবেকাকে ফেলে চলে এল মধু কলকাতায়। তার পরপরই এল হেনরিয়েটা। রেবেকার প্রেমের কোনো দাম থাকল না। ইস! ছেলেপুলের মা, কী হবে তার তা একবার ভাবল না। নিষ্ঠুর কবি! তুই না ভালবেসে বিয়ে করেছিলি রেবেকাকে? তুই ভুললি রেবেকাকে, অভিমানী রেবেকা পড়ে থাকল ও দেশে। মধু জানতেও পারে নি সারাজীবন তারই জন্য বসে ছিল সে। ভালবাসা তো এমনই হবে। কাঁদাবে শুধু কাঁদাবে।

বীরাঙ্গনা আর কোনও কথা বলে না। সে কি বোঝে না, টের পায় না? এই মেয়ে কী বলতে চায় তা সে ভালই বুঝতে পারছে। সে একবার টিয়াকে দেখল, একবার দেখল হাবলুকে। এই টিয়ার মনে হাবলুকে নিয়ে ঢেউ উঠেছে। হুঁ, বড় হয়ে গেল যে সব। তারা দত্তবাগানে পৌঁছল প্রায়। কোথায় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বাড়ি? তিনি না থাকলে মধু আরও কষ্ট পেত। তেলকালি মাখা এক বুড়োকে জিজ্ঞেস করল বীরাঙ্গনা, রাজবাড়ি কোথায় বলতি পার কত্তা?

বড় রাস্তা থেকে একটা গলিপথ ভিতরে ঢুকেছে, সেই পথ দেখিয়ে দিল বুড়ো, রাজবাড়ি ভিতরে, যাও।

নাট্যশালা? টিয়া জিজ্ঞেস করল।

বুড়ো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল টিয়ার দিকে, জবাব দিল না।

কোন রাজা, রাজার কাহিনি কী, জানে বীরাঙ্গনা। রাজা ঈশ্বর সিংহ এই প্রাসাদোপম বাড়ি কিনেছিলেন রবি ঠাকুরের ঠাকুর্দা দ্বারকানাথের কাছ থেকে। বীরাঙ্গনা বলে, বাড়িটার হাল কী করেছে দ্যাখ, কিন্তু এখেনেই প্রথম নাম হল মধুসূদনের।

দত্তবাগানের এদিকটা ফাঁকা ফাঁকা, আর এই রাজার বাড়ি তার ভিতরে একা একা দাঁড়িয়ে আছে। মস্ত দালান ঘুমিয়ে আছে একা। এ যেন রাজনারায়ণের বাড়ি। কেউ নেই, কেউ নেই। একা বুড়ো যেন ক্লান্ত হয়ে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে শ্বাস নিচ্ছে। এখানে দাঁড়িয়ে যশোর রোডের বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে তারা। চারপাশ নিস্তব্ধ। হাবলু অবাক, সে এর আগে কখনো রাজার বাড়ি দ্যাখেনি। বীরাঙ্গনা চুপ। হাবলু জিজ্ঞেস করল, কারা থাকে এ বাড়িতে।

বীরাঙ্গনা বলল, কেউ থাকলে কী এমন ভাবে পড়ে থাকে মধুর নাট্যশালা।

টিয়া বলল, ভিতরে যাব দিদমা?

সাপখোপ আছে, জঙ্গল হয়ে আছে সব তা দেখছিস, বীরাঙ্গনা কোমর বাঁকিয়ে দু'হাতে মাটি ছোঁয়, বলে, রাজা বুঝতে পেরেছিল মধু কত বড় কবি, মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে রাজার কাছেই সম্মান পেল প্রথম।

বেলগেছের এই নাট্যশালায় মধুসূদন প্রথম করল রত্নাবলী নাটকের ইংরেজি অনুবাদ। অনুবাদ না করলে কলকাতার ইংরেজ, ইহুদি, পারসিরা সে নাটকের বুঝবে কী? নাটক

বাংলায় হলো, কিন্তু তার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে তারা ধরতে পারল কী অভিনয় হচ্ছে মঞ্চে। মধুসূদনের প্রতিভা বুঝতে পেরেছিলেন রাজা, তার ফলে ইংরেজি কাব্য ক্যাপটিভ লেডি লিখে ব্যর্থ কবি কলকাতায় ফিরে নিজের জায়গা করে নিতে পারল। মাতৃভাষার রূপ চিনতে পারল মধু। শুনতে শুনতে টিয়া ডাকল, যাবে তুমি হাবলুদা?

গিয়ে কী হবে, রাজা তো নেই।

নেই তো সবাই জানে, রাজা দেখতে তো আসি নি আমরা, এই এস না। চাপা গলায় ডাকল টিয়া, দিদমা থাক, আমরা দেখে আসি।

ওই চাপা গলা, ওই চোখের ভাব কি চেনে না বীরাঙ্গনা, তার মনে হল বড় অন্যায় করছে মেয়েটা। হাবলুর এখন অনেক কাজ। হাবলুকে সে পেয়েছে যেন পরম রতন। ওই খুকি মেয়ের কাছে ছেড়ে দেবে নাকি? এপারে এসে হাবলুকে পেয়েই যেন বহুদিন পরে বীরাঙ্গনা তার হারিয়ে যাওয়া সাগরদাঁড়ির শোক ভুলতে পারছে। কিন্তু তার ভিতরে কী করে যে ঢুকে পড়ল এই টিয়া?

টিয়া একেবারে নিরীহ মুখে বলল, দিদমা আমরা একটু দেখে আসি।

দেখবি কী, সব তো জঙ্গল।

আমি কোনোদিন রাজার বাড়ি দেখি নি দিদমা, হাবলুদাও দ্যাখে নি, তাই তো হাবলুদা।

বুড়ি ভাবল সেও যাবে, একা ছাড়বে কেন, কিন্তু হাবলু যে হুট করে বলল, তুমি দাঁড়াও বীরা, আমরা ঘুরে আসি, তোমার কষ্ট হবে যেতে।

এ ছেলে দিদমা ডাকলেও বুড়ি যে বীরা ডাকই শোনে। এখনও তাই শুনল বটে, কিন্তু বুক তো ভেঙে গেল। যাবি, আমাকে দাঁড় করিয়ে তুই ওই মেয়ের সঙ্গে এই জঙ্গল পার হয়ে রাজার বাড়ি যাবি, কেন আমি দেখাতি পারি নে, তুই বলবি বীরাও চল, বললি নে। আমার যে কষ্ট হবে হাবলু, ওই টিয়া তোরে বশ করে ফেললে কোনো কাজ করতে পারবি নে। ত্যাগ কর ওরে, রেবেকারে যেমন ছেড়ে এসেছিল মধু, তেমনি। না ছাড়লে কি মধু কবি হতো, মেঘনাদের মরণ কথা লিখতে পারত।

টিয়া বলল, দিদমা, তুমি দাঁড়াও, আমরা যাব আর আসব।

বীরাঙ্গনা বলল, বনের ভিতর কোথায় যাবি, সাপখোপ থাকতে পারে।

না থাকবে না, হাবলুদা তো আছে। বলে টিয়া পা বাড়িয়ে হাবলুকে ডাক দেয়, এস।

বীরাঙ্গনা অন্য দিকে তাকায়। মনে মনে বলল, তোর খুব সাহস মেয়ে, হাবলুরে তুই কী করবি, হাবলু আমার মধুর মতো তেজী, তুই পুড়ে যাবি ওই রেবেকার মতো।

টিয়ার পিছু পিছু হাবলু এগোয়। টিয়া কমলা রঙের শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজেছে। চুলে একটি বেণী। পিঠের উপর তা দুলছে। হাঁটছে যেমন মরালির মতো। সম্মোহিতের মতো হাবলু তাকে অনুসরণ করছে। বুড়ি বীরাঙ্গনা মনে মনে বলল, তুই রেবেকা নস, তুই হেনরিয়েটা।

শুনলে টিয়া তীব্র আপত্তিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলত, আমি আমার মধুকে কারোর কাছ থেকে কেড়ে আনতাম না দিদমা, আমার মধুকে আমি বেঁধেও রাখতাম, যেতে দিতাম না কোথাও, যেতে গেলে জাহাজ ফুটো করে দিতাম, সাগরে ভীষণ তুফান, ঝড় উঠত, পাল উড়ে যেত জাহাজের, সব ডুবে যেত, মধু ভাসতে ভাসতে ফিরে আসত আমার কাছে।

রেবেকার জন্য কি চোখে জল আসে না বীরাঙ্গনার? আসে, কিন্তু তা বলবে কেন? মধুর বিপক্ষে যায় এমন কথা সে বলবেই না কাউকে। দুখিনী রেবেকার কান্নাই শেষ পর্যন্ত মধুকে অত কষ্ট দিল? হতে পারে তা, হতেই পারে। ম্লান মুখে বীরাঙ্গনা তাকিয়ে থাকল বনের পথে, পথ হারিয়ে গেছে জঙ্গলে, ছেলে মেয়ে দুটোও।

টিয়া ক্রমশ বুনো ঝোঁপের আড়ালে চলে যাচ্ছে। ঝপ করে ঘুরে তাকায় মেয়ে, দু'হাত বাড়িয়ে হাবলুকে আহ্বান করল, বলল, এস তুমিও আমার মধু, তোমার জন্য আমার ঘুম হয় না হাবলু, কথা দাও ওপারে যাবে না, ময়রমের কাছে আর যাবে না, বলো হাবলু, বলো, যাবে না। কালনাগিনী তোমাকে যেন বশ করতে না পারে। আমি তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসি। ওই বুড়ি তোমাকে আমার কাছ থেকে সরাতে পারবে না, পারবে না, তাহলে তুফানে জাহাজ ডুবিয়ে দেব আমি, বজ্রপাত ঘটাব, যেমন শুনি তেমন মন্বন্তর আসবে এ দেশে আবার, যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে ভারত পাকিস্তানে, বুঝলে তুমি মধু, আমার শ্রীমধুসূদন।

বলতে বলতে হাবলুকে দুহাতে নিজের বুকে টানল সেই মেয়ে, চাপা গলায় বলল, আই লাভ ইউ, লাভ ইউ হাবলু।

ছেচল্লিশ

হাবলুর নামে চিঠি এসেছে। সেই চিঠি হাবলুর বদলে টিয়ার হাতে পড়েছে হাবলু নেই বলে। হাবলু বীরাঙ্গনার সঙ্গে বসিরহাট গেছে। বীরাঙ্গনা হাবলুর একটা কাজ দেখছে ওখানে। যদি হয়, কিছুই না যদি কোনো উকিলের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া যায়। তার ছেলেতো ওই ভাবেই উকিলের মুহুরি হয়েছে। আর একটা উদ্দেশ্যও রয়েছে বীরাঙ্গনার, তা হল হাবলুকে বেলগেছে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। ঘি আর আগুন একসঙ্গে না রাখাই ভাল। হাবলুর উপর এত মায়া পড়ে গেছে বীরাঙ্গনার। হাবলুকে না দেখলে এত মন খারাপ লাগে। এক একসময় কি মনে হয় না হাবলুকে সে পেটে ধরেছে। কিন্তু তার নিজের ছেলের জন্যও তো এমন উতলা হয় না মন। হাবলুকে বুঝিয়েছে বীরাঙ্গনা, তাকে দাঁড়াতে হবে, তার দিকে তাকিয়ে আছে তার মা বাবা ভাইবোন। পার্টিশন রদ হবে কি হবে না সে পরের ব্যাপার, এখন কী হবে তা ভাবতে হবে তো। বীরাঙ্গনা জানে আসল ঘটনা ওটি নয়, ইদানীং সে সহ্য করতে পারছে না ওই টিয়া বলে মেয়েটিকে।

হাবলুকে সে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। কেন রে, হাবলুর মাথায় কত দায়িত্ব। হাবলু যদি এখন মেয়েমানুষের চোলে পড়ে তবে তার কোনো কাজই করা হবে না। মেয়েমানুষ জীবন নষ্ট করে দেবে হাবলুর। মধুর কী হয়েছিল? কিন্তু সে নিজের কথা ভাবে না। তার মাসসাই-এর কথা ভুলে যায়। মামসাই বলত যে নারীই পারে পুরুষের জীবনকে সম্পূর্ণ করে তুলতে। সে যাই হোক বীরাঙ্গনা ছাড়বে না হাবলুকে।

হাবলুর চিঠি এসেছে বনগ্রাম থেকে। প্রেরক মল্লিকা রায়। কে মল্লিকা রায়, হাবলুর দিদি বুলু? টিয়া চিঠিটাকে তার বই-এর ভিতর লুকিয়ে ফেলল। হাবলু এখেনে নেই, হাবলু এলে চিঠি হাতে পাবে। মাসি বলল, আমি কোথায় রাখব না রাখব, ভুলে যাব, তোর কাছে থাক, ওর দিদির চিঠি মনে হয়। রাখবেই তো টিয়া, আর পড়বেও সে । যদি কোনো জরুরি খবর থাকে তো জানাতে হবে বসিরহাটে। বুদ্ধি করে ঠিকানাটা চেয়ে নিয়েছিল হাবলুকে দিয়ে। চেয়ে নিয়েছিল হাবলুকে চিঠি লিখবে বলে। লিখবেই তো, কিন্তু লিখবে কী? যদি আর কারোর হাতে পড়ে, তখন? আর বুড়ি বীরাঙ্গনাকেও ঠিক বিশ্বাস হয় না টিয়ার। তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল তো হাবলুকে। না হলে অত তাড়া কিসের। আসলে তার আর হাবলুর সম্পর্কটা ধরতে পেরেছে বীরাঙ্গনা দিদিমা, বীরা।

কেন, ভালবাসায় কি পাপ হয়? পৃথিবীতে যা হয় সবই তো ভালবাসা নিয়ে, যত গল্প, উপন্যাস পড়েছে টিয়া সবই তো ভালবাসা নিয়ে। যত যুদ্ধবিগ্রহ সবই তো ভালবাসা নিয়ে। ভালবাসার কষ্ট নিয়ে। মধুকবির কথা এত বলে তবু ভালবাসায় আপত্তি! টিয়া এই সব ভাবতে ভাবতে খামের মুখ খুলতে লাগল। এযে পেন্সিলে লেখা চিঠি। কলম জোটে নি। ইস! খামের উপরে লেখা ঠিকানা অবশ্য কালিতেই। টিয়া চিঠিতে চোখ রাখল,

''স্নেহের ভাই, তুই দু'বার এলি, আমার সহিত দেখা হইল না। একদিন কাদের নিয়ে এলি আবার চলেও গেলি। আর একদিন জেঠার সঙ্গে দেখা করে চলে গেলি। জেঠা না বললে আমি জানতেও পারতাম না। জেঠার বয়স হয়েছে, সব কথা মনেও রাখতে পারে না। জেঠির সন্দেহ হয়েছিল তাই বারবার জিজ্ঞেস করলে তবে জেঠা বলে। ভাই, তুই কাহাদের সহিত এসেছিলি সেদিন, কেন এসেছিলি? জেঠার সঙ্গে কথা বলে এসেছিলি। জেঠা তো সব ভুলিয়া যায়, ওই দিনের কথাও ভুলিয়া গিয়াছিল... ।"

পড়তে পড়তে টিয়া ভাবে, কী গুরুচণ্ডালি দোষ রে বাবা। তার এটা হয় না। বই পড়ে পড়ে বাংলা লিখতে শিখেছে সে খুব ভাল। সে ভাবল সংশোধন করে দেয়। কিন্তু হাবলুর দিদির চিঠিতে কি সে কলম ছোঁয়াতে পারে? হাবলুর চিঠি হলে না হয় হতো। হাবলু তাকে কবে লিখবে চিঠি, সে চিঠি দিলে হাবলু উত্তর দেবে? টিয়া আবার চিঠিতে মন দিল,

'ভাই, তুই কাহাদের নিয়া এসেছিলি বল দেখি। তোর দিদি কি জলে ভাসিয়া গিয়াছে যে তাকে উদ্ধার করিতে হবে। যে লোক আসিয়াছিল সে নাকি একদম ভাল নহে। জেঠা বলেছে, অনেক বয়স। জেঠার একদম পছন্দ হয় নাই। এ ছাড়া সমুখে বড়দার বিয়ে, তার ভিতরে এই সব কাজ কি করা উচিৎ, তুই ভাবিয়া দেখিয়া বল দেখি ভাই, চিন্তা করিয়া বল দেখি। সেই লোকটিকে আমি দেখি নাই ভেবেছিস, আমরা কোথাও যাই নাই, পাশের বাড়িতে ছিলাম, জেঠি যাহা বলিয়াছিল সেই মতো কাজ হইয়াছিল, সত্যি কথা বলিরে ভাই, ওই পাত্র আমার একদম পছন্দ হয় নাই, তাহা ছাড়া শুনিয়াছি পাত্র আমাদের মতো উচ্চ বংশের নয়, তা কী করিয়া হইবে বল, বাবা মা মত দিবেন না। এর চেয়ে বলি আমার বিয়ে নিয়ে তোকে ভাবিতে হবে না। তুই নিজে দাঁড়াইতে চেষ্টা কর, তুই একদম চেষ্টা করিবি না। বলিয়া দে পাত্র আমাদিগের একদম পছন্দ হয় নাই। এক ফোটাও নহে। জেঠামশায় তো বললেন, অন্তত পঞ্চাশ বছর বয়স।...

টিয়া আর পড়তে পারল না। চোখ কিরকির করতে লাগল। কী লিখেছে তোমার দিদি, ও হাবলু, শুনছ। এসব কী কথা? এসব লেখার মানে কী? ফণিদার নামে এসব লিখেছে কেন, জেঠা কি চোখে দ্যাখে না? না না ফণিদার এখেনে বিয়ে করা উচিৎ না, বংশ উচ্চ কি নীচ সেই কথাও লিখেছে, ইস এই সব কেউ ভাবে! টিয়া কত বই পড়েছে, সব বই-এ তো বংশ মর্যাদা, জাতপাতের বিরুদ্ধে কথা বলা আছে। আর ওই সব বই-এ যা লেখা আছে, সবই ঠিক, পড়তে পড়তে তাই মনে হয়। ধর্মই বা কী, জাতপাতে ভরা হিন্দু ধর্ম, টিয়া মনে মনে বলল, তোমরা কি 'অভাগীর স্বর্গ' পড় নাই, এখনো জাতপাত লইয়া থাক, তোমরা কি স্বামী বিবেকানন্দর আহ্বান শোনো নাই, ধর্ম জাতপাত যদি মুখ্য হইত, তবে মধুসূদন কবি হইত না। খ্রিস্টান হইয়াও তিনি রাবণপুত্র মেঘনাদের করুণ মৃত্যু লইয়া কাব্য রচনা করিয়া অমর হইলেন। বিলেত যাইতে পারিবেন, ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবেন নিজের প্রতিভা লইয়া এই কারণে তো খ্রিস্টান হওয়া, কলিকাতার গোঁড়া খ্রিস্টান সম্প্রদায় কি মধুকে পছন্দ করিত, করিত না। মধুর মৃত্যুর সময়ে কী হইয়াছিল তাহা কি কেহ জানে?

হাবলু হাবলু তুমি তো বলো নবেল পড়লে সব্বোনাশ হয়, নবেল না পড়েও তোমার দিদি এসব কী লিখেছে দ্যাখো, এসব যদি মনে থাকে তবে ভবিষ্যতে কী হবে তার তা আমি জানি না। আমি বলতে পারব না। পৃথিবীতে প্রেমের ক্ষেত্রে বংশমর্যাদা জাতপাতই সবসময় বাধা হয়েছে তা তোমার জানা উচিৎ। মধুর সেই ঠাকুর্দা মানিকরামের ভালবাসা মর্যাদা পেল না কেন, ওই ধর্মাধর্মের জন্য। হিন্দু মুসলমানের জন্য। ধর্ম না থাকলে তাদের মিলন হতো ঠিক। তা কত সুন্দর হতো হাবলু। ভালবাসাই এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দরকার হাবলু। ভালবাসা ছাড়া তোমার দিদি জীবন কাটাবে কী করে হাবলু? ধর্ম না থাকলে ভালবাসা থাকত হাবলু, দেশ তো ভাগ হত না। টিয়া এই রকম কত কথা ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে ঠিক করল চিঠিটা লিখবে বুলুকে। ঠিকানা এই চিঠিতে রয়েছে, লিখতে অসুবিধে কোথায়?

সে লিখবে, ফণিদা তোমাকে ভালবাসবে বুলুদি, আমার নাম টিয়া, আমি কত বই পড়ি তা তুমি জান না। বই থেকেই শিখতে হয়, জানতে হয় বুলুদি। কত বড় বড় লেখকরা বলে গেছেন কত কথা! ফণিদা সম্পর্কে যা তুমি জেনেছ, কোনোটাই সত্যি নয়। উচ্চবংশ তোমার কী হবে বুলুদি? তোমাকে যে ভালবাসবে সেই তো উচ্চবংশ। উচ্চমানুষ। টিয়া বুক চেপে উপুড় হলো, মাদুরের উপর। তার অঙ্ক খাতার শেষের দিকের পাতা খুলল। কালির কলম নিল হাতে। লিখতে আরম্ভ করল, 'শ্রীচরণেষু বুলুদি, আমাকে তুমি চিনিবে না, আমি কলিকাতায় থাকি। হাবলুদা আর আমি কলিকাতায় এক বাসায় থাকি শ্রীযুক্ত অভিরাম বসু মহাশয়ের আশ্রয়ে। অভিরাম বসু সম্পর্কে আমার মেসোমশায় হইয়া থাকেন। হাবলুদা খুব ভালভাবেই আছেন। আমার মাসি শ্রীমতী প্রভাময়ী দেবী হাবলুদাকে নিজের পুত্রের মতো স্নেহ করিয়া থাকেন। হাবলুদার ভবিষ্যৎ যাহাতে ভাল হয় এবিষয়ে সর্বসময় ভাবিত থাকেন। কলিকাতা শহরে থাকিলে চাকুরির নানাবিধ সুযোগ আসিয়া থাকে। কলিকাতা ব্যতীত অন্য কোথাও জীবনে উন্নতি করা সম্ভব নহে। যখন দেশ ভাগ হয় নাই তখনও কলিকাতায় লোকে আসিত দূরদূরান্ত হইতে। দুই দেশে দুই শহর আছে, কলিকাতা ও ঢাকা, এই দুই শহরে না যাইলে জীবনে বড় হওয়া যায় না। গ্রাম বা মফস্বল শহরে থাকিলে তাহা হইয়া ওঠে না। তুমি কি অপরাজিত পড়িয়াছ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পথের পাঁচালী উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব বলিতে পার। অপু কিন্তু ফিরিয়া যায় নাই নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে। কলিকাতায় ছিল। যদি তাহা না পড়িয়া থাক তবে বলি সিন্ধুর অশ্রু নামের একটি বই পড়িও, তাহাতে দেখিবে কলিকাতায় আসিয়া কী করিয়া চন্দন রায় হইয়া উঠিল লাখপতি। এই সব কথা বলিবার কারণ হাবলুদাকে বীরাঙ্গনা দেব্যা লইয়া যাইতেছেন বসিরহাট। হাবলুদা পাকাপাকি ভাবে বসিরহাট থাকিবেন শুনিতেছি। বীরাঙ্গনাই এই সবের কারণ। কিন্তু কলিকাতায় না থাকিলে হাবলুদা জীবনে প্রকৃত উন্নতি করিতে পারিবে না। তুমি এই ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত দাও, তুমিই তো ইন্ডিয়ায় হাবলুদার অভিভাবক। কলিকাতায় আসিতে বলো। বীরাঙ্গনা হইতে হাবলুদা যেন সরিয়া আসে। বীরঙ্গনা হইতে পারেন কবি মধুসূদনের বংশ কিন্তু তাঁহার শিক্ষা ভাল নয়। তিনি রেবেকার প্রতি মধুকবির অন্যায়কে অন্যায় দ্যাখেন না। হেনরিয়েটা যে মধুর জীবনে আসিয়া তাহদের সংসারকে নষ্ট করিয়া দিল একথা বলিলে বীরাঙ্গনা অসন্তুষ্ট হন। ইহা কত বড় অন্যায় তাহা কে কহিবে? তুমি বলিলে হাবলুদা বিশ্বাস করিবে।' লিখতে লিখতে থামল টিয়া। কী লিখছে সে? এ কথা কি লেখা যায়? কিন্তু কাউকে তো জানান উচিৎ। পরে যদি কিছু হয় তখন তাকে দোষী করবে? আর তার তো দায়িত্বও আছে। সে না বললে কে বলবে? হাবলুকে তার মতো আর কে ভালবাসে, কেউ না। হাবলুর ভালমন্দ তো তাকেই দেখতে হবে। কিন্তু তা বুলুকে জানালেই বা কী হবে? বুলুর কথায় কি হাবলু ফেরত আসবে? বীরাঙ্গনা

কি ছাড়বে হাবলুকে? টিয়া কি জানে না তার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে হাবলুকে বীরাঙ্গনা নিয়ে গেল বসিরহাট। টিয়ার দু'চোখ জ্বলে উঠতে থাকে। ইস, বুড়ির তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখনো কিনা পুরুষলোকের উপর টান যায় নি। বুড়ির নাতির বয়সী, কোথায় বুড়ি চেষ্টা করবে তাদের ভালবাসা যাতে সব বাধা কাটিয়ে উঠতে পারে, সার্থক হয়, তা না করে সরিয়ে নিয়ে গেল! টিয়া দেখে নেবে বুড়িকে। সব জানিয়ে দেবে বুলু মানে মল্লিকা রায়কে। তার মনে হচ্ছে বীরাঙ্গনা দেব্যা ছাড়বে না হাবলুকে। সেদিন রাজার বাড়ি যাওয়াই ঠিক হয় নি তার। বুড়ি সব দেখে ফেলে বুঝে গিয়েছে। সে হাবলুর হাত ধরেছিল। আলিঙ্গন করেছিল। হাবলুর হাত ধরে রাজার বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভালবাসে তো হাত ধরবে না? কেঁপে গিয়েছিল তার সর্ব অঙ্গ। হাবলুও কি কাঁপে নি, কেঁপেছিল। নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ফেরার পথে আর একটাও কথা বলে নি, বলতে পারেনি সেও। সমস্ত শরীর ভার হয়ে ছিল। হাবলুর দিকে তাকাতে পারছিল না। হাত ধরলে এমন হবে যে কে জানত? বুড়ি সব খেয়াল করেছে। তার সঙ্গে আর কোনো কথা বলে নি। কী হিংসা বুড়ির মনে! এত বয়স তোমার বীরাঙ্গনা, তবু মনে হিংসা পুষে রেখেছ। হাবলু কি তোমার, আমার আমার। তুমি পারবে না হাবলুকে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিতে। ভাবতে ভাবতে টিয়া ঘেমে উঠল। ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল বাইরে। টিয়া উঠে জানালা বন্ধ করবে তো ইচ্ছেই করল না। শুয়েই থাকল। কী চিঠি এল, তার কী উত্তর কী লিখল সে, কেন লিখল? আসলে তো বুলু লিখেছে ফণিভূষণের বিরুদ্ধে। এ বিয়েতে তার মন নেই। ফণিভূষণের বয়স পঞ্চাশের উপরে। তাই বলেছে তার জেঠা। আর তার একদম পছন্দ হয়নি পাত্র। এখন এ চিঠি নিয়ে সে কী করবে, কাকে বলবে চিঠির কথা? তা হলে কি সে সব কথা জানিয়ে হাবলুকে লিখবে? হাবলুর কাছে এই চিঠি আর তার চিঠি একসঙ্গে যাক। বুলুকে চিঠি লিখলে কী হবে, বুলু তার জেঠার বাড়ি কেমন আছে তা কি শোনে নি টিয়া? এই চিঠি কেন লিখল সে তা হাবলু জেনে আসুক। টিয়া বুঝতে পারছিল না তার কী করা উচিৎ, পরামর্শ করারও কোনো লোক নেই। হাবলু যদি থাকত এখানে তবে তারা দুজনে মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারত। এপারে হাবলুর আর কে আছে সে ছাড়া, তারই বা কে আছে হাবলু ছাড়া? হাবলুর জন্য কে আর ভাবতে পারে সে ছাড়া? বীরাঙ্গনার কাছ থেকে ওকে সরিয়ে আনা দরকার। টিয়া দেখল বৃষ্টির ছাঁট জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর এসে পড়ছে। ওধারে যে মাদুর পাতা রয়েছে তা ভিজে যাচ্ছে। ভিজুক, টিয়ার আর কিছুই ভাল লাগছে না। তখন খোকন ঢুকল, ইস্কুল থেকে এসেছে সবে। টিয়া চোখ বুঁজল, ঘুমের ভান করে পড়ে থাকল। খোকন এগিয়ে গিয়ে জানলার কপাট বন্ধ করতে করতে ডাক দিল টিয়াকে, ও টিয়াদি, টিয়াদি, তোমার কী ঘুম বাবা, সব যে ভিজে গেল।

টিয়া ধড়ফড় করে উঠে বসল, উঠেই বলল, এই, ফণিদা কবে আসবে বল দেখি, তোর হাবলুদা?

খোকন বলল, তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলে হাবলুদাকে?

এই চুপ কর তো, আমি দেখব কেন, ও আমাকে দেখছে ঠিক, ও খোকন, ফণিদা কিংবা হাবলুবাবুকে দরকার।

খোকন অবাক হয়ে বলল, তোমার কী হয়েছে টিয়াদি, তুমি কি কাঁদছিলে স্বপ্ন দেখতে দেখতে?

বিব্রত টিয়া বলল, তুই খুব পাকা হয়ে যাচ্ছিস খোকন, কেন, কাঁদব কেন, আমার কি চোখে জল?

দেখে মনে হল তাই, তুমি জান না হাবলুদা কবে আসবে, তোমাকে বলে যায় নি?

আমাকে বলে যাবে কেন, এই তুই কী বললি, বল কেন বললি?

বাহ, তোমাকে বলে যাবে না, সবাইকে তো বলে গেল।

কী বলে গেছে?

মা জানে, মাকে জিগেস করো

তুই জানিস নে?

খোকন বলল, জানি, তবে ভুলও তো হতে পারে।

কী জানিস বল আমারে।

তুমি মার কাছে শুনে নিয়ো।

বলবি নে তো?

উদাসীন গলায় খোকন বলল, আমি ভাল করে জানি নে, বললি ভুল হতে পারে।

টিয়া বলল, আসবে কবে বল, খুব দরকার।

দরকার তো চিঠি লেখ। বলল খোকন সদ্য আয়ত্বে আসা নিষ্ঠুরতায়, মার কাছে ঠিকনা পাবে।

টিয়ার চোখ দিয়ে এবার সত্যি জল গড়িয়ে পড়বে। খোকনের কথায় এত মন খারাপ হয়ে গেল। খোকন বড় দয়াহীন, মায়াহীন। খোকন যে এই রকম শোধ নেবে তা কি সে ভেবেছিল? সেদিন নাট্যশালায় নিয়ে যায় নি বলে এত! খোকন চুপ করে টিয়াকে দেখছিল। সেদিন তাকে রেখে গেল কেন তা কি সে বোঝে না? নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, ওটা কার চিঠি?

সাতচল্লিশ

কার চিঠি, না হাবলুদার দিদির চিঠি। হাবলুদাকে তো বীরাঙ্গনা বুড়ি সরিয়ে নিয়ে গেল তার কাছ থেকে, এখন কী হবে? এ চিঠি তো হাবলুর হাতে যাওয়া দরকার। ওর দিদি কী লিখেছে তা শোন খোকন। শুনবে কেন খোকন, পড়ে দেখবে। খোকন টিয়াদিদির কথা শুনতে শুনতে চিঠি খুলে পড়তে আরম্ভ করেছে। খোকন পড়ছে কিন্তু টিয়া তার কথা বলেই যাচ্ছে। বলছে বীরা দিদিমা খুব হিংসুটে, কেন নিয়ে গেল হাবলুকে, কেন তা কি জানে না টিয়া? টিয়ার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে সে। হাবলুদাকে হাবলু বলছে। কেন বলছে, তার চেয়ে কত বড়। বলছে হাবলু তার, বীরা দিদমা পারবে না। কী পারবে না? না, ছিনিয়ে নিতে। হাবলুকে সে ফিরিয়ে আনবেই। ইস! শুনতে শুনতে শিহরিত হচ্ছে খোকন। চিঠিটাও তেমন। ফণিকাকাকে বিয়ে করবে না বলেছে হাবলুর দিদি। এসব বড়দের কথা, কিন্তু শুনতে খুব ইচ্ছে হয়। সে বুঝতে পারছে সব। টিয়াদিদি কেন রেগে আছে তা ধরতে পারছে। টিয়া বলছে, সে একটা চিঠি লিখবে, পোস্ট করে দেয় যেন খোকন। কাকে চিঠি দেবে টিয়াদিদি? সে পরে হবে, খাম দেখলেই তো ধরতে পারবে খোকন। কিন্তু একটা ব্যাপার তার খারাপ লাগছে, ফণিকাকা মানুষটা ভাল, তার বিয়ে হবে না? না করে দিল? তাহলে বীরা দিদিমা করল কী? বীরা দিদিমা তো চুপ করে গেছে। যাবেই তো, আসলে তো হাবলুকে তার কাছ থেকে...।

টিয়া বলল, কী করবে, বুড়ি মধুকবির কেউ হতে পারে বটে, কিন্তু মধুকবি কি ভাল ছিলরে খোকন? মধুকবি যে রেবেকাকে ত্যাগ করেছিল। রেবেকার কথা জানিস? জানিস নে তো। বড় হলে জানবি। তোর এখন বোঝার বয়স হয় নি। তবুও বলি, বুঝতে তো হবে। না বুঝে বা থাকবি কেন সোনা, বলতে বলতে টিয়া খোকনের গলা বেড় দিল। তুই আমার ছোট ভাই সোনা, তোর কাছে ছাড়া কারে বলব বল। রেবেকার কথা বলো তুমি বীরাকে, কিছুতেই দোষ দেখবে না মধুর, ও খোকন তুই শুনছিস?

শুনছে খোকন, শুনতে শুনতে সব বুঝতেও পারছে। ছাড়িয়ে নিল নিজেকে টিয়ার কাছ থেকে। বুক ঢিবঢিব করছিল। আগে তো এমন হয় নি। তুম সরে বসো টিয়াদি, মনে মনে কথাটা বলে নিজেই সরে বসে খোকন। টিয়া তার কথা বলেই যাচ্ছে। তার ভিতরে কতা কথাই না পাথর চাপা হয়ে আছে, সব যেন অবরোধ মুক্ত হয়ে আছড়ে পড়ছে দিনের আলোয়। বলছে যা তা খোকনের কাছে একেবারে নতুন। কেন বলছে টিয়াদিদি? রেবেকাকে ত্যাগ করে মধুকবি যে হেনরিয়েটাকে গ্রহণ করল, তা কি অন্যায় নয়? কিন্তু এ কথা কিছুতেই স্বীকার করবে না বীরাঙ্গনা দিদিমা। কী মনে হয় জানিস খোকন, কুটনি বুড়ি বীরাদিদিমাই ছিল এর মূলে। কী করে হয়, এই এখন যে হাবলুকে সরিয়ে নিয়ে গেল, কেন গেলরে?

খোকন কিছু বলছে না, কিন্তু তার ভিতরে যে ঢেউ উঠেছে। টিয়া বলছে, তোর বিশ্বাস হচ্ছে না জানি, কিন্তু এইটাই সত্যি কথা। এসব তো তোকে জানতে হবে, না জানলে বড় হবি কী করে? আসলে ফণিকাকার সঙ্গে যে বিয়েটা হোক তা-ই চায় নি বীরাদিদিমা। হাবলুকে আমার কাছে থেকে নিয়ে যাবে বলেই এত সব করা।

খোকন বলল, বড়দের নিয়ে এমন বলতে নেই টিয়াদি।

টিয়া থমকে যায়, বিড়বিড়িয়ে বলে, তোর মাথায় কিছুই ঢোকে নি তাই না?

খোকন চুপ করে থাকে। টিয়া বলল, বড় হয়ে সব বুঝবি, অবিশ্যি বোঝার বয়স তোর হয়েছে।

খোকন বলল, দিদমা নিয়ে অমন বলা কি উচিৎ?

উচিৎ যে না তা কি আমি জানি নে, কিন্তু কথাটা কি মিথ্যে, রেবেকার চোখের জল পড়ল, তাতে বুড়ির মনে কোনো দুঃখ নেই, এটা কি ঠিক?

সে কত আগের কথা, তখন কি ছিল দিদমা?

বলছি না ছিল, ছিল, ছিল।

খোকন বলল, মাকে জিজ্ঞেস করি, মা কী বলে শোনো।

মাসিকে, ও মা, তুই কী রে, কথা হচ্ছে আমাদের ভিতর, মাসি কী বলবে, আমাদের কথায় মাসি কেন, মাসি জানে না যেন, বলবি না খবদ্দার।

খোকন বলল, তুমি যে বল দিদিমা নিয়ে ওসব কথা?

টিয়া অবাক, ভয়ও পায়। খোকন কি বড় হয় নি একটুও। ইস, তাহলে তো ভুল হয়ে গেছে। কেন বলতে গেল ওকে? সে একটু দমে গিয়ে বলল, তুই কি কিছুই বুঝিস না খোকন, আমি কী বলেছি, বলেছি যা তা মাসিও মানবে, ওই যে রেবেকা, তার যে অত দুঃখ, সে কথা মানেই না দিদিমা, তার মধুই হল সব, কিন্তু এসব তুই মাসিকে বলবি না, এসব আমাদের কথা, আমাদের কি কথা থাকতে পারে না খোকন?

দিদমা ভাল।

আমি কি খারাপ বলছি, বলছি ওই সময়ে রেবেকার দিকে কেন থাকল না বীরাদিদিমা?

খোকন বলল, তুমি যে কী বলো, দিদিমা তখন কোথায় বলো।

ছিল মনে হয়, আমাদের গাঁয় একটা বুড়ি ছিল, তার বয়সের গাছ-পাথর ছিল না।

গাছ-পাথর মানে?

মানে অনেক বয়েস, একশো, দুশো, তিনশো।

কে বলল?

সবাই জানত, সবাই বলত।

তিনশো বছর মানুষ বাঁচে?

ওই রকম বুড়িরা বাঁচে, না বাঁচলে কী করে এতসব বলবে?

খোকন এত সময়ে টিয়ার কথায় আকর্ষণ বোধ করল। আগের কথাগুলোয় রোমাঞ্চ লাগছিল, নিষিদ্ধ কথা শোনার অনুভূতি জেগে উঠেছিল ভিতরে, কিন্তু সেখানে ওর মনে বসছিল না। সে বলল, দিদমার বয়েস কত?

মধুকবির থেকে দিদিমা বড়।

তাই কি হয়?

হয়, না হলে কী করে অত কথা জানবে?

বাহ, জানবে না কেন, ঠাকুদ্দা তো।

আমি যা বলছি তাই সত্যি, বুড়িরা ওইরকম হয়, তিনশো বছর বেঁচে থাকে, তখন ওদের বয়েস বাড়ে না।

মাকে জিজ্ঞেস করে দেখি। খোকন বলে।

ওফ সেই এক কথা, মাসি কী বলবে, এ তো আমাদের কথা।

আমাদের কথা জানবে না?

মোটেই না, আমরা কি জানি মাসিদের কথা, বুড়ি দিদিমার অনেক বয়স, হাবলুকে বুড়ি নিয়ে গেছে।

খোকন বলল, হাবলুদার জন্যি তোমার মন খারাপ হচ্ছে টিয়াদি?

হ্যাঁ, হচ্ছে তো, কাউকে বলবি না বল।

বলব না, কিন্তু আমি জানি।

কী জানিসরে, কী?

খোকন বলল, তুমি সেই দিন, হাবলুদার গার ঘাম মুছিয়ে দিলে টিয়াদি।

তুই দেখলি, বলিস নি তো, দেখলি কেন?

খোকন বলল, বাহ, চোখে পড়ে গেল যে, আর একদিন তুমি খাইয়ে দিলে টিয়াদি।

ইস, তুই সব দেখেছিস, কী অসভ্য ছেলে তুই। গরগর করে ওঠে টিয়া।

খোকন বলল, আমি কি বুঝি না ভেবেছ।

ওরে আমার সোনা, কী দুষ্ট ছেলে, তুই সব বুঝিস, কাউকে বলবি নে কিন্তু, তোরে আমি ভাল বই কিনে দেব, টার্জান পড়বি, অত জঙ্গলেও টার্জানেরও একজন ছিলরে, সবার একজন থাকতে হয়।

খোকন বলল, আমি তো ছোট টিয়াদি, আমি ওসব জানি না।

বড় হয়ে যাবি খুব তাড়াতাড়ি, তোকে আমি বড় করে দেব।

তোমার কে ছিল?

ছিল আবার কী, আছে, তোকে বলব কেন?

আমি জানি, তুমি হলে হাবলুদার ময়রম, তাইতো।

টিয়া চুপ করে গেল। খোকনও জানে ময়রমের কথা। হাবলু তাকে কি তার মতো মনে করে না। সত্যি তাই। সে কি তাহলে হাবলুর কাছে কেউ নয়? সে ময়রম। কোন ময়রম, যে কিনা কপোতাক্ষ নদের তীরে বসে এক মানিকরামের জন্য কাঁদত। ইস, সেখানে টিয়া কোথায়? হাবলুর ময়রমের কথাও কি টিয়া জানে না, হাবলু কি তাকে বলে নি? তখন মনে হয়েছিল সে ময়রমই হয়ে যাবে যদি হাবলু তার ভালবাসা বুঝতে পারে। এখন তো মনে হচ্ছে তা ঠিক না। খোকনও যদি বলে ময়রমের কথা তবে যে সে কোথাও নেই। তাকে নয়, হাবলু ভালবাসবে ময়রমকে। ইস, কান্না এসে যাচ্ছে যে চোখে। সে তবু বলল, মোটেই না, আমি টিয়া।

টিয়া খোকনকে জড়িয়ে ধরে, তুই বলবি আমি টিয়া, আমি ময়রম না, বলবি তুই সোনা,বলবি, টিয়া তোমারে ভালবাসে হাবলু, খুব ভালবাসে, তোমার জন্যি সে বসে আছে, তুমি ফিরে এস বসিরহাট থেকে।

বলব, তুমি এবার দিদমার কথাটা বলো। খোকন আবার নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় টিয়ার কাছ থেকে। গায়ে কেমন শিহরণ লাগছে। টিয়াদি তাকে জড়ালে আর বুঝি আগের স্বস্তি নেই।

খোকন নিজেই বুঝতে পারছে সে বড় হয়ে গেল প্রায়। আসলে তার ভয় কেটে যাচ্ছে। নিজের মনে হওয়া কথাগুলো বলতে বলতে বলতে নিজের ভিতরটা জেগে উঠছে যেন। তাই তাকে সব জানতে হবে। দিদিমার কথাগুলোও। সে রেবেকা হেনরিয়েটার কথাও শুনবে। টিয়াদি কী হয়েছিল বলো। টিয়া সেই কথা বলতে থাকে, বলতে বলত শোনায় বুড়ির বয়স দেড়শো দুশো, বুড়ির জন্যই মধুকবির জীবনে অত দুঃখ। রেবেকাকে ত্যাগ করল মধুকবি কার আস্কারায়? না, বীরাঙ্গনার। বীরাঙ্গনার জন্যই রেবেকার চোখের জল শুকোল না। তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে অনাথিনী পড়ে থাকল মাদ্রাজে। তখন রেলগাড়ি হয়নি, যেতে হয় জাহাজে, আসতে হয় জাহাজে। আসবে কী করে সে? কিন্তু এল তো হেনরিয়েটা।

খোকন শুনতে শুনতে বলে, তু মি জানলে কী করে?

কেন বলে নি কি বুড়ি দিদমা, সব বুড়ি জানে, সেই থেকে বেঁচে আছে, অত যে বলে মা জাহ্নবী আর রাজনারায়ণ দত্তর কথা, কই বলে না তো মধুর বাবা রাজনারাণ আবার বিয়ে করল কেন।

কে বলল?

কেন বীরাঙ্গনা দিদমা, মাসির সঙ্গে যখন বলছিল আমি শুনেছি, তখন মধুর মা বেঁচে, মাসি যখন বলল, এটা কি ঠিক হয়েছিল, বীরাঙ্গনা বলল, তখন অমন হতো, বহু বিবাহ হতো, খ্রিস্টান হলো মধু, সেই দুঃখে নাকি...তোর আর শুনতে হবে না খোকন, সব তোর শোনার মতো নয়, কিন্তু মা জাহ্নবী কি কাঁদে নি বল, তোর বীরা দিদমা কিছুতেই মধু আর তার বাবার অন্যায় দেখতে পায় না।

খোকন বুঝতে পারে তার টিয়াদিদি অনেক বড় হয়ে গেছে। অনেক। টিয়াদিদি তার মায়ের কথাই বলেছে। সে নিজেও শুনেছে তার মা জিজ্ঞেস করছে এটা কি ভাল হয়েছিল, হয় নি। দিদিমা বলেছিল, তখন ওতে কোন দোষ ছিল না। মধু মাদ্রাজে গেলে মধুর বাবা রাজনারায়ণ তার মাকে বলেছিল, কী বলেছিল? সবটা বুঝতে পারে নি খোকন, কিন্তু তার মা মাথা নেড়ে বলেছিল পুত্র গেল, স্বামীও গেল, কী কপাল মা জাহ্নবীর!

অভাগিনী মা জাহ্নবী! স্বামী তাকে এসে বলে, দেখ, আমাদিগের পুত্রটি তো

আমাদিগকে ছাড়িয়া গেল, তোমার আর সন্তান হইবার আশা নাই, আমাদিগের জলপিণ্ডের উপায় কী হইবে?

জাহ্নবী দাসী বলে, তুমি আবার বিয়ে করো, তোমার মঙ্গলেই আমার মঙ্গল, যদি তোমার পুত্র জন্মে, দুজনেই স্বর্গলাভ করব।

রাজনারায়ণ বিয়ে করল সাগরদাঁড়ি এসে, জাহ্নবী তখন কলকাতার খিদিরপুরে, চিঠি এল জাহ্নবীর কাছে, 'আমি যে কুকার্য করিয়াছি, তাহা তুমি শুনিয়াছ, যদি ইহাতে আমার উপর অসন্তুষ্ট হও, তবে আমার জীবন পরিত্যাগ করা শ্রেয়, পৃথিবীতে দুইটি মাত্র লোকের নিকট আন্তরিক ভালবাসা পাওয়া যায়, এক জননী অপর সহধর্মিনী। আমার জননী স্বর্গে গিয়াছেন, কেবল তোমার জন্যই আমি সংসারশ্রমে রহিয়াছি। যখন শুনিব, তোমার ভালবাসায় আমি বঞ্চিত হইয়াছি, তখনই এই সংসার ত্যাগ করিব...। তোমার জন্য যে একটি সেবিকা আনা হইয়াছে, কাল তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে হইবে।'

খোকন যেন আরব্য রজনীর কাহিনি শুনতে বসেছে এই ফুরিয়ে যাওয়া দিনের আলোয়।

চিঠি হাতে পেয়ে জাহ্নবীর খুব সুখ হল, তাই তো। সুখের আগুনে পুড়তে পুড়তে আঙরা হয়ে গেল জাহ্নবী দাসী। চিঠি হাতে জাহ্নবী খিদিরপুরের বাসায় একা একা বসে জাহাজের ভোঁ শুনল। নগেন ডকঘাটে গিয়ে খোঁজ করে ডেকে আনল এক বুড়ো জাহাজিয়াকে। সেই বুড়ো নগেনের মুখে সব শুনে হাহাকার করতে লাগল। তার জোয়ান বেটা যে বিলেতের জাহাজে গেছে কতদিন! ফেরেই নি। সে নগেনের সঙ্গে এল জাহ্নবীর কাছে, বলল, হপ্তা দুই বাদে তার জাহাজ ছাড়বে, মাদ্রাজ বন্দরে খবর নেবে, তবে আবার ফিরবে কবে, সে বলা যায় না, পরের শীত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সে কেস্তান হল কেন, এডা বড় অন্যায়, ও ছেলের জন্যি কাঁদো কেন?

জাহ্নবী বলেছিল, পেটে ধরেছি, কাঁদব না?

মেদিনীপুরের সেই বুড়ো জাহাজিয়া বলেছিল গুনা হঁইচে ওর, উপরালার কাছে ওরে জবাব দিতে হবে নে মা ঠাইরেন। বলতে বলতে বুড়ো জাহাজিয়া তার পথ দেখেছিল। সব থমথম করছিল। শীতের সন্ধ্যা নেমে আসছিল ধীরে ধীরে। জাহ্নবীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাগরদাঁড়ির নগেন কাঁদছিল বুড়ো জাহাজিয়ার শেষের কথাগুলো শুনে।

মাদ্রাজ গেছে মধু, কতদূর সেই দেশ। অকুল সমুদ্রে ভাসল মধু। কপোতাক্ষয় সেই রাতে মধু নৌকো ভাসালে জাহ্নবী আর থাকতে পারেনি গাঁ-দেশে। এবার শীত পড়েছিল খুব, শীতে সে গায়ে লেপ কাঁথা রাখে নি, তার নাড়ি ছেঁড়া ধন, তার প্রাণের মধু কোথায় কী ভাবে আছে! কিন্তু রাজনারায়ণ বলেছিল, দক্ষিণে মাদ্রাজিদের দেশে শীত পড়ে না,

সেই কথা শুনে জাহ্নবী দাসীর বুক থির হয়েছিল। রাজনারায়ণ তাকে খিদিরপুরে রেখে আবার দেশে গেল জমির চাষাদের কাছে ফসল বুঝে নিতে। গিয়ে আবার বিয়ে করে নিজ কর্তব্য পালন করেছে। নগেন চোখ মুছতে মুছতে বলেছিল, ওরা জাহাজিয়া, সাতঘাটের জল খেয়ে বেড়ায়, ওদের কথার কি মানে আছে মা, মদুদাদার কোনো ক্ষতি হবে না, ওর মতো রামায়ণ মহাভারত কেডা জানে বলো দেখি।

ওদেশে রামায়ণ মহাভারত কেউ জানে? জাহ্নবী কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করে।

নগেন বলবে কী, সে জানেই বা কী? কিন্তু জাহ্নবীই বা কার কাছে খোঁজ নেবে? তার সব জানার সূত্রই তো ছিল তার মধু আর মধুর বাবা রাজনারায়ণ। তারা না থাকলে এই নগেনই ভরসা। গাঁয়ের খবর নগেনের কাছেই পাওয়া যেত। মধু এসে নদীর ধারে তাঁবু ফেলে বসে আছে এ খবর নগেনই এনেছিল। কার মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরত এসেছে বিধবা হয়ে, ঘোড়ায় চড়ে সায়েব দারোগা এসেছিল কোন গাঁয়ে কোন ডাকাত ধরতে সে খবর নগেনই আনত। কোন গাছে বড় চাক হয়েছে মৌমাছির, কোন গাছে ব্রহ্মদত্যি বাস করেন সে খবরও নগেনের। নগেন তার পরিধির বাইরে যাবে কী করে? মাদ্রাজের খবর জানবে কী ভাবে? গাঁ, পাড়াপড়শির বাইরের খবর সে কতদিন আগে মধুর কাছে পেত, আর কে দেবে? কিন্তু তা বললে হবে কেন, নগেন মা জাহ্নবীর কান্না দেখবে কী ভাবে? বলল, আমি খোঁজ আনব মা, তবে শুনেছি সোনার লঙ্কা ওই মাদ্রাজের কাছে, সেতু বন্ধনের সাগর পেরুলিই।

কেডা বলল?

বুড়ো জাহাজি আসগর।

যে এয়েছিল?

না, সে আসে নি, তার বাড়ি বড় গাঙের ওপারে, উলুবেড়ে, বাড়ি গেছে।

তারে তুই ডেকে আন, তার মুখে আমি শোনবো।

তারে তখন পাবে কোথায় নগেন? গাঙ না হয় পার হলো, তারপর? ওপারে গিয়ে কোন গাঁ? নগেন গেল জাহাজঘাটায়। আসগর থাকে কোথায়? কেন কী দরকার? শুনে আর এক মাঝবয়সী মাঝি বলল, ওই বুড়োর ইন্তেকাল হয়ে গেছে, তিনদিন আগে। তবে এটা তো সবাই জানে, ওদেশে রাবণ পুজো হয়। আসলে ওটা রাক্ষসেরই দেশ। শুনে নগেন মনে মনে হায় হায় করতে লাগল। কোথায় গেল মধু কালাপানি পার হয়ে? রাক্ষসের দেশে? সোনার লঙ্কা ছারখার করে দিয়েছিল রাম লক্ষ্মণ, তারপরেও তা থাকে কী করে? সে কী করে বলে এই কথা মা জাহ্নবীকে। মা আরো শোক পাবে।

নগেনের রামায়ণ জ্ঞান মধুর কাছে, মা জাহ্নবীর কাছে, আর গাঁয়ের কথক ঠাকুর পার্বতীচরণ ভট্টর রামায়ণ পাঠের আসরে মা জাহ্নবীর সঙ্গে গিয়ে তা শুনে শুনে। সে ঠিক দুপুরে গিয়েছিল, ফিরতে ফিরতে বিকেল। এমনিতে ভীতু মানুষ, শহরে যা বেরিয়েছে

বাবুর সঙ্গে। লাল পাগড়ি পুলিশ আর সায়েবে তার বড় ভয়। এবং সায়েবে ভক্তিও। মানুষ অত ফর্সা হয় কী করে, কী ভাষায় না কথা বলে। যখন বাংলা বলে অবাক হয়ে শুনতে হয়। মধু যাবে বলেছিল ওই সায়েবের দেশে, গেল কিনা রাক্ষসরাজ রাবণের দেশে। মেঘনাদের দেশে। আহারে!

লঙ্কাপুরী বীরশূন্য হৈল এত দিনে।
মেঘনাদ পড়ে আজি লক্ষ্মণের বাণে।।
দূত মুখে শুনি মেঘনাদের মরণ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন।।
উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে কোথা ইন্দ্রজিত।......

মেঘনাদের মরণ কাহিনি নগেনের যে কতবার শোনা। মধুও তাকে কতবার বলেছে, তার মাকে শুনিয়েছে, নগেনও শুনেছে। সেই মেঘনাদের দেশে গেছে মধু। এ যেন নগেনের আবিষ্কার। তাহলে মধুর ভয় কোথায়, মধু যে মেঘনাদের মৃত্যুর জন্য কাঁদত ছোটবেলায়। ও দেশে মধুর ক্ষতি হবে না মা। ও বড় দুঃখীর দেশ। নগেন মা জাহ্নবীর কাছে বুঝি নতুন কথা বয়ে নিয়ে যায়।

তারপর কী হলো টিয়াদি?

টিয়া তো অবাক। সেও যে বীরাঙ্গনা দাসীর মতো গল্প ফেঁদে বসে আছে। বলবে সব বানিয়ে বানিয়ে? কে শুনবে সেই কাহিনি? তার হাবলু? হাবলু যদি শোনে সে খুব পারবে, পারবে, পারবে। রামায়ণ সেও জানে, মহাভারতও। মা জাহ্নবীর কথা জানে, রেবেকা হতভাগিনীর কথাও। তাদের কথা যে রামায়ণ মহাভারতের মতোই শেষ হইয়াও শেষ হইবে না কখনো।

আটচল্লিশ

পুত্র দূরদেশে। খ্রিস্টান হয়ে হিন্দু সমাজের বাইরে। স্বামী আবার বিয়ে করল, যতই বলুক, লিখুক রাজনারায়ণ, জাহ্নবী কি সুখে ছিল? মরার সময় জল আর মরার পর পিন্ডের নিকুচি করেছে, ওসব অজুহাত? যতই বলুক বীরাঙ্গনা, যতই সাফাই দিক, এও কি হয়, হতে পারে? বুড়ি তখন থেকে ওই কথাই বলে যাচ্ছে। সেই মধুকবির কাল থেকে। স্বামী তখন কিনা জাহ্নবীর পাশে দাঁড়াবে এসে, তা না করে বিয়ে করতে গেল পিন্ডের লোভে। মরার পরে কী হবে পিন্ড? শুনে বুড়ি বলেছিল, তুই মেয়ে যত খারাপ নবেল পড়ে বেশি জেনেছিস, হাবলু ঠিকই বলে, তোর কিছু হবে না, তুই কারে নিয়ে কথা বলছিস, মধু আর তার বাবা, তাঁরা কত বড় মানুষ, ছিহ্, কথা বলতে জানিস নে।

ওকে টান কেন দিদিমা, বলছি দুটো তিনটে বিয়ে কি ভাল, ভাল না বলেই সরকার আইন করে তুলে দিয়েছে।

সেই সময়ে সতীন নিয়ে ঘর করত লোকে, শুনেছি আমার ঠাকুদ্দার তিন বিয়ে ছিল।

ঠিক ছিল না, মধুকবি তো পরের জনকে বিয়েই করে নি, তুমিই বলেছ।

তোর এখনো বয়েস হয় নি এসব নিয়ে কথা বলার। বীরাঙ্গনা রেগে বলেছিল।

খোকনও সেই কথা বলল, তুমি এসব কী বলছ টিয়াদি, এসব বলতে নেই, শুনতে নেই ছোটদের।

কত কাল আর ছোট থাকবিরে খোকন, বড় হবি নে, দ্যাখ, আসল কথা হল মধুর বাবাও খুব নিষ্ঠুর ছিল, যেমন মধু ছিল। বলতে বলতে টিয়া যেন হাসফাস করতে থাকে। বলে, বীরা দিদিমা এসব মানে না, কেন মানে না?

মধুকবির আমল থেকে বেঁচে আছে বীরাঙ্গনা, আদরে আদরে নষ্ট করেছে ওদের, মেয়েরা মেয়েদের বেশি শত্রু, তখন থেকে সব ভালবাসাকে শেষ করেছে বুড়ি, বলতে বলতে যেন হিসহিস করছে টিয়া। হাবলুকে নিয়ে যেতে সে ধরতে পেরেছে বীরাঙ্গনার উদ্দেশ্য। এই বুড়িরা এমন হয়, নিজের যৌবন গেছে বলে কোনো যৌবনকেই সহ্য করতে পারে না। তার ভালবাসাই যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে তাও জানে সে, কিন্তু এখন তো কষ্ট হবে। ভালবাসায় এ কষ্ট সহ্য করতে হবে।

খোকন বলে, এ হয় না টিয়াদি, অতবছর মানুষ বেঁচে থাকে না, থাকে নি।

তুই জানিস নে, না থাকলেও থাকে, তুমি বীরা বলো কখনো মধুর বাবার অন্যায়ের কথা, রেবেকার দুঃখের কথা? বুড়ি বলবে না ওটা ঠিক হয় নি, ভালবাসা বোঝে না বুড়ি, বোঝে না বলেই সরিয়ে নিয়ে গেল হাবলুকে, যেমন নিয়ে গিয়েছিল মধুকে রেবেকার কাছ থেকে, সায়েব বাড়ির মেয়ে হয়েও কালো মানুষ মধুকে ভালবেসেই তো বিয়ে করল সে।

খোকন বলল, কী করব টিয়াদি, আমি বুঝতে পারছি টিয়াদি তোমার কথা, আমার ভয় করছে।

টিয়া বলল, আমার হাবলুকে আমি ছাড়ব না, কিছুতেই না।

খোকন চুপ করে থাকে। টিয়া গরগর করতে থাকে। খোকনের হাত ধরল, বলল, বসিরহাট থেকে যদি ওপারে চলে যায় হাবলুদা, কী হবে খোকন, ঘোজাডাঙা—ভোমরা বডার তো সামনে।

খোকন বলল, যাবে না, দিদিমা যেতে দেবে না।

তুই বলছিস বটে, কিন্তু আমাদের যাতে দেখা না হয় তাই চায় বুড়ি, আমার উপর খুব রাগ বীরা দিদিমার, আমি যে ওর কথা মানি নে, বলি যে মধু আর তারা বাবা ন্যায় করে নি, কষ্ট দিয়েছে রেবেকা আর মা জাহ্নবীকে।

শুনতে আমার ভয় করে টিয়াদি।

এত ভয় ভয় করিস, তুই না পুরুষ লোক, জানবি নে সব।

তুমি বলো টিয়াদি।

শোন, হাবলু কি যাবে ওপারে?

হাবলুদা নিজেই যাবে না।

যদি যায় তখন?

খোকন বলল, গেলে ঠিক করবে না, পাকিস্তান মানে না হাবলুদা।

হুঁ, জেলে ঢুকোয় দেবে বলেছিল না ওর বন্ধু কলিম?

ভয় নেই ওর পক্ষেও লোক আছে।

আচ্ছা খোকন, ওই আশাশুনি থেকে উতুলি কতদূর?

জানি নে, তবে কাছেই মনে হয়, একটা মাঠ পার হতি হয়।

গাঙ পার হতি হয় না?

না মনে হয়।

তা'লি তো যাওয়া সোজা।

মাঠ দিয়েই তো যেত হাবলুদা।

বিমর্ষতা এল টিয়ার মুখে, বলল, মাঠ যদি খুব বড় হয় তাতে ভয় আছে, কতরকম বাতাস বয় মাঠে তা জানিস?

খোকন বলল, ওই মাঠে খুব হাওয়া, একবার ঝড়ে পড়ে গিয়েছিল হাবলুদা।

হ্যাঁ শুনেছি, আমারে বলেছিল, একা একা মাঠ পার হওয়াই খুব ভয়ের, আমি তো ওরে বারণ করেছি খোকন, যদি না শোনে আমার কিছু করার নেই।

খোকন বলল, সে তো ওপারে গেলি হবে, গেছে কিনা কে জানে।

ও ঠিক গেছে খোকন, বুড়ি আমারে দেখতি পারে না, তাই ওরে ঠিক ওপারে পাঠায় দেছে।

বেলাকে এখন খুব কড়াক্কড়ি, যাবে না।

যাবে না তো থাকবে কোথায়, জেঠার বাড়ি যাবে না, পিসির বাড়ি যাবে না, বীরা দিদিমার বাড়ি কি তার ছেলে রাখবে, ছেলের সঙ্গে বনে না তো বীরাবুড়িরই, তো বাইরের লোক, মেসোর মতো লোক কি সবাই?

খোকনের মনে হল কথাটা বেঠিক নয়। ঠিকই বলছে টিয়াদি। তার মানে হাবলুদা পাকিস্তানে। এখান থেকে সরিয়ে পাকিস্তানে পার করে দিয়েছে বীরা দিদিমা। ইস, তাহলে তো খুব খারাপ হয়েছে। এপারে এই বাড়ি ছাড়া আর কোনো থাকার জায়গা নেই হাবলুদার। জেঠার বাড়ি থেকে পালিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এ বাড়ি এসেছিল। তার বাবাকে মামা বলে, হাবলুদার মামার বাড়ি ওপারে তাদের গাঁয়ে। খোকনের চোখ ছলছল করতে লাগল। এপারে জায়গা হল না, তাই হাবলুদা ওপারে চলে গেল। জায়গা কি হয় নি, কেউ কি বলেছে চলে যেতে? এ তো বীরাঙ্গনা দিদিমার করা। ওপারে গেলে আর যদি না আসে হাবলুদা? যদি কলিম তাকে ঢুকিয়ে দেয় জেলে। হাবলুদা তো এখন ইন্ডিয়ান।

টিয়া বলল, ঠিক ময়রমের বাড়ি যাবে হাবলু, ময়রমই ওকে খেয়েছে, কিন্তু হাবলু বোঝে না ওরা পাকিস্তানি, ওদের সঙ্গে কি ভালবাসা হতে পারে, দেশ ভাগ হয়ে ভালবাসা কি আগের মতো থাকবে?

ময়রমদিদি ওরে খুব ভালবাসে।

রাখ তোর ভালবাসা, বাসলেই হবে, হিন্দু মুসলমানে ভালবাসা হয়?

অজেত আলির বাপ মা খুব ভালবাসে হাবলুদারে।

বাসতেই পারে না, তাহলে পাকিস্তান হলো কেন, ওপার থেকে রিফুজি এল কেন, ওটা অন্য দেশ।

দেখ টিয়াদি, এ র'ম কি হয় না, তুমি যে এত বই পড়ো, তাতে কি এমন হয় নি?

টিয়া চুপ করে থাকে। কথাটা কি সে ঠিক বলছে, কথাটা কি সত্যি? এই যে সে চিঠি লিখবে ভাবছিল বুলুদিকে, কী লেখার কথা ভেবেছিল? তাতে জাত-বেজাতের বিরুদ্ধে কথা কি থাকবে না? তাহলে হাবলুকে যদি ময়রম ভালবাসে, বাসতেই পারে। কিন্তু তাতে যে তার বুক ভেঙে যাবে। এখনই যে তা হচ্ছে। কিন্তু কথাটা কি মিথ্যে, হিন্দু মুসলমানে ভালবাসা হলেও তার কোনো পরিণতি বোধহয় নেই। নেই কেন আছে, তা হলো হিন্দুস্থান-পাকিস্তান ভাগাভাগি, দাঙ্গা, রক্তপাত...তাকে এপারে পাঠানো হয়েছে ভয়ে। গোলমালে মেয়েদের উপর রোষ পড়ে বেশি। কত রকম খবর না আসত, ঘর থেকে টেনে নিয়ে যাবে গুণ্ডারা। দেশ ভাগ হয়ে তাদেরই দিন এসেছে। ভাগাভাগিতে তাদেরই সুবিধে বেশি। হাবলু তারা যদি শোনে তুমি ময়রমকে ভালবাস, তোমাকে খুন করে ফেলবে। তুমি আমার কাছে ফিরে এস হাবলু। পার্টিশন রদ করতে পারবে না তুমি। ও হয় না। ময়রম বলে কাউকে ভালবাসাও যায় না। আই লাভ ইউ হাবলু, তুমি ওপারে যেয়ো না। দেশ আলাদা হলে আর এপার ওপারে ভালবাসা হয় না। টিয়ার চোখে জল এসে যাচ্ছে। সে কোনো রকম বলল, আমার মা বাবাও যদি দেখত হাবলুকে, ভালবাসত।

তাহলে এখন কী করার? খোকন জিজ্ঞেস করল।

বুড়ি আমার ক্ষতি করতে গিয়ে হাবলুর ও ক্ষতি করে দিল, কেন পাকিস্তান পাঠাবে?

খোকন চুপ করে গেল। টিয়াদিদির কথা কখনো সত্যি মনে হচ্ছে, কখনো মনে হচ্ছে এ হতে পারে না। বীরাঙ্গনা দিদিমা ক্ষতি করতে পারে না হাবলুদার। বীরাঙ্গনা দিদিমা কখনোই হাবলুদাকে পাকিস্তানে যেতে দেবে না। হাবলুদাকে খুব ভালবাসে যে বীরা দিদিমা। মধুসূদন সম্পর্কে যা বলছে টিয়াদিদি তাও ঠিক না। কতবড় কবি, মহাকবি। বাল্মিকীর রামায়ণ নাকি নতুন করে লিখেছে প্রায়। বীরাঙ্গনা তো তাই বলেছে। বাবাও তাই বলে। টিয়াদিদি জানে না কিছুই। ওই জন্য হাবলুদা বলে নবেল পড়া ভাল না। ওই সব পড়ে পড়ে টিয়াদিদি এই সব বলছে। সে বলল, তুমি মেঘনাদের কথা জান, পড়েছ।

টিয়া বলল, তুই জানিস না তো।

শুনেছি।

টিয়া বলল, মধুকবির মেঘনাদ বধ আমার ভাল লাগে না, পড়া খুব শক্ত।

তুমি এত বই পড়, ওটা পড় নি কেন?

টিয়া বলল, আমার ইচ্ছে করে নি।

হাবলুদা এই জন্য বলে তোমার নবেল পড়া ঠিক না।

মোটেই না, সে আগে বলত, পরে আমি বুঝাতে হাবলু আমার কাছ থেকে দেবদাস নিয়ে পড়বে বলেছে। খোকনের মন হয় কথাটা সত্যি না। কিন্তু সে বলল না তা। বলল, পাকিস্তানে গেল কিনা মাকে জিজ্ঞেস করে আসি, মা তো জানবে, মাকে প্রণাম করল তো যাওয়ার সময়।

কই আগে বলিস নি তো, আমি তো জানি নে।

তুমি তখন ইস্কুলে।

চুপ করে গেল টিয়া। একটু দমে গেল মনে হয়। বোঝে তার অনুমান সঠিক। দেশে গেল বলেই প্রণাম করে গেছে হাবলু। তাহলে সব ঠিক ছিল। বীরাঙ্গনা তাকে ওপারেই পাঠিয়ে দিয়েছে। যে দিন তারা গেল রাজার বাড়ি—নাট্যশালা দেখতে, তার একদিন বাদেই। হায় হায় হায়, কী ভুল করেছিল সে, কেন ইস্কুল গেল সেদিন? বীরাঙ্গনাকে সন্দেহ করা উচিত ছিল তার। বীরাঙ্গনাকে চোখে চোখে রাখা দরকার ছিল। কিন্তু কী করে জানবে বুড়ি তলে তলে এই কাজ করবে। সে ভাবে নি কেন বীরাবুড়িকে নিয়ে? বুড়ি হাবলুকে ছাড়েই না। রাতে তাকে নিয়ে শোবে, কেন শোবে? এটা মাসির চোখে পড়ে না। হাবলু কি কচি ছেলে যে ওঁর কাছে শোবে। বুড়ি কি মেয়েমানুষ নয়? সে হাবলুকে বারণ করেছিল, হাবলুর তো বুদ্ধি নেই, বোঝার ক্ষমতা নেই। বুড়ি যে তাকে গ্রাস করছে তা ধরিয়ে দিলেও কি বুঝবে না? বুড়ির এই স্বভাবের জন্য ওর ছেলে ওকে দেখতে পারে না মনে হয়। টিয়ার মনে হল কাঁদে, খুব কাঁদে, কেঁদে সবাইকে বুঝিয়ে দেয় যে সে হাবলুকে কত ভালবাসে। হাবলুর সব্বোনাশ করে দেবে বুড়ি। মধুকবি আর তার বাবার নিন্দা করেছে সে তাই বুড়ি তাকে শাস্তি দিল। মনে হয় বুড়িও পার হয়ে যাবে বর্ডার। বুড়ি হাবলুকে নিয়ে সাগরদাঁড়ি চলে যাবে। সাগরদাঁড়িতে রেখে দেবে হাবলুকে। টিয়া মনে মনে অশান্ত হয়ে ওঠে। হায়, সাগরদাঁড়ি এখন জনশূন্য, রাজনারায়ণ দত্ত, দত্ত বংশের কেউ নেই ওপারে। কপোতাক্ষ তীরে সেই রাজার বাড়ি পড়ে আছে একা একা। এই কথাই না বলেছিল বীরাঙ্গনা রাজা ঈশ্বর সিংহর বাড়ি, নাট্যশালা থেকে ফিরতে ফিরতে। বলেছিল না ওই রকম ঝোঁপ জঙ্গল হয়ে আছে হয়ত সাগরদাঁড়ির দত্ত বাড়ি। কোনদিন না ওকে কপোতাক্ষ খেয়ে নেয়। কপোতাক্ষ বর্ষায় নাকি ভীষণ হয়ে ওঠে। যাক, কপোতাক্ষর গর্ভে যাক দত্ত বাড়ি, কপোতাক্ষ তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিক। এমনি কি হয় না? কত রাজবাড়ি, রাজার প্রাসাদ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কোন

বই-এ এমনই পড়েছে টিয়া। হাবলু তার কাছে ফিরে আসুক। বীরা বুড়ি সাগরদাঁড়িতে চলে যাক। থাকুক পাকিস্তানে। তার হাবলু—অমিতাভ ইন্ডিয়ান। ভাবতে ভাবতে টিয়ার মনে পড়ল, তার ঠাকুমা তাকে একটা গল্প বলেছিল। কোন গাঁর একটা বুড়ি ছিল, তার কাজ ছিল ছেলে মেয়ে ধরে নিয়ে দূর কোন নদীর ধারের এক বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখে দেওয়া। বুড়ি কত ছেলে মেয়েকে না সেই বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল, ঘুমো টিয়ে ঘুমো, কাঞ্চন বুড়ি এসে যাবে। সেই বুড়িই যেন সাগরদাঁড়ির শূন্য দালানে বসে আছে চুরি করা ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে। সেখানেই যাবে বুড়ি বীরাঙ্গনা। থাক হাবলু এখেনে, তোর জন্য থাকল সব। এই বাড়ি, জমিজমা, গাছগাছালি, ফলপাকুড়, সব। থাক, বাড়িটাকে দেখাশুনো কর, এসব তোর। আর ভয় পাবি নে, কেউ যদি এসে বলে তুমি কে, বলবি বীরাবুড়ি জানে আমি কে, আমি এ বাড়ির লোক।

হাবলু তো জানবে না যে এল সে কে? সে আসলে ওই বাড়িতেই থাকে। সে কে হবে, মা জাহ্নবী? বিদায় ঘাটে যায় আর আসে। বড় শোক নিয়ে গেছে মা জাহ্নবী। মধু তখন কালাপানির ওপারে মাদ্রাজে। হাবলু হাবলু তুমি শুনো কী বলে জাহ্নবী মা। বলবে, আমি জীবনে মরিয়া আছি, জ্বলন্ত শোকের আগুন আমাকে কয়লা করিয়া ফেলিয়াছে, আমি মরিয়াই বাঁচিব, কিন্তু আমরা বাছা যে সাত সমুদ্রের পারে রহিয়াছে, তাহার মুখখানি না দেখিয়া আমার মরিতে ইচ্ছে করে না।

বীরা বুড়ি সব জানে। জেনেও নিয়ে গেল হাবলুকে। সাগরদাঁড়িতে রাখতে গেল। ও বাড়ি মা জাহ্নবীর শোকের ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আছে। ও বাড়ি মা জাহ্নবীর কান্না ধরে আছে বুঝি। মধু মাদ্রাজ যাওয়ার পর যত বার জাহ্নবী গাঁয়ে ফিরেছে, কপোতাক্ষর ধারে গিয়ে বসে থেকেছে। যে ঘাট থেকে মধুর নৌকো ছেড়েছিল সেই ঘাটেই যেন ফিরবে মধু। টিয়ার মনে জঙ্গল ভরা নাট্যশালা—রাজার বাড়ি আর সাগরদাঁড়ির দত্তবাড়ি এক হয়ে যায়। মনে হয় হাবলুও বসে আছে কপোতাক্ষ তীরে বিদায় ঘাটে।

কোথায় যাচ্ছে বলে নি সেদিন? টিয়া জিজ্ঞেস করে।

বলেছিল কি না মা জানে।

মাথা নাড়তে লাগল টিয়া, বলল, যাবে কেন, অন্য দেশ, রায়েট হতে পারে।

হাবলুদার কিছু হবে না, বলছিল তো যাবে। খোকন বলে।

আমি বারণ করাতে বলেছিল যাবে না, গেলে তো সেই ময়রম আর সেই উতুলি!

কিন্তু ময়রমকে কি মেনে নেবে বীরাঙ্গনা? হয়ত নেবে। টিয়াকে জব্দ করতে ময়রম। ময়রম কি শুনেছে মধুকবির কথা, রেবেকা আর মা জাহ্নবী কথা? শোনে নি, তার সঙ্গে দেখা হয় নি তো বীরাঙ্গনার। বীরাঙ্গনার রাগ নেই তার উপর। বরং টিয়ার উপর শোধ নিতে ময়রমের কাছেই পাঠাতে পারে বুড়ি বীরাঙ্গনা। কত রকম ভাবে টিয়া। ভেবে আকুল হয়। কোনো সিদ্ধান্তেই আসতে পারে না। তার তখন রাগ হয় যেন মধুকবির

উপর। বড় বড় লোকের এ রকম নাকি হয়। তাদের কোনো দোষ হয় না, কথাটা তার সহপাঠিনীর। মধু না হয় বড় হল, রাজনারায়ণ কি বড়?

তাদের কথাবার্তা থেমে গেল প্রভাময়ী ঘরে ঢোকায়। শুধু প্রভাময়ী কেন, এসেছে যে ফণিভূষণও। বেলা পড়ে সন্ধে হয়ে এসেছে। কত সময় টিয়া আর খোকন কথা বলছিল তা খেয়ালই করে নি কেউ। ফণিভূষণ আজ একটু আগেই এসেছে তার কাজ থেকে। মন ভাল নেই। কাজে ইদানীং মনও বসছে না। সে এসেছে খবর নিতে। বীরাঙ্গনা নেই, হাবলুও নেই, তবে কার কাছে কী খবর পাবে? চলেই যাচ্ছিল কিন্তু প্রভা আটকেছে। বলেছে, ওই ছেলেপুলেদের সঙ্গেই তো বেশি মেলামেশা বীরামাসির, তারা বলতে পারবে।

মা চলে যেতেই খোকন বড়দের মতো বলে উঠল, এই যে চিঠি এসেছে বনগাঁ থেকে, এই যে।

হা হা করেও আঁটকাতে পারল না টিয়া। ফণিভূষণের হাতে পৌঁছে গেল বনগ্রামের চিঠি। ফণিভূষণ কাঁপা কাঁপা হাতে চোখের সামনে মেলে ধরল পত্রখানি। তার দু'চোখ খুব শান্ত হয়ে যেতে লাগল চিঠি পড়তে পড়তে। মুখ তুলে বলল, তোরা পড়েছিস তো?

টিয়া মাথা নামায়। খোকন একটা উজবুক, বড় হয় নি, না হলে ওই চিঠি ফণিকাকার হাতে দেয়! ফণিভূষণ বলল, পড়েছিস ভাল করেছিস, আমি ওপারেই চলে যাব, এদেশ কলকাতা আমার ভাল লাগছে না, উঠি।

চিঠিটা অবহেলায় ফেলে দিয়ে গম্ভীর ফণিভূষণ মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল। প্রভাময়ীকে বলেও গেল না। টিয়া দু'হাঁটুর ভিতরে মাথা গুঁজে হুহু কান্নায় ভেঙে পড়ল। কার জন্য তার কান্না কে বলবে? ওপারে মা বাবা ভাই বোন, তাদের জন্য? নাকি ব্যর্থ, অপমানিত ফণিভূষণের জন্য, নাকি তার হাবলুর জন্য? দেশ কেন ভাগাভাগি হল, সেই জন্য টিয়া কাঁদছে না, কাঁদবে না। কাঁদবে হাবলু আর ফণিকাকা, অচেনা বুলুদিদি আর তার বাপ মার জন্য। নাকি নিজের অজান্তেই সে কাঁদছে জাহ্নবী, মধু, রেবেকা আর হেনরিয়েটার জন্যও। জীবন শুধু দুঃখে ভরা। জীবন রয়েছে কপোতাক্ষ তীরে বিদায় ঘাটে। টিয়ার সামনে বুঝি ফুটে উঠতে থাকে কপোতাক্ষর অন্ধকার।

উনপঞ্চাশ

বীরাঙ্গনা আর হাবলু বেরিয়েছিল। শ্রাবণের প্রায় শেষ, বর্ষা এবার তেমন হয় নি এখনো। সেই যে দিনভর উপুরঝুপুর বর্ষা ছিল তা গেল কোথায়? কাগজে দিয়েছিল এবার দেরিতে আসবে বর্ষা, কিন্তু তা কত দেরি তা বলবে কে? বীরাঙ্গনা ঠিকই করে ফেলেছিল হাবলু যে বলছে যাবে ওপারে, যাক। মা বাবাকে বলে আসুক ফণির কথা, মা কী বলে শুনে বনগাঁ থেকে নিয়ে এসে শাঁখা সিঁদুরে ফণির সঙ্গে চার হাত এক করে

দেওয়া যাবে। হাবলুও চায় একটা কিছু হোক, কতবার বনগাঁ যাবে, গিয়ে তো একই কথা শুনবে। জেঠি চায় না যখন, জেঠার কিছু করার নেই। অবনীদার বিয়ের পরও কি জেঠি রাজি হবে? বিনি পয়সার এমন ঝি আর কোথায় পাবে?

রাস্তায় বেরিয়ে বীরাঙ্গনা বলল, আজ তো পার হতি পারবিনে, কাল বা পরশু যাবি না হয় আশাশুনি, একটা কাজ করলি হয়, যাবি দেখতি?

কী দেখতি বল দেখি।

যেখেনে মধু ঘুমোয় আছে।

কবরথান?

হ্যাঁ, কলকাতায় এত ঘুরে ঘুরে আসি, মধু কোথায় শুয়ে আছে তা দেখি নি, চ, মধুরে দেখে তারপর বিকেলে বসিরহাট যাব, এতদিন দেখি নি কেন তাই বড় আশচয্যি, সে তো দেখছে কে এল কে এল না।

যাওয়া হবে কী করে, তা জানে বীরঙ্গনা। জিজ্ঞেস করে নিয়েছিল অভিরামের কাছে। পার্ক স্ট্রিটের কবরখানা যাওয়ার সরাসরি কোনো বাস নেই এদিক থেকে, তবে শিয়ালদা পেরিয়ে মৌলালি পৌঁছে আধ ঘণ্টা হাঁটলে যাওয়া যেতে পারে সেই কবরস্থানে। ফুটপাথের উপর শ্বেত পাথরে খোদাই করা আছে, দাঁড়াও পথিক-বর, জন্ম যদি তব বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল!..., সমাধিলিপি দেখতে পেলেই বুঝে যাবে এসে গেছে মধুকবির শেষ আশ্রয়ে, ওই সাড়ে তিন হাত জমির জন্য কী না হয়েছিল তাঁকে নিয়ে। সে কথা বীরাঙ্গনা শুধু জানে না, জানে হাবলুও। তাকে সব বলেছে বীরাঙ্গনা। যত শুনেছে হাবলু, ততই বীরাঙ্গনার অনুরাগী হয়েছে। তাই হাবলু না করল না। বলল, যাব, দেখি আসি, উতুলি, আশাশুনি গে বলতি পারব তো।

বলবি, সেই যে মোছলমানের মেয়ে, তারে শুনাস।

হাবলু বলল, সে তো এপারেও বসে আছে, এই টিয়া।

বুড়ি হাসতে গিয়েও গম্ভীর হল, বলল, ও ছুঁড়িটা ভাল না, বড্ড টিকটিক করে, যেন সব বুঝে বসে আছে, পেকেছে বেশি।

না দিদমা, ও দিদির বিয়ের খরচ বিশ টাকা দেবে বলেছিল, বলেছিল আমার দিদি ওরও দিদি।

নিস নি তো?

না নিই নি, বিয়ে কবে হবে ঠিক নেই।

না নিবি নে, ওর পিকিতি ভাল না, শোন হাবলু, তোর ঘাড়ে ক'ডা বুন তা মনে রাখবি সব সময়।

হাবলু চুপ করে থাকে। দিদিমা যে টিয়াকে দেখতে পারে না তা হাবলু জানে, বোঝে। কেন পারে না তাও জানে। হুঁ, মধু আর তার বাবার পক্ষে কথা বলে না মেয়েটা। ময়রম ওই রকম হয়। ময়রম কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, হিন্দুস্থান পাকিস্তান মানি নে হাবলুদা, তুমি উতুলি থেকি যাও, তুমার মা বাপ ভাই বুন সবেরে নি এস, এখেনে কিছু হবে না, এখেনে আমরা হিন্দুস্থান পাকিস্তান হতি দেব না।

হাবলু জিজ্ঞেস করে, এমন কি হতি পারে দিদমা?

তারা বাস স্ট্যান্ডে এসে পৌঁছেছে। বাস এলে আবার যাবে, স্ট্যান্ডে বাস নেই। বড় বাড়ির বারান্দায় বসল দুজনে। সামনে কোণাকুণি বড় ঝিল পুকুর। পুকুরের মধ্যিখানে দ্বীপ। দ্বীপে গাছগাছালি ভর্তি। পাখি কত! বিকেলে সন্ধেয় কত পাখি ফিরে আসে ওই দ্বীপে। ভোরবেলায় দেখা যায় বকেরা সব উড়াল দিচ্ছে আকাশে। বীরাঙ্গনা বলল, তা কী করে হবে, ওরকম হতি পারে না।

হাবলু বলল, কেন হবে না, ধরো গে, ওই উতুলির কেউ হিন্দুস্থান পাকিস্তান মানে না।

না মানতি পারে, কিন্তু ওডা যে পাকিস্তান তা তো মানতি হবে।

হাবলুর মাথায় হিন্দুস্থান পাকিস্তান নিয়ে ময়রমের কথাটা এখনই মনে পড়ে গেল। কখন যে কী মনে পড়ে! সেই কবে কাঁদতে কাঁদতে কথাটা বলেছিল ময়রম, তখন ও কথার কোনো মানে ছিল না হাবলুর কাছে, উড়ে গিয়েছিল মাথা থেকে। এখন মনে হচ্ছে কথাটার একটা মানে ছিল, কথাটা সত্যি করে নেওয়া যেতে পারে। কী করে, না ওই দ্বীপের মতো করে। সে বলল, উতুলির কেউ বলবে না ওডা পাকিস্তান বা হিন্দুস্থান, ওডা শুধু উতুলি।

তা হয় না হাবলু, আলাদা হয়ে থাকা যায় না।

হাবলু বলল, কেন হবে না, উতুলি তার মতো থাকবে, ওই দ্বীপের মতন।

বীরাঙ্গনা বলল, যখন মিলিটারি ঢোকবে, তখন?

হাবলু বলল, খানা কেটে আলাদা করে দেব উতুলি।

বুড়ি হাসল, ও সব হয় না হাবলু, হয় না, ওদেশে পাকিস্তানি টাকা, পাকিস্তানি পুলিশ, হতি পারে না ওসব, তুই ওসব বলবি নে ওপারে গিয়ে, তোরে নে আমার খুব ভাবনা হাবলু, এই জন্যি তোরে ছাড়তি খুব ভয় করে।

হাবলু কী বুঝল তা সেই জানে। তার মাথায় ঘুরছে যখন কথাটা ঘুরতে থাকবে। দ্বীপের মতো আলাদা করে দেবে উতুলি আর ময়রমদের। মা বাবা ভাই বোন সেখানে থাকবে। হতে পারে, পারেই। অবরোধ হবে হিন্দুস্থান পাকিস্তান থেকে। বাস এসে গেল। তেত্রিশ নম্বর, লাল রঙের দোতলা। খাঁকি পোশাকের কন্ডাক্টরকে বীরাঙ্গনা তার যাত্রাপথ বলতে সে ডাকল, এস বুড়ি মা, নামিয়ে দেব ঠিক জায়গায়। দোতলার সামনের সিটে বসল দুজনে। বুড়ি বলল, আলাদা হওয়া খুব কঠিন হাবলু, অনেক দাম দিতি হয়, মধুকবি আলাদা হতি গে মরণের পর শুয়ে থাকার জায়গা পাচ্ছিল না, তারে হিন্দু কেস্তান সবাই ত্যাগ করেছিল, শেষের কডা দিন কী কষ্টে গিছিল তাঁর।

বুড়ি আবার বলল, স্বর্গ নরক এক সঙ্গেই থাকেরে হাবলু, জগৎ হল সেই রকম, এক জগতে দুটোই রয়েছে।

কেডা বলল?

কেডা আবার বলবে, আমার তা মনে হয়, দ্যাখ হাবলু এক মানষের ভিতরেও তো দুরকম আছে, আমি এমন লোক দেখিছি যার মতন দয়ালু হয় না, আবার রাগলি সে চণ্ডাল, মারতি মারতি মেরেই ফেলে দিল ছোট ভাইডারে।

হাবলু চুপ। তার মনে পড়ছিল দিদিমার মুখে শোনা মধুর বিদেশ যাত্রার কথা। কলকাতা কেন সায়েবের দেশও মধুর জন্য নরকের দুয়ার খুলে রেখেছিল। বীরাঙ্গনা গুনগুন করছিল, প্রবাসে দৈবের বশে, জীবতারা যদি খসে এ দেহ আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে...। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর না বাঁচালে বিদেশের জেলখানায় পড়ে থেকে মরতে হত মধুকে। ঋণের বোঝা এতই হয়ে উঠেছিল। বুড়ি বলে ফরাসি দেশের কথা, দুটো বাচ্চা নিয়ে মধু, হেনরিয়েটা তখন উপোস করছে। কোলের শিশু কাঁদছে খিদেয়। সেইসব দিনের কথা টিয়া জানে না। টিয়াকে ডাকার কথায় দিদিমা না করেছিল, ও আবার শোনবে কী, ও জানে শুধু রেবেকা, আরে, তুই তোর সোয়ামীকে বাঁধতে পারিস নি বলে সব দোষ মধুর হবে, মধু ছিল কবি, কবির বউ হওয়া কি সোজা কথারে হাবলু, তুই তো এখন বড় হয়ে গিছিস, তোরে বলতি বাঁধা নেই, তুই এখন দেখেশুনে চলবি, তোর উপর নজর আছে, মেয়েমানুষ হল অমাবস্যে পুন্নিমের মতো, ভাল তো ভাল, না হলি তোরে নষ্ট করি দেবে, অন্ধকার।

বিদ্যাসাগর টাকা পাঠালে তবে মধু বেঁচেছিল। কিন্তু সে ছিল ফরাসি দেশে, ওদেশে এমন দুঃখী মানুষের দুঃখে কষ্ট পাওয়ার মানুষ ছিল। দাতব্য প্রতিষ্ঠান তার ঘরের দরজায় রেখে যেত বাচ্চার দুধ, কবি আর কবি জায়ার জন্য খাবার। এক ফরাসি দয়াবতী মধুকে সাহায্য করত। শুনতে শুনতে হাবলু বলেছিল, তোমার মতো দয়া ছিল তার মনে। শুনে বীরাঙ্গনা বলেছিল, মেয়েরা তো মায়ের জাত, তাদের ভিতরে দয়ামায়া থাকে, ওদেশে মেয়েরা কত স্বাধীন, দয়ামায়া দেখাতে পারে, আমার দেশে কী করে দেখাবে, টাকা সব পুরুষমানুষের হাতে।

কথাটা হাবলুর ভাল লেগেছিল। তার মনে হয়েছিল শুধু দিদিমা কেন, টিয়াও দয়াবতী। দয়াবতী বলেই হাতখরচের টাকা দিদির বিয়েতে দেবে বলেছিল। কিন্তু বনগাঁর বড় জেঠি কেন অমন? শুধু অবনী আর অবনী, নিজের ছেলে ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই যেন। সবাই হাবলু। অবনী তাকে চোরের মার মারল, জেঠি দেখতে দেখতে বলতে লাগল, মার, শাসন কর, হাতপা ভেঙে ফেলে রেখে দে। হাবলু এসব কথা বীরাঙ্গনাকে বলে নি। বীরাঙ্গনা টিয়ার উপর খুব রেগে আছে। অথচ হাবলুর যে মনে হয়, টিয়া যেন ময়রম। ময়রমই যেন টিয়া। টিয়া যেন সেই দয়াবতী যে কিনা মধুর দরজায় ভোরবেলায় রেখে যেত দুধ, মাখন, রুটি, ফল। না হলে কবির খাওয়া জুটবে না। গেল কেন মধু বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে? কবির উচিৎ হয়েছিল ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়া? মনে হয় এটাও মধুর ন্যায় হয় নি। তখন মেঘনাদ বধ লেখা হয়ে গেছে। তখন মধুর নাটক একেই কি বলে সভ্যতা আর বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ লেখা হয়ে গেছে।

হাবলু বলল, কবরখানে কেমন ভয় করে দিদিমা।

ভয়ের কী হল, দেশবিদেশ থেকে মধুরে দেখতি আসে ওই জায়গায়, সাগরদাঁড়ির মধুকবি ওখেনে শুয়ে আছে।

কবি ওখানে জেগে আছে মাটির তলায়। কবি যেন একাই নিরস্ত্র মেঘনাদ একাই সবহারা রাবণ। কবি যেন নিজেই ছিল যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎ। আর লক্ষ্মণ সেই যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করল ঘাসবনে শিকারী বাঘ যেমন নিজেকে লুকিয়ে নিরীহ প্রাণীর দিকে এগোয় সেই ভাবে, যে ভাবে নদীর জলে নিজেকে লুকিয়ে শিকারে যায় ধূর্ত কুমির, সেই ভাবে। লক্ষণের সঙ্গে আছেন মায়াদেবী, যিনি মায়াবলে যজ্ঞাগারের বন্ধ দরজা খুলে দিলেন। দেবতারা ইন্দ্রজিতের কাছে পরাজয়ের গ্লানি মুক্ত হতে না পেরে মায়াদেবীর সঙ্গে লক্ষণকে পাঠাল নিরস্ত্র মেঘনাদকে হত্যা করতে। হায়রে মেঘনাদ, কে জানত এই সব কথা, মধু লিখল তাই হল। দেবতার অন্যায়ের কথা কে লেখে, কার বুকের পাটা আছে সে কথা বলার? মানুষের অন্যায়ের চেয়ে দেবতার অন্যায় কিসে কম? ভগিনী শূর্পনখার অপরাধ সে লক্ষণের প্রণয় অভিলাষী ছিল। সেই দোযে তার রূপ নষ্ট করে দিল লক্ষণ নাক কেটে দিয়ে। সব দেবতাদের ছল কিনা কে বলবে? আসল উদ্দেশ্য ছিল মেঘনাদ বধ। না হলে ওই মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসন অধিকার করে নিত। কুদর্শন কালোমানুষ সুদর্শন সাদামানুষের চোখের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছিল। বীরত্বে না পেরে অনার্য কালোমানুষকে রাক্ষস করে দিল আর্য দেবতারা। রামায়ণের যুদ্ধটাই যেন দেবতাদের সাজানো। এ সব বীরাঙ্গনাকে শিখিয়েছিল তার মাসসাই। শুনতে শুনতে কী অবাকই না হয়েছিল বীরাঙ্গনা। কী বল তুমি মাসসাই, দেবতা আর এই ইংরেজ এক। কী বল তুমি মাসসাই, রামায়ণের যুদ্ধ হল অনার্য আর আর্যের যুদ্ধ! কত সব কথা বলত মাসসাই, সব তোরে বলে যাবরে হাবলু। শুনলি বড় আশ্চর্য হবি তুই। ও সব শুনার পর মধুর কথা মনে পড়লি বুক হা হা করে। এই জন্যি মধু মেঘনাদ আর রাবনের দুঃখের কথাই লিখে গেল। অনার্য দ্রাবিড় জাতির কথা বলে গেল।

বাস চলছিল। উপর থেকে দেখা যাচ্ছিল নীচের শহর। লাঠি হাতে লালপাগড়ি পুলিশ দাঁড়িয়ে রাস্তায়। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে হাত তুলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। রাস্তার ধারে ফুটপাথের গায়ে দোকান খুলে ধূপ ধুনো দিচ্ছে কাপড়-দোকানি। তার পাশে আর একটা দোকান, সেও কাপড়ের। ফুটপথ দিয়ে হনহন করে লোক হাঁটছে

এদিক ওদিক। টিকি তোলা ট্রাম ওদিক থেকে আসছে ঠংঠং করতে করতে। আকাশে মেঘ আছে। সেই মেঘ তাকিয়ে আছে হাবলুর দিকে। মেঘের চোখে চোখ পড়ল হাবলুর। তার মনে হল টিয়াকে নিয়ে এলে সেও দেখতে পেত মধু কোথায় শুয়ে আছে। বিলেত থেকে ফিরে ক'দিন ভাল কেটেছিল তার। তারপর ভয়ানক এক যুদ্ধের দিন শুরু হল। যেমন নিরস্ত্র মেঘনাদের সমুখে এল মায়াদেবীর আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে প্রবেশ করা লক্ষণ। ভিটে ছাড়া করতে যেমন স্বাধীনতা এল দাঙ্গার রক্ত মেখে। ইংরেজ ভাগাভাগি করে দিল দেশটাকে। ইংরেজ জানত এই দেশের মানুষের সঙ্গে বীরত্ব, সাহসে পেরে উঠবে না। এ দেশ সোনার। লুটেরা কোম্পানি বুদ্ধি করে হিন্দু মুসলমান বিরোধ লাগিয়ে দেশ লুটে নিয়ে ভাগাভাগি করে দিয়ে চিরকালের মতো হিংসার বীজ পুতে দিয়ে গেল। দেশের মানুষ হল নিরস্ত্র মেঘনাদ। সারা দেশটায় বীর ইন্দ্রজিতের চিতা জ্বলতে লাগল। বুক চাপড়ে ঘরে ফিরতে লাগল সন্তানহারা রাবন।

করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষঃদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্ত দিবা নিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।।

সপ্ত দিবা নিশি আর শেষ হয় না। মেঘনাদের মরণও যেন শেষ হয় না।

মধু পাঁচ বছর বিদেশে কাটিয়ে দেশে ফিরলে এ দেশ আনন্দ করে নি। তার কোনো আবাহন হয় নি। মধু অভাবে কষ্টে রোগে শোকে হেনরিয়েটাকে নিয়ে মরণের দিকে এগোলেও এদেশের মানুষ খোঁজই রাখে নি তার। খ্রিস্টান সমাজ তাকে কবরের মাটিই দিতে চায় নি প্রথমে। ঘাড় ঘুরিয়ে হাবলু দেখল বুড়ি বীরাঙ্গনার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তুমি কাঁদছ বীরা? কান্নার কোনো দাম আছে এ সংসারে, নেই।

বীরাঙ্গনা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল তার দিকে, বিড়বিড় করতে লাগল, এই, এ কথা তো মাসসাই বলেছিল, তুই জানলি কী করে, তাহলি তুই কেডা, কেডারে তুই হাবলু?

ভারী মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে চেয়ে নিঃঝুম হাবলুর ভিতরে কী যেন দেখতে পায় বীরাঙ্গনা দাসী। মাসসাই যেন স্বপ্নের ভিতর এসে গেছে। এখনও মাসসাইকে সে ছাড়ে নি। স্বপ্নে তো আসে মাসসাই। এই যে এসেছে। ডবলডেকার বাসে তার পাশে বসে আছে মাসসাই। বিড়বিড় করে বলছে, আমি তোমার মাসসাই বীরা, তোমারে কি আমি নামতা পড়াই নি, ভুলে গেলে সব! আমি তোমারে মধুকবির কথা যা বলতে পেরেছি, তার বেশি আমার দেওয়ার কিছু নেই বীরা, এ কথা ভুল না বীরা, সঙ্গে রেখে দিয়ো।

সঙ্গে রেখে দিয়েছে বীরা। ওই নিয়েই তো পার হয়ে এসেছে। এখন মধুকবির কথা গেয়ে বেড়াচ্ছে ঘরে ঘরে। গেয়ে বেড়ানর কথাটি বলেছিল বীরাঙ্গনার ছেলে কানাই। বলেছিল, কী হবে মা, কেডা বিশ্বাস করবে যে মধুসূদন আমাদের কেউ হয়, আর হলেই বা কী, এদিকের লোক বলে যারাই আসে ওপার থেকে, বলে তারা জমিদার ছিল, গোয়াল ভরা গরু আর গোলা ভরা ধান ছিল, গরিব কি কেউ ছিল না, আমরা ওসব না বলে মধুকবির সঙ্গে নিজেদের সম্পক্কোর কথা বলছি, সবাই হাসে, বলে আমি তাহলি কাব্য লিখি নে কেন?

হুঁ, ওপার থেকে আসা আর সবাই যেমন ভিটে বাগান পুকুর গরু বাছুর নিয়ে কথা বলে, বীরাঙ্গনা বলে মধুকবির কথা। গেয়ে বেড়ায় বুঝি। তাই হোক। মাসসাই যা বলে গিয়েছে তাই লোকের ঘরে ঘরে শোনায় বীরাঙ্গনা দাসী। লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে? ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কি রে ফিরে, মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে?....গুনগুন করতে থাকে বীরাঙ্গনা দাসী, আচমকা থেমে হাবলুর দিকে ফিরে বলে, সব মনে রেখেছি মাসসাই, সব।

হাবলু বলল, আমি যে সব ভুলে গিছি বীরাঙ্গনা।

জানি তো, তুমি কি মনে রাখবা, আমাকেই সব মনে রাখতি হবে, সাগরদাঁড়ি, কপোতাক্ষ, বিদায়ঘাট, রাজনারায়ণ, জাহ্নবী, হেনরিয়েটা, মধু তোমারে সব মনে করায়ে তবে আমি মরব।

হাবলু বলল, তোমারে মরতি দিলি তো, মরে কোথায় যাবা বীরাঙ্গনা দেব্যা?

যাবার জায়গা নেই নাকি?

না নেই, বর্ডারে আটকি যাবা।

শুনে বীরাঙ্গনা ফোকলা গালে হাসল, বলল, ওখেনে বর্ডার আছে কেডা বলল তোরে?

আছে, এডা হিঁদুর, ওডা মোছলমানের, সেডা কেস্তানের, বডারে বডারে ছড়াছড়ি, কত লোকের কত ধম্মো বলো তুমি দিদমা?

বুড়ি ভাবল তার হাবলু যা বলছে সেই কথা তো বলত তার মাসসাই, হাবলুর যা শোনে এখন, সবই যে তার কথা মনে হয়। কী যে হলো তার এই বয়সে, হাবলুকে না দেখে থাকতে পারে না। হাবলুও আশ্রয় পেয়েছে তার কাছে। এত বড় বিদেশবিভুঁই-এ কোথাও না কোথাও একটা আশ্রয় তো চাই। মাথার উপর ছাদ না থাকলেও একটা মানুষ যদি সহায় থাকে, তার অনেক দাম। নির্বান্ধব, নিরালম্ব হয়ে থাকতে পারে মানুষ? আবার যদি আত্মীয়-স্বজন থেকেও না থাকে তা হয় আরো কষ্টের, আরো দুঃখের। সেই কষ্ট তো আছে হাবলুর। তাই বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে বীরাঙ্গনাকে। বীরাঙ্গনাও এপারে একা হয়ে ইতস্তত ঘুরত। তাকে স্বাধীনচেতা করে দিয়েছিল তার স্বামী, কম বয়সের বিধবা, তাকে তার দুই সন্তান নিয়ে কম কষ্ট করতে হয় নি ওপারে। জমিজমা রক্ষা, প্রাপ্য অংশ উদ্ধার, বিলি বন্দোবস্ত করা, চাষার কাছ থেকে ধান নিজের ঘরে আনা,

সবই একা করতে হতো। যুবতী বিধবার সম্পত্তির দিকে কত শরিকের না নজর। তাকে নষ্ট করতে পারলে, তার নামে বদনাম দিতে পারলে ভূ-সম্পত্তি গ্রাস করা সহজ হয়, সে সব চেষ্টা কি হয় নি, ঠেকাতে হয়েছে। ছিল না বেশি কিছু, মাসসাই নিজেই রক্ষা করতে পারে নি জমিজমা। সে দিকে মনই ছিল না মানুষটার, বুঝতও না তেমন। এপারে এসে বীরাঙ্গনার সেই কাজও নেই, সব তো ফেলে আসা হয়েছে ওপারে। এক শরিক বলেছিল ব্যবস্থা করে দেবে, করে নি, ফাকি দিয়েছে। সেই সব কথা এখন তার ছেলে কি শোনায় না, ছেলের বউ কি শোনায় না? ছেলেও অবশ্য মায়ের মতো, সিধেসাধা প্রকৃতির, তার মা তো তার কথাতেই বিশ্বাস করেছিল আত্মীয়দের।

বীরাঙ্গনার দেশ গেছে, বিষয় সম্পত্তি গেছে, সঙ্গে নিয়ে আসতে পেরেছে শুধু মহাকবি মাইকেল মধুসূদনকে। সে দিকে কোনো শরিক চোখ দেয় নি। বীরাঙ্গনা এই নিয়েই খুশি। মধুর জীবন যে শহরে কেটেছে, সেই শহর তার মনে শান্তি দিয়েছে বুঝি। আর একা হয়ে গেল যে এপারে এসে তা থেকেও তো মুক্তি হয়েছে হাবলুকে নিয়ে। একটা কাজ তো হয়েছে হাবলু থেকে।

বীরাঙ্গনা বলল, তুই যদি বড় কাজ পেয়ে দূরে চলে যাস, আমারে ভুলে যাবি হাবলু?

হাবলু হকচকিয়ে গেল, এ আবার কী কথা, কেমন কথা? সে কোথায় চাকরি করতে যাবে, কে দেবে তাকে চাকরি? আর সে চাকরি করবেই বা কেন। বেলগেছের মামা তাকে তো কত জায়গায় পাঠিয়েছিল, সে কি কোথাও গেছে? তার উদ্দেশ্য তো পার্টিশন রদ করা। না করতে পারলে জেঠার ছেলে অবনীদাকে টিট করা যাবে না। ওই কাজটা তাকে করতে হবে। কাজে ঢুকলে এক জায়গায় আটকে যেতে হবে। উপরওয়ালা মালিক যা বলবে, তাই শুনতে হবে। কাজের জায়গা ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলবে না। সবাই চায় হাবলু কাজ করুক, উপায় করুক, বাকি ছিল বীরাঙ্গনা দিদিমা, সেও ধরে নিয়েছে হাবলু কাজই করবে। টিয়াও তো তাকে কাজ দেখতে বলছে।

হাবলু বলল, আমি চাকরিবাকরি করব না।

তবে কী করবি তুই?

তুমি কি তা জান না?

তুই কি কবিতা লিখিস হাবলু?

হাবলু বলল, না, তুমি কি ভেবেছ আমি মধুর মতো হবো?

পারবি হতে, পারবি নে, কেউ কারোর মতো হতি পারে নারে হাবলু, সবাই তার নিজির মতো হয়।

হাবলু বলল, তোমার মধুর যে কষ্ট গেছে, সে কষ্ট আমার হলি পলায়ে যাতাম, আমারে জব্দ করা অত সহজ না, তুমার মধুর মতন আমি মেনে নিতাম না সব, জেঠার বাড়ি একেবারে ছাড়ি নি, জেঠা আর অবনীদা আমারে ভয় করে এখন।

পঞ্চাশ

শিয়ালদা অবধি ভালো চেনে বীরাঙ্গনা। মৌলালির মোড়ে নেমে বীরাঙ্গনা বলল, আমার হাত ধর মাসসাই, আমারে নিয়ে চ মধুর কাছে।

হাবলু বীরাঙ্গনার হাত ধরে রাস্তা পার করাল। লোককে জিজ্ঞেস করে সোজা পথে হাঁটতে শুরু করেই সামনে পীরের দরগা দেখে দাঁড়াল দুজনেই। হাবলু বলল, আমার বলা হয় নি তুমারে, আমি ওই বেলগেছের পরেশনাথে, শ্যামবাজারের কালীবাড়িতি মানত করিছি, এখেনেও করব, পার্টিশন যেন রদ হয়, ময়রম যেন ভাল থাকে।

কর মানত। হাসল বুড়ি। অবোধ বালক। মামসাই তুমি কী ছিলে আর কী হয়ে এলে! হাবলুকে টাকা দিল বীরাঙ্গনা, নে নে, ধূপ বাতি দে, মাথায় কাপড় দিতে হয় রে মাসসাই, আমার ঠাকুর-দেবতায় আর ভরসা নেই।

এই দরগা মৌলা আলির, আরবদেশের সেই পবিত্র মানুষের চিহ্ন এই দরগায়। খাদেম বুড়ো মুসলমান, গায়ে তার গোলাপি জোব্বা, মাথায় সবুজ কাপড় বাঁধা, চোখমুখে অসংখ্য বলিরেখা, বয়স কত হবে তা বলা কঠিন, বুড়ি আর তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আছে অভিভূত দৃষ্টিতে। তখন হাবলু বলছে, তুমি না হয় তুমার মধুর জন্যি মানত করো বীরা।

হাঁ হাঁ ধূপ, বাতি দাও দিদি, সবার ভাল হবে হজরত মউলা আলি সায়েবের দোয়ায়।

বুড়ি বিষণ্ণ মুখে হাসি ফোটাতে চায়, পারে না। সে যেন মা জাহ্নবী হয়ে গেছে। মা জাহ্নবী তখন কোথায়, কিন্তু উপরে গিয়েও কি তার চোখ জলে ভরে ওঠে নি, আকাশ থেকে কি জাহ্নবীর অশ্রু ঝরে পড়ে নি এই ভুঁই-এ। মধুর কবরে। যখন মধু অভাবে শোকে মরণের দিকে যাচ্ছে, তখন কি তার মা উপরে বসে কাঁদে নি। বীরাঙ্গনাও কি কাঁদে নি? এই যে এখন তার চোখে জল। তা দেখে বুড়ো খাদেম বলল, আঁখো সে পানি গিরতি মা, আলি সায়েব সব দুখ দূর করে দিবে, ভাল হবে তুমার মধুর।

শত অশ্রুপাতেও নিয়তি আর ভাগ্য এড়ান যায় না। মাসসাই বলত, ভাগ্য না বীরা, বড় বড় মানুষকে এমনই প্রতিদান দেয় সমাজ, সমাজটা খুব ভয়ঙ্কর। এই জগৎ যত সুন্দর তত কুৎসিত। স্বর্গ আর নরক এখানে এক সঙ্গে। যাঁরা এই পৃথিবীকে কিছু দিতে আসেন তাঁরা নরক দর্শন করেন এই পৃথিবীতে বসেই। নরকই দর্শন হয়েছিল মধুর। বিলেতে যেমন, নিজের দেশেও তেমন। বিলেত থেকে ফিরে ছ'বছর বেঁচেছিল মধু। পাঁচবছর কোর্টে গিয়েও ব্যারিস্টার মধুসূদন দত্তর মক্কেল চলে গেল ধীরে ধীরে। কবি কি মামলা মোকদ্দমা নিয়ে জীবন কাটাতে পারে? আর এই কবির জীবন হিসেবি তো ছিল না। মাদ্রাজ আর বিলেতে অত অর্থ কষ্ট পেয়েও মধুর স্বভাব যায় নি। কবি ছিল কবিরই মতো। ঋণে ডুবে যাচ্ছিল মধু। এই শহরেও তার শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছিল। মধু ছিল দানশীল, উদার। হাতে এক পয়সা এলে কোনো অনুগ্রহ প্রার্থীকে

ফেরাত না, কী করে নিজের সংসারে হাড়ি চড়বে তা ভাবত না। ঋণ করেও অনুগ্রহ প্রার্থীকে সাহায্য করত কবি মধুসূদন। ব্যারিস্টারিতে সুবিধে না হওয়ায় মানভূমের পঞ্চকোট রাজবাড়িতে রাজার আইনি উপদেষ্টা হয়ে গেল। কলকাতা থেকে সে কতদূর। মানভূমে বেশিদিন থাকে নি মধু, ফিরে এল যখন শরীরে রোগ। কলকাতা ফিরে মধু যেমন রোগগ্রস্ত হল, হেনরিয়েটাও। দুজনে অসুস্থ, দুটি সন্তানের ভরণপোষণ কোন পথে হবে? ঘরের আসবাবপত্র বিক্রি হল। তা শেষ হতে অন্নাভাব এল ঘরে। দুই সন্তানের মুখেরটা যোগাড় করে নিজেরা অনশনে অর্দ্ধাশনে থাকল।

খাদেম বুড়ো বলল, আলি সায়েবের দোয়া মাগো মা, তোমার মধুর দুঃখ থাকবে না।

মধুরে তুমি চিনতে বাবা? মধুর কথা তোমারে কেডা বলল? বীরাঙ্গনা পরপর জিজ্ঞেস করে।

তুমিই তো বললে, তুমার চোখের পানি পড়ল ভুঁয়ে।

বীরাঙ্গনা অবাক, সে তো কথা বলেনি একটাও, তাহলে? খাদেম বুড়ো বলছে সে বলেছে। তাহলে তাই। বুড়ো বলল, পীর বাবা তুমার মধুকে ভাল রাখবে মা, রোগ যা হোক ইলাজ হবে, আরাম দেবে।

কী আরাম দেবে বাবা, ভাত জোটে না যে, মধু আর তার বিবি দুজনেই যে মরছে এক সঙ্গে, কবি মধুসূদন মরছে না খেয়ে, ওষুধপথ্যি না পেয়ে, তখনো দুটো পয়সার জন্যে মায়াকানন লিখতে বসল, পারল না শেষ করতে, শুনবা কী সেইসময় সে নিজেরে নিয়ে লিখেছিল,

কী হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে?
দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুল পতি?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে,
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি!

মধু যেন ঊরু ভেঙে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে পড়ে থাকা দুর্যোধন, মধু যেন প্রাণ ভয়ে ভীত মৈনাক গিরি, দেবরাজ ইন্দ্রের ভয়ে সাগরে গিয়ে ডুব দিয়ে লুকিয়ে থাকল। হায়! আসলে তিনি মেঘনাদ, বীরা শুনছ। কতবার শুনেছে বীরা, কতবার বলেছে বীরা সেই কথা মেঘনাদের যজ্ঞগৃহে লক্ষ্মণ ঢুকেছিল এক তস্করের মতো। নিরস্ত্র মেঘনাদকে হত্যা করতে কোনো অনুশোচনা হয় নি লক্ষ্মণের। মধুর কথা শুনবে, না মেঘনাদের কথা শুনবে বীরাঙ্গনা? দুজনের কথাই যে একরকম লাগে বীরাঙ্গনার। মেঘনাদ আর মধুতে কোনো তফাৎ নেই।

বুড়ো খাদেম বলল, রোঁও মাত, রোনেসে কোই ফায়দা নেহি।

কান্নার কোনো দাম নেই বীরা। বীরের জীবনের এই পরিণতি হয়। মধুই তো গ্রীক বীর হেক্টরের মৃত্যু নিয়ে হেক্টর বধ লিখেছিল মৃত্যুর আগে। সবই যেন তার নিজের

কথা হয়ে গেল। পৃথিবীর যত বীর সন্তান, তারা সবাই পরাজিত মানুষ। হেরেছে নিজ ধর্মে অবিচল থেকে। মেঘনাদ, দুর্যোধন, কর্ণর মৃত্যুর কথা ভাব দেখি বীরা। দেবতা যাদের বলি আমরা, তারা সব কালেই অনৈতিক যুদ্ধে পরাস্ত করেছে তাদের বিরোধীদের। মধু যেন সেই পরাজিত মানুষ। তারই যেন ঊরু ভঙ্গ হয়েছিল, রথের চাকা বসে গিয়েছিল, যজ্ঞগৃহে নিরস্ত্র তারই সমুখে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সমর সজ্জায় সজ্জিত লক্ষ্মণ।

মাথায় রুমাল দিয়ে হাবলু অগুরু মোমবাতি আর ধূপ বাতাসা হাতে দরগার সামনে দাঁড়ায়। দরগা কতকালের পুরোনো। বাবা হজরত আলি কত শত বছর আগের মানুষ। তাঁর নামে এই দরগা। এই শহর যখন গড়ে ওঠে তখন থেকে তিনি আছেন। সেই আরবের মরুভূমিতে থেকেও আছেন এখানে। দরগা ঢাকা রয়েছে সবুজ রেশমি কাপড়ে। ভিতরটা ধূপের গন্ধে ভারী হয়ে আছে। অগুরু আতরে থমথম করছে। খাদেম বুড়ো তার হাত থেকে মোমবাতি নিয়ে জ্বালাতে লাগল, বলল, ইনি শুয়ে আছেন এখানে, বোলো সাচ বাত বোলো।

হাবলু তার কথা বলল মনে মনে। খাদেম বুড়ো বলল, মধুর কথা বোলো, মধুর ইলাজ হোক, মধুর সব দুঃখ বাবা মউলা আলি লিয়ে লিন, বাচ্চাদের ভাল রাখুন, মধুর সব কষ্ট যাক, যাক, মধু মধু মধুর মতো হোক এ জগৎ।

বীরাঙ্গনা বলল, মধুর কাছে যাব বলে বেরিয়েছি বাবা, পার্ক স্ট্রিট কোনদিকে?

বুড়ো খাদেম দেখিয়ে দিল, সিধা যাও, এক কবরখোলা মিলবে, নোনা পুকুর, তারপরও সিধা যাও মিলে যাবে, আড্রিস হায়?

বীরাঙ্গনা বলল, চিনা আছে আমার, শ্বেত পাথরে তার নাম তার কথা লিখা আছে, দাঁড়াও পথিক-বর, জন্ম যদি তব বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! বলতে বলতে বীরাঙ্গনা হাবলুর হাত ধরল, চ মাসসাই, চ, মধুরে দেখে আসি, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

হাঁটা আরম্ভ হতেই বুড়ি বীরাঙ্গনা জিজ্ঞেস করে, কী বললি দরগার বাবারে?

বললাম বীরাঙ্গনার যেন ভাল হয়।

এই কেন বললি, বীরাঙ্গনার ভাল হয়ে কী হবে, বীরাঙ্গনা এবার মরবে।

এ তুমি কী বলো বীরা, মরা বললেই মরা?

হ্যাঁরে তাই, মরব, বেঁচে আমার লাভ?

হাবলু বলল, তাহলে আমিও মরব বীরাঙ্গনা।

ঝটকা দিয়ে দাঁড়ায় বীরাঙ্গনা, কী বললি তুই?

শুনলে তো, যা বলিছি ঠিক বলেছি।

ওরে আমার সোনারে, তাই কি হয়, তুই কেন মরবি, তুই পার্টিশন রদ করবি, তুই মধুর কথা বলবি জনে জনে।

বীরা আবোলতাবোল ছাড়ো, মধুর কী হলো বলো।

বলছি তো মাসসাই।

তুমি আমারে মাসসাই বললে আমি তোমারে আবার ময়রম বলি, যেমন বলি টিয়ারে।

ওই টিয়ারে বলিস যদি, আমারে বলিস নে।

টিয়া তোমার কী করল?

কী করল তা তুই জানিস নে, মধুরে ও সহ্য করতি পারে না, রেবেকার জন্যি ওর প্রাণ কাঁদে, হেনরিয়েটাকে নষ্ট মেয়েমানুষ বলে, সে না থাকলি নাকি মধুর মরণ ওভাবে হত না।

কী জানি বীরা, তবে ও মেয়ে ভাল, আমারে ভালবাসে, আমিও খুব। বলতে গিয়ে হাবলু কেঁপে গেল, তার ভালও লাগল বলতে পেরে। কথাটা কাউকে তো বলার দরকার। সুযোগ খুঁজছিল, বলে দিল।

হাবলু চুপ করে থাকল। বীরা দিদিমা ভাল, কিন্তু টিয়াও তো ভাল। টিয়া খুব সুন্দর। টিয়া তাকে আবার চুমু দিয়েছে রাজার বাড়ি গিয়ে। আলিঙ্গন করে তাকে ফিসফিসিয়ে বলেছিল, আমাকে ভুলবে না তো হাবলু। আশ্চর্য, টিয়া যে বলল, তোমার ময়রম আছে, কিন্তু আমি তোমাকে তার চেয়েও ভালবাসব হাবলু, পাকিস্তান থাকবে, তুমি ওপারে যেয়ো না, যেয়ো না।

বীরাঙ্গনা আচমকা ঘুরে বলল, তোরে ময়রম ভালবাসে, তা জেনেও কেন টিয়া? গলা বুঁজে গেল বীরাঙ্গনার, থেমে গিয়ে শ্বাস নিল, তারপর আবার বলল, হেনরিয়েটারে ঘেন্না করে বলে না, কেন বলেরে হাবলু, ও যে ময়রমের থেকে তোরে আলাদা করে নেচ্ছে।

বীরার মনে লেগেছে তা বুঝতে পারছে হাবলু। চুপ করে থাকা ছাড়া কী উপায়? কথাটা বলে চুপ করে গেছে বীরাঙ্গনা। তারা হাঁটছে। হাবলু নিজে কী করবে জানে না। সেই যে তাকে ভালবাসা দিল টিয়া, যা কোনোদিন ময়রম দেয় নি, তখন মনে হয়েছিল টিয়াই ভাল, ময়রম থাকুক গাঙ পাড়ে বসে। সে বোধ হয় মানিকরাম কবির মতো ময়রমকে ছেড়ে চলে এসেছে। পরে মনে হয়েছে ময়রম আলাদা। সেই যে মাঠ পেরিয়ে, গাঙ পেরিয়ে উতুলিতে গিয়ে পড়লেই দেখা যাবে ময়রম হাত তুলে ডাক দিচ্ছে, কে এল গো, কদ্দিন পরে আসা হল হাবলুবাবুর, ময়রম আর অজেত আলির কী হল তা কি খোঁজ নিয়েছিলে?

তোর সেই বেড়ালগুলো?

সে কি পথে দেখা হয় নি, আয়না গয়নারে আমি ঝে তোমার খোঁজে আশাশুনি যেতি বলিলাম, গেছে তবে দেখা হল না কেন গো? বলে সে মুখ ফিরিয়ে নিল, পিঠ থেকে লম্বা বেণী ঘুরিয়ে বুকের সামনে এনে লাল ফিতে খুলে প্রজাপতি বানাতে লাগল। তখন হাবলু জিজ্ঞেস করল, অজেত কই, আজ খেলা আছে কিনা জানিস?

না, জানিনে, আমার কী দরকার, ওই যে আমার আয়না গয়না আসতেছে, দেখি আশাশুনির কী খবর আনল, সেখেনে কলিম কী বলে, শয়তানডারে আমি দেখে নেব, কেডা এ বাড়ি আসপে তা আমরা বোঝপো, ওর বলার কী হক?

ময়রমের সঙ্গে কার তুলনা। ময়রম ময়রমের মতো। বীরাঙ্গনা বলল, দ্যাখ মাসসাই, ময়রমের কপাল ওই রকম, ময়রমের ভাগ্য হল গাঙ পাড়ে বসা, রেবেকা ওই ময়রমের কপাল নিয়ে এসেছিল, তোর অজেতের বুনও তাই, তোর বীরাও তাই। বলতে বলতে বীরাঙ্গনা তার থান কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের কোণ মুছে নিল, বিড়বিড় করতে করতে বগলে পুটুলি নিয়ে হাঁটতে লাগল। কী জোর তার হাঁটায়! হাবলু তার সঙ্গে হাঁটতে বুঝি হিমসিম খায়। শোনে বীরা বলছে, তার মাসসাই তার ভরা বয়সে তাকে গাঙ পাড়ে রেখে চলে গেল, ভাবেও নি তার বীরাঙ্গনার কী হবে, ভাবেও নি যুক্তবঙ্গ আবার ভঙ্গ বঙ্গ হবে, পাকিস্তান ছেড়ে বীরাকে পুটলি বগলে কলকাতার পথে পথে ঘুরতে হবে।

তারা ডান দিক ধরে হাঁটছিল। রাস্তা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ করে ট্রাম যাচ্ছে। ট্রামে আসা যেত। কিন্তু হেঁটে যেতেই বীরাঙ্গনা বেশি স্বচ্ছন্দ, গাঁ দেশে গাড়িঘোড়া ছিল কোথায়? হেঁটেই তো চলা হোত। এদিকে দোতলা বাসও আছে। রাস্তা দিয়ে ছুটছে। কুকুর বগলে এক মেম সায়েব রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। হাবলু অবাক হয়ে দেখল। বীরা দাঁড়াল, মনে হয় ওই আরম্ভ হল কবরথান, এই যে ট্রাম ডিপো, নোনাপুকুর এ জায়গারে বলে, কবরথান পেরুলিই পার্ক ইস্ট্রিট, এদিকি কোথায় ওর বাসাও ছিল নোনাপুকুরের আশপাশে।

ট্রাম ডিপো থেকে ট্রাম বেরিয়ে গেল শিয়ালদার দিকে। রাস্তার ওদিকে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বুড়ি হাঁ করে তাকিয়ে আছে কবরখানার দিকে কোণাকুণি। ওরা এগোতে লাগল কবরখানার দিকে। ওপার থেকে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বুড়িও পার হয়ে আসতে লাগল। পাঁচিল ছুঁয়ে হাবলু বলল, তুমি আগে এসেছিলে বীরা?

বীরাঙ্গনা বল, কী করে আসব, কবে থেকে বলতিছি তবু আসতি আর পারলাম কই?

তবে যে এসব বলতেছ?

বীরাঙ্গনা বলল, আমার মাসসাই এয়েছিল, মাসসাই যা বলেছিল সব মিলে যাচ্ছে, একেবারে সব জায়গাই দেখেই চিনতে পেরিছি।

কতকালের কথা মনে রেখেছে বীরাঙ্গনা। মাসসাই তাকে নামতার মতো মুখস্ত করিয়েছিল। একটা কথাও ভোলে নি বীরা। এখন তারা দাঁড়িয়ে আছে কবরখানার গেটের সামনে। পড়ছে সমাধিলিপি। পড়তে পড়তে হাবলু বলল, টিয়া আর ময়রম যদি আসত, দেখে যেতে পারত, ওদের আবার কেডা আনবে, ওরা তো নিজি নিজি আসতি পারবে না।

ওরা আসপে কেন, একবার কপোতাক্ষ একবার গঙ্গা, শেষবার জগতের সব গাঙে বিদায়ঘাট রেখে মধু যখন যায়, কে ছিল তার পাশে?

হাবলু অবাক হল না। তারও যেন মনে হল কথাটা মিথ্যা নয়। যেন তখনও তারা সবাই ছিল এ জগতে। সেই প্রায় ভিখিরি হয়ে যাওয়া দুজনে রোগে মরণের দুয়ারে এগোতে লাগল এক পা এক পা করে, তখন কে ছিল তাদের পাশে? মেয়ে শর্মিষ্ঠা আর দুই ছেলে মেঘনাদ, নেপোলিয়নের কী হবে তারা মরে গেলে, কে ভেবেছিলরে? তের বছর সাত মাস বয়সের শর্মিষ্ঠার বিয়ে হল এক আধবুড়ো আর্টিস্টের সঙ্গে। রিক্ত মধুসূদন বাঁচল যেন মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পেরে। বিড়বিড় করতে করতে চোখ মুছতে থাকল বীরাঙ্গনা, বলল, এও আর এক বিদায়ঘাটে আলাম আমরা হাবলু, এখেনে শেষবারের মতো এল মধু, চিরকালের মতো গেল মধু, একা থাকুক শ্রী মধুসূদন, কেউ যেন তার পাশে না আসে, কবিরে একা থাকতি দিতি হয়।

তাহলি কি আমিও যাব না ভিতরে, তুমি একা যাবা বীরা?

তা হয় নাকি মাসসাই, মধু যে আমাদের জন্যি অপেক্ষা করতি করতি ঘুমুয়ে পড়ল, তার শিয়রে বসি আমরা, ঘুম ভাঙাব না।

হাবলু দেখতে পায় বড় গাউন পরা ময়লাটে রঙের বুড়ি, এসে দাঁড়াল ফুটপাথে। ছোট করে ছাঁটা চুলের সবটা পাকা, মুখখানি হিজিবিজি নানা দাগে ভরা। চোখ দুটি ফ্যাকাশে, ঘোলাটে, গায়ের রং ফর্শা ছিল, রোদ বর্ষায় তা জ্বলে পুড়ে গেছে। দেখে মনে হয় পশ্চিমের রক্ত এর ভিতরে। মেম সায়েব, বীরাঙ্গনার কাছে জানা রানি এলিজাবেথের দেশের কেউ ছিল এর পূর্বপুরুষ কোনোদিন। হাবলু বেলগাছিয়ায় এক মেম দেখেছিল মাস ছয় আগে, খরগোসের মতো কুকুর নিয়ে টালা ট্যাঙ্কের ওদিক থেকে আসত। এখন আর দেখে না। তাকে দেখে মেম মনে হতো। মনে হতো রাজার মেয়ে রাজকন্যা। একে যে দাসীও মনে হয় না। গাউনটা খুব ময়লা, খালি পা, তার দিকে চেয়ে হাসল, এগিয়ে আসতে লাগল।

হেলো, হাউ ডু ইউ ডু? খুনখুনে গলায় জিজ্ঞেস করল আধ-বুড়ি মেম।

বুঝতে পেরেও আচমকা ইংরিজি শুনে হাবলু বিব্রত হয়ে পড়ে। ইংরিজি বই, এ স্টেপ টু ইংলিশে ছিল এর জবাব, 'আমি অ্যাম ওয়েল', বলতে তার বুক গুড়গুড় করতে লাগল। সে চুপ করে থাকে। কী আশ্চর্য বীরাঙ্গনা তার বগলের পুটুলি সামলে নিয়ে বলল, হ্যালো বউ, মাই সিস্টার, বুন।

আই, বীড়া, বীড়াঙ্গনা, লেডি উইথ কারেজ, টুমি আসিবে আমি জানিতাম, আয়াম ওয়েটিং ফর ইউ সিনস এইট্টিন নাইনটি টু।

বীরাঙ্গনা আচমকা ঘোর লাগা গলায় বলে ওঠে, রেবেকা! আমি যে তোমারে দেখতি পাব বুন তা কোনোদিন ভাবি নি, তুমি তো কালাপানির ওপারে, কপাল পোড়া হতভাগিনী বুন আমার।

টুমি কবে আসিলে বীড়া? খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে বুড়ি মেম।

দশ বছর তো হবে।

সাগরদাঁড়ি?

থাকা হল না।

কী আশ্চর্য ব্যাপার, প্রায় সত্তর বছর ধরে বসে আছে এইজন বীরাঙ্গনার জন্য। হাবলু একটু তফাতে সরে যায়। কথা বলুন ওঁরা, কথা বলুন। হাবলু সব শুনতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে। দুই বুড়ি কাঁদছে। দুই বুড়ি হাসছে। বুড়ি বীরাঙ্গনা বলছে কেন চলে এল সাগরদাঁড়ি থেকে। পার্টিশন হয়ে গেছে তা কি জান না তুমি বুন? বিদায় ঘাটের কথা শোনো নি? বিদায় ঘাট, মধুর বিদায় ঘাট! হাঁ হ্যাঁ, শুনিয়াছি, শুনিয়াছি, আমার হাজব্যান্ড বলিয়াছিল, তো কী হইয়াছিল?

বীরাঙ্গনা বলে তখন দেশ কী করে দুই ভাগ হলো। শুনতে শুনতে বুড়ি মেম নিস্তব্ধ। বুড়ির দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। বিড়বিড় করে বুড়ি, ইহা ঠিক হয় নাই, ইহা ঠিক হয় নাই। সাগরদাঁড়ি ওপারে। সেই বাড়ি ওপারে। কেহ নাই ও বাড়িতে। হায় হায়, রিভার কপোতাকসো?

সব ওপারে বুন।

টুমি কী কহিলে সিস্টার, এ টুমি কী কহিলে, আমি এই কথা শুনিবার জন্য বসিয়া আছি বীড়াঙ্গনা, কারেজাস লেডি, পোয়েট মধু রিভার কপোতাকস আর সাগরদাঁড়ির কথা এতো বলিয়াছে যে উহা হইয়াছে মাই নেটিব ল্যান্ড, চলিয়া আসিলে তো লইয়া আসিতে পারিলে না?

কী নিয়ে আসব?

কেন রিভার কপোতাকস সাগরদাঁড়ি, হাউজ অব ডাট ফ্যামিলি।

তা কী করে হবে, ওরা কী দোষ করল যারা ওপারে রয়ে গেল। বীরাঙ্গনা বিড়বিড় করে বলতে লাগল, সাগরদাঁড়ি তো সাগরদাঁড়িতেই থাকপে বুন, কী করে আনা যাবে?

নো নো নো, টুমি আমার কথা ঠিক বুঝিতে পারিতেছ না। বলতে বলতে দুই বুড়ি কথা বলতে বলতে ঢুকে পড়তে থাকে কবরখানার ভিতর। বীরাঙ্গনা বোঝাতে থাকে, বুড়ি মেমও মাথা ঝাঁকাতে থাকে। হাবলু ওদের অনুসরণ করে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, কে যেন কাতর গলায় বলল, স্টপ, দাঁড়াও পথিক-বর! দাঁড়ায় হাবলু। প্রবেশ পথে সেই সমাধি-লিপির পাশে কবরখানার পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়ে গুনগুন করছে একটা লোক, দাঁড়াও পথিক-বর জন্ম যদি তব বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল!

একান্ন

পাগলই হবে। বিনবিন করে কবি মধুসূদনের সমাধিলিপি বলে যাচ্ছে নিজের মনে...এ সমাধিস্থলে... (জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম)...মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত

দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন! হাবলু তার বিনবিন শুনতে শুনতে গোরস্থানে প্রবেশ করতে লাগল দুই বুড়ির পিছনে পিছনে। মেঘের ছায়া গাছের ছায়ার ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা মাটির উপর দিয়ে হাবলু এগিয়ে যেতে লাগল। তার মাথার ভিতরে ঘোর, সে যেন টলছে। মাটির তলায় কতজন শুয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে, জেগে আছে, হাড়গোড় মাটি হয়ে গেছে কতজনের। হাবলুর মনে হচ্ছিল কারো না কারোর বুকে তার পা পড়ছে। সে বসে পড়ল উবু হয়ে। ওই যে ওঁরা একটি সমাধিস্থলে গিয়ে দাঁড়ালেন। হাবলু ওদের কথাও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

কত কালের প্রাচীন ছায়া এখানে। বুনো আম, জাম, তেঁতুল, কদম, কালকাসুন্দে হলুদ ফুলের রাধাচুড়া, বট। বর্ষা নামছে, হয়ে গেছে অল্পবিস্তর দিনকয় আগে। মাটি নরম। নরম মাটির উপর শুকনো মরা পাতারা ভিজেছে। ঠিক দুপুর বেলা। বিস্তীর্ণ গোরস্থান নিঃঝুম হয়ে পড়ে আছে। কোথাও কেউ নেই। যারা এসেছিল তারা কোনো কোনো বাঁধানো কবরের উপর শাদা, নীল, হলুদ, লাল, বেগনি—নানা রকম ফুল ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে। বাকি মৃতরা কেউ ফুলের অপেক্ষা করে নেই। কফিনের ভিতর হাড়গোড় নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। কোথায় শুয়ে আছে মধু, এই জীবনের মধু, বুড়ি মেম রেবেকা বিনবিনিয়ে বলে, সে আমাকে বিটরে করল বীরা, আমি সপনেও ভাবি নাই এমন যে হইতে পারে কখনো।

বীরাঙ্গনা বলে, পুরুষ জাতি অমন হয় বুন, তা সহ্য করাই তো মেয়েদের জীবন।

নো নো নো, আমার মধু আমারে ভালবাসিত, সে জানিত রেবেকাকে কী ভাবে ভালবাসিতে হয়, অথচ সে একজন এমন নারীর মোহে পড়িল, সে তাহাকে রূপে ভুলাইয়া, বশ করিল ডাকিনীর ন্যায়, মধুর মন হইতে মুছিয়া দিইল আমারে।

বীরাঙ্গনা বলল, থাক রেবেকা থাক, সে বড় কষ্ট পেয়েছিল সমস্ত জীবন।

আমি কি পাই নাই?

পেয়েছিল, কবি-জায়া কষ্টই পেয়ে থাকে, কবির জায়া কি কখনো সুখে থাকে?

ওই তো মধুর সমাধি। এখানে চিরবিশ্রামে আছেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত...দাঁড়াও পথিকবর...শ্বেত পাথরে তা বাঁধানো। তার উপর অবিরাম ঝড়ে পড়ে হলুদ রঙের ফুল, রাধাচুড়া। এই একটু আগে অশ্রু বিন্দুর মতো পড়েছিল বৃষ্টির কয়েক ফোঁটা। দুই নারী, দুই বৃদ্ধা সমাধির দুই পারে। সামান্য দূরে হাবলু উবু হয়ে বসে।

এই রেবেকার কথাই টিয়া বলে, আর টিয়ার মুখে এর কথা শুনেই দিদিমার যত রাগ টিয়ার উপর। এখানে হেনরিয়েটার পাশে মধু শুয়ে আছে, আর মাদ্রাজে চার সন্তান সমেত যাকে ছেড়ে এসেছিল সেই রেবেকা পড়ে আছে কোন মাটির তলায় একা একা। এই সব কথা টিয়া বললেই, বুড়ি ফোঁস করে। এখন যে রেবেকা টমসন ডাট তার সখী হয়ে উঠল, কতকাল বাদে দেখা হলো বুঝি দুজনের। তাকে যেন এই প্রথম দ্যাখে নি

ওই রেবেকা দাসী, রেবেকা বেওয়া। আর দিদিমা বীরাঙ্গনা দাসীও যেন ভুলেছে প্রথম দেখার কথা। হাবলু শুনতে পায় দুই নারীর কথা। দালান কোঠার বারান্দায় বসে দুই বুড়ি সারাদুপুর যেমন সুখদুঃখের কথা বলে, দূরে গাছের পাতার আড়ালে এক প্রাচীন এক ঘুঘু যেমন চোখের জল ফেলতে ফেলতে অবিরাম ডেকে যায়, তেমনি যেন এখন। ঘুঘুর ডাক শোনা যায়। হলুদ পাতা খসে পড়ে। পুরনো কবরের দুই দিকে দুই বুড়ি। দ্বিপ্রহর ঘুমিয়ে থাকে। কোথাও কেউ নেই। বাইরে লোয়ার সার্কুলার রোডেও কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। রেবেকা বলে, আমার দুঃখ যায় না সিস্টার, মধু আর হেনরিয়েটা নিদ্রিত রইয়াছে পাশাপাশি, হেনরিয়েটা ডাকিনী, কোন ফুলের মধু দিল মধুকে খাইতে মধু আমারে ভুলিয়া গেল, তাহার সন্তানদের ভুলিয়া গেল, পথমে আমি কিছুই জানিতে পারি নাই সিস্টার।

স্বামীকে খেয়াল করলি এমন হতো না বুন, পুরুষমানুষ বাইরে বাইরে ঘোরে, কতরকম বাতাস তার গায়ে লাগে।

রেবেকা বিড়বিড় করল, আমি কেন মাদ্রাজে মধুকে রাখিয়া নর্দান প্রভিন্সে গিয়াছিলাম সিস্টার, আমার সর্বনাশ হইয়া গেল ওই সময়।

ভুলে যাও বুন, ভুলে যাও।

ওই সময়ে হেনরিয়েটা বশ করিল মধুকে, হায়, সে কী ভয়ানক দিন না ছিল।

মনে রেখ না রেবেকা বুন, দুঃখের কথা মনে রেখে শুধুই দুঃখ।

রেবেকা বলল, আমি কোনোদিন ভাবি নাই মধু আমাকে ছাড়িয়া ওই ডাকিনীর কবলে পড়িবে, আমার পেটে তখন সন্তান, মধু গোপনে হেনরিয়েটার প্রেমে বিভোর, আমি তো চিন্তাও করি নাই এমন হইবে, মধু আনমনা হইয়া থাকে, একদিন কি ঘুমের ঘোরে বুঝি হেনরিয়েটার নাম উচ্চারণ করিল, আমি কহিলাম, ''তুমি কাহার কথা বলো প্রিয়, সে কহিল আমার কথাই ঘুমের ভিতর কহিয়াছে। কে হেনরিয়েটা? মধু কহিল, হেনরিয়েটা নহে রেবেকা, আমি ভুল শুনিয়াছি।''

হয়ত তাহাই হইবে। ভুলই শুনিয়াছি। হেনরিয়েটার কথা বাতাসে উড়িয়া আসিতেছিল, সেই কারণেই ভুল শোনা। পরে বুঝিলাম মধুর কথা সত্য নহে।

তারপর কী হলো? কী হবে? রেবেকা কি চিনত না হেনরিয়েটাকে। সে ছিল জর্জ হোয়াইটের কন্যা। মিঃ হোয়াইট তার স্বামীর সহকর্মী। হেনরিয়েটা মাতৃহীন। মিঃ হোয়াইট আবার বিয়ে করে হেনরিয়েটার বয়সী এক বউ এনেছেন ঘরে। আগে মধু মাতৃহীন কন্যা হেনরিয়েটার কথা বলত। সে আসবে মিসেস ডাট-এর কাছে। এখন মধু হেনরিয়েটার কথা বলে না। কোনো কথাই না। কিন্তু ঘুমের ঘোরে তার নাম করে।

থাক রেবেকা বুন, থাক, এই সব ভেবে কতজন মধুরে দোষ দেয় কত!

রেবেকা শোনে নি বীরাঙ্গনার কথা। তার মনে ফিরে আসছে মাদ্রাজের দিনগুলি।

কবিকে কোনোদিন সন্দেহ করতে হবে তা রেবেকা ভাবে নি। সে চার সন্তানের মা। কনিষ্ঠটি কোলের শিশু। তার নাম মাইকেল জেমস, ব্যাপটিজম হয় নি তখনো। তাদের উপরে সাড়ে ছ বছরের মেয়ে বার্থা, চার বছর দশ মাসের মেয়ে ফিবি, সাড়ে তিন বছরের ছেলে জর্জ। চার সন্তানের মা রেবেকার রাতের ঘুম গেল। বার্থা একদিন দেখেছে তার বাবা টমটম গাড়িতে বসে আছেন, পাশে আন-নোন এক লেডি। গাড়ি গেল সমুদ্রের দিকে। রেবেকা দিনমানে সন্তানদের সামনে স্বামীকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না। এক ভোরে সে স্বামীকে ডেকে তুলল, বলল, বারান্দায় আইসো।

মধু রেবেকাকে জিজ্ঞাসা করিব, কী হয়েছে রেবেকা?

তুমি মিঃ হোয়াইটের মেয়ে হেনরিয়েটাকে লইয়া সি-বিচ গিয়াছিলে?

বার্থা বলেছে তা টের পায় মধু। মেয়ে তাকে রাস্তায় দেখে বিস্মিত হয়ে টমটমের পিছনে দৌড়েছিল ডাকতে ডাকতে। মধু কোচোয়ানকে জোরে ঘোড়া ছুটোতে বলেছিল। ঘোড়ার উপর চাবুক পড়েছিল। মেয়ের নাগাল ছাড়িয়ে গিয়েছিল তারা। ধুলোয় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল সে। গাড়ির পিছনে ছুটতে ছুটতে না ধরতে পেরে বার্থা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছিল। বাবা তাকে দেখতে পেয়েও পেল না, তার ডাকে দাঁড়াল না, আর বাবার পাশে ও কে? তার মা তো কোনোদিন বাবার সঙ্গে টমটম গাড়ি চেপে সি-বিচের দিকে যায় না। কেন যাবে তার বাবা আর একজন লেডির সঙ্গে? ওই লেডি কে মা?

বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে মধু তাকিয়ে থাকে পথের দিকে। মাদ্রাজ শহর তখনো ঘুম ভেঙে ওঠে নি। সব কিছু নীরব হয়ে আছে। চার্চের ঘণ্টা ঠিক সাতটার সময় বেজে উঠলে মানুষজন দেখা যাবে পথে। তখন সবে আলো ফুটছে। মধু জিজ্ঞেস করল, কেন রেবেকা?

আমি জানিতে চাই।

হেনরিয়েটার কথা কি তুমি জান না, মিঃ হোয়াইটের রি ম্যারেজ তাঁর কন্যার মন ভেঙে দিয়েছে।

তোমার আচরণে যে তোমার শিশুকন্যার মন ভাঙিয়া গিয়াছে তাহা কি ফিল করিতে পারো?

মধু ঠিকই করেছিল সব কিছু অস্বীকার করবে। হেনরিয়েটার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। মাতৃহারা মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেয় মাত্র। কিন্তু রেবেকা টের পেয়েছে সব। সে জিজ্ঞেস করে, ইয়াং লেডিকে লইয়া সি-বিচ যাইতে হইলো তাহার মন ভাল করিবার জন্য।

আমাকে বলল, অনেকদিন সে সমুদ্রতীরে যায় নি, তাই, রেবেকা চলো আজ আমরা সকলে মিলে সমুদ্রের তীরে যাই, সমুদ্রতীরে দাঁড়াইলে আমার প্রিয় কবি বায়রনের জন্মভূমি ইংল্যান্ডের বাতাস যেন পশ্চিম থেকে ধেয়ে এসে বুকের ভিতর প্রবেশ করে।

রেবেকা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, ও কথা তুমি তোমার সেই মাতৃহারা হেনরিয়েটাকে কহিও, তাহার সহিত তোমার কী রিলেশন?

কোনো রিলেশন নেই, আই লাভ ইউ রেবেকা।

ভালবাসিতে একদিন, আজ নহে।

না রেবেকা, হেনরিয়েটা কেউ নয়, আমার সঙ্গে কাব্য কবিতা নিয়ে কথা বলে, বায়রনের কবিতা নিয়ে কথা বলে।

আমি ওসব কথা শুনিব না, কাব্য আলোচনার জন্য তোমাকে উহাকে লইয়া সি-বিচে যাইতে হয়।

দু'দিন বাদে আবার স্বামীকে ঘুম থেকে তুলে বাইরে ডেকে রেবেকা জিজ্ঞেস করে, ওই হেনরিয়েটার সহিত তুমি কতদূর অগ্রসর হইয়াছ?

মাদ্রাজ শহরে শীত আসে না। শীতের সময় একবার ঘুরে আসে বর্ষার মেঘ। মৌসুমি বায়ু দূর সমুদ্রে বিলীন হওয়ার আগে মাদ্রাজ শহরে বৃষ্টি নামিয়ে যায়। সেদিন ভোর থেকে গুরুগুরু মেঘ ডাকছিল। আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল মেঘে। ভোরের আলো ঢেকে গিয়েছিল মেঘের তমিস্রায়। মধু কী বলবে, সত্য না মিথ্যা? অস্বীকার করবে, নাকি বলবে, সে যাই হোক, রেবেকার কোনো ভাবনার কারণ নেই। তার সন্তানের মা রেবেকাকে তো সে ভালবাসে। কিন্তু তা কি হয়? রেবেকা কেন তার স্বামীর ভাগ আর একজনকে দেবে? কেউ কি চায় তার প্রিয়জন আর একজনের অধিকারে যায়?

মধু বলল, তোমাকে অসুখী করব না রেবেকা, তাকে তুমি গ্রহণ করো তোমার সখী করে নাও।

বালিকা কন্যা বার্থার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, সে ছুটে মায়ের কোলে মুখ গুঁজল, নো নো, নেভার, মা তুমি কাঁদিতেছ কেন?

বার্থা আমার কাছে এস। তার বাবা তাকে ডাকল।

বার্থা গেল না। তারপর আচমকা উঠে চিৎকার করে বলে ওঠে, হু ইজ দ্যাট লেডি, সে কেন তোমার সহিত সমুদ্রে যাইবে?

বালিকা কন্যার দুচোখ জ্বলছিল। মধু দেখতে পেয়েছিল বার্থার পরে ফিবি, ফিবির পরে জর্জ, দুই শিশু দোড় গোড়ায়। তার ভয় হচ্ছিল ন'মাসের শিশু জেমস হাঁটতে শেখে নি যে, সেও হামাগুড়ি দিয়ে চলে আসবে বারান্দায়। তার তখনো বুলি ফোটে নি মুখে, সে তবু তাকে তিরস্কার করবে বার্থার মতো।

রেবেকা বলেছিল, সে আমার সখী হওয়ার চেয়ে আমার মরণ ভালো।

চুপ করো রেবেকা, কী বলতে কী বলছ তুমি!

রেবেকা বলল, আমার মরণ কামনা করো তুমি, কিন্তু আমি মরিব না, বলো কতদূর গিয়াছ তুমি ওই দুশ্চরিত্রার সহিত?

দোরগোড়ায় দাঁড়ান ফিবি কেঁদে উঠেছিল, আমার খুব ভয় করে মা।

মধু ডেকেছিল, কাছে এস, কিসের ভয়?

নো, বার্থা ছুটে গিয়ে ফিবিকে ধরে মায়ের কাছে নিয়ে গেল। তার সঙ্গে জর্জও এল মায়ের কাছে। তিন সন্তানকে আঁকড়ে ধরে রেবেকা জোর পায়, চাপা গলায় বলে, ইহাদের মুখ দেখিতে পাও, তোমার মায়া নাই?

মধু ভেবেছিল, হেনরিয়েটা তার বুকের একভাগে থাকুক, রেবেকা আর একভাগে। ডান অলিন্দ আর বাম অলিন্দ, দুই অলিন্দে দুজন থাকুক। কিন্তু তা ছিল তার মনের ভিতরের কষ্টকর বোঝাপড়া। হেনরিয়েটা তার সর্বস্ব অধিকার করে নিয়েছে তখন। বারবার বলছে, মধুকে ছাড়া সে বাঁচবে না। তার সংস্পর্শে এসে মধুর কাব্য প্রতিভার স্ফূরণ হবে। রেবেকা তার যোগ্য নয়। ঝড় উঠেছিল মধুর মনে। হেনরিয়েটার কথা ধ্রুব মনে হচ্ছিল। হেনরিয়েটা বলেছিল, রেবেকা তার যোগ্য নয়, সে শেষ অবধি মধু কথা মেনে নেবে না, না মেনে নিয়ে করবে কী? মধুও তেমন ভেবেছিল। মধু বলেছিল, শোনো সে বড় দুঃখী মেয়ে, সে যদি তোমার দাসী হয়ে থাকে রেবেকা, প্রিয়তমা?

কী বলিতেছ তুমি নিজেও জান না, তোমার পিতা এমন করিয়াছিল শুনিয়াছি, তুমি কি বলো আমার কোনো সম্মান নাই, এদেশে ইংরাজের সুশাসন, ইহা তুমি কী করিয়া করিবে, কোনো খ্রিস্টান ইহা করিতে পারে?

মধু বলল, শান্ত হও রেবেকা, আইনে ইহা হয় না বটে, কিন্তু তুমি কনসেন্ট দিলে কোনো অসুবিধা নাই।

আমি কেন কনসেন্ট দিব পোয়েট? ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল সন্তানের মা। তার সামনে অকুল দিকহীন মহাসাগর ফুটে ওঠে। মেঘময় আকাশ। হাল ভেঙে সে যেন হারিয়েছে দিশা। সে কী ভয়ানক সকাল! সে বুঝতে পারছিল, এ দেশে এমন হয়ে থাকে। হিন্দু ধর্মে বহু বিবাহ অতি স্বাভাবিক। তাকে মধুই বলেছিল তা। মধু বলেছিল, হিন্দু সমাজপতি, ব্রাহ্মণ আর কায়স্থকুলের পুরুষরা নিজেদের যথেচ্ছ ভোগের ব্যবস্থা করে রেখেছে ধর্মের নানা অনুশাসনে। 'এক একজন ব্রাহ্মণ কত যে বিবাহ করিয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্বশুরবাড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার সমস্ত জীবন কাটিয়া যায়।' বহু বিবাহ, বহুগামী হওয়া হিন্দু পুরুষের অধিকার।

মধু বলেছিল, হিন্দু ধর্ম আর হিন্দুজাতি ধ্বংসের মুখে, হিন্দু এক বৃদ্ধ জাতি, এর মৃত্যু আসন্ন, বিশাল মর্মরের তৈরি কবর মুখ ব্যাদন করে আছে হিন্দু জাতি আর ধর্মকে গ্রাস করতে। কী অপূর্ব বলত মধু, হিন্দু ধর্মের এই বিনাশ অপ্রতিরোধ্য এবং নিয়তি নির্ধারিত। এ যেন এক অতিকায় অর্ণবপোত, পাল তুলে চলেছে দিকহীন পথে। সমুদ্রের ভিতর যে ডুবো পাহাড় থাকে, সেই পাহাড় অপেক্ষায় আছে অর্ণবপোতের জন্য, চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে। কে আর ওই মৃতকে তুলে সুন্দর জীবন দান করবে? কার হাতে হবে তা?

ভাঙা অর্ণবপোতের টুকরো অংশগুলোকে জুড়ে কে আবার অর্ণবপোতের আদি রূপ ফিরিয়ে দেবে?

মধু সেই কারণেই নাকি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তার রক্তের ভিতর কি পিতা আর পূর্বপুরুষের ব্যভিচারি মন জীবন্ত রয়েছে! না হলে এই ফুলের মতো শিশুদের কথা মনে এল না ওই মিঃ হোয়াইটের মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সময়? রেবেকা এবার বলল, আমি মরিবার পর তোমার কনসেন্টের প্রয়োজন হইবে না পোয়েট।

মধু চুপ করে থাকে। রেবেকা ফুঁসছিল। সমাজকে অগ্রাহ্য করে বিবাহের এই ফল। সে বলল, কিন্তু আমি অত সহজে মরিব না পোয়েট, আমি হেনরিয়েটাকে তোমার জীবনে প্রবেশ করিতে দিব না, কে দিতে চায় তাহার প্রিয়জনের ভাগ অন্য নারীকে?

মধু বলল, সে তোমার কৃপা প্রত্যাশী রেবেকা, তোমার দয়া চায়।

রেবেকা বলল, অভিনব কথা শুনাও তুমি পোয়েট, তুমি আমাকে গডেস মনসার কথা শুনাইয়াছিলে, কালনাগিনী, ব্ল্যাক স্নেক, ওই হেনরিয়েটা তাই, কোন ছিদ্রপথে প্রবেশ করিল কহ, আমি উহাকে এনট্রি দিব না, আমি আমার সমাজে কমপ্লেন করিব এই রূপ অসামাজিক কাজের কথা জানাইয়া।

তুমি এত নিষ্ঠুর হতে পারবে।

ক্রুয়েলটি? কতটা ক্রুয়েল হইলে এই কথা তুমি বলিতে পারো মধু! তোমার মধুরতা আর নাই, মায় হানি, পোয়েট মধু, তুমি কি সে যে আমাকে ভালবাসিয়াছিল!

তখনই আকাশে মেঘ গর্জন শোনা গেল। উপরে তাকায় হাবলু, ঘন ঘোর মেঘপুঞ্জে কলকাতার আকাশ ছেয়ে গেছে। দুই বুড়ি একে অপরের দিকে তাকিয়ে আচমকা নীরব হয়েছে। রেবেকা দেখছে অকাল বৃষ্টি নামল মাদ্রাজ শহরে।

বাহান্ন

মধু তার পিতা রাজনারায়ণ দত্তের দ্বিতীয় বিবাহের কথা রেবেকাকে নিজেই বলেছিল। কোনো কিছুই গোপন করে নি। মা জাহ্নবীর সম্মতির জন্য সাগরদাঁড়ি থেকে পত্র পাঠিয়েছিল রাজনারায়ণ। সেই পত্রই সম্মতি। মা জাহ্নবীর কোনো উত্তরের প্রয়োজন ছিল না তার কাছে। রেবেকা টের পেয়েছিল পিতার পথেই পা বাড়তে চায় পুত্র। কিন্তু সে জাহ্নবী দাসী নয়। সে রেবেকা টমসন ডাট। সে ইংরেজ তনয়া। তার ভিতরে নীল রক্ত প্রবাহিত। ইংরেজ এই দেশের কল্যাণে শাসনভার হাতে নিয়েছে। এসব কথা মধুর কাছেই শোনা। মধুই তো তাকে বলেছে, এ দেশের সুপ্রাচীন সভ্যতা এখন অস্তাচলে। হিন্দুধর্ম বার্ধক্যে পীড়িত। ইংরেজ এ জাতিকে পতনের হাত থেকে উদ্ধার করতে এসেছে। সে জাহ্নবী দাসীর মতো আত্মসমর্পণ করবে না। পারবে না। ক্রুদ্ধ রেবেকার চোখে জল

এসে যায় দুঃখে, কান্না সংবরণ করে বলেছিল, ইহাকে কুপ্রস্তাব কহে, আমি ইহাতে রাজি নহি, তুমি হেনরিয়েটার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিবে, এই প্রত্যাশা করি।

শুনতে শুনতে বীরাঙ্গনা বলল, মধুর নিন্দায় বুক ফেটে যায় রেবেকা, বুন, আর শুনতে পারি নে, আর বলিস নে।

রেবেকা বলল, তাহার মনে দয়ামায়া ছিল না, মধু তো ফিরিল না হেনরিয়েটার নিকট হইতে, বরং আরো মত্ত হইল সেই নাগিনীকে লইয়া, তাহাদের অভিসার চলিতে লাগিল।

বীরাঙ্গনা চুপ করে থাকে। কী বলবে সে? সবই সত্য। রেবেকা বলতে থাকে তার দুঃখের কথা, তারপর কত কথা শুনিতে পাইলাম হেনরিয়েটা আর মধুকে লইয়া, সমাজের লোক কহিতে লাগিল তাহাদের কোথায় কোথায় দেখা যায়, কোন উদ্যানে যায় তাহারা, ছেলেমেয়েরা তাহাদের পিতার সহিত কথা বলে না, কী ম্লান মুখ তাহাদের, কিছু না বুঝিলেও বুঝিয়াছে কিছু মনে হয়। আহা সে মুখ যেন কোনো মাকে না দেখিতে হয়, তাহাদের পিতা আর তাহাদের নাই।

বীরাঙ্গনা মাথা নিচু করে মধুর সমাধির উপর তাকিয়ে থাকে। এতটা সে ভাবে নি কখনো।

রেবেকা বলছে, বার্থা আবার দেখিল তাহার পিতা সেই যুবতীর সহিত চলিয়াছে চার্চে, সে আর সহ্য করিতে পারিল না, তাহাদের সমুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, তুমি কে, আমার পিতার হাত ধরিয়াছ কেন, তোমার কারণে আমার মা চার্চে আসে নাই, আমি প্রতিবেশীর সহিত আসিয়াছি, তুমি আমার পিতাকে ছাড়ো।

ক্রুদ্ধ হেনরিয়েটা বলল, তোমার কন্যা সহবত জানে না, রেবেকা উহাকে সে শিক্ষা দেয় নাই, বরং আমাকে অপমান করিতে পাঠাইয়াছে, আই লাভ ইউ পোয়েট, আমি তোমাকে ছাড়িব না।

শুনতে শুনতে বীরাঙ্গনা বলল, শর্মিষ্ঠা নাটকের কথা বলিস যে বউ, রাজা যযাতির দুই প্রেম, দেবযানী আর শর্মিষ্ঠা, শর্মিষ্ঠার ছেলেরা এমনভাবেই দাঁড়িয়েছিল যযাতির সমুখে।

নাটক নহে, ইহা লাইফ, চরম সত্য সিস্টার।

শুধু কি তোর কষ্ট ছিল বউ, তার ছিল না, তোকে কি সে ভালবাসে নি?

ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু পরে হেনরিয়েটা আসিলে তাহার স্মৃতি হইতে আমি মুছিয়া গিয়াছিলাম।

না রেবেকা তা নয়, তোমাকে সে ভোলে নি বুন।

তুমি মধুর হইয়া কথা কহ কেন, সে ছিল অকৃতজ্ঞ, নিষ্ঠুর এক পুরুষ, সে তাহার পিতামাতাকেও ভুলিয়াছিল, ভোলে নাই? তীক্ষ্ণ স্বরে বলল রেবেকা। উত্তেজনায় ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল, সেলফিস!

মাথা আবার নিচু করল বীরাঙ্গনা দাসী। কী করে এই কথার জবাব দেবে সে? কথা কি সত্য নয়? কিন্তু কবি তো অমন হয়। সে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে অতি প্রিয়জনকে। রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করে সে চরম দারিদ্রকে বরণ করে নিতে পারে। মধু কি তা নেয় নি? রাজনারায়ণ দত্তর কম ছিল? হেলায় ত্যাগ করল সে। বিলেতে গিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে ছিল না সে? এসব কথা রেবেকা কি শোনে নি। কিন্তু শুনলেও তো তার কষ্ট যাবে না, ক্ষোভ যাবে না। তাকে যে ছেড়ে এল মধু, আর তো ফেরে নি। সন্তানদের কথাও মনে রাখে নি। তাদের উপর কি কোনো মায়া ছিল না তার? রেবেকার চোখের জল ফোটা ফোটা পড়ছে মধুর সমাধির উপর। রেবেকা রেবেকা, তুই বুন ভুলে যা, যদি না-ই ভুলবি তবে এখেনে এলি কেন? ঘৃণা কর দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদনকে। ঘৃণা করে সরে যা। হায়রে জীবন! এত ঘৃণা যদি থাকে তোর, হতভাগী এলি কেন সমাধির পাশে?

আমি যে মধুকে ভুলিতে পারি নাই সিস্টার। বলতে বলতে মুখে দু'হাত চাপা দিল রেবেকা টমসন ডাট। বীরাঙ্গনা চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। নোনাপুকুরের এই গোরস্থানের মাথার আকাশে এক টুকরো সজল মেঘ। কবরস্থানের প্রাচীন গাছগুলি এত সময় ছিল নিস্পন্দ। এখন তার ডাল-পাতারা ধীরে ধীরে আন্দোলিত হচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে পশ্চিমদিক থেকে। রেবেকা বলতে থাকে, সে কলিকাতায় গেল আর ফিরিল না, হেনরিয়েটা কবে গেল জানি না, আমি জাহাজঘাটায় খোঁজ নিই, কলিকাতা হইতে কোনো জাহাজ কি আসিবার কথা আছে? পোস্ট অফিসে খোঁজ নিই, কোনো পত্র আসিল কি রেবেকা টমসন ডাটের নামে? জাহাজ কত আসে, পোয়েট মাইকেল এম ডাট নাই। মাদ্রাজের পোর্ট আমার মধুকে একেবারে বিদায় দিয়াছে। ওই পোর্টে পোয়েট আর কোনোদিন পা রাখিবে না। সে এমন, ছাড়িয়া যায় তো একেবারে যায়। বার্থা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় পথে পথে, সঙ্গে থাকে ফিবি, তাহারা জানে তাহাদের পিতা শহরেই আছে কোথাও। লুকাইয়া আছে। জাদুকরী তাহাকে মেষে পরিণত করিয়াছে।

বীরাঙ্গনা বলল, সে আর ফেরে নি কোনোদিন।

হ্যাঁ, দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেবেকা, বলল, বিদায় ঘাট হইয়া গেল মাদ্রাজ পোর্ট, কপোতাকসর কথা আমি জানি সিস্টার, আমার মধু আমাকে সব কথা কহিয়াছিল, কী সুন্দর ছিল তাহার বিবরণ!

বিদায় ঘাট! শিহরিত হয় বীরাঙ্গনা, তুই তো সবই জানিস বউ!

মধু বলিয়াছিল, কপোতাকসোর ঘাটের কথা, ঘাট কহে তো উহাকে?

হ্যাঁ, নদী ঘাট, গোটা দেশই এখন বিদায় ঘাট, আমি কি আর সাগরদাঁড়ি ফিরব কখনো?

বিন বিন করে রেবেকা, ঘুমের ঘোরে বার্থা তাহার পিতার জন্য কাঁদে, অথচ দিবসে সে বলে বেশ হইয়াছে গিয়াছে, অমন পিতার প্রয়োজন নাই, সে কী ভয়ানক দিবস

রজনী পার হইয়াছে, দশমী দিবস, গডেস দুর্গা ইমার্সন হয় যে দিবসে, বড় দুঃখময় সে দিবসের আর শেষই হয় না, মধু কহিত কপোতাকসোর ঘাটে গডেস ইমার্সনের কথা, তাহা বুঝি সত্য হইল।

বীরাঙ্গনা ডাকল রেবেকাকে, আহা, বলিস নে আর, প্রমীলার দুঃখ তোর হয়েছিল রেবেকা।

মধু যাইবার তিন মাসের মাথায় কোলের ছেলেটি মরিল।

হা ভগবান! কেঁদে ওঠে বীরাঙ্গনা, কী শুনাস তুই বউ।

কবির সন্তান অনাথ-আতুর হইয়া গেল।

গুনগুন করতে থাকে বীরাঙ্গনা,

জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়?

তুমি তাকে বাঁধতে পার নি বুন, পরে কেঁদে কী হবে? আঁচলে চোখ মোছে বীরাঙ্গনা।

কী ভাবে বাঁধিব, কতজন বলিয়াছিল, পুয়োর, নেটিব ক্রিশ্চান, কেন উহাকে বিবাহ করিবি, আমি বলিয়াছিলাম ভালবাসিয়াছি তাই, আমাদের বিবাহের পর আমার সমাজের কতজন নিন্দা করিয়াছিল, ভর্ৎসনা করিয়াছিল, সে তখন কবিও হয় নাই, হি ওয়াজ এ পপার, বাট আই লাভড হিম, স্টিল আই লাভ হিম, সে স্বপ্ন দেখিত, দেখাইত, সব স্বপ্ন ছাই হইয়া গেল নিষ্ঠুর পুরুষের দ্বারা, পিতা মাতা স্ত্রী, সন্তান সকলকে ত্যাগ করিল সে কত অনায়াসে।

বীরাঙ্গনার সহ্য হয় না মধু-নিন্দা। মন হয় তার ঘৃণা উগরে দিতেই পুরোন কথা তাকে শোনাচ্ছে রেবেকা টমসন ডাট। সারা জীবন আইনের বিচ্ছেদ পায় নি মধু, তাই হেনরিয়েটাকে বিয়ে করতে পারে নি। শোধ নিয়েছিল রেবেকা। সন্তানদের তাতিয়ে ছিল, তাই বালিকা কন্যাও বাবাকে অপমান করে মায়ের ইন্ধনে, তারপর রাতে ঘুমের ঘোরে কাঁদে। ফিবি বলত, বাবা খারাপ মানুষ তাই মা তাকে আসতে দেয় না। বীরাঙ্গনা কঠিন স্বরে বলল, তোমাকে ভালবাসত না মধু, ভালবাসত না বলেই তোমাকে ছেড়ে চলে আসে সে।

বজ্রপাত হয় যেন গোরস্থানে। গাছে গাছে আগুন ধরে গেল বুঝি। রেবেকা নিস্তব্ধ দুপুর চূর্ণ করে আর্তনাদ করে ওঠে, কী কহো তুমি বীরাঙ্গনা, ভালবাসিত না?

না, তাই ফিরে আসে।

আমার সন্তানরা ভালবাসায় জন্মায় নাই?

না। খুব কঠিন স্বরে বলল বীরাঙ্গনা।

মিথ্যা, তুমি মিথ্যা কহিতেছ, তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ ক্যাপটিভ লেডি কাব্যে সে কী লিখিয়াছিল আমাকে লইয়া? বলে কাঁদতে কাঁদতে ছেড়া গাউনের পকেট থেকে বের করল পুরানো এক পোকায় কাটা বই। খুব সাবধানে তার পাতা খোলে, মাথা নত করে বই-এর পাতায়, ধীরে ধীরে পাঠ করতে থাকে ক্যাপটিভ লেডি,

Come, list thee, gentle one!–and whil'st the lyre
Breathes softer melody for thee, mine own?
I'll weave the sunny dreams, those eyes inspire,
In wreathes to consecrate to thee alone,-
Love's offering, gentle one!–to Beauty's queenly throne.

(এ, তোমার জন্য রচনা করা এই কোমল সুর শোনো,
নরম বাতাসের মতো এই স্বর আমারই সৃজন
সূর্যকরোজ্জ্বল স্বপ্ন বুনিব আমি, তোমার নয়নে এ নয়ন মেলিয়া,
শুধুই গাঁথিব প্রেমের মালা, সুন্দর তুমি, রানির মতো বসিয়াছ যে সিংহাসনে
কতই মধুর তোমার নয়নে এ নয়ন রাখা, নয়নে তোমার রয়েছে প্রেমের আলোকমালা)

হাবলু শুনতে পাচ্ছে। কোথা থেকে যে খুনখুনে নারী কণ্ঠে বেজে উঠছে নীল নয়না ইংরেজ কন্যার প্রতি নিবেদিত প্রেম। হাবলু কিছুই বুঝতে পারছে না, কিন্তু শুনতে বড় ভাল লাগছে। কেউ যেন মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করছে ইংরেজি শব্দগুলি। কে? সে এদিক ওদিক তাকায়। পরপর সমাধি ফলক। হেনরিয়েটাও শুয়ে আছে এখানে, কবি তার পাশে। রেবেকা দূর মাদ্রাজে। তার মনে হলো প্রাচীন বৃক্ষেরা বুঝি কবরে কফিনে শায়িত কবিকে শোনাচ্ছে সেই গান। গানের মতোই শুনছে সে। রেবেকা অশিক্ষিত, রেবেকা কাব্য কবিতা বোঝে না, কিন্তু ভালবাসিতে জানে। সারাজীবন ওই গ্রন্থখানি সঙ্গে নিয়ে বেঁচেছে। মধু জানতেও পারে নি তা।

এমন ভালবাসিতে কে জানিত, মধু, মাইকেল এম ডাট, ভাল না বাসিয়া তুমি লিখিয়াছিলে? ঝুঁকে পড়ে আর্দ্র স্বরে জিজ্ঞেস করে রেবেকা, বলো পোয়েট, না শুনিয়া মরণের পরেও আমার দুঃখ যাবে না, বলো পোয়েট, হেলো, হেলো, মায় হানি, শুনতে পাও মধু? মায় ডিয়ার মাডু।

বীরাঙ্গনা বলল, বড় কষ্টে ছিল তখন, কী দুঃখ পেয়েছিল সে তা কি তুমি জান রেবেকা?

রেবেকা বলল, পপার আবার পপার হইয়া গিয়াছিল শুনিয়াছিলাম।

ছিহ! ওই কথা বলতে নেই।

দুঃখে বলি সিস্টার, মাদ্রাজে থাকিলে সে কষ্ট পাইত না।

বীরাঙ্গনা মাথা নাড়ে, বলে, কবির জীবন এমনি হয়।

রেবেকা বলল, আমি তো ভালবাসিয়াছিলাম সিস্টার, শুধু ভালবাসায় কি জীবন পূর্ণ হয় না?

বীরাঙ্গনা চোখে মোছে, কে জানে এই কথার উত্তর? পুরুষমানুষ বহুগামী, ভালবাসার মর্যাদা দিতে পারে না। তার রক্তের ভিতরেই রয়েছে ওই বীজ। রক্তের ভিতরে যে ভিন্ন পুরুষ ঘুমিয়ে থাকে, সে জেগে উঠলে কে করবে প্রতিরোধ? কিন্তু এই কথা কি রেবেকাকে বলা যায়, কবি নিজের দুঃখকে সমস্তজীবন ধরে নিজের ঘরে ডেকে এনেছিলেন। বীরাঙ্গনার মাসসাই বলত, নিয়তি ছিল ওই, আর ওই নিয়তিই তাকে দিয়ে মেঘনাদের মরণকথা লিখিয়ে নিয়েছে, যা লিখে গেছে মধু, সবই শোকগাথা, সব বুঝি ওই চরম দুঃখকে ধারণ করে, আহা, তার জন্য কে না চোখের জল ফেলবে, কাঁদ রেবেকা কাঁদ, ভুলে যা সব, রাবনরাজার মতো শোক পেয়েছে মধু, মেঘনাদের মতো বেঘোরে মরেছে মধু।

বীরাঙ্গনার মনের কথা কি শুনতে পায় রেবেকা? বুঝতে পারে বুড়ি মেম? বুড়ি হয়েই তো মরেছিল সে, মাদ্রাজ পোর্টে গিয়ে বসে থাকত, গাউনের পকেটে ক্যাপটিভ লেডি। তার কাছে সময়েই সংবাদ এসেছিল, তার মধু নেই, সে বিশ্বাস করে নি।

ওই যে বুড়ি মেম রেবেকা টমসন ডাট, ডাকছে কবিকে, ভালবাসিয়া লিখিয়াছিলে তো প্রিয়তম আমার। শুনিতে পাও মাড়ু, মায় হানি!

কে, কে এসেছে? মাটির তল থেকে জলদ গম্ভীর স্বর উঠে এল বুঝি।

রেব্বেকা, মায় হানি, রেব্বেকা টমসন ডাট, আমি তুমার রেবেকা, বার্থা ফিবির মা।

আয় লাভ ইউ রেবেকা।

পার্ডন! মাথা নামিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল রেবেকা, আবার কহ।

আয় লাভ ইউ রেবেকা ম্যাক্টাভিস।

পার্ডন।

ভালবাসি, ভালবাসি, দিস ইজ বেঙ্গলি, আয় লাভ ইউ ইন বেঙ্গলি।

সো সুইট! কণ্ঠস্বর জড়িয়ে যায় রেবেকার।

পার্ডন। মধুকবি বলল।

থরথর করে কাঁপছে রেবেকা। মাইকেল এম. এস. ডাট একজন পোয়েট। এই প্রথম কোনো কবিকে দেখল রেবেকা। নেটিভ পোয়েট, কিন্তু লেখে ইংলিশে। ইংলিশম্যানের চেয়ে সে ইংলিশ অনেক সুন্দর লেখে আর বলে। পোয়েট তার ম্যানুস্ক্রিপ্ট রেখে গেছে তার কাছে। লং ভার্স লিখেছে পোয়েট। কবির প্রেম নিবেদনের পর ঘুম গেল রেবেকার। কী করে পড়বে সে ওই লং ভার্স, কবি ছাড়া ওই কাব্যভাষা বুঝিয়ে দেবে কে? বরং কবির হাতের ছোঁয়ায় নিজের হাত বুলিয়ে তার কত সুখ। মনে হয় কবির বুকে হাত রেখেছে সে। কবি তার রক্ত মাংস নিয়ে ওর কবিতার খাতার ভিতরে আছে। গোপনে চুমু দেয় রেবেকা ওই খাতার পাতায় পাতায়। চুমু দিয়ে আরো অনিদ্রায় ডুবে যায়। কী দিন না গেছে সেই সব। মনে পড়ে পোয়েট?

সেই লং ভার্স ছিল গোপনে রেবেকা ম্যাক্টাভিসকে নিবেদন। রেবেকা ম্যাক্টাভিস, নীলকরের কন্যা, নীল নয়না শ্বেতাঙ্গিনী। বীরঙ্গনার মনে হয় কবরের অতলে শুয়ে কবি মধুসূদন চোখের জল ফেলছে রেবেকা টমসন ডাট-এর ডাক শুনে। বৃষ্টি নামল। এমন ভালবাসা বর্ষার মেঘ ডেকে আনে গোরস্থানের আকাশে। গোরস্থানের মাটি লতাগুল্মের গন্ধে ভরে যায়।

বীরাঙ্গনা এসব জানে। সাগরদাঁড়ির মেয়ে সে। সব জানে। রেবেকার কথা, হেনরিয়েটার কথা। তার স্বামী তাকে সব বলে গেছে যে। সেই লোকটা যা বলে গিয়েছিল, শিখিয়ে গিয়েছিল সব সে মনে রেখেছে। ভুলে গেলেও আবার মনে পড়ে যাচ্ছে হাবলুকে বলার সময়। যেন অকালে চলে যাওয়া নিজের স্বামীকেই শোনাচ্ছে সে।

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে,
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!—

এ তো রেবেকার কথা হাবলু। সতত রেবেকার কথা, কপোতাক্ষই তো সেই হতভাগিনী রে, সতত রেবেকার কথাই মনে পড়েছে তার, বিলেতে হোক, কলকাতায় হোক, কপোতাক্ষ আর রেবেকা যে এক হয়ে গেছে।

হাবলু ডাকল, দিদমা যাবে তো, বিস্টি নামল।

চমকে ওঠে বীরাঙ্গনা, কই সে? কোথায় মধুর কপোতাক্ষ?

হাবলু বলল, চলো এবার।

রেবেকা! হতভাগিনীকে কত ভাল না বাসিয়াছিল কবি, আর সেও ভালবাসিয়া জীবনভর কাঁদিয়াছিল একা একা পুরানো বইটিকে সঙ্গে নিয়া। কবরের সামনে মাথা নুয়ে নিশ্চুপ হয় সাগরদাঁড়ির মধু বয়ে আনা বীরাঙ্গনা দাসী। আরো বৃষ্টি এল।

তিপ্পান্ন

হাবলু বলল, মা, জেঠির বাড়ি না রেখে দিদিরে নিয়ে আসি এখেনে।

হাবলুর মা সরমা বলল, এখেনে তো আমাদেরও থাকা চলবে না খোকা, এডা পাকিস্তান।

ওপারে যাবা কোথায় মা, হিন্দুস্তান পাকিস্তান রদ হবে।

মা বলল, ওসব কথা ঠিক না, মুসলমানে পাকিস্তান চায়, তারা হিন্দুদের অধীনে থাকবে না বলে, সত্যিই তো, কেনই বা থাকবে, আমাদের ওপারে যেতিই হবে, তুই কিছু ঠিক কর।

হাবলু চুপ করে থাকে। সে এপারে এসেছে মায়ের কাছে, পুজোর সময়। পুজো গেল টিমটিম করে। এখানকার হিন্দুরা পুজো করুক তাই চায় এখানকার মুসলমান, কিন্তু বাইরে থেকে যারা এসেছে সেই হাজি সায়েব আর তার সাকরেদ কলিমই আটকে দিল সব জৌলুষ।

হাবলু এল ক'দিনের জন্য। আসবে বলে ঠিকও ছিল না। কিন্তু বীরাঙ্গনা বলল, তোরে যে দিল্লি নিয়ে যাব তা তোর মা বাবার জানা উচিত হাবলু, তাদের বলে আয়, আর দেখে আয়, দেখিস নি তো অনেকদিন, পুজোটা মা বাপের কাছে থাক।

তা ঠিক। দিল্লি যে যাবে ফেরার কিছু ঠিক আছে? তার আসল উদ্দেশ্য তো প্রধানমন্ত্রী নেহেরু আর প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদজীর সঙ্গে দেখা করে আর্জি জানানো। আর্জি খুব পরিষ্কার, মানুষ বড় দুঃখে আছে স্যার, হিন্দুস্থান পাকিস্তান তুলে দাও।

মানুষ বড় দুঃখে আছে, কতটা সে দুঃখ শুনবে মা, মনে করো তাঁর শ্বশুরবাড়ি সাগরদাঁড়ি, রেবেকা দাসী, মধুকবির কপোতাক্ষর ধারে বসে স্বামীর জন্য চোখের জল ফেলবে তারও উপায় নেই তাঁর, হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয়ে গেছে, তিনি পার্ক স্ট্রিটের কবরের ধারে বসে স্বামীর কথা ভাবেন আর কাঁদেন।

কী কথা বলে হাবলু? কোন মধুকবি? তাঁর বিধবা কি এখনো বেঁচে আছে? জানে না ভাল হাবলুর মা সরমা। জানবে কী করে, কে জানাবে? মধুকবির কথা অল্প অল্প শুনেছে, তা পাশের জেলার মানুষ বলে। যশোর খুলনার কীই বা তফাৎ, গায়ে গায়ে। কপোতাক্ষ তো যশোর থেকে এই সাতক্ষীরে মহকুমায় এসে ঢুকেছে। সরমার বাপের বাড়ি আরো দক্ষিণে বাঁকা ভবানীপুর। তার পাশের গ্রাম রাঢুলিতে তার মামার বাড়ি। সেই গাঁয়ে তো পি সি রায়ের বাড়ি। সে বাড়ি সরমা দেখেছে ছোটবেলায়। কত বড় দালানকোঠা। বাড়ি দেখেই কৌতূহল গেছিল। বড় মানুষ ছিলেন তিনি, পণ্ডিত ছিলেন বিজ্ঞানী ছিলেন, এই পর্যন্ত। সে আর কি জানবে? জানার শক্তি থাকা তো চাই। জানতে হলে, নিজের কিছু জানা থাকা চাই তো। হাবলুর বাবা কিছু জানত। সেই বিয়ের পর বলত রবি ঠাকুরের কথা, ব্রিটিশের অত্যাচারের কথা। ক'দিন স্বদেশি নিয়ে মেতেছিল, তারপর ধীরে ধীরে থেমে গেল। গাঁয়ে বসে আর কতদূর এগোন যায়? আর লোকটা আদতে অলস আর ভীরু। এরপর ছেলেপুলে হতে আরম্ভ করল। জমিজমা ভাল করে দেখা প্রয়োজন পড়ল। শরিকদের থাবা থেকে জমি বাঁচান অতি সহজ নয়। লোকটা ঘোর সংসারি বটে, কিন্তু অল্পে খুশি। পাকিস্তান ছেড়ে যে ইন্ডিয়ায় যাবে, সে ঝুঁকি নিতে পারছে না। যাক যা হবার তা হবে। হাবলু এসেছে ওপার থেকে এতেই সরমার বুক জুড়িয়েছে। হাবলু এখন তার চোখ। সে-ই তাকে দেখাবে নতুন কিছু। এই যে বলল, রেবেকা দাসীর কথা, মধুকবির প্রথম পক্ষ, কিন্তু কোন মধুকবি? তাঁর বিধবা কি এখনো বেঁচে আছে?

হাবলু বলল, তা থাকে কী করে মা, মধুকবি রবিঠাকুরের চেয়েও বয়সে অনেক বড়।

তার বিধবা? মেয়েলি কৌতূহল জেগে ওঠে, সে কি বেঁচে আছে, ওঁর দুই বিয়ে না?

অন্ধকারে হাতনেতে বসে মা ছেলের কথা হচ্ছে। একটা টেমি জ্বলছিল তাদের সামনে। হাবলু তা নিভিয়ে দিয়েছে। কেরাচিনের আকালও চলছে এদিকে। এমন কি হিন্দু খদ্দেরের কাছে বেশি দাম নিচ্ছিল ডিলার, থাকলে বলছিল, নেই। কানে যেতে হাতেবরভাই বন্ধ করেছে। হাতেবরভাই বলেছে, 'এ ডামাডোল থামবে, তুমি ওপারে যেও না মৃগেন, ভেসে যাবা।' ভেসে যাওয়ার কথাটা মনে পড়ল সরমার। ভয় করে ওপারে যেতে, ভয় করে এপারে থাকতে। এখনো একটা মেয়ে রয়েছে, তারে কতদিন রাখা যাবে কে জানে। ধর্ম নিয়েই ভয় বেশি সরমার। মধুকবি ছিল হিন্দু, হলো খেস্টান। সারাজীবন তার জন্য কষ্ট পেয়েছে খুব।

হাবলু বলল, তাকে মাদ্রাজে রেখে মধু চলে এসেছিল মা।

তাই! একা থাকল তিনটে বাচ্চা নিয়ে। আহা! খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে সরমা। কেন যে ধর্ম ত্যাগ, ভয় করল না? হাবলু বলে রেবেকা দাসী আর হেনরিয়েটার কথা যেটুকু জেনেছে তা। শুনতে শুনতে অবাক হয় সরমা। হাবলু বলছে সব, সেই হাবলু। কী করে সে এত কথা জানল? সে তো কিছু জানে না। শুধু শুনেছিল দুই বিয়ে। দুই বিয়ে সে কম দ্যাখে নি। তার এক জেঠারই ছিল তো দুই বউ। ইস, ছোটবউ আসার পর শুধু কেঁদে মরত বড়জেঠি। কোনো বউ-এরই কোনো ছেলেপুলে হয় নি। জেঠা শেষে আবাদে গিয়ে পড়ে থাকত। দুই জেঠি শুধু ঝগড়া করত। সে জিজ্ঞেস করল, পেথম পক্ষের সঙ্গে দ্বিতীয় পক্ষের ঝগড়া হতো?

দেখাই হয় নি মনে হয় না।

তোরে এত কথা জানাল কেডা?

বীরাঙ্গনার নাম বলল না হাবলু, বলল, কলকাতায় গেলে সব জানা যায় মা।

মনে হয় তা, এই গাঁয় বসে কতডা জানবে কেডা?

কলকাতা যে কী তা তোমারে বুঝান যাবে না মা।

সরমা বলল, দুই বউ-এ দেখা হয় নি বলছিস?

হ্যাঁ হয় নি, মা পরের জন হেনরিয়েটার সঙ্গে বিয়েই হয় নি কবির।

ওমা, সে কী করে হয় রে! সরমা গালে হাত দিল। সে যেন তার কোনো প্রতিবেশিনীর সঙ্গে পাঁচা (পর চর্চা) করতে বসেছে। এসব কথা কি পুরুষ লোকের সঙ্গে হয়, নিজের ছেলের সঙ্গে? কিন্তু হাবলু তো ঝুপ করে বেড়ে গেছে ওপারে গিয়ে। এখানে থেকে এত বড়টি হতে পারত না মনে হয়। হাবলু বলছে, হেনরিয়েটা বিয়েই করতে পারে নি সারাজীবন।

ইস! বিয়ে না করে বউ হলো! কত বড় অন্যায়।

হাবলু বলল, মা, ডিভোর্স দেয় নি রেবেকা, তাই।

পরের পক্ষের ছেলেপুলে ছিল?

ছিল মা, এক মেয়ে শর্মিষ্ঠা, আর দুই ছেলে মেঘনাদ, নেপোলিয়ন।

ছিহ্! তুই এসব কী করে জানলি?

কলকাতায় গেলে জানা যায়।

এসব জানা তোর ঠিক হয় নি খোকা।

হাসল হাবলু, অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল। হাট থাকলে তবু এই আশাশুনি গ্রামের নিথরতা একটু কাটে। বাজরে গেলে লোকের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। তা বাদে দিন রাত যেন একই রকম। কোথাও কোনো শব্দ নেই। বহুদূর থেকে অনেক রাতে ভেসে আসে কোনো মানুষের গলার আওয়াজ। কেউ কাউকে ডাক দেয় বুঝি। গরু, হাঁস কুঁকড়ো হারালেও অমন করে তাকে ডেকে ডেকে ঘোরে মানুষ। হ্যাঁ, এই গাঁয়ে শোনা গিয়েছিল আল্লা হো আকবর ধ্বনি। মসজিদের দিক থেকে তখন প্রায়ই রাতে উঠত ওই আওয়াজ। আজানের ডাক চোঙা দিয়ে ডেকেও অত জোর তুলতে পারত না ইমামভাই। তা বাদে গ্রাম সারাদিন প্রায় বোবা হয়ে থাকে।

অথচ কলকাতায় কী হয়, সারারাত ধরে গাড়ি চলে সেখানে। কত আওয়াজ, কথা কখনো থামে না কলকাতায়। কত কথা কলকাতায়। গড়ের মাঠে যাও মানুষ মুখোমুখি বসে কথা বলে যাচ্ছে। আর বলছে বলেই সব কথা কলকাতায় গিয়েই জানা যায়। কতরকম লোক সেখানে। জানতে হবেই মা মধুকবি আর রেবেকা আর সেই হেনরিয়েটার কথা। না জেনে কী করে থাকব, আর তোমার হাবলু বড় হয়ে গেছে। রেবেকা ডিভোর্স দেয় নি তো মধুকবি আবার কী করে বিয়ে করে?

সরমা জিজ্ঞেস করে, ডিভোস কী?

মুসলমানদের যেমন তালাক মা, খ্রিস্টানদের বিচ্ছেদ।

থাক ওসব আর বলতে হবে, অলক্ষুনে কথা সব। বলে সরমা চুপ করে থাকল। হাবলুও। সরমার মনে হয় তার ছেলে অনেক অনেক বড় হয়ে গেছে এই বছর দেড়ের ভিতর। বিচ্ছেদ বুঝে গেল। বিচ্ছেদ! হাবলু কঠিন কথাটা কি ভাবে বলে দিল। বিচ্ছেদ মানে আলাদা হওয়া তো। যেমন হিন্দু মুসলমানে ওইটা হয়ে আলাদা দেশ হয়েছে, তেমনি। এসব কথা নিয়ে আলাপ করতে ভয় লাগে। হিন্দু মুসলমানে তো হলো ওই সব। উচ্চারণ করতেও বুক কাঁপে। তার কাছে সেই মধুকবি আর রেবেকার বিচ্ছেদ যেন এপার ওপারের বিচ্ছেদ। কিন্তু এই ভিন্ন হয়ে যাওয়া তো তাদের ইচ্ছেমতো হয় নি। এইসব ভাবতে ভাবতে সরমা বলে, কিন্তু আর একটা বিয়ে করতে ওসব লাগবে কেন, বিয়ে করতে ওসব দরকার হয়?

হয়, খ্রিস্টানদের ওসব দরকার পড়ে, যে কেউ ইচ্ছে মতো বিয়ে করতে পারে না।

সরমার দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এতো বেশ ভালো। রেবেকা মত দিল না তাই

সারাজীবন বিয়ে করা হল না মধুসূদনের। ওই ধর্মে মেয়েমানুষের এত জোর! তার নিজের জেঠা কি মত নিয়েছিল প্রথম পক্ষের? তার বাপের বাড়ির গাঁয়ের হরিচরণ বাঁড়ুজ্যের সাতটা শ্বশুর ঘর ছিল শোনা যায়। এসব কথা হাবলুকে জিজ্ঞেস করা যায় না। কিন্তু মধুকবির দ্বিতীয় পক্ষের কথা সে হাবলুর কাছে জেনে নিতে থাকে। আশাশুনির মতো গ্রামে বাইরের আলো নেই বললেই হয়। সে এসব কথা কোনোদিন শোনে নি। জিজ্ঞেস করল, সে খুব সুন্দরী?

মেম সায়েব যেমন হয়, তেমনি হবে মা।

দুই পক্ষই তো মেম, তাই না?

তাই তো শুনেছি মা।

দেখিস নি?

তারা সব মরে হেজে গেছে কবে, মধুকবি আর হেনরিয়েটা দুদিন আগে পিছে করে প্রায় একসঙ্গে মারা গিয়েছিল, খুব কষ্ট পেয়েছিল তারা।

তোরে এসব বলল কেডা?

সাগরদাঁড়ির বীরাঙ্গনার কথা বলে হাবলু। সরমা শুনতে শুনতে অবাক হয়ে বলে, তুই কলকাতার এই খবর আনলি খোকা, তুই কত বড় হয়ে গেলি!

মা ছেলের কথা হয় কত রাত্তির অবধি। বীরাঙ্গনার কথা হয়, মধুকবির কথা হয়। সেই কথা গিয়ে পড়ে বনগাঁয়ে জেঠার বাড়িতে। এতক্ষণে সরমা প্রকাশ করে তার কৌতূহল, বলল, ওই যে ফণিভূষণ না কে তার কত বয়েস?

চমকে যায় হাবলু, ফণিদার কথা বলল কে মা?

কেউ বলে নি, চিঠি এয়েচে বনগাঁ থেকে, তোর জেঠার, তার সঙ্গে তোর দিদিরও।

কী লিখেছে দিদি?

একটা দোজবরে বুড়ো নিয়ে গিয়েছিলি বনগাঁ, তার সঙ্গে বুলির বিয়ে দিবি?

জেঠা লিখেছে?

না তোর দিদি।

জেঠা কী লিখেছে?

ওই কথাই লিখেছে, তুই কি এসব বুঝিস?

বাবা জানে?

উনি তো চোখে দ্যাখেন না প্রায়, চিঠি আমি পড়লাম, তোর বাবারে বলি নি।

হাবলু বল, সব জেঠির বুদ্ধি মা, বিনি পয়সার ঝি পেয়েছে, দিদিরে দিয়ে লিখিয়েছে ঠিক, জেঠাও তাই, জেঠির ভয়ে লিখেছে এসব।

সে কেমন, ওই ফণিভূষণ?

হাবলু সব বলতে থাকে। বনগাঁর কথা ফণিভূষণের কথা, জেঠার ছেলে অবনীর

কথা। শুনতে শুনতে সরমা চোখে কাপড় দেয়। মেয়েটারে ভাসিয়ে দিল নাকি তারা? হাবলু থাকলে তবু হতো, ভাই বোন একসঙ্গে থাকবে বলেই তো পাঠানো। সরমা বসিরহাটের ননদের বাড়ির কথাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে। জিজ্ঞেস করে মেয়ে ডলুর কথা। পিসির বাড়িতেও হাবলুর স্থান নেই, সব কথা শুনতে শুনতে সরমা বলে, তা'লে তোর দিদি কি ফিরে আসবে?

আমি দিল্লি থেকে ঘুরে আসি মা।

কাজ দ্যাখ খোকা, কাজ দ্যাখ, তুই এ বাড়ির বড় ছেলে।

হাবলু বলে, সব আবার আগের মতো হয়ে যাবে মা, যাবেই।

অন্ধকারে আরো বিষণ্ণ হয় সরমা, অন্ধকার আরো নিবিড় হয়। ছেলে যাতে মনস্থির করে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না। যে ঘটনা কোনোদিন হবে না, সেই ঘটনা ঘটাতে চায় হাবলু। কোনো বাস্তব-বোধ নেই ওর। এত দাঙ্গা এত রক্তপাত, মানুষের এত কষ্ট, তারপরে আবার জোড়া লাগে নাকি দেশ? সম্পত্তি ভাগ হলে, হাড়ি ভিন্ন হলে সংসারে কি আবার মিলমিশ হয়? হাবলু এসব জানে না, বোঝে না। যদি ওর ওই কথা সত্যি হয়, আবার রায়ট হবে। ফেলে যাওয়া সম্পত্তি নিতে যদি ফেরে মানুষ, যারা দখল করেছে তারা কি এমনি ছেড়ে দেবে? যেদিন চলে যায়, চিরকালের মতোই যায়। ফিরতে পারে না সে। সরমা বলল, তুই দিল্লি গে চাকরি দ্যাখ খোকা, তাহলি আমরা সবাই ওপারে চলে যাব, দিদি আর বুনির বিয়ে দিতি হবে তো, ভাইটা কি খড়্গপুরি পড়ে থাকবে?

হুঁ। হাবলু অস্ফুট স্বরে মায়ের কথায় তাল দিল।

মন সব সময় ব্যস্ত হয়ে থাকে খোকা, ছেলেমেয়েগুলোরে পার করে দিয়ে কী হলো বল।

আবার সব ফিরে আসবে মা।

কী সব বলিস তুই, মুসলমানরা থাকবে না হিন্দুর সঙ্গে, ওদের কিছু ছিল না, এবার যদি হয়।

কেডা বলে এসব কথা? হাবলু জিজ্ঞেস করে।

তোর হাতেবর চাচা, বলে পোদ, চাঁড়াল, ডোম, ক্যাওট, কৈবত্ত আর মুসলমানের এক অবস্থা, সবাই গরিব, তারা পাকিস্তানের পক্ষে, তোর বাবার সঙ্গে বলছিল, আমি শুনেছি, গরিব মানুষ কেন ছাড়বে যা পেয়েছে তা।

কী পেয়েছে?

পাকিস্তান।

হাবলু চুপ করে কথাটা বুঝে নিতে চায়। কথাটা কি ঠিক? পাকিস্তান কি গরিবের দেশ হবে? তাহলে তারা ভাই বোনরা ওপারে ভেসে বেড়াচ্ছে কেন? তার দিদি জেঠির ঘরে ঝিগিরি করছে কেন? শিয়ালদা স্টেশনে অত রিফ্যুজি কেন? কী ভয়নাক দশা তাদের। আর পোদ, চাঁড়াল, ক্যাওট কি পালায় নি পাকিস্তান থেকে? তাহলে বনগাঁ, শিয়ালদা স্টেশনে কারা পড়ে আছে বামুন কায়েতের সঙ্গে?

সরমা বলে পাকিস্তানে তাই হবার কথা ছিল।

হাবলু জিজ্ঞেস করে, হবে না?

মানুষটা আপশোস করে, হবে না, ধম্ম, ধম্ম করছে সব।

হাবলু বলল, এত ধম্ম ধম্ম করলে কি কারোর ভালো হয় মা?

সরমা অবাক। কত বড় হয়ে গেল ছেলে? এসব কথা বড় ভাল কথা, কিন্তু বলায় বিপদ আছে। আগে একবার হাবলু ঝামেলায় পড়েছিল, এখন গ্রাম গঞ্জ বদল হয়ে গেছে। মানুষের মন বিষিয়ে গেছে স্বাধীনতা আর পাকিস্তান হওয়ার পর। সে হাবলুকে বলে, হয় না যে তা কেডা না জানে? কিন্তু সে কথা এক, হিন্দুস্থান পাকিস্তান এক হওয়া আর এক, তা কেউ মানবে না, তুই ওসব কথা বলবি নে এখেনে।

হাবলু চুপ করে থাকে কিছু সময়, তারপর বলে, আমি আর আসব না মা।

কোথায় আসবি নে?

এপারে, যতদিন না আমার কথা রাখতে পারি ততদিন।

তাই বললি হয় খোকা, যা হয়েচে তা আর রদ করা যাবে না, তা বলে তুই আর আসবি নে! না আসবি তো আমাদের নে চ, চাকরি নিয়ে বাসা ঠিক কর ওপারে।

হাবলু বলল, আমি আগে দিল্লি যাই, পণ্ডিতজি আমার কথা ঠিক বোঝবে মা।

কোন পণ্ডিতজি?

মহাত্মাজি থাকলে আরো বুঝত, তিনি বেঁচে থাকলে সব অন্যরকম হতো।

তোর বাবা বলে নেতাজির কথা, তিনি থাকলে মানষির এ অবস্থা হতো না।

হাবলু বলল, হতো হয়ত, আসল দুটো মানুষ নেই, আমি নেহেরুরে সব জানাব মা, সারা দেশ বিদায় ঘাট হয়ে গেছে, কেউ কোথাও দাঁড়াতে পারছে না, শুধু বিদায় নেচ্ছে, সারা হিন্দুস্থান পাকিস্তান, দিল্লি লাহোর কলকাতা ঢাকা, সব বিদায় ঘাট, মানুষ শুধুই নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে যাচ্ছে, এর নাম কী স্বাধীনতা, আমি বলব, পণ্ডিতজি এসব তুমি কি জানো, চলো বাপুর সমাধি রাজঘাটে, গান্ধিজি আমাদের কথা শোনবেন, তিনিই পারবেন।

ছেলের কথা শুনতে শুনতে সরমার গা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসে। এসব কথা কি স্বভাবিক? সে বলল, কী বলছিস খোকা, তোর কথা শুনলি লোকে হাসবে, গান্ধিজি কি বেঁচে আছে?

হাবলু গুম হয়ে যায়। মা বলছে, জওহরলাল নেহেরু ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী, কত বড় মানুষ, তিনি কেন তার সঙ্গে কথা বলবেন, মনে মনে ভাবলেই হলো।

হাবলু আঙুল মোচড়ায়। তার শরীর অন্ধকারে শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

চুয়ান্ন

তারা কুথায় ও ময়রম? উঠনে পা দিয়ে হাবলু জিজ্ঞেস করল।

কারা, কাদির কথা বলতেছ তুমি?

তোর বেড়াল?

ডুরে শাড়ি, রংজ্বলা হলুদ ব্লাউজ, রুখু চুলের গোড়ায় কাপড়ের লাল পাড় বছর পনেরর ময়রম ঘুরে গিয়ে বলল, তুমি কি উদির জন্যি এলে হাবলুদা?

তোর মা কুথায়?

মা গেছে খালাঘর, বুদাহাটা।

চাচা কই?

ময়রম—মরিয়মের মুখ অন্ধকার। চুপ করে থাকে। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছতে থাকে। কী হলো রে ময়রম, কাঁদিস কেন, চাচাও কি ইন্ডিয়ায় চলে গেল? পাকিস্তান তার সহ্য হল না? চাচা কি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর নিকট গেল ইন্ডিয়া পাকিস্তান এক করে দিতে? শুনতে শুনতে আর সহ্য হয় না মরিয়মের, চিৎকার করে ওঠে, ইন্ডিয়ায় গেও তুমি বদলাও নি হাবলুদা, পাকিস্তান রদ হবে কেন, কী করতি রদ হবে, আব্বা বলত পাকিস্তান গরিবের ভালর জন্যি হয়েছ, তুমারে কেউ কিছু বলে নি, কিছু শুনো নি তুমার চাচার কথা, আব্বা কি আর আছে, পাকিস্তান পাকিস্তান করে মলো?

নেই! হাবলু কেঁপে গেল। নেই মানে নেই। তার মানে রায়ট? কবে হলো? ওফ! নেই মানে করাচি দিল্লি লাহোর, ঢাকা, গেল কোথায়?

হা আল্লা, তুমার মাথায় ভূত, জিন পরি, আব্বা ক্ষেত থেকে এল, এসে বসল ওই হাতনেতে, বলল, ময়রম পানি দে, আমি ঘটি ভরতি যেটুকুন সময়, বেলা দ্বিপহর, সিদিন খুব রোদ হইলো গো হাবলুদা, আব্বা ভোরবেলা থেকি মাঠে গিসল, তার আগে দুদিন পানি হইলো, আগের রাতিও হইলো, জষ্টির পেথম, তখন জমিনে হাল না ফেললি হবে না। বলতে বলতে হাঁপাতে লাগল ময়রম, আমি পানি আনতি যতডা সময়, এসে দেখি আব্বা কাত হয়ে আছে, তখনই সে লোক নেই, মাঠেই হাওয়া লেগেছিল তার, পানিটুকুন গলায় দিতে দিল না ইবলিস।

হাবলু থম মেরে যায়। এ কথাটা দুদিন ধরে কেউ বলল না। কেউ কি জানে না? জানবে না কেন, মানুষ আর ওসবে মাথা ঘামায় না। এসব মনেও রাখে না। তার মা কি জানে না? কেন জানবে না, ময়রমের বড়ভাই অজেত গিয়ে বলে এসেছিল। চাচি কেঁদেছিল, তবু চাচি এর ভিতরে ভুলে গেল, যাক গে, মোছলমান কি মনিষ্যি যে মনে রাখতি হবে?

এ কথা বলচিস কেন তুই, তোরে কেডা মোছলমান বলেছে?

মোছলমানকে মোছলমানই তো বলবে হাবলুদা, না বললিই বরং দোষ, কথা হলো গে মোছলমানের দেশ হাসিল হলো, তা কারুর মনে ধরে, কারুর ধরে না, আগে হিঁদুর ছিল সব, এখন আমরা পাইছি কিছু, তাতেই চোখ টাটাচ্ছে কতজনের, আব্বার তো ভোগ করা হল না সাধের পাকিস্তান।

হাবলু অবাক হয়ে ময়রমের কথা শোনে। ময়রমের মুখে এসব নতুন কথা। ময়রম আগে এসব বলত না। বরং তারা চলে যাবে শুনে কেঁদেছিল। হাবলু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সে তো ভেবে এসেছে ময়রম তার কথায় আগের মতো সায় দেবে। খোঁজ নেবে। হাবলু এদিক ওদিক তাকায়, তিনটে বেড়ালের একটাও নেই। তারাও কি ওপারে চলে গেল। উঠনে গুঁড়ি গুঁড়ি মুরগির ছা পিন পিন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পিছনে তাদের মা মুরগিটা হেলেদুলে তাদের তাঙড়িয়ে তাঙড়িয়ে ঘুরছে। তিনটে কাক পর পর বসে আছে কাপড় মেলার তারে। চেনা মনে হয়। চেনা বলেই অবাক হয়ে হাবলুর দিকে তাকিয়ে। ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে দেখছে। তারটিতে এখন কাপড় নেই, তাই হুস হুস করছে না কেউ। ময়রম কী বুঝল কে জানে, হাতনেতে তালপাতার বড় চাটাই পেতে দিল। ডাকল, বসো, তুমি আসবা তা আমি জানতাম, আবার ফিরে যাবা কবে, ইন্ডিয়ার জল পড়িছে, এলে কেন শুনি?

হাবলু জবাব দেয় না, শেষ আশ্বিনের আকাশ নীল। তার ভিতরে পালক মেঘের রাশ। বাতাস বলতে নেই। ঘাম হচ্ছে এখনো, ঠাণ্ডা যা রাতে। হিমে ভিজে থাকে সকালবেলার মাটি, আর পেকে ওঠা ধানের ক্ষেত, বিঘের পর বিঘে...। এখন সব ভরন্ত হয়ে আছে।

হাবলু ভাবল চলে যাবে। অজেত নেই, চাচা নেই, চাচি নেই, তবে আছেটা কে? আয়না, রয়না, গয়নাও নেই। শুধু আছে ময়রম। সে যেন আলাদা, এ ময়রম যেন আগের মতো নয়। মনে হতেই হাবলু চমকে যায় নিজে নিজে। ময়রমের রূপ ধরে কে রয়েছে এই ভিটেয়? যে কিনা আসতে না আসতে খোঁজ নেয় সে কবে ফিরে যাবে। সে চায় না হাবলু পাকিস্তানে থাকে। কেন চায় না, না হাবলু তাকে চিনতে পারবে। চিনলে সে তাকে ধরিয়ে দেবে। ও আসল ময়রম না, এ হলো শ্যাওড়া গাছের পেত্নি। ময়রমের সুখ দেখে সে এ বাড়িতে এসে উঠেছে। আসল ময়রমকে কোথায় লুকোল? গাছের মাথায় রেখে দিল। সেখানে বসে সে কাঁদছে! হাবলু বলল, আমি বসব না, আমার কাছে সব ধারা পড়ে গেছে, তুই সে নস।

হাতনের বাঁশের খুঁটোয় ভর দিয়ে ময়রম বলল, তুমি কী বলতেছ হাবলুদা?

তা কি বুঝতি পারছিস নে তুই, আমি ধরতি পেরেছি, অজেত খুব অন্যায় করেছে ময়রমরে একা রেখে গিয়ে, চাচিই বা কী, খালাঘর গেল, তারে নিয়ে গেল না। হাবলুর গলায় রাগ ঝরে পড়ে।

তুমার পাগলামি গেল না, সেই গৎখালির ভূত চেপি আছে তুমার মধ্যি, ওডা তো গল্প। আমারে তুমি ভুলোতি পারবানা মনি।

ময়রম বিড়বিড় করল, একরকম, সেই একরকম, ইন্ডিয়ায় গে বদল হয় নি, ফাগল কুথাকার, তুমি বস, তুমার বন্ধু এনেছিল, দুধ আর শিমুই দিই, খাও, ঈদির সময় আনিসলো, আব্বা নেই, কার খেতি মনে যায় বলো, তুমারে দিই, পয়সার জিনিস, নষ্ট হই যাবে! ইস, তুমি কত রোগা হই গেছে হাবলুদা, চোখমুখ বসে গেছে, এস, খুব ঘামতেছ দেখি, বাতাস করি, এস, পানি খাও বাতাসা দে। বলতে বলতে ময়রম নেমে আসতে থাকে। তা দেখে হাবলু পিছতে থাকে। বলে, না, আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুই সে নস।

ময়রম থমকে দাঁড়ায়, বলে, তুমি কী বলতেছ বুঝা যাচ্ছে না।

হাবলু বলে, তুই কেডা?

কেন, আমারে তুমি চেন না?

চিনতি পারতিছি, তুই ময়রম নস।

খিলখিল করে হেসে ওঠে ময়রম, না, নই তো, কিন্তু তাহলি আমি কেডা, ইস, পাগল, ওর'ম করে না।

হাবলু পিছিয়ে যায় কয়েক পা, বলে, অজেতরে কুথায় বেঁধে রেখিচিস বল, চাচা, চাচি, ময়রম, তুই সবাইরে লুকোয়ে ভিটে দখল করে বসে পান চিবোচ্ছিস হারামজাদি, রাম নাম কর দেখি, বল রাম রাম।

এই ভিটের পশ্চিমে সেই প্রান্তর। তা পেরিয়ে আশাশুনি যেতে হয়। ওই মাঠ পেরিয়ে এসেছে হাবলু। এই নবগাঁ পেরিয়ে উতুলিতে তার মামা বাড়ি। এই গাঁ ও ওই উতুলির ভিতর বলা যায়। একই মৌজা, কেটে আলাদা হয়েছে মুসলমানদের বসতি। এখন উতুলির আর হিন্দু মুসলমান আলাদা পাড়া থাকছে কই। হিন্দুরা দেশ ছাড়ছে। বড় মানুষ ভদ্রদের কেউ নেই বলা যায়। অতুল ঠাকুদ্দাও গেল কলকাতায় ছেলের কাছে। ময়রম টের পায় হুহু হাওয়া আসছে ওই ভুলভুলির মাঠ থেকে। সব কেমন নিস্তব্ধ। যে কাক তিনটে কাপড় মেলার তারে বসেছিল তারা আচমকা উড়ে গেছে। আকাশে কোনো পাখিও দেখ যাচ্ছে না। বাড়িতে সে আর তার বড় ভাই। অজেত গেছে সাতক্ষীরা। ফিরতে বিকেল। ভাদ্র-আশ্বিনের রোদ কী চড়া। গরম কী ভ্যাপসা। তার ভিতরে কেমন একটা হাওয়া দিচ্ছে মনে হয়। গা সিরসির করে ওঠে ময়রমের। সে বলে ওঠে, হায় আল্লা, এ যে পাগল হই গেছে, মাঠের বাতাস লেগিছে, আমারে কোনোদিন খারাপ কথা বলেছে! আমারে দেখলি কী র'ম হই যেত, ও হাবলু, হাবলুদা তুমার কী হলো?

হাবলু তার কথা কানেই নেয় না, বলে, তুই কেডা বল।

ময়রম বলে, যা ভেবিচি, বাতাস লেগেছে গো মাঠ পেরুতি গে, জিন পরি তে ধরেছে তুমারে, না হলি এ'রম কথা বলে!

হাবলু বলল, ওসবে পার পাবা না মণি, আমি তোমারে চিনিছি, দাঁড়াও তুমার ব্যবস্থা করতিছি, দাঁতে কলসি নিয়ে ছাড়তি হবে বলে দিচ্ছি, আশাশুনির ওঝা আনব, তুমারে সে কী করে দ্যাখো!

ইন্ডিয়ায় গে মাথা খারাপ করে ফিরেছে গো, তুমারে কেডা ওপারে যেতি বলিল বলো। বলতে বলতে ছুটে আসে ময়রম। পিছতে থাকা হাবলুর হাত ধরে ফেলে, কী হলো তুমার গো, এতদিন বাদে এলে, মাথা খারাপ করতিছ কেন হাবলুদা?

হাবলু বলল, আমার যা বুঝার বুঝা হই গেছে, আয়না রয়না গয়না—বিড়েল তিনটে কই, তারাও কি বাঁধা পড়ে গেছে, নাকি মেরি ফেলিচিস তাদের, বিড়েলে ঠিক চিনে নেবে, কুকুর বিড়েলে আগে ধরতি পারে।

ময়রম বলে, কী বলো তুমি পাগল, বিড়েল নিয়ে এসব কথা বলে! উরা আমার সই, পাজিগুলো পাড়া বেড়াতি গেছে, এসি যাবে, চলো বসবা চলো, আমি হাড়িতে চাল নিই, খেয়েদেয়ে ঘুমাও, তুমার বন্ধু অজেতভাই এসে যাবে বিকেল বিকেল।

না, আমি ওসবে ভুলতিছি নে।

কী বলো তুমি হাবলুদা, এই হাবলুদা, এই এই, আমারে দ্যাখো তুমি, আমি তুমার বন্দু অজেতের বুন ময়রম, মাথা ঠাণ্ডা করো হাবলুদা।

হাবলু ঘোরের ভিতর বলে, ছেড়ে দে আমারে, ছেড়ে দে তোরে আমি চিনে গেছি।

না ছাড়ব না, কিছুতেই তোমারে ছাড়ব না, ইন্ডিয়ায় গে তুমার মাথা আরো গেছে, অমন আমার হাবলুদা কেমন হই গেল গো। বলতে বলতে হাবলুকে জাপ্টে ধরে ময়রম, চলো উপরে হাতনেয় গে বসবা চলো, তুমার এখন কুথাও যাওয়া হবে না। বলতে বলতে জড়িয়ে নিয়ে হাবলুকে হাতনের দিকে টানতে থাকে ময়রম।

ময়রমের বেষ্টনির ভিতর হাবলু অবশ হয়ে যায়। সমস্ত দেহ শিথিল, এই যে ছোঁয়া, এ তো ময়রমের, এই ছোঁয়া তার ভিতরে নিয়ে আসছে জোড়া সেই দেশ, যা ছিল কিন্তু নেই। সে ইন্ডিয়ায় যাওয়ার সময় কাঁদতে কাঁদতে তাকে মাঠের ধারে অশ্বত্থ তলায় ধরেছিল ময়রম, তার হাতটি ধরেছিল, 'না তুমি পাকিস্তানে থাকো, পাকিস্তান রদ হয়ে যাবে, ইন্ডিয়া পাকিস্তান আলাদা হবে না।'

সেই কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কী মায়া এই ছোঁয়ায়। হাবলু কেঁপে ওঠে। এলিয়ে পড়ে। এ যদি অন্য কেউ হতো সে ঠিক ধরতে পারত। তার বুকের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে ময়রম, তার তাপেই হাবলু নিজের বুকে উষ্ণতা টের পাচ্ছে। অন্য কেউ হলে তফাৎ আরো ধরা যেত। ময়রম সবার থেকে আলাদা। ময়রম সেই ওপারের টিয়ার থেকেও আলাদা। টিয়াও এত কোমল নয় যত কোমল ময়রম। বুক জুড়িয়ে যায় কথা শুনলে। সে হাতনেয় গিয়ে মেটে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে। ময়রম তার মুখোমুখি, চোখমুখ উদ্বেগে ভরা। তার মাথায় হাত দিয়ে চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে। ডাকল

তাকে, পানি খাবা, ও হাবলুদা, কী রোগা হই গেছে তুমি, ওপারে গে খেতি পাচ্ছ না ঠিক মতো, কেডা দেবে, মা বাপ যার ইদিকি, তারে কেডা খেতি দেবে ভাল করে, ওপারের লোকের মন আছে ভাত দিবার, ও দেশে ধান হয়? কাঁপল ময়রম হাবলুকে কথাগুলো বলতে বলতে।

হাবলুর দু'চোখ বুঁজে আসছে। ময়রম তাকে জল খাইয়ে দিচ্ছে, যেন সে একটা শিশু। তার জামার বোতাম খুলে দিয়ে বুকে ফুঁ দিচ্ছে ময়রম। খারাপ বাতাস তাড়িয়ে দিচ্ছে। হাবলুর বুকের ওপর যেন আতরের গন্ধে ভরা বাতাস এসে পড়ছে ধীরে ধীরে। বাতাস যেন খেলা করছে। কী সুগন্ধ ময়রমের মুখ নিঃসৃত নরম বাতাসে। সব কিছু জুড়িয়ে দিচ্ছে।

কী হলো, তুমার কী হলো, ও হাবলুদা। ময়রম আর পারে না। কী হলো তার! উঠোনে নেমে যাবে? হাবলু তাকে আঁকড়ে ধরেছিল। বুক ধুকপুক করছে। তার কি ঠিক হলো হাবলুকে ওভাবে টেনে আনা? সে সামান্য তফাতে সরে বসে, শূন্য উঠনের দিকে তাকায়। প্রিয় পুরুষ মানুষের ছোঁয়া তার ভিতরটা নাড়িয়ে দিয়েছে। হাবলুর কথা কতদিন ভেবে ভেবে তার চোখে জল আসে। ময়রম ডাকে ফিসফিসিয়ে, ও হাবলুদা, এই।

হাবলু জবাব দেয় না। একটুবাদে ময়রম বলে, তুমি ঘুমাবা, চলো অজেতভাই-এর বিছনায় গে শুই থাকো, আমি ভাত চাপাই, ডিমের ঝোল আর ভাত, ঘি রয়েছে, দুদ রয়েছে, আর কী লাগবে।

হাবলুর বুক কাঁপছে। ময়রম কি এত কাছে কোনোদিন এসেছে? কী অদ্ভুত এক গায়ের গন্ধ পাচ্ছে হাবলু, তাতে আরো ঘোর আসছে। কাছে পিঠে কোনো কাঁটালি চাঁপা গাছ থেকে তার সুবাস উড়ে আসছে। ময়রমের গা ভুরভুর করছে ওই গন্ধে। সে বিড়বিড় করল, ও ময়রম, ও ময়রম আমি ভাবলাম অ্যাদ্দিনে তোর বে হয়ে গেছে চলন বিলির দিকি কোন গাঁয়, তোরে আর দেখতি পাব না।

ইস, আমি বে করব না, ওই দ্যাখো বেড়ালগুলো ঠিক খবর পেই গেছে, তেনারা এসে গেছেন পাড়া বেড়ান শেষ করি, যাহ্, কাঁটালতলায় গে বস থাক! পাজি! বেড়াল তিনডে দেখতি এয়েচে আমি আমার অতিথরে কীর'ম যত্ন করি, কতদিন বাদে এয়েচে আমার অতিথ, যাহ, বলছি, নাহলি ঠেঙাব বলি দিচ্ছি, সেই সক্কালা দুদভাত খেই বেরুলি, আর দেখা নেই, এখন আদিখ্যেতা করতি এলি।

হাবলু ডাক শোনে, ম্যাও। চোখ খুলে দ্যাখে হাতনেতেই দশহাত দূরে বসে আছে তিনটে বেড়াল আয়না রয়না আর গয়না। আয়না গয়না যেন দুই যমজ কন্যা। শাদায় হলুদে ছোপ ছোপ। রয়নাটা ধবধবে, কোথাও এক বিন্দু অন্য রং নেই, নাকের নিচে গোঁফ, গোল গোল চোখ। সে আসলে রাজপুত্তুর, বাকি দুই বেড়ালি তার পিছু পিছু ঘোরে। হাবলুকে দেখে তিনটে বেড়ালই বুঝি হাসল, আয়না বলল, কেমন আছ গো হাবলুভাই, আপু যে কেঁদে মরে তুমার জন্যি।

পাড়াবেড়ানি তিন সই। বেড়ালগুলোকে দেখে বাঁচলও যেন ময়রম। না হলে একা একা সে কী করে হাবলুর এখানে বসে থাকে? আবার রাগও হলো, হাবলুর কপালে কি হাত দিতে পারবে সে এই তিন বেড়ালের সামনে? লজ্জা করবে না? কিন্তু আয়না গয়না যে গুটি গুটি তার কোলে এসে উঠল। রয়না বসে আছে মাটিতে। সে আবার একা তার কোল চায়। ময়রম ডাক দিল হাবলুকে, ও হাবলুদা, এই দ্যাখো কারা এয়েছে।

হু। সে কি জানে না কারা এয়েছে। তিন বেড়াল। এই তো তাদের ডাক শুনল। হাবলু বিড়বিড় করে বলল, তুই ও কথা আর বলবি?

কোন কথা দাদা? জিজ্ঞেস করে সেই শ্যামলে শ্যামল মাটির মেয়ে রয়নার মাথায় হাত দিয়ে বলল, জিজ্ঞেস কর দিনি কোন কথা?

হাবলু ধীরে ধীরে উঠে বসল। কয়েক হাত দূরে বসা ময়রমকে দেখলে দুটি চোখ দিয়ে, বলল, আমি ভাবলাম ওরা নেই, আছে তাহলি।

থাকবে না কেন?

পাকিস্তান-হিন্দুস্থান হয়ে সব উলোট পালোট হয়ে গেছে।

চুপ করে থাকে ময়রম। হাবলুর দৃষ্টিতে তার মুখ নেমে গেছে আচমকা। আনত মুখে চুপ করে থাকে। হাবলুও সহসা চুপ। গা সিরসির করছে আবার, কথা জুটছে না মুখে, ডাকবে যে ময়রমকে, তাও পারছে না। ইস মনে হচ্ছে এখন চলে যায় এই ভিটে ছেড়ে, এই উতুলি ছেড়ে, জেলা ছেড়ে পাকিস্তান ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু যাবে কোথায়, ময়রম কি পিছু ছাড়বে? বিদায় নিলেই কি বিদায় হয়ে যায়? ময়রম এই ভিটেয় বসে তার জন্য চোখের জল ফেলবে। হাবলু মনে হলো সে মানিকরাম, আর ময়রম সেই ময়রম। সে দেখল ময়রমকে। ময়রম কি সত্যি বলল তখন পাকিস্তান ছাড়া সে কিছু বোঝে না। হাবলু যা বলতে চায়, করতে চায় কোনোটাই সে মানে না? টিয়া মেয়েটা তো তার কথায় সায় দেয় না। সেও তো আর এক ময়রম।

ময়রম—মরিয়ম এক একবার মুখ তুলে হাবলুকে দেখে নিয়ে মাথা নামিয়ে নিচ্ছে। হাবলুও তাই। তিনটে বেড়াল অবাক হয়ে দেখছে আপু আর হাবলুভাইকে। সময় যায়। নিস্তব্ধ হয়ে আসে চারদিক। উঠনের তারে যে কাকদুটি ছিল উড়ে গিয়ে ফিরে এসে তারাও চুপচাপ। শান্ত হয়ে থাকলেই ওরা বুঝবে ওদের। মানিকরাম ফিরে এসেছে ময়রমের কাছে। কবি মানিকরাম। হাবলুর মনে হয় সে বুঝি সেই মানিকরাম হয়ে গেছে, মধু কবির পূর্বপুরুষ। সে শেষ পর্যন্ত ফিরে এল জমিদারের মেয়ে ময়রমের কাছে। ময়রম তাকে ভালবেসেছিল। কিন্তু কবি মানিকরাম কী করে মুসলমান জমিদারের মেয়ের ডাকে সাড়া দেয়? ধর্ম তাদের মেলাবে না। কবি মানিকরাম জমিদারের সেরেস্তা ছেড়ে বিবাগী হলো, আর জমিদার কন্যা মরিয়ম, ময়রম কপোতাক্ষ ধারে বসে ডাক দেয় গাঙে ভেসে যাওয়া নৌকোর মাঝিমাল্লাদের, ওগো, তোমরা কি দেখেছ সাগরদাঁড়ির

কবি মানিকরামকে, যদি দেখা হয় বোলো ময়রম তার জন্যি গাঙপাড়ে বসে আছে, তারে ছাড়া সে আর কাউকে জানে না।

মাথা নামিয়েও ময়রম যেন তাকে দেখতে থাকে মনে মনে। হাবলু শোনে সে ফিসফিস করছে, 'কত দিন গাঙ ধারে সারাদিন বসি শুদু এ নৈকো ও নৈকোরে ডাক দিই মানিকভায়, তুমার কবিতা আমার এত ভাল লাগে, তুমি রামায়ণের কবি বাল্মিকী ঠাকুরের মতো হবা একদিন।'

এ তুই কী বলিস ময়রম?

ঠিকই বলি হাবলুদা, তুমি আর যেও নি, ইন্ডিয়ায় তুমার ভাত নেই...ইন্ডিয়া তুমারে পাগল করি দেবে! বিড়বিড় করতে করতে ময়রমের চোখে জল এসে যায়। আঁচলে চোখ মুছতে থাকে সে। তিনটে বেড়াল তাকিয়ে আছে তাদের আপুর দিকে। কী হলো তার? রয়না জিজ্ঞেস করতে যাবে তো গয়না ইশারায় বলল, না, চুপ। চুপ করে গেল ইন্ডিয়া পাকিস্তান, মহাবিশ্ব। এমন দৃশ্য তো নতুন কিছু নয়, কত ঘটেছে কতকাল ধরে, কিন্তু প্রতিবারই তা নতুন হয়ে জন্ম নেয়।

পঞ্চান্ন

হাবলু বিকেল বিকেল ফিরবে। উঠনে তিনটে বেড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ময়রম। অজেত ফেরে নি। কখন ফিরবে তা কেই বা জানে। হাবলুকে আটকাতে পারল না ময়রম। এমন কি হতে পারে না তার ভাই আজ ফিরল না, তখন? সে না হয় দোর এঁটে শোবে, কিন্তু তা হাবলু থাকলে তো হবে না। তাই হাবলু যাক। হাবলু সারা দুপুর ধরে তাকে কলকাতার কথা শুনিয়েছে। গড়ের মাঠ, বেনেপুকুরে কবি মধুসূদনের কবরস্থান, কুকুর নিয়ে ফর্শা মেম সায়েব। হাবলুর কাছে মধুসূদনের কথা শুনে ময়রম অবাক। কী আশ্চর্য! ওপারে গিয়ে হাবলু কত কিছু জেনে গিয়েছে। কলকাতায় এসব জানা যায়। শুনে ময়রম বলল, কলকাতা পাকিস্তানের ভিতরে থাকলি ভাল হতো।

আর যদি পাকিস্তান না হতো?

পাকিস্তান হয়ে মোছলমান বেঁচেছে, তাদের অবস্থা ফেরবে।

কেডা বলে? হাবলু জিজ্ঞেস করে।

যে লোক বলত সে লোক আর নেই। বলে ময়রম চোখ মোছে আঁচলে।

চাচা বলত! তার মতন ভালমানষি?

হুঁ, এ নিয়ে অজেতভায়ের সঙ্গে লাগত খুব, সেদিনির আগের রেতে এ নিয়ে কথা কাটাকাটি হলো বাপ বেটায়।

ওডা ঠিক হয় নি ময়রম, অজেত কেন বলতি গেল, তবে অজেত ঠিক, টেকবে না।

কার কথা বলতিছ?

এই হিন্দুস্থান পাকিস্তান।

ময়রম চুপ করে থাকে। আব্বা যে জমিন ভাগে করত ভদ্দরবাড়ির, তারা সে জমি তাদের দিয়ে গেছে। গচ্ছিত রেখে গেছে। কিরণ ভদ্দর বুড়ো বলে গেছে পার্টিশন উঠে গেলেই ফেরবে। পাকিস্তানে তাহলে কি তাদের লাভ হয় নি? উঠে গেলে জমি কি থাকবে? কিন্তু অজেত আর হাবলুর কথাও কি সত্যি মনে হয় না? সব যদি আগের মতো হয়ে যায়। কলকাতা আবার তাদের হয়ে যায়! গড়ের মাঠ নাকি চলন বিলের মতো বড়। চলন বিলও দ্যাখে নি ময়রম, শুনেছে, তার শেষ নেই।

এইসব কথার ভিতরেই ময়রম খবর পেল বীরাঙ্গনা দাসীর, কবি মধুসূদনের, রেবেকা মেম আর হেনরিয়েটার। হাবলু দেখেছে রেবেকাকে। সেই মেম এখন বুড়ি। মেমসায়েব হাবলু আরো দেখেছে বেলগেছেয়। আর অজেত ভাই-এর জন্য রেডিও পার্কে যুগের যাত্রী ক্লাবে খেলার ব্যবস্থা করেছে। ওই ক্লাবের কোচ নিশীথদা বরিশালের লোক, সে বলেছে ওখেনে খেললি 'মো'নবাগান, ইজবেঙ্গল, ম'মেডান সব ক্লাবে নিয়ে নেবে। সেই সব ক্লাবের লোক আসে রেডিও পার্কে, ভালো প্লেয়ার ওখেন থেকে তোলে। শুনতে শুনতে মোহিত হয়েছে ময়রম। দুঃখও পেয়েছে, আসল কথাটা বলতে বলতে। অজেতভাই ফুটবল ছেড়ে দিয়েছে, অজেতভায়ের কিছুই ভাল লাগে না, পাকিস্তানও না, বলে বেহারিরা তাদের জন্যি পাকিস্তান করেছে, পাকিস্তানে বাংলা চলবে না।

ও ময়রম সত্যি?

বড়ভায়ের নামে কি মিথ্যে বলব, আব্বার সঙ্গে এই নিয়ে কোঁদল হতো।

চাচা কি বলত?

রাগ করত আব্বা, এই সব কথা ভুল তা বুঝাত, বলত মোছলমান এদেশেই বাঁচপে, মোছলমানের আবার বেহারি বাঙালি! শেষে তো আব্বা চলেই গেল হাবলু, মানুষ যে চলি যেতি পারে তা আমি ভাবি নি, আমার আব্বা যে থাকপে না তা আমি জানতাম না, আব্বার মনে খুব অশান্তি হচ্ছিল অজেতভাইরে নে, অজেতভাই বলত বাঙালির সব্বোনাশ হই গেছে পাকিস্তান করে, এখন উদ্দু না শিখলি পাকিস্তানে ভাত নেই, ঢাকায় এসব নে খুব গোলমাল, বেহারীর বলতেছে, মোছলমানের জবান উদ্দু, পাকিস্তানে বাংলা চলবে না, খাঁটি মোছলমান বাংলা বলবে না, আল্লাহর জবান হয় উদ্দু আর আরবি।

সারাদুপুর এই সব কথা বলে নি ময়রম, সে যখন বেরতে যাবে তখন বলছে। কী আশ্চর্য কথা। হাবলু বসে পড়ল উঠোনে পাতা খেজুরপাতার চাটাইয়ে। চাটাই পেতেছিল ময়রম। বেলা পড়ে এসেছে, উঠনে বসে কাঁথা সেলাই করবে। সে বলল, এসব কথা তো বাড়িতি শুনি নি।

কেডাই বা শুনেচে, খবরডা এনেচিল তুমার বন্দু, সে সাতক্ষীরে গে রেডিও শুনে আসে, তাতে ইন্ডিয়ার খবর যেমন পায়, পাকিস্তানেরও, রেডিও পাকিস্তান, আব্বা

বলত, ও ইন্ডিয়ার রেডিও শোনে, মোছলমানের শুদু রেডিও পাকিস্তান শুনা উচিৎ, উর্দ্দু খবর কি শোনে? উর্দ্দু শিখতি হবেই, শিখলি দোষ কী, ওতো আরবির মতন দেখতি, আরবি হলো খাঁটি মোছলমানের জবান।

হাবলু বলল, এত কিছু হচ্ছে, আমি কিছুই জানি নে।

আমরা জানি নে, বলল তুমার বন্দু, আমরা শুনলাম, এই নে আব্বার সঙ্গে কোঁদল হতো রোজ, অজেতভাই, তোমার বন্দু, অনেক খপর রাখে। আব্বারে বলত কোন সভার আগে গান্ধিজি আর তার লোক আগে 'আলহামদু' সূরা ও 'কুলহু' সূরা পড়ত, তারপর রামবন্দনা, তারপর লোকে বলত হিন্দু মোছলমান ভাই ভাই, তাহলে কেন পাকিস্তান-হিন্দুস্থান হবে, গান্ধিজি খুব কষ্ট পেইল, এই পাকিস্তানে আমাদ্দের সব্বোনাশ।

হাবলু শুনতে শুনতে ভিতরে উত্তেজনা অনুভব করে। তাহলে সে যা বলে, তা অন্যরকমে বলে অজেত। অজেতের সঙ্গে কথা বলতেই হবে। সে চলে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে যায়। আর একটু দাঁড়িয়ে গেলে হয়। আর ওই দাঁড়ানোর ভিতরেই অজেত এসে যায়। ময়রম তাকে কথায় কথায় আটকেছিল, অজেত এসে যেতে একেবারে আটকে যায় হাবলু। অজেত তাকে দেখে উদ্বাহু হয়ে এগিয়ে আসে, ওরে, হাবলু ইন্ডিয়ান, তুই কবে এলি এই বেহারি পাকিস্তানে?

তোর জন্যি ফিরি আলাম অজেত।

একেবারে!

একেবারের মানে কী, আমি তো বেরিয়েছি জওহরলাল আর আয়ুব খাঁর সঙ্গে দেখা করব বলে, শোন অজেত শোন।

শুনল অজেত। তাদের কথা শুনল ময়রম। অজেত শুনতে শুনতে বলে, হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ রতন, তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি...মধুকবির সাগরদাঁড়ি যেতি হবে হাবলু, মধুকবির কথা নিয়ে এলি পাকিস্তানে, রবি ঠাকুর, মধুকবি, নজরুল নে পাঞ্জাবি আর বেহারিগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতি হবে।

চাচা তো অমন ছেল না, চাচা আমার খুব ভালবাসত অজেত।

সে তো বাসতই, তোর জন্যি দুঃখ করত খুব, কিন্তু ওই এক কথা, মোছলমান অনেক কষ্ট করেছে, মোছলমানের দুঃখ এবার ঘুঁচবে, পাকিস্তান হাসিল যখন হয়েছে, পাকিস্তান রাখতি উর্দ্দু শিখতি হবে, মোছলমানের জবান বাংলা না।

হাবলু বলে, জবান কী?

জবান হলো ভাষা।

হাবলু বলে, ময়রমও জবান বলতিল।

বেহারিরা আসার পর এই সব কথা চালু হয়ে যাচ্ছে। বিড়বিড় করে বলতে থাকে অজেত, আব্বা কেমন যেন হয়ে গেল হিন্দুরা চলে যেতে, এই ধর বছর চার।

হাতনেতে বসে দুই বন্ধু। হাতনেতে বিছানা। মশারি গোটান রয়েছে, ওদের গল্প শেষ হলে মশারি টাঙিয়ে দিয়ে সে দোর দেবে। আসলে তাও নয়, মশারি কি ওরা টাঙিয়ে নেবে না, নেবে, কিন্তু ময়রম আর আয়না রয়না গয়না শুনতে চায় দুই বন্ধুর কথা। এই যে গ্রাম, এখানে কোন খবরই মেলে না। হিন্দুরা চলে যেতে লাগল যখন তখন টের পাওয়া গেল বড় কিছু হয়েছে, পাকিস্তান হওয়া মানে, মুসলমানের হওয়া। বেহারিরা ক'ঘর এল, ধরা গেল, ওপারেও বড় কিছু হয়েছে, যাদের কথা বোঝা যায় না, হিন্দি উর্দু বলতে বলতে তারা গাঁ গঞ্জেও ঢুকে পড়ল। খবর যা জানে, তা হলো পুরুষ লোক। মেয়েরা জানবে কী করে? তাদের পুকুরঘাটে শুধু ঘাটেরই কথা। এবাড়ির কথা, ও বাড়ির কথা। ভিন দেশ থেকে আসা বেহারিদের কথা, তাদের পুরুষরা বাংলা না বলতে পারলেই বাঁচে। পুরুষরা বলেই না, মেয়েরা বলতে চায়, চেষ্টা করে পুকুর ঘাটে বসে তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের ভাষা শিখে নিতে। এসেছে কোথা থেকে, না সেই পশ্চিম থেকে। তারা সারাবছর পুকুরে এত পানি দ্যাখে নি, এমন গাঙও দ্যাখে নি যা সারাবছর পানিতে ভরা থাকে, জোয়ার ভাটা আগে দ্যাখেই নি তারা, এত গাছপালা ভাবতেই পারত না। এই সব কথা। তাদের দেশ ছিল শুকনো। পানির নাম গন্ধ নেই। তবে কি পানি ছিল না। ছিল, কুয়ো ছিল, তার কত নীচে পানি। ময়রম রাবেয়ার কাছে শুধু পানির কথাই শোনে। তাদের দেশে গরমির টায়েমে কী কষ্ট! পোখর যা ছিল তা শীতের সময় থেকেই শুখা হয়ে যেত। রাবেয়া বলে ইতনা পানি! মেয়েদের কষ্ট কমেছে। পানি তো তাদেরই আনা করতে হতো। তবুও আসতে কী মন চায়! রায়ট লাগল যে। এপারে যেমন মোছলমানের জোর, ওপারে হিন্দুর। এই সব কথা ময়রম আর তার ভিতরে হয়। ময়রম হিন্দি একটু আধটু বলতে শিখেছে, রাবেয়া বাংলা। এর বাইরে আর কী বা কথা হতে পারে তাদের ভিতর? গাঁয়ে বসে কিছুই জানা যায় না। তার আব্বা বেঁচে থাকলে কিছু কথা শোনা যেত, করাচি লাহোর ঢাকা... ছেলে অজেতকে উপদেশ দিত, করাচি যাওয়ার চেষ্টা করতে বলত। পাকিস্তানি মিলিটারিই অজেতের শ্রেষ্ঠ জায়গা। ফুটবলার অজেত লম্বা চওড়া, অজেত যেন বাঙালির মতো না। অজেত মিলিটারিতে গেলে অনেক উপরে উঠতে পারবে। পাকিস্তান রক্ষা করা যেমন মোছলমানের ব্রত, তেমনি সে উদ্ধার করবে কাশ্মীর, পতাকা তুলবে লালকিলায়।

আব্বা আস্তে আস্তে কেমন হয়ে গেল। তার কারণ ওই রাবেয়ার বাবা আখতার চাচা। সেই বলল, বেটা, উর্দু শিখনা হি পড়েগা, উর্দু পাকিস্তানের জবান, যাও আর্ম ফোর্সে জয়েন করো, মুসলমানের শির উঁচা করো, লালকিলা কৌন বনায়া, মুসলমান, তাজমহেল, আগরা ফোর্ট কৌন বনায়া, মুসলমান, হিন্দুস্তান কৌন বনায়া, মুসলমান, পুরা হিন্দুস্তান মুসলমানের ছিল বেটা, হিসটিতে ইসব পাবে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ বোলো।

সাতক্ষীরে গেলে ধরা যায় কী হচ্ছে সারা দেশে। সবসময় টগবগ করে ফুটছে

লোকে। হিন্দুরা এক এক করে চলে যাচ্ছে। বেহারিরা বলছে সব হিন্দুকো হটাও, পাকিস্তানে শুধু মুসলমান থাকবে, যে হিন্দু থাকবে, তাকে ফুল ফেমিলি মুসলমান করে দাও কলমা পড়িয়ে। ইস্কুলে উর্দু চালু করে দিয়েছে, আরে কী সব হচ্ছে এই পাকিস্তানে, বলছে বাংলা হলো হিন্দুর জবান, মুসলমান বাংলা বলবে না, রবিন্দ সংগীত হিন্দুর লিখা, মুসলমান রবীন্দ সংগীত লিখুক, আর এটাও ঠিক গান হারাম হ্যায়।

অবাক হয়ে অজেতের কথা শোনে হাবলু। আহারে অজেত বড় দুঃখে আছে। অজেত বলে তার আব্বা কত ভাল মানুষ ছিল, সেই মানুষটা রাবেয়ার আব্বা আখতার আলির সঙ্গে সন্ধে বেলায় বসে কথা বলতে বলতে বদলে গেল। তাকে বলত, জগতে ইতনা দিন আয়েগা বেটা, যো দিন পুরা জগৎ মুসলমানের হয়ে যাবে।

হেসে ফেলল হাবলু, চাচা বলত!

হ্যাঁ, আমার তখন আব্বাকে মনে হতো আলাদা লোক, সে আব্বা না।

কী আশ্চর্য, পাকিস্তান এমন হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, কিন্তু আমরা ছাড়ব না, বাংলা আর বাঙালির পূর্ব পাকিস্তানে এসব চলবে না, আমাদের ভাষা বাংলা, আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...তুই জানিস হাবলু?

কথা দিন থেকে রাতে গড়ায়। দুই স্যাঙাৎ কথা বলে যেতে থাকে, বিছানার বাইরে বসে ময়রম কথা শুনে যেতে থাকে। অপলক দৃষ্টিতে সে হাবলুর দিকে তাকিয়ে থাকে। বাইরের উঠনে ম ম করছে জোছনা। ময়রমের পাশে তিনটে বেড়াল গুটিসুটি মেরে বসে থাকে। ময়রমও মাঝে মাঝে একটা দুটো কথা বলে। বলে, তা'লি কি এডা ভাল হলো না, রাবেয়া তো বাংলা বলতি চায়?

কী বলে? অজেত জিজ্ঞেস করে।

বলে ইতনা পানি...ই তো পানি...পেড় নেহি গাছ, পুকুর পাড়ে বসে আমার কাছে শেখে, চাওল নেহি ভাত, দামাদ নেহি, জামাই।

হাবলু বলে, বাহ বেশ তো।

ও বলে বঙ্গাল দেশের লেড়কার সঙ্গে শাদি করবে।

হা হা করে হেসে ওঠে হাবলু, তারপর অজেতকে বলে, দুই সাগরদাঁড়ি যা অজেত, তোর যোগাযোগ করা উচিত সফিউদ্দিন মন্ডলের সঙ্গে, কলকাতার কাছে নিমতে তে তার বাড়ি ছিল, এপারে এয়েছে সাগরদাঁড়িতে ফেমিলি নিয়ে। চিঠি দিইল বীরা দিদিমারে বেলগেছের ঠিকানায়।

সেই সফিউদ্দিনের কথা আচমকাই মনে এল। সেই যে বনগাঁ যাওয়ার পথে দেখা হয়েছিল তাদের সঙ্গে। সে আসছিল ওপার থেকে এপারে, তার বিবি গুনগুন করে কাঁদছিল। তাকে বীরাঙ্গনা বলেছিল সাগরদাঁড়ি গিয়ে মধুকবির গাঁয়ে আশ্রয় নিতে।

সাগরদাঁড়ি গিয়ে কী হবে? অজেত জিজ্ঞেস করল।

মেঘনাদবধ আর মধুকবির কথা বল।

বলে কি হবে, আখতার আলি বলবে ও কিতাব মুসলমানের ভাল করবে না, কুরান ছাড়া মুসলমান আর কিছু জানবে না।

তুই কি বলিস?

আমরা বড় বেপদে রয়েছি হাবলু।

তুই সাগরদাঁড়ি ঘুরে আয়, সফিউদ্দিনের সঙ্গে কথা বল।

কী কথা বলব?

বাংলা নিয়ে কথা।

বল, মুসলমানের ভাষা উর্দু কেডা বলেছে, আমাদের ভাষা বাংলা, আমাদের কবি মধু, রবি, নজরুল, জসিমুদ্দিন।

যাব, মধুর কথা জেনে এসে বলব।

বলে দে মধু কত দুঃখ নিয়ে মরেছে, মধু রাবনের পুত্র মেঘনাদকে হিরো করেছিল, মধু বাংলাভাষায় লিখেছিল, বীরাঙ্গনার কথাও বল।

বলতি হবে, না বললি বাঁচা যাবে না।

শুনতে শুনতে ময়রম ভাবে, না, হাবলুর কথা এখন তো বেশ লাগছে। ওর মাথায় কী যেন আছে। এখন তো পাগল মনে হচ্ছে না। সে ভাবছিল বলার মতো একটা কথা পেল বটে। রাবেয়াকে বলা যাবে। রাবেয়ার জন্য ধারাপাত আর বর্ণ পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ আনতে বলেছিল সে সাতক্ষীরে থেকে। এনেছে কি বড়ভাই। হ্যাঁ, এনেছে, তার ব্যাগে আছে। রাবেয়া পড়বে, তাকে পড়াবে ময়রম। ময়রম সিক্স অবধি পড়েছিল। তারপর আর যেতে পারে নি ইস্কুলে। হাই ইস্কুল এই গাঁয়ে নেই, মাইল পাঁচ দূরে। পাকিস্তান কতদিন হয়ে গেল, কই হাই ইস্কুল তো গড়ে উঠল না। আব্বাই বলত, মুসলমান মেয়ে আবার পড়বে কেন, আর ছেলেদেরও তো কুরান ছাড়া আর কিছু পড়ার নেই। আব্বা এসব ওই রাবেয়ার আব্বা আখতার আলির কাছে শুনত আর বলত। অথচ আব্বা তো এমন ছিল না। আখতার আলি এই গাঁয়ে আসার পর এমন হয়ে গেল তার সঙ্গে সন্ধেবেলায় বসে কথা বলতে বলতে। ময়রমের চোখে জল এসে যায়। আব্বা মাটির নিচে শুয়ে কি এখন টের পাচ্ছে না সব। হিন্দুরা চলে গিয়ে কি ইস্কুল হলো এতদিনে? মুসলমানের উন্নতি মানে কি মুসলমান মেয়ের উন্নতি নয়?

ছাপ্পান্ন

রাবেয়াকে দেখল হাবলু পরেরদিন সকালে, এই আমাদের হাবলুদা, তোরে বলতাম এর কথা, হাবলুদা এই হলো রাবেয়া।

মাথায় কালো ওড়না দিয়ে মুখখানি আড়াল একটুখানি, লালডুরে শাড়িই পরেছে সে। মাথা নিচু করে জিজ্ঞেস করল, কিতাব আনল বড়ে ভাই?

হ্যাঁ এনেছে, এই দ্যাক, তুরা এলি উপার থেকে, হাবলুদা গেল উপারে।

রাবেয়া বেশ লম্বা, মুখ নিচু করে চাপা গলায় বলল, ইন্ডিয়া!

হ্যাঁ, ইন্ডিয়া।

বেহার, রাঁচি জিলা?

কলকাতা।

কলকাত্তা! আচমকা মুখে ওড়না চাপা দেয় বছর পনেরর কিশোরী, হামার বড়ে চাচা কলকাত্তায় থাকে রে, মুঝে বহুত পেয়ার করতা বড়ে চাচা, চাচিমা, আপা, বহেন নাসিমা, ছোটাভাই, রাজাবাজার।

হু, হাবলুদা সব চেনে কলকাতার, রাজাবাজারও চেনে।

হিঁদু হ্যায় না?

হ্যাঁ, হাবলুদা তেমন হিঁদু না, আমাদ্দের মতো হিঁদু।

আব্বার রোষ হবে, মানা কিয়া, কোই হিন্দুকো সাথ বাতচিত করতে মানা আছে, হামি যাচ্ছি ময়রম।

আরে তোর আব্বা জানবে না।

ওজেত ভাইয়া কাঁহা?

মাছ আনতি গেল, জামাল মাসসায়ের পুকুর ছ্যাঁচবে আজ, দুকুরি হাবলুদা খেয়ে যাবে, কবে আবার আসপে, আসপে কি না ঠিক নেই।

হাত ধরে ময়রমকে টেনে নিয়ে গেল রাবেয়া উঠনের শেষে, বলল, হিঁদুলোগ খতরনাক, লুটতরাজি করতা, ইজ্জত লুটতা।

হেসে ফেলল ময়রম, দূর হতো আমাদের হাবলুদা, ও খুব ভালো।

রাবেয়া বেশ ফর্শা, ডান হাতে একজোড়া আসল বা নকল সোনার চুড়ি, ঝলমল করছে, অন্য হাতে লাল বেলোয়ারি কাচের চুড়ি, এক ঝলক হাবলুকে দেখল, হাবলু হাতনেতে মাদুরের উপর বসে আছে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে। তাদের দেখছে কি দেখছে না তা ধরা যাচ্ছে না। রাবেয়া হাবলুকে দেখেই বলল, কিতাব দে, হিঁদু হামার ডর লাগে, উ লোগ আচ্ছা নেই।

তোর আব্বা বলেছে?

হাঁ, কিতাব লি আ।

তোর আব্বা যে বলে বাংলা হিঁদুর ভাষা।

নেহি, হামার তো আচ্ছা লাগে।

তোর আব্বা দেখলি খারাপ হবে, কিতাব এ বাড়িতি থাক, তুই এসে পড়ে যাস।

উ হিঁদু লোগ কব জায়েগা?

আজই।

কিতাবটা দিখা ময়রাম।

হাবলু শুনতে পাচ্ছে। রাবেয়া এক একবার চকিত দৃষ্টি হেনে ময়রমের সঙ্গে কথা বলছে। রাবেয়া বার বার বলছে হিদুঁ লোক খতরনাক, কিন্তু দেখছেও হাবলুকে। বছর চোদ্দ পনেরর কিশোরী, অনাত্মীয় যুবকের দিতে তাকিয়ে তো দেখবে। আর ওই দৃষ্টির ভিতরে যত কৌতূহল, তত ভয়ের ছায়া। আব্বা যদি শোনে হিঁদু এসেছে ইন্ডিয়া থেকে, তখন খুব রেগে যাবে। কিন্তু রাজাবাজারে তার বড়চাচা, তার খবর কি এই লেড়কা এনে দিতে পারবে? বলবে নাকি ময়রমকে দিয়ে? সাহস হলো না, তার আব্বা বলে, হিন্দু হলো কাফের, আল্লা পাক কাফেরকে জিন্দা না রাখতে বলেছে, বোরখা পরবি রাবেয়া, হিন্দুর আঁখোতে তুই পুড়ে যাবি, খুবসুররত কত মুসলমানের লেড়কি যে হিন্দু নষ্ট করেছে। এই ইস্ট পাকিস্তানের মুসলমান মুসলমান নেহি, তোকে আমি আসলি মুসলমানের ঘরে পাঠাব, করাচি কি লাহোরে শাদি করাব।

আব্বার কথাগুলো তার মনে পড়ল। হিন্দুরা মুসলমান মেয়ের ইজ্জত নেয় বলেই না পাকিস্তানে আসা। এই যে হিন্দু বসে আছে ময়রমের কোঠিতে, ইয়ে আচ্ছা নেহি। কিন্তু লোকটাকে তার খারাপ মনে হচ্ছে না। আব্বার সব কথা ঠিক মনেও হয় না। এই এখানে কি হিন্দু নেই? তাদের গাঁ পিঠাপুরায় কি হিন্দু ছিল না। তারা তো কাঁদল ছেড়ে আসার সময়। তবুও রাবেয়া বলল, হামি যাই, যেতেছি, তুই রাজাবাজারের বাত শুনাস, রায়ট হতেছে কি না পুছ, ইন্ডিয়াতে রায়ট হতেছে?

তুই ঘাটে আয়, বই নে আমি যাচ্ছি।

ঠিক হ্যায়, রাজাবাজারের খবর কি, খবর দেনাই হোগা।

ত্রস্ত পায়ে রাবেয়া চলে যেতে ময়রম বলল, তুমি হিদুঁ তাই চলে গেল।

হাবলু বলল, আমি কি চলে যাব?

ওরা হিঁদু দেখতি পারে না।

ওরকম হয়, অনেক লোক আছে মোছলমান দেখতি পারে না, মোছলমানকে উঠনে পা দিতি দেয় না।

সে তো জানি, তুমি কী করে এ বাড়িতি ভাত খাও?

মা বাবা না করে না, বাবা রামকৃষ্ণ ঠাকুরির কথা বলে, তাঁর ওসব কিছু ছিল না।

হাবলুকে বসিয়ে রেখে লাল পাতলা কাগজের উপর বিদ্যাসাগরের ছবি আঁকা বর্ণ পরিচয় আর ধারাপাত, শাড়ি গামছা, কলসি নিয়ে ময়রম উঠনে নেমে জিজ্ঞেস করল, রাজাবাজার কাঁহা হ্যায়?

ময়রমের অদ্ভূত ভাষায় অবাক হাবলু, হেসে উঠে বলল, হম জানতি নেহি, তুই হিন্দি বলচিস যে?

হিন্দি না উদ্দু, রাবিয়া শিখোচ্ছে।

যাহ্ বাবা, হাবলু আরো অবাক, বিনিময় হচ্ছে দুজনে। বর্ণপরিচয় নিয়ে ময়রম ঘাটে যাচ্ছে, ঘটে বসে পড়া হবে। সে বলল, রাজাবাজার কলকাতায় পড়ে, শ্যাল'দা যেতে আমি দেখেছি।

রায়েট হচ্ছে সেখেনে?

কেডা বলল?

কেউ না, রাবেয়া জিজ্ঞেস করল।

সব ভাল আছে, এখন পার্টিশন রদ করতি পারলি হয়, সারা দেশ বিদায় ঘাট হয়ে গেছে, রায়েট করে করে বিদায় ঘাট, মানষি চোখের জল ফেলছে শুদু।

পরে শোনবো, আমি ঘাটে যাই। রাবেয়া গেল ঘাটে। ঘাটে যাওয়ার পথে বাঁ দিকে মিত্তিরদের রেখে যাওয়া বাড়ি দেখল। সেই বাড়িই জলের দরে নিয়েছে রাবেয়ারা। এটা ছিল মিত্তির পাড়া, যদিও সেনরা থাকত, ধররা থাকত, ঘোষ ছিল। আর ছিল মল্লিক, এক ঘর মল্লিক আছে। আখতার চাচা একদিন আব্বাকে বলেছিল, এক হিঁদু ভি নেহি রহেগা পাকিস্তানে, এক হিঁদু পাঁচ বনেগা, পাঁচ হিঁদু পঁচিশ বনেগা, হিঁদু লোগ পাকিস্তান বরবাদ করে গা। কেমন বলে চাচা, সবটা সে ধরতেও পারে না সে। রাবেয়ার মুখের বুলি বেশ মিঠে লাগে, কিন্তু ওর আব্বারটা শুনলে ভয়ই করে। রাবেয়ার বুলি শুনলে মনে হয় 'উদ্দু'টা শিখে নেয়, 'উদ্দু' জবান। কিন্তু চাচার কথা শুনলে মনে হয় না না কিছুতেই না। চাচা বলে বাংলা বাত গন্ধি বাত। বাংলা মাত বোলো, উর্দু হামারা জবান হ্যায়, পাকিস্তানমে উর্দু শিখনাই পড়েগা, বাংলা হিঁদুর জবান। আব্বা তখন ওই কথায় সায় দেয় নি। বাংলা মুসলমানেরও ভাষা, বাংলার কবি নজরুল, জসিমুদ্দিন, আর রবি ঠাকুর তো আছেনই। তাতে তক্কো লেগেছিল খুব। কিন্তু রাবেয়ার কাছ থেকে উর্দু শিখে নিচ্ছে সে। বলতে শিখছে ঘাটে বসে।

অজিত মিত্তিরদের বাড়িটা খুব সাজানো ছিল। মাটির ভিটে কেমন নিকোন হয়ে ঝকঝক করত সব সময়। উঠনে ধানের গোলা দুটো, তার তলার উঠনটিও কী সুন্দর নিকোনো থাকত। মাসি সেখানে লক্ষ্মীর পা এঁকে দিত পিটুলি দিয়ে। ধানের গোলা তো মা লক্ষ্মীর ভিটে। উঠনের পশ্চিম কোণে জবা, গাঁদার গাছ ছিল। একটা গন্ধরাজ গাছ ছিল। কাঞ্চনফুলের গাছটি ছিল পুব দিকে। রাবেয়ার আব্বা সব সাফ করে দিয়েছে, ধানের গোলা সরিয়ে দিয়েছে বাড়ির দক্ষিণ কোণে। কেন তা কে জানে? পাকিস্তান গড়তে হলে হিঁদুর কোনো চিহ্নই রাখা যাবে না। সে যা করেছে তার উল্টো করো, তবে মুসলমান জিন্দা রহেগা। এই রকম বলতে বলতে গন্ধরাজ, কাঞ্চন, জবা সব গাছগুলিকে কেটে সাফ করে দিল। তারপর উঠনটিতে সুপুরি গাছ লাগিয়ে দিল। এখন সুপুরি বনের আড়ালে সব। অজিত মিত্তিরের সঙ্গে আব্বার ভাব ছিল। অজিত মিত্তির চলে গেলে আব্বা ক'দিন খুব হা-হুতাশ করেছিল। এই স্বাধীনতার মানে কী? হিঁদুরা কেন যাবে?

অজিত মিত্তিররা তো বছর খানেক গেছে। তারা থাকবেই ভেবেছিল, কেন পারল না তা সবাই জানে। ঢালি পাড়ার বাশার শেফালিকে শাদি করবেই, গিয়ে প্রস্তাব দিয়েছিল। এমন কী হয়? না হলে, শেফালিকে নিয়ে করাচি চলে যাবে বলেছিল বাশার। বাশার ছেলে ভাল। সাতক্ষীরে কলেজে পড়ত। কিন্তু মুসলমানের ছেলের সঙ্গে কেন বিয়ে হবে হিঁদু মেয়ের? অথচ বাশারকে পছন্দ করত শেফালির বাবা। সে লোকটা ভাল ইংরিজি জানত, বাশার তার কাছে পড়ত ইস্কুল শেষে। শেফালিও। তাতেই ভালবাসা হয়। সে যে ভালবাসে হাবলুদাকে, তার কী হবে? কোন দেশেতে যাবে সে? তবে একটা কথা ঠিক, বাশার ও বাড়ির উঠনের পর আর এগোতে পারে নি। হিন্দুবাড়িতে মুসলমানের ওই পর্যন্তই যাওয়া। হাতনেতে উঠাও বারন, তা হলে মুসলমান ছেলে কী করে হিন্দুর জামাই হবে? ইস্! এটাই ভাঙতে চেয়েছিল বাশার। অনেক হয়েছে, পাকিস্তান হয়েছে, ভাল মন্দ জানি নে, যাকে ভালবাসি তারে শাদি করবই, আমারে কেউ আটকাতি পারবে না, মোছলমান কি কুঠো রুগি যে তারে ছুঁয়া যাবে না, অনেক সয়েছে মোছলমান।

রাতের অন্ধকারে গরুর গাড়ি চেপে এক বস্ত্রে তারা সাতক্ষীরে হয়ে ভোমরা রওনা হয়েছিল। তার আব্বা সঙ্গে গিয়েছিল চোখের জল ফেলতে ফেলতে। তারা চলে গেলেই তো রাবেয়ারা এল। কত জমি ছিল। সব ছিল ভাগে। ভাগচাষী ছিল সব নমঃশুদ্দুর আর মুসলমান। তারা খুব খুশি, তাদের কাছে জমি রেখে গেল ওরা। ফিরবে ওপারে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে। যতদিন না ফিরবে, ততদিন জমি তাদের হেফাজতে। যারা গাঁ ছেড়ে একবার ইন্ডিয়ায় চলে গেছে তারা কি কেউ ফিরেছে এ পর্যন্ত? বামুন কায়েত কেউ পাকিস্তানে থাকবে না। তারা আনন্দেই ছিল একটা বছর, কিন্তু বছর কাটতেই আখতার আলি হাজির। রীতিমতো এক্সচেঞ্জ করে মিত্তিরদের পিঠাপুরা বিহারে পাঠিয়ে চলে এসেছে এখানে। এসেই সব জমি নিজের খাসে নিয়ে নিল, নমঃশুদ্দুর, মুসলমান, কাউকে রেয়াৎ করল না। সে নিজে বসে থেকে অন্য চাষা দিয়ে চষাবে। গোলমাল হয়েছিল, এই এদিকেও তো তেভাগা হয়েছিল বছর দশ-বারো আগে, পার্টিশনের পর পর। চাষা উচ্ছেদ চলবে না। কিন্তু আখতার আলির খুব রোষ। কিঁউ রে, হমার জমিন, ইয়ে হমারা পাকিস্তান হ্যায়, ফালতু বাত না করবে।

রাবেয়া পিছন থেকে ডাকল, এই ময়রম।

সে পিছন ফেরে। রাবেয়া অপেক্ষা করছিল আমতলায়। সে শুখা দেশের মানুষ। সাঁতার জানে না। তাকে তার আম্মা, আব্বা বলে দিয়েছে পোখর কি পানি বহুত খতরনাক হ্যায়, আকেলা পোখরমে কভি নেহি যানা।

ময়রম দাঁড়াল, বলল, কেয়ারে, হিঁয়া হ্যায় তু?

হাঁরে, আমি হিঁয়া রয়েছি, বই কই? বলে খিল খিল করে হাসতে লাগল সে। দুই সখী বহু পুরোন ঘাটে নেমে গেল। নেমে বসল দুজন মুখোমুখি। হাল্কা লাল পাতলা

কাগজের উপর বিদ্যাসাগর—ঈশ্বরচন্দ্র শর্মণ—বিদ্যাসাগরের ছবিওয়ালা বইটি রাবেয়ার হাতে দিল। রাবেয়া উত্তেজিত হয়ে বইটি দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, কৌন হ্যায় এ লোগ?

বিদ্যাসাগর।

কেয়া?

বিদ্যার সাগর।

সমুন্দর?

হ্যাঁ, তোর সমুন্দর, আমার সাগর, সাগরে যেমন পানির শেষ নেই, ইনির তেমন বিদ্যের শেষ নেই, বহুত গেয়ানি, লিখাপড়া বহুৎ।

হিঁদু হতিছে?

হিঁদু বামভন, তাই কী হয়েচ, হিঁদুরাই তো বিদ্যে জানত, মোছলমান তো চাষা, লেকাপড়ার ধার ধারে না।

ইয়ে ঠিক হতিছে না।

শুনে খিলখিল করে হাসতে লাগল ময়রম। ঠিক হতিছে না। কোনটা ঠিক হতিছে না? বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয়? কেন হতিছে না? তা'লি কি আখতার আলির বননো পরিচয় পড়বে লোকে? কথাটা মনে এল, মুখে বলল না ময়রম। বলল, বননো পরিচয় এডাই, এ থেকে তোরে শিখতি হবেনে।

রাবেয়া বইটি উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল। ভিতরে শাদা কালো রেখা চিত্র দেখতে লাগল। অ-য় আজগর আসছে তেড়ে, আ-এ আমটি খাব পেড়ে...।

এ কী হতিছে?

অজগর, বল অ-য় অজগর আসছে তেড়ে।

উসকি বাদ?

আ-য় আমটি খাব পেড়ে।

পেড় তো গাছ হতিছে।

খিলখিল করে হাসল ময়রম, নেহি রে নেহি, এ হলো আম পাড়া, আমরে আম।

অজগর সাপ হতিছে।

হ্যাঁরে, সাপ হোতা হ্যয়, শোন আম পাড়া কী, গাছে আম ঝুলতি হ্যয়, ঝুলে রয়েছে... বুঝিয়ে দিতে লাগল ময়রম। তা শুনে হাসতে লাগল রাবেয়া, বইটিকে দেখতে লাগল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। বিড়বিড় করল, আলেফ-বে-উর্দু যেমন হতিছে।

রাবেয়ার বাংলা শেখা আর বলার কী চেষ্টা! কী হবে শিখে? ওর তো শাদি হবে করাচি লাহোরে। সেখানে উর্দু জবান ছাড়া চলবে না। এই পূর্ব পাকিস্তানেই উর্দু না জানলে কোনো উপায় নেই। চাকরি-বাকরি হবে না। বাংলা চলবে না। সাতক্ষীরেতে এ

নিয়ে চলছে খুব। অজেতভাই এক একদিন বলে। সে আর তার আম্মা শোনে। তার ভয় করে, অজেতভাই বলে, উর্দুর বিরুদ্ধে ঢাকায় মিছিল হচ্ছে, গুলি চলেছিল একবার, তিনটে মানুষ মারা গিয়েছিল। তাদের নাম বলেছিল অজেত।

রাবেয়া জিজ্ঞেস করে, অজেতভায় কুথা গেল?

মছলি আনতি।

মাছ, কাতলা মাছ হতিছে?

কেডা জানে কী মাছ?

অজেতভায় ভাল।

না ভাল না, তোর মতলব ভাল না, তুই এত অজেত অজেত করিস কেন?

মতলব?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মতলব, তুই উদ্দু আর আমরা বাংলা?

তো কী হতিছে?

তোর শাদি হবে সেই করাচি, তোর আব্বা আমার আব্বারে বলত মিলিটারির সাথে শাদি করাবে, করাচির মিলিটারি অফিসার, তুই বাংলা শিখে কী করবি?

মর্জি, মেরা মর্জি, হামি করাচি যাব না।

শাদি হবে?

নেই জায়েগি।

বললে হবে, তোর আব্বা তোরে ওখেনেই পাঠাবে।

নেই, অজেতভায় কী বলতেছে?

উহ্, শুদু অজেতভায়, অজেতভায়, কী হতিছে রাবিয়া, তোর রাজাবাজারে কিছু হয় নি।

রাবেয়া বলল, উ ছাবাল ভাল, লেকিন হিঁদু।

হিন্দু হলি খারাপ, ওরাও তাই মোছলমানরে মানষি বলে মনে করে না।

মতলব, অজেতভায় কখুন ফিরতিছে?

এই এখন। মুখ টিপে হাসে ময়রম। ইস, এবার কী হবে? রাবেয়ার কী হবে তার যে হাবলুর জন্য মন খারাপ করে, হাবলুকে আজ দুপুরে একবার ছুয়ে বুক এখনো ধড়ফড় করছে, রাতভর করেছে, কতবার যে ঘুম ভেঙেছে তার ঠিক নেই। সকাল থেকে দূরে দূরে রয়েছে অনেকটা। কিন্তু জানে হাবলু শেষ অবধি ইন্ডিয়ার লোক। হিন্দু হাবলুর সঙ্গে তার শাদি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবু হাবলুর কথা ভাবতে ভাল লাগে। কিন্তু হাবলুর সঙ্গে যদি সে পালায়, তার অজেতভাই, বড়ভাই মদত দেবে। রাবেয়া যদি শাদি করতে চায় অজেতভাইকে, রাবেয়া পালাতে পারবে না। আখতার আলি বলে, বঙ্গালির সঙ্গে বেহারি কভি নেই মিলতা, বঙ্গালি উদ্দু না শিখলে পাকিস্তানি হতে পারবে

না। তার কথা শুনে মনে হয় হিন্দু বামুনের যেমন নমঃশুদ্দুরে ঘেন্না, বেহারির তেমন বাঙালির উপর ঘেন্না। আখতার আলির কানে গেলে, কালই করাচি লাহোর চলে যাবে মেয়েকে নিয়ে।

তুই বাংলা শিখে কী করবি, পাকিস্তানে বাংলা চলবে না।

কিঁউ?

তোর আব্বা জানে।

লেকিন অজেতভায় কী বলতিছে?

তোর আব্বা বলে, বাঙলা জানলে কামকাজ মিলবে না পাকিস্তানে, অজেতকে বাংলা ভুলতে হবে, বাঙালিকে বাংলা ভুলতে হবে।

ক্ষেতিকাম?

ধুর, অজেতভাই তো মাস্টারি করবে।

বাংলা মিঠা হতিছে।

তোর আব্বা শুনলি বেড়োন দেবে, মারেগা রে মারেগা।

হম দেখ লেঙ্গে।

হু তুই কত দেখে নিবি, বইটা আমি রাখব না নিয়ে যাবি?

রাবেয়া বইটা নিয়ে বুকে চেপে ধরল, তারপর বলল, তুই রাখি দে, মুঝে ডর লাগতেছে মরিয়ম।

মরিয়ম নামটি—এক এক সময়, আচমকা কী সুন্দর উচ্চারণ করে রাবেয়া।

সাতান্ন

অজেত বলল, সাগরদাড়ির কথা বললি তুই, সাগরদাড়ি যাবি হাবলু?

আমার তো ইন্ডিয়ায় যেতি হবে, দ্যাখ অজেত, আমার মাথায় যে ভূত চাপে, তারে নামানো বড় কঠিন, আমি নেহেরু আর আয়ুব খাঁর সঙ্গে দেখা করব বলেছি যখন, করবই, দিল্লি হয়ে পাঞ্জাব দিয়ে লাহোর, করাচি, পিন্ডি যাব।

অজেত হাঁ করে তাকিয়ে থাকল হাবলুর দিকে। এ কোন হাবলু? আশাশুনির হাবলু জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি যাবে, তারপর লাহোর! সে তো বেরতেই পারছে না উতুলি আর সাতক্ষীরে ছেড়ে। হাবলুর কথায় সাগরদাড়ি তীর্থে যেতে ইচ্ছে হয়েছে। একা একা যাবে কী করে? একা কোনো কাজ হয় কবিতা লেখা ছাড়া। অজেত গোপনে তা লেখে। হাবলু তা জানে না।

দুটো সাইকেল নিয়ে যাওয়া যায়। সাইকেল তো রয়েছে তার আর তার আব্বার। হাবলু চলুক। আশাশুনিতে খবর করে তারা সাগরদাড়ি যাবে। অজেতের মনে টান উঠল... হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ রতন, তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি, পরধন

লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ...। যেতে হবে সাগরদাড়ি। অজেত অনেকদিন ধরে কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। কিছু একটা করতে হবে, কিন্তু কী? তার সঙ্গে আব্বার মৃত্যুর ক'দিন আগে থেকে খুব ঝামেলা চলছিল। আব্বা বলেছিল, তাকে মিলিটারিতে যেতে হবে, পাকিস্তানি ফৌজে ঢুকে কাশ্মীর দখল করতে হবে, মুসলমানের পবিত্র কাজ তা।

আখতার আলি বলেছিল, লাল কিলা দখল করনা হোগা বেটা, যা ফৌজে যা, খুলনা টৌনে ফৌজঅলারা জোয়ান ঢুঁড়ছে, রিডিও নিউজ শুন।

না, আমি যাব না, আমি টিচার হবো।

টিচার! ফুহ্! ঘৃণায় মুখটি যেন বেঁকে গিয়েছিল আখতার আলির। তা দেখে আব্বা বলেছিল, পাকিস্তানের মিলিটারিতে ঢুকতে পারলে বর্তে যাবে অজেত। আখতার আলি পুরোনো কথা আবার বলতে শুরু করেছিল, লাল কিলা দখল করনা হোগা বেটা, যা মিলিটারিতে যা।

ক'দিন ধরে তক্কো হচ্ছিল। সে আখতার আলিকে বোঝাতে পারছিল না, এটা কোনো পথ নয়। এই রকম বিদ্বেষ তার নেই। তার বরং দুঃখ হয় হিন্দুরা চলে যেতে। পাকিস্তান থাকুক, হিন্দুরাও থাকুক। তার খুব মনে পড়ে হাবলুর কথা। এই গাঁয়ের মিত্তিরদের কথা। ওই আখতার আলিরা সব দখল করে নিচ্ছে। কথায় কথায় বলে কিঁউ রে, ইয়ে হমারা পাকিস্তান, ইন্ডিয়া নেহি। যেন পাকিস্তান ওদের একার। পাকিস্তান ওরাই হাসিল করেছে। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। কথা বোঝা যায় না। রবি ঠাকুরের নাম ধরলে বলে হিঁদু পোয়েট, উর্দু মুসায়েরা কর, উর্দুই পাকিস্তানের জবান।

চ হাবলু চল, সাগরদাঁড়ি যাই, আমার খুব একা লাগে হাবলু, খেলা বন্ধ করে দিইছি, মাঠে যেতি ভাল লাগে না, গড়ের মাঠে খেলা তো হল না?

কেন ঢাকায় খেল, ঢাকার ম'মেডানে, আবাহনী ক্লাবে।

দূর ঢাকা অনেক দূর, যাগগে, চ সাগরদাঁড়ি চ, মধুসূদনের বাড়ি দেখে আসি, আমাদের সামনে বিপদ হাবলু, কী বিপদ তা ক'দিনির ভিতর বুঝতি পারবে পূর্ব পাকিস্তান, ঢাকায় গেলি সব ধরা যায়।

এই রকম কথা হতে হতেই ওরা চলল সাগরদাঁড়ি। কিন্তু সাইকেলের পথ তো অনেক, বড়দল ঘাট থেকে স্টিমারে যেতে পারে তারা। উজানে সাগরদাঁড়ি ঘাটে গিয়ে নামবে, কথাটা বলল হাবলুর বাবা, সাইকেল নিয়ে যাবি, পথঘাট কি ভাল, বিশ্বাস হয় না, যতই থাকুক অজেত।

অজেত আর হাবলু বলতে এসেছিল। কথাটা মেনে নিল। তার আগে ভাত খায় দুই বন্ধু। বিকেলে চলল ফিরে নবগাঁ উতুলি। পরদিন ভোরে উঠে সাইকেলেই চলল স্টিমারঘাটা বড়দল। সেখানে ফুফুর বাড়ি সাইকেল রেখে স্টিমার ঘাটা। বেতনা আর কপোতাক্ষ মিশেছে সেখানে। সেখান থেকে সাগরদাঁড়ি মেল ছাড়ে। স্টিমারের নাম

শুনে হাবলুর মনে পড়ল তুফান মেলের কথা। ওদেশে রেল গাড়ি, এ দেশে স্টিমার। গাঙের পর গাঙ, রেল লাইন পাতবে কোথায়?

নদী ঘাটে পৌঁছে হাবলুর চোখে জল এসে গেল। কে জানে কেন, হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল সে। কী হলো রে পাগল, কী হলো তোর? অজেত তাকে ধরল।

হাবলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, এই গাঙ-কপোতাক্ষী, এই জল আর আমার না অজেত, সব পর হই গেছে।

কী পাগলামি করিস, পার্টিশন হয়েচে তো করবি কী?

হাবলুর কান্না চলতে থাকে, রুমালে চোখ মোছে, চোখ কচলায় সে, বলে, ইস, কী হলো রে অজেত, এমনি নদী এমনি জল এমনি আকাশ ওপারে নেই।

তোরে বলল কেডা, সব জা'গাই সোন্দর।

ভোঁ ডাক দিয়ে দিয়ে স্টিমার চলছিল। গাঁর মানুষ ছেলেপুলে, বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে বসে রয়েছে ডেকে। চুপচাপ। ছাগল নিয়ে বসে আছে এক বউ, সঙ্গে দুটো বাচ্চা। হাবলু অবাক হয়ে দেখছিল নদী তীরের শ্যামলিমা। জোয়ার চলছে, নদীতে ঢেউ উঠছে, নদী তীরে বুড়ো চাষা, চাষী বউ, সব যেন ছবির মতো। স্টিমারের ভোঁ শুনে সবাই তাকিয়ে আছে নদীর দিকে। স্টিমারে। হাবলুর দিকে। হাবলুর কান্নাভরা মুখের দিকে। তখন অজেত বলছিল, দ্যাখ হাবলু, তুই এপারের লোক তাই তোর খুব কষ্ট হচ্ছে, যারা ওপার থেকে এয়েচে, এমনকি ওই আখতার আলি, রাবেয়ার আব্বা, সেও পর্যন্ত বলে তার গাঁয়ের মসজিদ আর কলকাতার গড়ের মাঠের কথা, বলে, পাকিস্তানে গোটা কলকাতা আসা উচিত ছিল।

হাবলু চুপ করে শোনে। অজেত বলে, ওই আখতার চাচা বলে, তাদের পিঠাপুরাও পাকিস্তানে এলে ঠিক হতো, বলে সবই যদি পাকিস্তান হতো, লাহোরের সঙ্গে দিল্লি, সব।

তাহলি পার্টিশন হতো কোথায়?

হতো না।

আমি তো বলি সেই কথা। হাবলুর মুখ কান্না মুছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মেঘ ভেঙে রোদ উঠল যেন, উদ্ভাসিত মুখে সে বলল, তোর ওই আখতার আলিও এই কথা বলে, তাহলি কেউ চায় না এই রকম ভাগাভাগি?

ওটা তো অন্তরে যে ভালমানুষটি থাকে, তার কথা। আসলে ভাগ হলো তো হিন্দু মুসলমানে। অন্তরের ভালমানুষটা তো এক একবার হুস করে ভেসে ওঠে, যেমন গাঙে শুশুক মুখ তোলে, তেমনি, আসলে ওই লোকটা আমাদের ঘেন্না করে, ভাষার জন্য ঘেন্নাটা বেশি, বলে আমরা 'বঙ্গাল কি মুসলমান আসলি মুসলমান নেহি', কিন্তু আমি কি উর্দু ভাষারে ঘেন্না করি, করি নে, কেন করব, আমি শুনেচি উর্দু ভাষায় প্রেমচাঁদ

লিখতেন, সাদাত হুসেন মান্টো, রাজিন্দর সিং বেদি, কিষাণ চন্দর লেখেন, কবি ফিরাক গোরখপুরি, এইসব পড়ব বলে আমি উর্দু হয়ত শিখব, কিন্তু এই সব লোক মানুষকে বিষিয়ে দিচ্ছে, বাংলা শিখলি কি তুই রবি ঠাকুর, নজরুল পড়তি পারতিস নে, ওসব জ্ঞান আছে?

অবাক হয়ে অজেতের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনছিল হাবলু। এসব কথা অজেত কবে শিখল? আগে কি এই সব বলত? ওই যে সব লেখক-কবির নাম বলছে তাদের নাম কবে জানল এই উতুলিতে বসে। আগে তো শোনে নি?

হাবলু কথায় অজেত বলল, তুই বা এত মধুকবির কথা জানলি কবে?

কলকাতা গে।

আমি সাতক্ষীরে কলেজ থেকে, একজন সার আছেন, জামিল আখতার, উনি উর্দু পড়ান, নোতন করে শিখতি হচ্ছে, এসব ওঁর কথা, উনি রবি ঠাকুরের কবিতা উর্দুতে অনুবাদ করেছেন, আবার উর্দু থেকে বাংলায় প্রেমচাঁদের গল্প কাফন, ঢাকার ম্যাগাজিনে ছাপতে দিইছেন, সেই গল্প আমারে পড়ি শুনালেন, কী গল্প!

হাবলু বলল, কোথায় বাড়ি ছিল ওঁর?

বীরভূম, বোলপুরের কাছে, তুই শান্তিনিকেতন গিছিস?

মাথা নাড়ল হাবলু। সে সম্ভ্রমের চোখে দ্যাখে অজেতকে। এই সেই অজেত। বছর দুই-এর ভিতর বদলে গেল এমন যে চেনা যাচ্ছে না। কী সব কথা বলছে, শুনতে খুব ভালো লাগছে। সেই জামিল সার বলে, উর্দু খুব মিঠা ভাষা, তারে নষ্ট করে দিচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানিগুলো। পাকিস্তানে বাংলা হওয়া উচিত রাষ্ট্র ভাষা, কেন না বাংলায় বেশি লোক কথা বলে দুই পাকিস্তানে, পুবে, পশ্চিমে মিলে বাঙালির সংখ্যা বেশি।

হাবলু না পেরে বলল, তা'লি পাকিস্তান নিয়ে গোলমাল বেঁধেছে?

হ্যাঁ, উর্দু না বাংলা এই নিয়ে, ঢাকায় তো চলছে সব সময়, আরে স্বাধীনতার পর থেকে, বায়ান্ন সালে তিনটে লোক গুলি খেয়ে ভাষার জন্য শহীদ হলো, সালাম বরকত রফিক, তারপর থেকে বাংলা উর্দু নিয়ে চলছে। সরকার বলছে উর্দু ছাড়া হবে না, আমরা বলছি না বাংলাতে করতে হবে, কিন্তু এটা সত্যি যে পাকিস্তানে সব কিছু উর্দু-ওয়ালাদের জন্য, চাকরিবাকরি, ব্যবসাপাতি, সব, পাকিস্তান হয়ে বাঙালির সব্বোনাশ হয়েছে, ওরা লুট করছে আমাদের।

হাবলুর মনে হয় অজেত অনেক বড় হয়ে গেছে। অজেতের কথা বোঝা যাচ্ছে না। শুধু ধরা যাচ্ছে পাকিস্তান হয়ে খুব সুবিধে হয় নি এই পুব দিকে। দলে দলে বেহারি এসে গাঁয়ের জমি কিনে নিচ্ছে, তাদের কথা ধরা যায় না। তাদের আচার ব্যবহার মেলে না। মসজিদও গড়ছে তারা নিজেদের। সেখানে বাঙালি যায় না। অথচ ইসলাম ধর্মে কি ভেদাভেদ আছে নাকি? তারা বলছে বাঙালি কোনোদিন মুসলমান হতে পারে না,

জবান আরবি উর্দু হতে হবে তবেই সে আসলি মুসলমান। এই যদি হয় তবে হিন্দুস্তান পাকিস্তান হয়ে লাভ কী হলো পূর্ব বাংলার মানুষের? পাকিস্তান শুধু পশ্চিম দিকটাই হতে পারত। আমাদের কী হলো? এইসব কথা শুনতে শুনতে হাবলু দেখল ওই দেখা যায় ঘাট। লোকজন উসখুস করছে। সাগরদাঁড়ির স্টিমারঘাটা এসে গেল। পৌঁছে গেল তারা। ভোঁ, ভোঁ, ভোঁ—স্টিমার ডাক দিচ্ছে।

এই হলো সাগরদাঁড়ি। এই কি তার বিদায় ঘাট? লোকজন ঘরের পথ ধরল। স্টিমার যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরে যাবে। সাগরদাঁড়ি মেল এখান থেকে ফিরবে আবার বড়দল ঘাট, বড়দল থেকে খুলনার গাড়ি মানে স্টিমার মিলবে। পথে পড়বে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের গ্রাম রাড়ুলি-কাটিপাড়া। সে হলো ডাউনের কথা। সে কথা যাক। সবুজ বন-বনানীতে ভরা গ্রামখানি স্টিমার আসার পর যেমন কলরবে মুখর হয়েছিল তা কেটে গিয়ে নিস্তব্ধ হলো আবার। স্টিমারঘাটে একটি ঝোপড়ির হোটেলে ভাত ডাল বড় সরপুঁটির ঝোল খেতে খেতে অজেত জিজ্ঞেস করল, মধুকবির ভিটে কোথায়?

মাইকেলের বাড়ি?

হাবলু বলল, বিদায় ঘাট কোথায় বলতে পারেন?

হোটেলওয়ালা অবাক হয়ে দেখল তাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তারপর জিজ্ঞেস করল, ইস্টিমারে আলেন তো, ঘর কনে?

জবাব দিল অজেত, বলল, সাতক্ষীরে উতুলি, ডাউনে, আমরা কবির ভিটে দেখব বলে এয়েচি, সাতক্ষীরে কলেজের স্টুডেন্ট।

লোকটা কলেজ স্টুডেন্ট শুনে সম্ভ্রমের চোখে তাকায়, বলে, ইস্টুডেন মানে ছাত্তররাই তো দেশির সব, কত ছাত্তর আসে এহেনে, আমাদ্দের গর্ব হয়, ঢাকা থেকি এইলো শীতের সময় মদু কবির জন্মদিনি, সব জানতি, আর দেখতি সফিউদ্দিন মন্ডলকে ধরতি হবে নে, তার পাঠশালে যান, পাগলা মতো লোক, গাছতলায় ইস্কুল খুলেচে, সব জানে তিনি।

সে কে? সফিউদ্দিন? বুক ঝমঝম করে ওঠে হাবলু। এ কে সেই লোক, ঘোলা না নিমতের সেই সফি? তাকে তো বীরাঙ্গনাই পাঠিয়েছিল এখানে। সে বলতে গিয়েও থেমে গেল। সে তো আসলে এই দেশের নয়, সে হলো ইন্ডিয়ার অমিতাভ রায়-হাবলু। জানতে পারলে কি ভাল ব্যবহার পাবে? কে জানে? পাশপোর্ট ছাড়া এসেছে সে। ধরে থানায় নিয়ে গেলে হাজতে ঢুকিয়ে দেবে। তখন বেরনো কঠিন হবে। হাবলু চুপ করে গেল। অজেত কথা বলতে লাগল। খাওয়া শেষ হলো। পয়সা মিটিয়ে তারা সফিউদ্দিনের বাড়ির সন্ধানে এগোল হোটেলওয়ালার দেওয়া নির্দেশ মতো। ঠিক দুপুরের গাঁ খানি নিঃঝুম প্রায়। পথে নেমে হাবলু বলল, এ ঠিক সেই লোক, নিমতে থেকে এয়েচে, দিদমা বলেছিল সাগরদাঁড়ি আসতে।

হাবলুর কাছে আগের দিন শোনা কাহিনি মনে পড়ল অজেতের। সে একটু উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ক'পা এগোতেই হাবলু আমগাছ তলায় দেখতে পেল লোকটাকে। জনা দশ-এগার বাচ্চা নিয়ে বসে আছে সেই সফিউদ্দিন, পাঠশালা খুলে বসেছে বড় আমগাছ তলায়।

দূরে দাঁড়িয়ে থাকল দুজন। সফিউদ্দিনের পাঠশালা থেকে ''অ-য় অজগর আসছে তেড়ে, আ-য় আমটি খাব পেড়ে'' ভেসে আসছিল। বাচ্চাদের রেখে সে উঠে দাঁড়িয়েছে দুই অচেনা মানুষকে দেখে, ভাইজান, আপনারা কারা? জিজ্ঞেস করতে করতে এগিয়ে এল সফিউদ্দিন। গালে পাতলা দাড়ি, চেক লুঙ্গির উপর লং ক্লথের শাদা পাঞ্জাবি। চোখে গোল চশমা। হাবলু লোকটাকে দেখে অভিভূত হয়ে গেল। মনে হলো ঢিপ করে একটা প্রণাম ঠুকে দেয়। সে এগিয়ে গেল, আমারে চিনতি পার দাদাভাই, আমি হাবলু, অমিতাভ, বনগাঁর ট্রেনে দেখা হয়েছিল।

আরিব্বাস তুমি সেই তুমি, নানির নাতি, নানিরে নিয়ে এলে নাকি, কবির নাতনি তিনি, ঠিক বলতিচি কি?

হাবলুর চোখে জল এসে গেল। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল সফিউদ্দিন, বলল, নানিরে আনলে না কেন ভাইজান, নানির কথায় আমার সব দুঃখু কেটে গেছ।

অজেত হাত ধরল সফির, বলল, আমি অজেত, উতুলি বাড়ি।

আপনারে আমার দরকার খুব, কথা হবেখন। সফি বলল, আমি ওপার থেকে এখেনে এইছি।

অজেত হাত মেলায়। কী রকম শিহরিত হচ্ছে হাবলু। সেই লোকটাকে সত্যি যে এই সাগরদাঁড়ি এসে পেয়ে যাবে, তা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। সাগরদাঁড়িতে নামার পর তেমন কিছু মনে হচ্ছিল না। বরং নিঃঝুম গ্রাম তাকে বিমর্ষ করে তুলছিল। কিন্তু সফিউদ্দিনকে পেয়ে তার মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি সাগরদাঁড়ি এসে পৌঁছেছে। কবি মধুসূদনের দেশে। তখন তার বীরাঙ্গনার কথা মনে পড়ল। আহারে, দিদমাকে আনতে পারলে কী ভাল না হতো। সফিউদ্দিন যশোর শহরে থাকতে পারত, তার মামু ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু এখানে এসে বসত করেছে। পাঠশালাটা তার দুপুরের। বিনি পয়সায় বাচ্চা পড়ায়। সাগরদাঁড়ির সন্তান নিরক্ষর তো থাকতে পারে না। তবে কিনা কেউ কেউ তার বাড়ি এসে কিছু না কিছু দিয়ে যায়। কলা, আম, সিজিনের ফল, নতুন ধান...যেমন পারে। সাগরদাঁড়ির মানুষ ভাল। তাকে গ্রহণ করেছে সাদরে। যখন শুনেছে সে এসেছে মধুকবির টানে, তার কাছে বীরাঙ্গনা নানির গল্প শুনে গাঁয়ের মানুষ তাকেই ভার দিয়েছে মধুকবির বাড়ি তীর্থ স্থান করে গড়ে তুলতে।

জমি পেয়েছে সস্তায়। দোকান করেছে একটা। সকাল বিকেল খোলে। গড়গড় করে বলে যেতে লাগল সফিউদ্দিন। শুনতে শুনতে হাবলু নিজেই টের পেয়ে যায় সে

আর আগের মতো নেই। সে বদলে যাচ্ছে। কী অদ্ভুত এই জীবন। সে কি কোনোদিন ভেবেছিল সাগরদাঁড়িতে আসবে? মধুকবির সাগরদাঁড়ির নামই তো জানত না সে। বীরাঙ্গনাকেই বা চিনত কবে? পার্টিশন—হিন্দুস্থান, পাকিস্তান এই সব করে দিয়েছে। স্থবির জীবনকে নাড়িয়ে দিয়েছে। বাচ্চারা কলরব করতে করতে বাড়ির দিকে ছুটল। তারা তিনজনে হাঁটছিল কপোতাক্ষর দিকে। কিন্তু একটু কোণাকুণি। ছায়া ঢাকা পথ। ঘুঘুর ডাক শুনতে পাচ্ছে হাবলু। মধুকবি চলে গেছে গাঁ ছেড়ে, দেশ ছেড়ে। বাক্যহারা গ্রাম থমথমে হয়ে আছে। হাবলু বলল, বিদায় ঘাট কই দাদা?

চলো, দেখাব সব।

সাগরদাঁড়ির দত্তবাড়ির শরিক বলতে কে তা জানা নেই। মাগুরা থেকে এক দত্ত এসে দাবী করেছিল, তারা কবি মধুসূদনের, রাজনারায়ণ দত্তর সম্পত্তির অধিকারী, তাদের হক আছে এখেনে। কিন্তু তাদের দাবী ধোপে টেঁকেনি। তারা চেয়েছিল দাবী প্রতিষ্ঠা করে সব বিক্রি করে ওপারে গিয়ে মিশে যাবে। খরিদ্দারও ঠিক করে ফেলেছিল। গাঁয়ের লোক হতে দেয় নি। কবি মধুসূদনের শরিক সাগরদাঁড়ির সকল মানুষ, তারা অধিকার ছাড়বে কেন? অধিকার মানে মধুকবির যশে গর্বিত হওয়া। রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে। সাধিতে মনের সাদ, ঘটে যদি পরমাদ,...। সাগরদাঁড়ি তাঁকে মনে রেখেছে। হাবলু চেপে ধরেছে সফিউদ্দিনের হাত, কী বলো তুমি সফিদাদা, আমার চোখে জল এসে যাচ্ছে।

সফিউদ্দিন বলল, জন্মভূমির জন্য কবির কত কান্না ছিল বলো, পূর্ব পাকিস্তানে মধু কবির কথা ঘরে ঘরে বলে বেড়ান উচিত, বুঝলে অজেত ভাই।

অজেত আলি চুপ করে ছিল। তার মনের ভিতরে কী যেন ভেসে উঠে আবার ডুবে যাচ্ছিল। গাঙের শুশুক, আর পাতার আবডালে বসে থাকা পাখির মতো। এক একবার ভেসে উঠছে আবার জলের গভীরে, পাতার আড়ালে চলে যাচ্ছে। তারা কপোতাক্ষর তীরে এল আবার। স্টিমার ঘাটা অনেকটা দক্ষিণে। স্টিমার রয়েছে এখনো, তার সামান্য ধোঁয়া উগরোন চোঙ দেখা যাচ্ছে। ভোঁ নেই, ছাড়বে, ভাটা পুরোপুরি শুরু হলে। সফি বলল, এই সেই ঘাট।

ভাঙাচোরা পুরোন ঘাটলা রয়েছে, গাঙে এখন ভাটার টান শুরু হবে হবে। ওপারে গাছগাছালি, ধানকাটা মাঠ, খেজুর গাছ ইতস্তত এখানে ওখানে। হাবলু বলল, এরে সেই বিদায় ঘাট বলে?

হ্যাঁ, ওই পুবি দ্যাখো দত্ত বাড়ি, এখেনে মধু তাঁবু ফেলে বসে ছিল মা জাহ্নবীর সঙ্গে দেখা করবে বলে, মনে করে দ্যাখো, তখন কপোতাক্ষ আরো বড় ছিল, কেরমে কেরমে ছোট হয়ে আসছে, এরপর শুনা যাচ্ছে ইস্টিমার চলবে না।

তা হয় নাকি?

হয়, আপে তো আর ইস্টিমার যায় না, এখেন অবদি শেষ।

হাবলু ভয় পেল বুঝি, এ গাঙ থাকবে তো?

থাকবে কি যাবে উপরঅলার ইচ্ছে, গাঙের তো বয়স হয়। বিড়বিড় করে বলল সফিউদ্দিন।

অজেত আলি চুপ করে দাঁড়িয়ে, তার মুখে কথা আসছে এবার, বলল, আপনি বড় কাজ করতিছেন সফিভাই, মধুকবিরে নে আমাদের লড়তি হবে।

চমকে ওঠে সফিউদ্দিন, কী বলেন ধরতি পারলাম না।

আমরা রাতি থাকবে কোথায়, স্টিমার তো ছেড়ে যাবে একটু বাদে। হাবলু বলল।

থাকবা তো বটে, ছাড়বে কেডা, ওপারের কথা জানব না, সেই নানি, নিমতে, ঘোলা, বিরাটি, কলকাতা, বঙ্গবাসী কলেজ, আমি কি ছাড়ব ভাইরে, আমার কি মন টানছে না বলো। বলতে বলতে সফির গলা ভার, চোখ ছলছল। কপোতাক্ষ তখন ফিরতে শুরু করেছে সাগরের দিকে, গাঙের বয়ে চলার শব্দ শুনতে পায় তারা তিনজনে। বিড়বিড় করছিল সফিউদ্দিন, সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে। সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে....যা ছেড়ে এসেছি তারে কি কেউ জন্ম জন্মান্তরে ভুলতে পারে ভাইজান, সেই বিরাটি কলকাতা আমার কাছে কপোতাক্ষ নদ।

এই হল মধুকবির পিতৃপুরুষের ভিটে, দালান কোঠা। সরকারকে গণ দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে এই ভিটে অধিগ্রহণ করে নেওয়ার জন্য। ঢাকায় পাঠানো হয়েছে সেই আবেদন পত্র। তা মাস চার হয়ে গেল। কোনো জবাব আসে নি। ঢাকা যেতে হবে। ঢাকা অনেক দূর। ঢাকায় কোনোদিন যায় নি সফিউদ্দিন। বছর তো পোরে নি তার এখানে আসার। সঙ্গে কাউকে চাই, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে প্রশস্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলছিল সফি। হাবলু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল গাঙের দিকে। ওই দেখা যায় বিদায় ঘাট। কে এল, কে? মধু, আমার নাড়ি ছেঁড়া ধন মধু...। ঘুরে তাকায় হাবলু। কপাট বিহীন দুয়ারের ভিতরে অন্ধকার। কৌতরের বকম বকম ধ্বনির ভিতরে জেগে উঠল যেন মা জাহ্নবীর কণ্ঠস্বর। সে কি ফিরল আমার কোলে? হাবলু অনুসরণ করছিল কণ্ঠস্বর। ঢুকে পড়ল ভিতরে। চাপা রোদন ধ্বনি কানে এল বুঝি...যা নগেন যা, বলে আয় মা বসে আছে ভাতের থালা নিয়ে...অন্ন জল ত্যাগ করেছে মা। হাবলু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আলো আঁধারে। তখন কে যেন তার হাত ধরল, চ, হাবলু, মধুর জন্ম স্থান দেখবি নে? মধুর পিতৃকুলের কথা শুনবিনে?

ওই যে বীরাঙ্গনা, মাথার শাদা চুলে একটুখানি ঝুঁটি, শীর্ণকায়া, গালভাঙা বুড়ি, বগলে কাপড়ের পুটুলি নিয়ে তার আগে আগে যায়, বনগাঁ থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসে গেছে সাগরদাঁড়ি। হাঁটতে বড় ভালবাসে বুড়ি। পারলে দিল্লি লাহোর হেঁটে যায়। বিনবিন করছে বীরাঙ্গনা দেব্যা... 'হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন, তা সবে, (অবোধ আমি!)

অবহেলা করি'...বঙ্গ কুলতিলক, দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদনের দুয়ারে এসেছ তুমি। এ তোমার সাত জন্মের পুণ্যি। দাঁড়াও পথিক-বর, জন্ম যদি তব বঙ্গে!...। হাবলু রে হাবলু, অমিতাভ রায়, আয় তোরে দেখাই মধুর বাল্য-ভুবন। মা জননী জাহ্নবী এইখানে মধুরে এই ধরায় এনেছিল দশমাস গর্ভে লালন করে।

তখন স্টিমারের ভোঁ শোনা গেল। কপোতাক্ষ চলেছে এবার সাগরের দিকে। বড়দল যেতে সন্ধে হয়ে যাবে, রাত হবে আরো ডাউনে যেতে, সাগরে পৌঁছতে সেই রাত ফুরিয়ে যাবে হয়ত।

আটান্ন

রাতে সফিউদ্দিনের ঘরে ডাল ফুলকপির ডালনা আর দুধ-গুড় দিয়ে ভাত খাওয়া হলো। সকালে তারা ফিরবে স্টিমার এলে। স্টিমার রাতে একটা আসে। সেটি ভোরে যায়। সন্ধের পর থেকে ঠাণ্ডা পড়ছে। এ বছর দেরি করেই আসছে শীত। সফিউদ্দিনের উঠনের কোণে ধানের গোলা আছে একটা। ধান পেকেছে মাঠে। কাটা শুরু হয় নি। পুজো গেল নম নম করে। সফিউদ্দিনের দুঃখ কম না। বলছিল সেই কথা। সব লন্ডভন্ড হয়ে গেল। এমন যে হবে, তা কেউ ভাবে নি। এদিকি কোনো পুজো নেই। আছে তা যশোরে। তাও সে রমরম আর নেই। হিন্দুরা চলেই যাচ্ছে শুধু।

খাওয়ার পর প্রশস্ত হাতনেতে তাল পাতায় বোনা চাটাই-এ বসে কথাটা পাড়ল অজেত, বলল, ঢাকা আমি যাব, কিন্তু ইস্কুলে অনুমোদনের জন্য কিসে লিখেছ দরখাস্ত?

কেন বাংলা, ইংরিজি আমার তেমন ভাল হয় না, আর ইংরেজ নেই তো ইংরিজি কী হবে।

অজেত বলল, না ইংলিশ না, উর্দু চাই, না হলে দরখাস্ত পড়ে দেখা হবে কিনা সন্দেহ।

সে কি বলতেছ অজেতভাই, উর্দু কে লেখবে, কে জানে তা?

অজেত বলল, সবার শেষে যে দরখাস্ত পড়বে সে বাংলা জানে না, জানলেও জানবে না, বড় বড় পোস্টে উর্দু না জানলে উপায় নেই, সব পশ্চিমের লোক, পাঞ্জাবি।

শুনেছি তো, উর্দু জানতিই হবে, এ কী রকম হলো অজেতভাই?

অজেত আলি বলল, দ্যাখো না ভাইজান, পোস্ট কার্ডে ইংরিজি আর উর্দু, মানি অর্ডার ফর্মে, রেলের টিকিটে, সব জায়গা থেকে বাংলা বাদ। তোমার সব জানা দরকার, পরে এয়েছ, কী হচ্ছে পাকিস্তানে তা জানতি হবে, উর্দু ইস্কুল করলি তুমি সরকারের নেক নজরে আসবা, অনেক টাকা পাবা, মধুকবি বাংলার কবি, তার জন্যি বয়ে গেছে আয়ুবশাহির, বাংলা বাংলা করলি গুলি খেয়ে মরতি হবে, মিলিটারি শাসন কী তা বুঝা যাচ্ছে, মিলিটারিই এবার থেকে শাসন করবে পাকিস্তান, উর্দু তোমারে শেখাবেই, বাংলা আঁস্তাকুড়ে দেবে।

তালি কী হবে? ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞেস করে সফিউদ্দিন।

তুমি যদি উর্দু না জান, কিন্তু কাউকে দিয়ে লিখিয়ে দরখাস্ত পাঠাও উর্দু ইস্কুলের জন্যি, টাকা পেয়ে যাবা, ফলস এমন টাকা পাচ্ছে কত লোক, ইস্কুলির কোনো চিহ্ন নেই, ওপার থেকে আসা উর্দু জানা লোকের দর খুব বেড়ে গেছে, দরখাস্ত লিখেই কত টাকা, অথচ সাপ ব্যাঙ কী লিখতেছে জানার উপায় নেই।

তা হলি বাংলার কী হবে পুব বাংলায়?

অজেত আলি বলল, বাংলাই থাকবে, দেশ ভাগ হয়ে শিক্ষিত লোক সব ওপারে চলে গেল, তারা হিন্দু ছিল, এখন এপারে যারা আছে হিন্দু মুসলমান সবাইরে লেখাপড়া করাতি হবে, আর তা বাংলায় হবে, বাংলা আমার নিজির মা'র ভাষা।

কী কথা হয়ে যাচ্ছে, হাবলু খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে শুনতে পাচ্ছিল কথাগুলো। এসব যে হচ্ছে এপারে তা বীরাঙ্গনা জানে না। বীরাঙ্গনা জানে এপারে যারা থাকল তারা খুব সুখে আছে। মুসলমান চাষা জমি পেল, পেটে ভাত পাবে এবার। এই কি সেই সুখের চেহারা? মিলিটারি শাসন করছে, বাংলা উঠে যাচ্ছে...। ওপারে যারা গেছে তারা তার নিজের মতো ছন্নছাড়া হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। রিফিউজি ক্যাম্পে, বাংলা ছেড়ে দন্ডকারণ্যের পাহাড়ি জমিতে গিয়ে ঘর বেঁধে বাঁচতে চেষ্টা করছে। এত দাঙ্গা এত ভিটেয় আগুন—সব তাহলে এই জন্যে? গান্ধিজী জানত এমন হবে, তাই সে খুন হয়ে গেল স্বাধীন দেশে। হাবলু চমকে চমকে উঠছিল। সে যা ভাবতে পারছে, তা আগে কখনো ভাবে নি। সে জানতই না এমন ভাবে সে কিছু ভাবতে পারে। হিন্দু ভাবছে মুসলমান জিতে গেছে, মুসলমান ভাবছে হিন্দুরা জিতে গেছে। আসলে কেউ জেতে নি। সবাই হেরেছে স্বাধীনতায়। কথাটা সে বলতেই সফিউদ্দিন তাকে জাপটে ধরল, ঠিক বললে ভাই ঠিক বললে, এমন কথা কেউ বলে নি তো।

অজেত বলল, তুই হাবলু, তুই! তোরে এসব কে শিখাল?

হাবলু বলল, বুড়ি বীরাঙ্গনা আর মা জাহ্নবী আর বিদায় ঘাট আর ওই গাঙ, আমার কপোতাক্ষী।

তিনজনে চুপ করে থাকে। তারাভরা আকাশের নীচে বসে তিনজনেই মৌন। কারোর চোখে ঘুম নেই। আকাশের সেই প্রাচীন তারাটি, যে জেগে ছিল সেই মধুসূদনের নৌকো ভাসানোর সময়ে, তা প্রায় একশো বছর হয়ে গেল, একশো বছর ধরে সে প্রতিটি রাত জাগে সাগরদাঁড়ির দিকে তাকিয়ে, আজ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সেই বিমর্ষ তারার মুখ। তার মনে পড়ে যাচ্ছে সব।

অনেকটা সময় বাদে সফিউদ্দিন বলল, ও ভাই অমিতাভ, তোমারে তো আসল কথাডা বলাই হয় নি, মনেই ছিল না, মাস খানেক আগে তিনি এয়েছিল আমারে খুঁজে খুঁজে, তুমাদের সঙ্গে ছিল আর একজন, সেই ফণিভূষণ বাবু, সেই তিনি।

চমকে ওঠে হাবলু, কী বলছ সফিভাই, ফণিদা এয়েছিল এখেনে?

হ্যাঁ তিনি, তুমার কে হয় তিনি?

কবে এয়েছিল? হাবলু জিজ্ঞেস করে।

যশোরে তার দিদির ঘর, সেখেন থেকেই এয়েছিল, বলল বাগেরহাট যাবে।

তারপর? হাবলু অধীর হয়ে ওঠে।

এপারে ফিরে এল সে, যশোরে জামাইবাবুর ব্যবসায় ঢুকবে ঠিক করেই এয়েছে। বলল সফিউদ্দিন। একটু থেমে আরো বলল, সে বলেছে মাঝে মাঝে আসবে এখেনে, জায়গাটা তার ভাল লেগেছে, শান্তি হয়েছে।

চুপ করে থাকে হাবলু। সে তো জানেই না তার দিদির চিঠির কথা পুরোটা। তার নামে একটা চিঠি এসেছিল কলকাতা থেকে বসিরহাটে, বীরাঙ্গনা দিদিমার ঠিকানায়। লিখেছিল খোকনের জবানিতে টিয়াই। তাতে দিদির একটা চিঠির কথা ছিল। চিঠি আছে টিয়ার কাছে। ''পত্রপাঠ হাবলুদা যেন কলিকাতায় ফিরিয়া আসে, টিয়াদিও খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে চিঠি পড়িয়া... ফণিভূষণবাবু চিঠিটি পড়িয়াছেন, ওই দিনই তিনি আসিয়াছিলেন, পড়িয়া দুঃখিত মনে চলিয়া গেলেন, তাঁহাকে বিবাহ করিবে না বলিয়া লিখিয়াছে দিদি। ইহা বড় বুকে বাজিয়াছে তাঁহার। ...টিয়াদি কি উত্তর দিবে বনগাঁর চিঠির...হাবলুদার দিদি বুলিদি তো টিয়াদিদিরও দিদি, হাবলুদার দিদির কষ্টে টিয়াদিদিরও কষ্ট...চিন্তায় ঘুম আসে না, না বলিয়া বেলগাছিয়া হইতে চলিয়া আসা হাবলুদার ঠিক হয় নাই...কাউকে কাউকে কষ্ট দিয়া হাবলুদা কী সুখ পায়?" চিঠিটা তার আগেই পড়েছিল বীরাঙ্গনা। পড়ে খুব গম্ভীর হয়ে থেকেছিল পুরোটা দিন, তারপর রাতে বলেছিল, সব মিথ্যে, মেয়েটা বলেছে আর খোকন লিখেছে, নবেল পড়ে পড়ে মেয়েটার মাথা খারাপ, তুই কিছু বুঝিস হাবলু, ওর কথা বিশ্বাস করবি নে।

হাবলু চুপ করে ছিল। তখন বীরাঙ্গনা বলেছিল, তার এখন অনেক কাজ, দিদির বিয়ে, মা বাপকে নিয়ে আসা, ফণির সঙ্গে হবে বিয়ে, তার জেঠার ছেলে অবনীর বিয়ে হয়ে যাক। ...তারপর তো হাবলু ভুলেই গিয়েছিল ওসব কথা। এপারে এসে মায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। ফণিদা কেমন তা বলেছে সব। হাবলুর মনে হলো তাহলে টিয়ার কথা সত্যি। সত্যিই তো, এপারে মায়ের কাছেও তো চিঠি দিয়েছে দিদি। কিন্তু দিদির চিঠি তাহলে ফণিদা পড়েছিল। কী লিখেছিল দিদি? চালচুলোহীন দোজবরে বুড়ো! লোকটা এপারে চলে এল, বলল, পাকিস্তানে থাকবে? তাই কি হয়? হয়ত ঘুরে যেতে এসেছে।

হাবলু চুপ করে আছে দেখে সফিউদ্দিন বলল, তুমি কিছু জান না?

কী জানব? হাবলুর মনে হয় ফণিদা হয়ত সব কথা সফিউদ্দিনকে বলেছে।

ও আর ইন্ডিয়ায় থাকবে না, আমিও বললাম, হ্যাঁ, সাহস করে থাকো, ভালমানষির সংখ্যাই জগতে বেশি, হিন্দু কি নেই পাকিস্তানে, থাকবে তো থাকো, এ তো তোমার বাপ-ঠাকুদ্দার দেশ, মাইকেল মধুসূদনের দেশ।

হাবলু বলল, যশোরে গেলে কি দেখা পাওয়া যাবে ফণিদার?

জানব কী করে, যশোরে থাকবে না বাগেরহাটে থাকবে কে জানে?

এই বললে যশোরে দিদির কাছে থাকবে, যশোর থেকে বনগাঁ আর কতদূর। হাবলু বিড়বিড় করে।

ও ঠিক করতে পারছে না কী করবে, যশোর না বাগেরহাট?

যশোরে থাকলি ই তো ভাল।

চলে এল কেন?

জানি নে তো। হাবলু বলল, জানতামও না।

মানুষটার ভিতরে একটা দুঃখ আছে। বলল সফিউদ্দিন।

তোমারে কিছু বলল সফিভাই?

মাথা নাড়ল সফিউদ্দিন, না, দেখে মনে হলো, রাতভর জেগে ছিল প্রায়, ভোরে কপোতাক্ষ ধারে চলে গেল, বলল, মন বড় অদ্ভুত জায়গা, সে তার অধীনে নেই।

হাবলু চুপ করে থাকে। তার আর কিছু বলার ছিল না। আরো কিছু বলছিল সফিউদ্দিন, তার কানে ঢুকছিল না। সে বিড়বিড় করে বলল, ফণিদা খুব ভাল মানুষ।

সফিউদ্দিন বলল, হ্যাঁ, বলল, সে আসবে মাঝে মধ্যে, মাইকেল মধুসূদনের গাঁয়ে, নানি তাকে চিনিয়েছে মধুকবিকে, নানির উপর খুব মায়া তার, আবার নানিই তার বুক ভেঙে দিয়েছে।

আর কথা হলো না। হাবলু কথা বাড়াল না। তার মনে হলো সে যশোরে যায়। যশোরে না হলে বাগেরহাটে। কিন্তু যশোরে কোথায় যাবে, সে যে কাউকে চেনে না। ফণিদার দিদি জামাইবাবুর খবর পাবে কী করে? নাম তো জানে না। রাতে তার ঘুম ভেঙে যেতে লাগল বার বার। সে ধরতে পারছে এমন কোনো কথা লিখেছিল যার কারণে মানুষটি নিঃসঙ্গ হয়ে ফিরে এসেছে পাকিস্তানে। দিদি কেন লিখল, দিদি তো দ্যাখেই নি মানুষটাকে। দিদি লেখে নি, দিদি তো জেঠামশায়ের বাড়িতে ঝি গিরি করে। জেঠামশায়ের কিছুই বলার উপায় নেই। সামনে অবনীদার বিয়ে। দিদির বিয়ে হোক তা জেঠি চায় না। তবু দিদি এমন কথা লিখল, যার কারণে ভাল মানুষটি ওপার থেকে চলেই এল মনে মনে অপমানিত হয়ে। না দেখেই দিদিকে কি ভালবেসে ফেলেছিল ফণিভূষণ? এমন হয়, হতে পারে? আসলে ভালবাসার কাঙাল ছিল লোকটা। আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথাও একটা। না পেয়ে ফিরেই এলে। আবার পূর্ব পাকিস্তান তাকে না নিতেও পারে। অদৃশ্য টানে বনগাঁ গিয়ে পড়তে পারে। যশোরে বসে বনগাঁয় মাঝে মধ্যে চলে গিয়ে ফিরে আসতে পারে। যশোর বনগাঁ আর কত পথ। মোটর চালু হয়েছে, মোটরে আর কত সময়? আগে তো বনগাঁ যশোর জেলার ভিতরে ছিল।

দিদির ছবি দেখেই পছন্দ করে ফেলেছিল ফণিদা। ইস! বড় ভুল হয়ে গেছে। বীরাঙ্গনা দিদিমা আর এগোল না, বলল ক'মাস বাদে আবার যোগাযোগ করবে। হাবলু এপারে আসাই তো এ ব্যাপারে মা বাবার সঙ্গে কথা বলতে। বনগাঁর চিঠি সত্যি নয়। দিদির চিঠি দিদির জবানিতে জেঠি লিখেছে। জেঠি চায় দিদি তার ঘরে ঝি গিরি করুক। অবনীদাও তাই চায়। ওখানে থাকলে দিদির বিয়ে হবে না। কথাগুলো হাবলু মায়ের কাছে বলে এল সাগরদাঁড়ি থেকে বাড়ি ফিরে।

সাগরদাঁড়ি থেকে বড়দল হয়ে উতুলি, উতুলি থেকে আশাশুনি। হাবলুর কথা শুনে সরমা চুপ করে থাকে। বিকেল তখন পড়ে আসছে। হেমন্তের বেলা। এ বাড়ির হাতনে থেকে বড় রাস্তাটা দেখা যায়। রাস্তা দিয়ে সোজা চলে যাওয়া যায় সাতক্ষীরে, পথে পড়বে ডুমুরে, নরহরিপুর, নোনাডাঙা, তেখালি...। গরুর গাড়ি করে সরমা গেছে। আবার ডুমুরের পুবে বেতনা গাং আছে। আসলে ওটা সাতক্ষীরের গাং-ই বলা যায়। ওই গাং পথে ফিংড়ি পড়ে। ফিংড়িতে সরমার বোনের বাড়ি। সেই ছোটখুকি রমলা ফিংড়ি ছেড়ে ওপারে গিয়ে হারিয়ে গেছে। শোনা যায় কোন ক্যাম্পে ছিল ওরা ছেলেমেয়ে নিয়ে, সেখান থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে মধ্যপ্রদেশের কোন পাহাড়ি এলাকায়। ওই সব শুনে হাবলুর বাবা বলেছে, সে দেশ ছাড়বে না। তার আর কী হবে? মেয়ে দুটো পার করে দিয়েছে, ছেলে দুটোও গেছে। মেয়েদুটোর বিয়ে দিতে পারলে আর চিন্তা কী? ছেলেরা ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে। পুরুষমানুষ নিয়ে তো ভাবনা করার মানে নেই। কিন্তু সরমার যে আর মন বসছে না এখানে। স্বাধীনতা মানে যে এইরকম বুক খালি হয়ে যাওয়া তা কে জানত? ছেলেমেয়েগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে ওপারে। তাদের সময়মতো ভাত জুটছে কিনা সন্দেহ। হাবলু আবার খেয়ালি প্রকৃতির। হাবলুর জন্যই সরমার বেশি চিন্তা হয়। কেন তা জানে না সে। বুলির যে অত অপমান হচ্ছে বনগাঁয় জেঠার বাড়ি, তা নিয়ে ততো উদ্বেগ নেই, যেমন আছে হাবলুকে নিয়ে। পাগল পাগল! না হলে নেহেরু আয়ুব খাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবে? আর এই নিয়ে খুব ভয় হয় সরমার। ছেলেটার যদি কোনো বিপদ ঘটে? মানুষ যে বড় নিষ্ঠুর প্রকৃতির। বলছে লাহোর করাচি যাবে। কী হবে হাবলুর? শুনে মৃগেন, হাবলুর বাবা বলেছে, ও ঠিক কাজ করে আসবে, আমি না খেয়ে মরার জন্য ওপারে যাব না, এপারে কেউ না কেউ তো আছে।

ও যা করার এপারে থেকে করুক, আমাদ্দের কাছে থাক।

তা হয় কী করে, মেয়েদুটোর বে'র ব্যবস্থা করবে তো।

বিয়ে ও দেবে কী করে, ও কী বোঝে?

মৃগেন চুপ করে থাকে, চোখের রোগ হয়ে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসতে সে ওপারে যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করেছে। স্বামী স্ত্রী দাওয়ায় বসে আছে। হাবলু এসে আবার বেরিয়েছে। হাতেবর স্যার, গাঁর আর ক'জনের সঙ্গে দেখা করে আসবে। হিন্দু ঘর আছে কিছু, কিন্তু সে হল নম পাড়া, নমঃশুদ্দুর। কায়স্থ ঘর তিনটি, বামুনরা কেউ নেই, ছিল তো সাত ঘর মাত্র। গাঁ খালি হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে।

মৃগেন বলল, ওদ্দের পাঠালামই বা কেন, এপারে কেউ থাকছে না!

মুসলমান ঘরে মেয়ে দিতে?

কপালে যা থাকত তা হতো, আমি ওপারে গে ভেসে বেড়াতি পারব না।

সরমা বলল, বাবা হয়ে বলতে পারতিছ?

কী বললাম? আগে তো বাঁচা, মুসলমানেরাও একসঙ্গে থাকতি পারবে না, বেহারিরা এদেশের সব নিয়ে নেবে, তার চে বরং হিন্দু ওদের ভাল ছিল, অশান্তি লেগে গেছে, এরপর দ্যাখবা আবার সব এক হই গেছে।

সরমার চোখ চকচক করে ওঠে। হবে কি? আবার সব আগের মতো? সবাই ফিরে আসবে যারা চলে গেছে। উফ! সে যে কী হবে! ওই যে সাতক্ষীরের পথ, ভোমরা বর্ডারের পথ, ওই পথে বিদায় নিয়েছিল সব। ওই ঘাটে আবার ফিরবে। তখন আচমকা মনে পড়ে গেল মধুকবি কি ফিরেছিল আবার? হাবলু জানে। যে যায়, যারা যায় তারা কি আর কোনোদিন ফিরতে পারে? তারা শুধু এই হাতনেতে বসে অপেক্ষা করে যাবে, কে আসে কে আসে না ওই পথে তা লক্ষ্য করতে। ওই হাবলু ফিরছে, হিম হিম ভাব এসে গেছে এর ভিতরে। সরমা হাবলুর জন্য একটা কাঁথা বুনেছে, ও নিয়ে গিয়ে রাখবে কোথায় কে জানে। উতলা হয়ে উঠল সরমা।

উনষাট

যাবে যাবে করেও অনেকদিন রয়ে গেল হাবলু। এসেছিল আশ্বিন মাসে পুজোর আগে আগে, গেল কার্তিক পার করে অঘ্রান মাসে। মা কাঁথা বোনা শেষ করলে সেই কাঁথা নিয়ে সে রওনা হলো ইন্ডিয়ার দিকে। বাবা বলেছে যাবে না ওপারে, আরো বলেছে হাবলু যদি মনে করে তবে ডলু বুলুকে আবার পার করে দিতে পারে।

সরমা মাথা নাড়ল, চোখে আঁচল দিয়ে বলল, না, যদি পারিস বুলুকে দিয়ে যাস, লোকের ঘরে ঝি গিরি করতি হবে না, আমার কাছে থাকুক।

ডলু থাকপে?

লেখা পড়া তো শিখোচ্ছে? বলল মৃগেন, পিসির কাছে ভাল আছে, আমার বুন অযত্ন করবে না।

হাবলু বলল, কলিম বসি'হাট যায়।

কেডা বলল? সরমা জিজ্ঞেস করে।

কলিমই বলেছে, ডলুর সাথে ওর যোগাযোগ আছে, বসি'হাটে কলিমের খালা থাকে, কলিম খালার কাছে গিয়ে ডলুর সাথে যোগাযোগ করে।

তোরে এসব বলল ?

হ্যাঁ মা, ও বলছে বসি'হাট থেকে দিল্লি হয়ে করাচি চলে যাবে, ডলু রাজি হলেই হবে, ডলু কলিমকে ভোলেনি, এবার কলিম আমার সাথে ভাল ব্যবহার করল, বলল, আমি যেন আশাশুনি না ভুলে যাই, তোমাদের কোনো অনিষ্ট হতি দেবে না সে, ডলুকে সে ভালবাসে, আগের বার রাগে পড়ে ওই সব করেছিল, ডলুর কথা সে বাড়িতিও বলেছে।

ফুঁপিয়ে ওঠে সরমা, তা'লি কী হবে ?

দিল্লি করাচি এক হয়ে যাবে না ! হাবলু তার মাকে বোঝায় আসার আগের রাতে। বাবা ঘুমিয়ে পড়েছে না জেগে, তা ধরা যায় না। চোখ এমনি খারাপ, তার উপর রাত কানাও। শীতের রাত, কুয়াশা এই অঘ্রানেই এই গাঁয়ে ছেয়ে দিয়েছে সব, ঘরবাড়ি, গাছ-গাছালি, দূরে নদী, মাঠ প্রান্তর। মৃগেন শুনছে কিনা পাশের কামরা থেকে তা ধরা যায় না। হাবলুদের মাটির বাড়ি। পরপর তিনটে ঘর, একটাই লম্বা হাতনে। রান্না ঘর আলাদা পোতা। উঠনের বাঁ ধারে শিউলি গাছ, এখনো ফুল ফোটায়। একেবারে চৈত্র মাসে গিয়ে বিশ্রাম নেয়। হাবলু ছোটবেলায় ওই শিউলিপাতার রস কত খেয়েছে ভাদ্র মাস পড়লেই। মা জোর করে খাওয়াতো। এখন ভাবতে ভাল লাগে।

সরমা বলল, করাচি গেলি আর দেখতি পাব না ?

হুঁ, করাচি যাবে, ওখেনে বলে বাংলা বললি লোকে হাসে, গায় থুহ্ করে। হাবলু বলে।

কে বলল ?

কলিম নিজি, আসলে ও ভয় দেখায় করাচির কথা বলে, দিল্লি হয়ে করাচি যেতি গেলি ওরে না ইন্ডিয়ান বলে ধরে নেয়, আমি এইটা বলতি ও চুপ করে গেছে।

সরমা বলল, হুঁ, ইন্ডিয়া পাকিস্তানের লোক আলাদা করে তো ধরা যায় না।

দেখ মা আমি যা বলছি তাই হবে।

হাবলু রওনা হলো পরদিন সকালে। মাকে প্রণাম করল, বাবাকে। শিউলি গাছে গিয়ে মাথা ছোঁয়াল বলল, আবার যেন ফিরে আসি। শিউলি গাছ তার মাথায় ফুল ঝরিয়ে দিল। হাবলু তাদের হাতনেতে মাথা ঠেকাল, আবার যেন সবাই ফিরে আসে। উঠনের ধুলো মাথায় দিল। শূন্য উঠনে চেয়ারে বসে আছে মৃগেন একা। সরমা ছেলের পিছু পিছু বেরিয়ে এল রাস্তা পর্যন্ত। ওই হাবলু যাচ্ছে। পায়জামা, লম্বা ঝুলের শার্ট, গায়ে একটা খদ্দরের চাদর, বাড়িতে ছিল ওর বাবার, মা ওকে দিয়ে দিল। বাবা বেরবে আর কোথায় ? হাবলুর হাতে একটা টিনের সুটকেস, তার ভিতরে কাঁথাটা আছে, আছে হাবলুর একটা ফুল প্যান্ট আর ধুতি পায়জামা শার্ট। সব গুছিয়ে দিয়েছে সরমা। দাঁড়িয়ে থাকল পথের ধারে। ওই যে যায় তার ছেলে। তখন মৃগেন এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে, সরমার পিছনে দাঁড়িয়ে হাবলুর বাবা জিজ্ঞেস করল, চলি গেছে ?

গেল তো, তুমি কিছু বললে না।

কী বলব, ও যা বলে আমি তাই চাই, আমার ছাওয়াল আমর মতোন হয়েছে, কদ্দুর গেল ও ?

অনেক দূর। সরমা বিনবিন করে বলল।

দেখা যায় ? আবছা হয়ে আসা চোখ মেলে জিজ্ঞেস করল মৃগেন।

হ্যাঁ দেখা যায়।

দেখা যায় ? আবার জিজ্ঞেস করল মৃগেন।

ওই তো খোকা যায়, এবার পথ ঘুরি গেল।

চোখের আড়ল হই গেল ? হতাশ মৃগেনের কণ্ঠস্বর মৃদু হয়ে এল।

গেল। মুখে আঁচল চাপা দিল সরমা।

মৃগেন বলল, কী করতে পারে দ্যাখো।

কী করবে হাবলু ?

মৃগেন উত্তর না দিয়ে ফিরছিল চেয়ারের দিকে। উঠন ভর্তি রোদ। উঠনের ধারে ঘাস জমিতে শিশিরবিন্দু রোদে ঝলমল করছে। এখন জমিতে জমিতে ধান পেকেছে, আর দিন কয় বাদে কাটা শুরু হবে। পরিপূর্ণ সব দিক। শুধু মৃগেন আর সরমা সর্বস্ব খোয়ানো দুই নারী পুরুষ বসে থাকল একা একা।

আশাশুনি থেকে আবার বসিরহাট, ভোমরা বর্ডার দিয়ে। বুড়ি বীরাঙ্গনা অধীর হয়ে উঠেছিল। কী করছে হাবলু এতদিন ওপারে গিয়ে, আশ্বিন গেল, কার্তিকও গেল, অঘ্রান পড়ল, সে কি আর ফিরবে না ? পাকিস্তানে থেকে গেল ? ঠিক ময়রম নামের মেয়েটা তাকে আটকে রেখেছে। কথা ছিল মা বাবাকে বলে সে ফিরলে তাকে নিয়ে বীরাঙ্গনা দিল্লি যাবে। কিন্তু ময়রম তাকে পাকিস্তানেই আটকে রাখল। মেয়েরা পারে। কিন্তু বুড়ি বীরাঙ্গনা পারছে না। মন খারাপ করে বুড়ি হাবলুর কথা ভাবে। এপারে ওই টিয়া, ওপারে ময়রম, বীরাঙ্গনা হাবলুকে নিয়ে দিল্লি চলে যাবে। তাতে হাবলুকে রক্ষা করা যাবে।

মায়ের অস্থিরতায় তার ছেলে কানাই বলল, মা, তুমার এই দোষ, ও তুমার কেডা যে এত অস্থির হও, তুমি বড় পরবুদো, নিজির ছাওয়ালের কথা মনেও আন না।

বীরাঙ্গনা হাসে। অঘ্রান পড়তে এক দুপুরে হাবলু এল, কোথায় দিদমা ?

তাকে দেখে বীরাঙ্গনা যেন হাতে চাঁদ পেল, ও হাবলু, এলি তুই, আমার যে ঘুম হয় না তোর জন্যি কতদিন ! আনন্দে চোখে জল এসে গেল বীরাঙ্গনার। হাবলুকে বসিয়ে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল, এতদিন কুথায় ছিলি হাবলু, বীরারে ভুলি গিসলি, পুরুষমানষির এই হলো দোষ, তোর জন্যি বসি আছি, দিল্লি যেতি হবে, তোর একটা ব্যবস্থা না করলি আমি স্বস্তি পাব না।

বীরাঙ্গনা গেল দিল্লি। সঙ্গে হাবলু। হাবলুকে নিয়ে সে যেন কলকাতা থেকে পালায়। আহা, বাপ মা এপারে পাঠিয়েছে বুনদের দেখার জন্যি। কিন্তু থাকবে কোথায় তা ঠিক করে দেয় নি। কুকুর বেড়ালের মতো উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেড়াচ্ছে। অবিশ্যি বেলগেছেয় তুমার বন্ধুর বাসায় ছিল ভাল, কিন্তু কতদিন থাকবে বলো অমূল্য। কামকাজ কিছু করতে হবে তো। ও বলে দিল্লি আসবে, দিল্লি আসবে, তাই নিয়ে আলাম। বুনরা তো পিসি আর জেঠির কাছে ঝি গিরি করে। বড়টা তো পুরো ঝি, ছোটটা অর্ধেক। পিসির তবু চক্ষুলজ্জা আছে, মেয়েটারে পড়ায় মেয়ে ইস্কুলে। বসিরহাটের মেয়ে ইস্কুলের নাম আছে। কিন্তু ওই পিসি এই হাবলুটারে চক্ষুপড়ে দেখতি পারে না। নাহলি কি এমন ভেসে ভেসে বেড়ায়! বীরাঙ্গনা বলছে, হাবলুকে কোথাও যদি ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, সেই জন্যি তো আনা, আর হল কী...। কথাটা বীরাঙ্গনা বলেছে তার মেয়ে রমলাকে, আসলে ওই বাড়িতে একটা মেয়ে আছে, বীরাঙ্গনা কিছু বলতে বাকি রাখে না। হাবলুর বড় বোনের কথা, তার বিয়ে, ফণির কথা...সব। হাবলুর কথা দুপুরে হয় মেয়ের সঙ্গে। বলে, টিয়ারে তুই দেখেছিস তো খুকি, মেয়েটার খুব বাড়, সব যেন ফুলে ফেঁপে উঠেছে এর ভিতরে। অমন দেহের তো টান আছে একটা, হাবলুরে তাই সরাতি হল, খুব পাকা, শুধু গা ঘেঁষে আসে, আগুন আগুন।

হাবলুর সব পরিচয় শুনে রমলা বলল, কিন্তু তুমি নিয়ে এলে যে মা, ওর জেঠা, পিসে তো জানে না, তারা কি তোমাকে দুষবে না?

দুষলে দুষবে, ভাত দিবার মুরদ নেই, কিল মারার গোঁসাই, ছেলেটার উপর বড় মায়া পড়ে গেছে রে, ওর মাথায় আবার আছে পার্টিশন রদ করবে, একেবারে নাবালক, কিন্তু মেয়েটা এমন লেগেছিল ওর পিছনে, না নিয়ে এসে পারলাম না, বলে কিনা রাজনারায়ণ মধু কেউ ভাল ছিল না, কোনো কোনো মেয়েমানুষ যত খারাপ করতি পারে তা আর কেউ পারে না, বল খুকি।

যখন রমলা আর বীরাঙ্গনার কথা হয়, হাবলু থাকে বাইরে। এই সরকারি আবাসন দুপুরে চুপচাপ। এ তার কলকাতা শহর না যে সবসময় হৈ হল্লা লেগে থাকবে। কী রকম ফাঁকা ফাঁকা, আর শহরটাও নাকি অনেক অনেক বড়। এই শহরে বসেই হিন্দু মুসলমানের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে গেল। এই শহরে বসেই ঠিক হল কপোতাক্ষ যাবে কোন দেশে, কারা পাবে সাগরদাঁড়ি। কাদের জমিজমা পুকুর বাগান সব অন্যদেশে চলে যাবে। ময়রম, অজেত আলি থাকবে কোথায়। বুড়ি বীরাঙ্গনা করবে কী? মেঘনাদের মৃত্যু-শোক আর সাগরদাঁড়ি, কপোতাক্ষ হারানোর শোক নিয়ে কলকাতা-দিল্লি-বসিরহাট করে বেড়াবে। যখন মধু বেঁচে ছিল, কলকাতা ছিল রাজধানী। কলকাতায় বসে মধু লিখছে মেঘনাদের মরণ বৃত্তান্ত। রাম লক্ষণের অন্যায় যুদ্ধজয়ের কথা ফাঁস করে দিচ্ছে। হেরে যাওয়ার কথা যাদের তারা হয়ে যাচ্ছে বিজয়ী। প্রকৃত বীর মরণের মুখ দেখল। দেখ দেখ, দিল্লি এসে হাবলুর যে সব মনে পড়ে যাচ্ছে। বীরাঙ্গনার কাছে যা শুনেছে তা যেন তার কানের কাছে গুনগুন করতে লাগল বীরাঙ্গনাই।

''হে রক্ষকুলপতি,
শুনেছি, মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছ পুনঃ
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি;
কিন্তু অনুমতি দেহ, সমূলে নির্মূল
করিব পামরে আজি। ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে,
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

পন্ডিতজি, বীর হল মেঘনাদ, কিন্তু এ কথা জানত কে? তুমিও কি জান পন্ডিতজি? জান কি যজ্ঞাগারে কী হয়েছিল? দেবতার বরে, দেবতার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে লক্ষণ ওই কাজটা করল। রাবণ রাজার ঘরশত্রু বিভীষণ লক্ষণকে নিয়ে ঢুকে গেল যজ্ঞস্থলে। মায়াবলে, সকলকে মায়ায় ভুলিয়ে।

মহামায়া না থাকলে, সহায় হলে কে বাঁচাত লক্ষণকে? ন্যায় যুদ্ধের ক্ষমতা ছিল না লক্ষণের। পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে দেবতারা কৌশল করে হারাল মেঘনাদকে। না হলে কী করে ঢোকে ভিতরে?

'যত দেবদেবী আজ সবাই সুপ্রসন্ন তোর প্রতি, হে সুমিত্রা-সুত, দেব-অস্ত্র পাঠিয়েছে দেবরাজ, শিবের আদেশে আমি মহামায়া এসেছি লক্ষণের সহায় হতে।'

দেব-অস্ত্র ধরে বিভীষণকে সঙ্গে নিয়ে মহামায়ার বরে বলীয়ান হয়ে চলল লক্ষণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে। সেখানে তখন বীর ইন্দ্রজিৎ, নিরস্ত্র, যুদ্ধে যাওয়ার আগে বৈশ্বানরের পুজোয় বসেছিল। সে জানত না যে দেবতার পুজোয় বসেছে সে, সেই দেবতাই তার মৃত্যু-ক্ষণ রচনায় আছে গোপনে। হে ভরত ভাগ্য বিধাতা এমনি হয়েছিল বলে বীর ইন্দ্রজিৎ শেষ হল। না হলে রামায়ণে লেখা হত সত্য আর ন্যায় যুদ্ধের কথা। এ ভারত সত্য হত, কপোতাক্ষ সাগরদাঁড়ি পর হয়ে যেত না। দেবতারা কবে ন্যায় করেছে বল। ভারতের ভাগ্যদেবতাও ন্যায় করে নি। ন্যায় করলে পরাজিত দেবতা কৌশলের আশ্রয় নেয় না।

হাবলু সবে এসেছে, মন খারাপ লাগছে এতদিন বাদে। কতদূর তার আশাশুনি, বসিরহাট, কলকাতা, বনগাঁ। দিল্লি আসতেই লেগে গেল আড়াই দিন। ট্রেন চলল তো সে আর থামেই না। কতরকম লোক। বীরাঙ্গনা বলেছিল, পাকিস্তান করেছে শুধু মুসলমানের জন্য, ইন্ডিয়া সবার জন্য। সবাই থাকবে, আছেও। দ্যাখ মুসলমান না হয় পাকিস্তানে গেল, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পার্সিরা যাবে কোথায়? হাবলুর বিস্ময় যেন এখনো

কাটে নি, সে দিল্লি এল। এই সেই দিল্লি, মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লি। বাবর, আকবর, হুমায়ুন, শাজাহান ঔরঙ্গজেব...উফ। এই সেই দিল্লি, এখানে মহাত্মা গান্ধিজি হায় রাম বলতে বলতে...আশাশুনির হাতেবর চাচা খুব গান্ধিজির কথা বলত, খুন না হলে, বেঁচে থাকলে নাকি দেশ আবার জুড়ে যেত, গান্ধিজির মৃতদেহের উপরই তো গড়ে উঠল হিন্দুস্থান পাকিস্তান। বাবা আবার গান্ধিজির বিপক্ষে বলত। নূর আলি বলত কায়েদ-ই-আজমের কথা। মহম্মদ আলি জিন্নাহ, তিনি না থাকলে নাকি মুসলমানের দেশ হাসিল হত না। তখন বাবা বলত, নেতাজি ফিরে এলে এসব কিছুই হত না। এই সব কথা শুনতে শুনতে হাবলু এত বড়টি হয়েছে। কী হলে কী হতো, তা বুড়ো লোকরা ভাবুক, হাবলুর 'এইম ইন লাইফ' হল হিন্দুস্থান-পাকিস্তান রদ। এই সেই দিল্লি, এখানে জওহরলাল নেহেরু থাকেন, তার কাছে যাবে হাবলু। প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে যাবে। কী করে যাবে, দেখা যাক কী হয়। নিয়ে যাবে বীরা দিদিমাকে। কে ইনি, না মাইকেল মধুসূদন দত্তর নাতনি। পন্ডিতজি আপনি মেঘনাদ বধ কাব্য শুনুন এঁর মুখে। মধুকবির সাগরদাঁড়ি ওপারে চলে গেছে, ইচ্ছে থাকলেও যাওয়ার উপায় নেই। কপোতাক্ষ নদ পড়ে গেছে ওপারে, যশোর খুলনা সব। এ কি হতে পারে? শুনবেন প্রধানমন্ত্রীজি, শুনুন, 'এক মধুকবি বিদায় ঘাট থেকে দেশ ছাড়ল চিরতরে, আর আমরাও দেশ ছেড়েছি চিরতরে, কত নদী যে বিদায় ঘাট নিয়ে কানছে একা একা।'

কথাটা তার। আচমকা বলে ফেলেছিল। বীরা তাই শুনে বলেছিল, তুই পারবি হাবলু, পারবি। কী পারবে তা বলে নি বীরা। দিল্লি গিয়ে সত্যি যদি হাবলু দেখা পায় পন্ডিত নেহেরুর, তবে তাকে কী শোনাবে, কপোতাক্ষর কথাই তো শোনাতে হবে। নেহেরুজি শুনুন, বিদায় ঘাটের কথা শুনুন। এখনো বিদায় হয়ে যাচ্ছে। হিন্দু মুসলমান বিদায় ঘাটে খালি হাতে বসে আছে।

হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা, শোনো তুমি, কপোতাক্ষর তীরে ঘুরতে ঘুরতে মধু কী বলেছিল, ''এই মধুমাখা স্থানে আসিলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোনো স্থানে গেলে সে রূপ পাওয়া যায় না, কপোতাক্ষ, যে তোমার তীরে পাতার কুটিরে বাস করিতে পায়, সেও পরম সুখী।'' পন্ডিতজি শুনুন কপোতাক্ষর কথা মধু লিখেছিল দূর ফরাসি দেশে বসে। বিলেতে বসে মধু কপোতাক্ষকে দেখতে পেত মনশ্চক্ষে। আমি আর কত জানি, জানে আমাদের বীরাঙ্গনা দেব্যা, বীরাঙ্গনা জানে মেঘনাদ বধ কাব্য। বীরাঙ্গনা আসতে আসতে ট্রেনে বলেছে, দেখা হবে না জানি হাবলু, কিন্তু নেহেরুর সব জানা উচিত, মধুর দেশ অন্যদেশ হয়ে গেল। জানা উচিত মধুর কথা। পন্ডিতজি তুমি কত পড়েছ, কিন্তু কি জানো পুত্রের মরণে রাবনের হাহাকারের কথা। রাম লক্ষণের কথা জেনেছ, বীর নেঘনাদের কথা কি জেনেছ, সে জানত আমাদের মধু, আমরা তোমাকে

শোনাতে এলাম হে ভারত ভাগ্য বিধাতা। শোনো শত শত মেঘনাদের কথা, শতশত রাবণ রাজার হাহাকার। শতশত পুত্র, কন্যা গেছে তোমাদের অন্যায়ে।

কী সুন্দর বলছিল বীরাঙ্গনা। দিল্লির ট্রেন আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস যায় কোথায় দিল্লি ছাড়িয়ে,না সেই পাঠানকোট অবধি। তারপর খুব কাছেই নাকি পাকিস্তান, লাহোর পেশোয়ার। বীরাঙ্গনাকে ঘিরে বসেছিল যেন সবাই। তারা বাঙালি যে সবাই তা নয়, কিন্তু যখন বীরাঙ্গনা বলেছিল, এই ছেলে যাচ্ছে পন্ডিতজির সঙ্গে দেখা করতে, আর্জি আছে, কী আর্জি, না রদ করা হোক এই দেশ ভাগ। শুনে সবাই হৈহৈ করে উঠল। সাচ! কৌন পার্টি? হিন্দু মহাসভা, স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ? সব হিন্দুর হয়ে যাবে? নেহি, নেহি, বীরাঙ্গনা বলে ওঠে, তা কীর করে হয়, আগে যেমন ছিল তেমন থাকবে, পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মারাঠা, দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ, হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান পার্সি, সবাই।

তা হয় নাকি, হয় না, আর হবে না।

কেন হবে না?

যে খুনখারাবি হয়েছে আর হবে না, সর্বস্বান্ত হয়ে এসেছি, সব গেছে আমার, আর দরকার নেই।

গাড়ির লোক দুভাগ হয়ে গেল। কেউ বলল, হয় যদি হোক। কেউ বলল, না, দরকার নেই, আবার রায়ট হবে, রায়ট কি বন্ধ হয়েছে, পাকিস্তান থেকে হিন্দু তাড়ান বন্ধ হয়েছে?

বীরাঙ্গনা তখন অন্য কথায় যায়। কে জানে গাড়ির ভিতরে মুসলমান আছে কিনা। এখনই তো মুসলমানের উপর সব ক্ষোভ উগরে দিতে শুরু করেছে কেউ কেউ। ট্রেন মানে তো গোটা দেশ। ইন্ডিয়া। ভারত। হিন্দুস্থান। তার ভিতরে সবাই উঠে বসে আছে। দেশ মানে ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস। কথা খারাপ হলে এর ভিতরেই রায়ট লেগে যেতে পারে। বুড়ি জানে হাবলুর ওই ইচ্ছে কোনোদিন পূরণ হবে না। শুধু ওই কথা বলে ওকে নিয়ে আসা। সরিয়ে আনা। না হলে টিয়া মেয়েটা ওকে খারাপ করে দিত। বড় মায়া হয়েছে তার হাবলুর উপর। এতই মায়া যে না দেখে থাকতে পারে না। ছেলেটাকে যদি দিল্লিতে কোনো কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, বীরাঙ্গনা নিশ্চিন্ত হতে পারবে। তখন সে থেকেই যাবে মেয়ের কাছে। হাবলুর কাছে। শুধু ফণির বিয়েটা দেওয়া গেল না। এই মাসে হাবলুর জেঠার ছেলের বিয়ে হয়ে গেলে তখন নতুন করে খোঁজ করতে হবে। সে যাই হোক, হাবলুকে দিল্লিতে রাখতে পারলে বীরাঙ্গনা নিজেও স্থির হতে পারে। ছেলেটার ভাল করতে ইচ্ছে হয়রে খুকি। এমন দুঃখী মা বাপের ছাবাল ও। না হলি এপারে যে দুটো মেয়ে রয়েছে তাদের দেখাশোনা করতে ওরে পাঠায়। আর ও পার্টিশন রদ করার কথা ভেবে ঘুময় না।

ঘুময় না বটে হাবলু। দিল্লিতে এসে তার ঘুম আরো গেছে। দিল্লিই তো সব। দিল্লি থেকেই তো ভাগ করা হল দেশ। সম্পত্তি ভাগ করে নিল দুপক্ষ। কিন্তু তাতেও শান্তি নেই। লোকের দুঃখ বেড়েই যাচ্ছে। কষ্ট শেষই হয় না। ঘুমের ভিতরে যেন ফিরে আসে লুটেরা দাঙ্গাবাজের দল। হা রে রে রে করতে করতে অশ্বারোহী সৈন্যদল। তারপরে কামান বন্দুক নিয়ে আরো কারা। পন্ডিতজি এখন দেশের মাথা, তিনি আবার জুড়ে দিন দেশ। তিনি আশাশুনি চেনেন না, রাড়ুলি কাটপাড়া চেনেন না, চেনেন না সাগরদাঁড়ি, কপোতাক্ষ, বেতনা, ভৈরব, রূপসা, তিনি এত পন্ডিত, তিনি কি জানেন মেঘনাদ বধের কথা? বাল্মিকী রামায়ণে যা লেখা নেই তা লিখে গেছে মধুকবি। বাল্মিকী পুত্রহারা রাবণের কথা ভাবেন নি। বাল্মিকীর রামায়ণে কোথায় ছিল প্রমীলা যে সহ-মরণে যাবে? বাল্মিকী তো রাবণ বধেই আনন্দ পেল, আর মধু যে অন্যায় যুদ্ধে মেঘনাদের মরণের জন্য হাহাকারে জীবন ব্যয় করল তা কে জানে। শোকের কথা শোনো পন্ডিতজি।

অবাক হাবলু দেখে তার সামনে সাত ঘোড়ার টাঙ্গা। টাঙ্গা থেকে নেমে এসেছে যে তাকে তো ভাল চেনে। শাদা গান্ধি-টুপি মাথায়। ফর্শা টুকটুকে রং, মাথায় ততো লম্বা নন, চোস্তা পায়জামা, শাদা পাঞ্জাবি, তার উপর যে কোট তার নাম হয়েছে তাঁর নামেই। হাবলুকে তিনি ডাকছেন, এস, এই টাঙ্গায় উঠে বস।

পন্ডিতজি তুমি! হাবলু, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা অমিতাভ রায় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এই সেই ভারত ভাগ্য বিধাতা। কিন্তু কোন ভারত? খন্ডিত ভারত। পাকিস্তান হলো যে ভারত, তার আবার দুই ভাগ। পূর্ব আর পশ্চিমের মাঝখানে ভারত বসে থাকল, সাগর থেকে গেল। তোমার এই খন্ডিত ইন্ডিয়ার কে কেমন আছে তা জানো হে প্রণম্য রাজপুরুষ? বিনবিন করতে লাগল হাবলু। তার ভিতরে ভর করেছে সাগরদাঁড়ি থেকে আসা বীরাঙ্গনা দেব্যা। তার ভিতরে ভর করেছে, আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ট্রেনের অসংরক্ষিত কামরার গিজগিজে মানুষ, তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বিদায়ঘাট পার হয়ে এসে শিয়ালদা স্টেশনে লুটিয়ে থাকা সমস্ত সংসার...হাবলু বিনবিন করছে, সব গেছে আমাদের, শোনো পন্ডিতজি, দেশবাসী এখন সন্তানহারা রাবন রাজা...

করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষেদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে...
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।।

কাঁদছে হাবলু, অমিতাভ রায়। মেঘনাদ প্রমীলা, মৃগেন সরমা, ময়রম, টিয়া, কপোতাক্ষ সফিউদ্দিন, ফণিভূষণ, অজেত আলি, বড়দল স্টিমারঘাটা, হাতেবর স্যার...কাঁদছে কত শত সহস্র মানুষ, কপোতাক্ষ, পদ্মা মেঘনা, গঙ্গা গোদাবরী, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা...। হাবলুর সঙ্গে গুনগুন করছে তারা, 'করি স্নান সিন্ধুনীরে...'

ষাট

পন্ডিতজি বললেন, শোক সম্বরণ করো, রহো বেটা, শোক ধারণ করে থাকলে মানুষ নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারবে না।

অবাক অমিতাভ রায় দেখল পন্ডিতজির চোখে জল। তিনি বিড়বিড় করছেন, এ ভাবে তো কখনো বুঝি নি রাবণের হাহাকার, আহা তুমি কী শোনালে, মানুষ তো উল্লাস করে তার মৃত্যুতে।

কী বলো পন্ডিতজি, মানুষ কি উল্লাস করতে পারে মানুষের মৃত্যুতে? কথাটা বলতে বলতে আরো কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায় অমিতাভ রায়। হিন্দুকে মেরে মুসলমান, মুসলমানকে মেরে হিন্দু কি উল্লাস করছে না, দেশময় শুধু এই লেগেছে, এই-ই তো সত্য, পন্ডিতজি সবই জানেন, জানেন মানুষ কীভাবে মানুষকে মারছে। স্বাধীনতার জন্য এই সব লাগে নাকি?

চুপ করে রয়েছেন পন্ডিতজি। তারপর বললেন, রক্ষকুলপতি রাবণকে মানুষ বলল কেউ তা কতবার শুনেছি, কিন্তু এই প্রথম শুনলাম যেন কথাটি, এভাবে কথার পিঠে কথা না বসলে ভাষা আর কথা মর্যাদাময়ী হয় না।

অমিতাভ রায় বলে, পন্ডিতজি রাবনপুত্র মেঘনাদের মতো মরেছে হিন্দু মুসলমান।

তুমি কি সেই কপোতাক্ষ কুল থেকে এলে?

হ্যাঁ, আমি মধুকবির দেশের লোক, মধুকবি আমার দেশের লোক।

দেশবাসী মেঘনাদের মতো নিহত হয়েছে বলো তুমি?

হাবলু উল্লাস প্রকাশ করল, পন্ডিতজি, তুমি মেঘনাদের কথা জান?

মহাকবি বাল্মিকির মেঘনাদ?

না, মধুকবির মেঘনাদ, পন্ডিতজি তুমি কি জান তার মরণ? ভাগ করে দিলে সসাগরা এই বসুন্ধরা, কত মেঘনাদের মরণ এল এই অন্যায়ের পথে।

পন্ডিতজি বললেন, বীরের মৃত্যু এই ভাবে হয়।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও কি মেঘনাদের মতো...কথা শেষ করল না অমিতাভ রায়, পন্ডিতজি বলছেন, আমি কিছুই জানি না অমিতাভ, আই ফিল ফর হিম।

অমিতাভা রায় বুঝল না কার কথা বলছে পন্ডিতজি? মধুসূদন, না মেঘনাদ, মেঘনাদ না রাবন, রাবন না রাজনারায়ণ, মা জাহ্নবী, নাকি সুভাষচন্দ্র? নাকি বিদায় ঘাট থেকে নৌকো ভাসানো মানুষজন। ওপারে বসে বাবা এখনো বলে সুভাষ বোস থাকলে হাড়ি ভাগ হতো না। ওপারে বসে হাতেবর চাচা বলছে গান্ধিজির পথ ছিল ঠিক পথ, সেই পথ পরিহার করল মানুষ। আর শেষে তাঁকে মেরেই দিল। পার্টিশন না হলে গান্ধিজিকে মরতে হত না। তিনি হিন্দুর হাতে মরেছেন মুসলমানের মতো, মুসলমানের হাতে

মরেছেন হিন্দুর মতো। তিনি আর কিছুকাল বেঁচে থাকলে ভাঙা দেশ জোড়া লেগে যেত। তাঁকে বাঁচতেই দিল না। আবার এর বিপক্ষেও কথা বলছে কতজন। দেশটার এমন কিছু হয়ে গেল, মানুষ সহ্য করতে না পেরে আকথা কুকথা বলে বেড়াচ্ছে। গান্ধিজির নামে বলছে, জওহরলাল, কায়েদ ই আজম মহম্মদ আলি জিন্নার নামেও বলছে। এক একজন এক একজনের পক্ষ নিয়ে অন্যদের নামে কুৎসা গেয়ে বেড়াচ্ছে। হিন্দু বলছে মুসলমানের নামে, কায়েদ-ই-আজম যদি বছর শেষ হলেই মারা যাবেন, তবে কেন দেশটাকে ভেঙে নিলেন। পাকিস্তানের সুখ তিনি ক'দিন ভোগ করলেন? পাকিস্তান তো তাঁর স্বপ্ন ছিল। অথচ তাঁর ভিতরে রাজ রোগ, আয়ু সীমিত। তিনি না বলেছিলেন পাকিস্তান হিন্দু মুসলমান দুয়ের দেশ হবে, তো এত মানুষ ভিটেমাটি হারাল কেন? তাঁর কথা তো খাটল না। আত্ম গরিমার জন্য দেশটাকে তিনি টুকরো করে আলাদা করলেন। বিশ লক্ষ মানুষের প্রাণ গেল।

মুসলমান বলছে হিন্দুর নামে। জওহরলাল কিছুতেই ক্ষমতা ছাড়তেন না। মুসলমানের নিজের কিছুই থাকত না, পরদেশী হয়ে বাস করতে হতো জওহরলালের ভারতে। পাকিস্তান মুসলমানের মুক্তি হয়ে আসবে। মুসলমানের হাতে ক্ষমতা আসবে। লিগ মুসলমানের ভিতর পাকিস্তানের স্বপ্ন চারিয়ে দিয়েছিল। লিগ মানে কায়েদ-ই-আজম মহম্মদ আলি জিন্নাহ। আর কেউ না। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানও নন। পাকিস্তানের স্বপ্ন মহম্মদ আলি জিন্নার স্বপ্ন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হলো একবছর পরে, আর আরো তিনবছর বাদে খুন হলেন লিয়াকত আলি খান, যিনি কায়েদ-ই-আজমের সঙ্গে পাকিস্তান হাসিল করেছিলেন। আর পাকিস্তান হয়ে গেল মুসলমানদের, হিন্দু পালাতে লাগল।

অমিতাভ রায়ের মনে হলো, মা জননী অনেক সয়েছে, আরো সইবে, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ভাতের থালা হাতে কোলে কাঁখে বাচ্চা নিয়ে পথে নেমেছে জাহ্নবী মায়ের মতো মা, অঙ্গবস্ত্র নেই অঙ্গে, অন্ধকারে বেরিয়েছে মা জননী, তারপর এল দাঙ্গা...উফ! দেশটায় দুর্ভাগারা থাকে। যা হবার ছিল তা হয়েছে। এর বাইরে কিছু হতে পারত না এ জাতির। এই বাইরে কী হতো আর?

পন্ডিতজি বললেন, চল, রাজঘাট নিয়ে যাই তোমাকে, সেখানে গান্ধিজি রয়েছেন, সব বলবে সেখানে, আমি প্রতিদিন একবার করে যেতে চাই, কিন্তু ভুলে যাই প্রতিদিন, কতদিন যাই নি সেখানে, যমুনার সেই তীরে, মনেই পড়ে না কতদিন তাঁর কথা, আবার মনে পড়লে কারা যেন আটকে দেয়, বুঝতে পারি আমার পথ রাজঘাটের পথ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি রাজঘাটের পথের কথা ভুলে গেছি, পরিহার করেছি।

ওই পথে ভুল ক্ষমতার অবসান হতো, বলল অমিতাভ রায়, মানুষ বাঁচত।

সে তো গান্ধিজির স্বপ্ন, স্বপ্ন কখনো সত্যি হয় না। বললেন পন্ডিতজি।

ক্ষমতাই সমস্ত সব্বোনাশের শিকড়। অমিতাভ রায় বলল।

এ তোমার অলীক ধারণা, ক্ষমতাই পারে মানব-কল্যাণকর কাজে ব্রতী হতে।

লিগ আর কংগ্রেসের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দেশটার সব্বোনাশ হয়ে গেল, মানুষ অনাথ আতুর হলো, মানুষ মানুষের অনাত্মীয় হলো, সৎ ভাই বোন, সৎ মা হলো, কোন কল্যাণ হলো মানুষের?

আমার মত ভিন্ন, এ ব্যতীত উপায় নেই, বুদ্ধ গান্ধির পথে যেতে হবে এই ভাবে। পন্ডিতজি বললেন, এই পৃথিবী কত বড় যুদ্ধ পেরিয়ে এসেছে বলো, পৃথিবীকে শান্ত করতে হবে।

হাবলু বলল, আমার জন্ম যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের সময়, ফ্যান মেগে বেড়াত তখন আমার মা বাবা।

পন্ডিতজি নীরব। কান্ড দ্যাখো, আশাশুনির সেই হাবলু, সেই অমিতাভ রায় বসে আছে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পাশে। কতদিন হয়ে গেল, কত বছর, অমিতাভ রায় তাঁর সঙ্গে রাজঘাটের পথে চলেছে। মাস গেল বছর গেল অমিতাভর বয়স বেড়ে যায়, কিন্তু রাজঘাটের পথ আর শেষ হয় না। পথটা ক্ষমতা থেকে ক্ষমতাহীনতার, শত সহস্র থেকে শত শূন্যতার, সাত রং থেকে শুভ্রতার। শাসক থেকে সন্ন্যাসীর পথ। সেই পথে কে যাবে? কে রাজপাট, বধূ আর সন্তান, ক্ষমতার শীর্ষ বিন্দু ত্যাগ করে নিরালম্ব হয়ে পথে নামতে পারে? কে আট হাতি ধুতি সম্বল হয়ে দুঃখী মানুষের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াতে পারে ভারত ভাগ্য বিধাতা না হয়ে, আতুরের পাশে আতুরে বেশে গিয়ে। এই দ্যাখো আমার কিছু নেই, আমি তোমাদের পাশে এলাম, বেলেঘাটায় নোয়াখালিতে। এস আমি তোমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের করুণা ভাগ করে নেব, ভাত রুটির মতো করে।

সাত ঘোড়ার টাঙ্গা চলেছে দিল্লির রাজপথ দিয়ে। পথে কত মানুষ। সাত ঘোড়ার টগবগ টগবগ শুনতে পেয়ে তারা পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে হাত তুলেছে। হাবলু হাবলু, অমিতাভ ওওও। সেই ওপারে পড়ে থাকা আশাশুনির অমিতাভ রায়। অমিতাভ হাত তুলল। লালকেল্লার পাশ দিয়ে ছুটছে ঘোড়া। লালকেল্লা থেকে তোপ দাগল কারা। পন্ডিতজি বললেন, আনন্দের তোপধ্বনি, দিল্লি আজ তোমার আগমন বার্তা দিচ্ছে সকলকে।

অমিতাভ রায় বলল, কিন্তু আনন্দ কোথায় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, তোমাদের আনন্দ আমাদের শোক, মেঘনাদ বধ হল, দেবতার বুক শান্ত হল, কিন্তু মধুর শোক হল, রাবণের শোক হল, তা না জানলে এ ভারতে সুখ আসবে না কোনোদিন, এ স্বাধীনতা কেন?

পন্ডিতজি বললেন, তুমি বলো দেখি মেঘনাদের কথা কী লিখেছিল মধুসূদন।

অমিতাভ রায় বলল তার জেঠার কথা, জেঠির কথা। তাদের ঘরে দিদি কেমন করে আছে। অমিতাভ বলল, ফণিভূষণের কথা, আবার তার পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার

কথা। সফিউদ্দিন আর সাগরদাঁড়ির কথা। তার মা বাবার কথা। তারপর বলল, ময়রমের কথা, টিয়া বলে এক মেয়ের কথা, সে নাকি তাকে ভালবাসে, কিন্তু তার যে শুধু ময়রমের কথা মনে পড়ে। ময়রম ওপারে থাকে, ফেরার সময় ময়রমের সঙ্গে দেখা করে আসা হয় নি। আর কি হবে দেখা? সে কি তার জন্য বসে থাকবে সমস্তদিন সমস্তজীবন? বসে থাকলেই বা কি, সে যে অন্য দেশ।

এইভাবে কতকাল গেল। বছরের পর বছর গেল। ওপারে চলে যাওয়া ফণিভূষণ গেল কোথায়, কোথায় গেল সফিউদ্দিন, অজেত আলি ময়রম আর তার সখী রাবেয়া—কিছুই জানা ছিল না অমিতাভ রায়ের। মা বাবা মরেছিল ওপারে, হাতেবর চাচা মরেছিল ওপারে, ৭১ সালে পালিয়ে এসে খবর দিয়েছিল হাতেবর চাচার বেটা শুভ। তখন ডলুর সংসার হয়েছে বসিরহাটের পাশেই অনন্তপুর গাঁয়ে। স্বামী সরকারি আমিন। বুলু চলে গিয়েছিল বনগাঁ থেকে। ওপারে গিয়ে হারিয়ে গেল গাঁয়ে মিলিটারি ঢুকলে। তার বিয়ে হয় নি। মা বাবাকে দেখত। তাদের বাড়িতে খান সেনা ডেকে এনেছিল দেখিয়েছিল রাজাকার কলিম। বছর পঁয়তিরিশের বুলুকে তারা তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে মেরে ফেলে রেখে গিয়েছিল। ঘরে শেকল তুলে দিয়ে আগুন দিয়েছিল হাতেবর, মৃগেন রায়ের ভিটেতে। উতুলির রাবেয়ার বিয়ে হয়েছিল আর্মি অফিসারের সঙ্গে ঢাকায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের কী হলো জানা নেই। ময়রমের বিয়ে হয়েছিল ধারে কাছে কোথাও। অজেত আলি মুক্তি হয়ে গিয়েছিল। এসব হলো ১৯৭১-এর বসন্ত শেষের কথা। পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তির লড়াই শুরু হয়েছিল। অমিতাভ রায় সেই যে দিল্লিবাসী হলো, দিল্লি থেকে মধ্যপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ থেকে দন্ডক অরণ্য, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, এখানে ওখানে বেঁচে থেকে বয়স বাড়িয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধের সময়, নতুন দেশ বাংলাদেশের জন্মের সময় অমিতাভ বনগাঁ, বসিরহাট, হাবড়া মসলন্দপুর রিলিফ ক্যাম্পে ক্যাম্পে খুঁজেছিল নিজ গাঁ, আশাশুনি, উতুলি, সাগরদাঁড়ির মানুষ। তারপরও কতকাল কাটল খণ্ডিত স্বদেশে। অজেত আলির মৃত্যু, বাবা মার মৃত্যু, বুলুর ধর্ষিতা হয়ে মৃত্যু, হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু জন্ম দিয়েছে যে নতুন দেশের সে দেশে যায় নি অমিতাভ রায়। কী হতে পারে সফিউদ্দিনের? হয় মরেছে না হয়ে বেঁচে আছে সেই বিদায় ঘাট নিয়ে। অমিতাভ রায়ের রাজঘাট যাত্রা শেষ হয় নি। বুড়ো হয়ে গেছে অমিতাভ, তবু শেষ হয় নি।

এই সেই অমিতাভ রায়। বৃদ্ধ বোম্বাই মেলে করে পশ্চিমের শহরে চলেছেন বহুজনের সঙ্গে। কতদিন ছেলে ডেকেছে, বাবা এস, এ এক আশ্চর্য শহর, দিনরাত জেগে আছে। মানুষ ছুটছে সবসময়। তোমাকে দেখাই শহরটা। কত কাজ এখানে, নিত্যনতুন কাজ

তৈরি হচ্ছে, আর গোটা দেশ ছুটে আসছে এখানে। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান, তার সঙ্গে পার্সি, তার সঙ্গে খ্রিস্টান, সব ধর্ম, সব জাতি প্রতিদিন মিলেমিশে যাচ্ছে।

অমিতাভ, হাবলুর ছেলে অনলাভ। অনলের মতো তেজ তার। কেমন বিয়ে করল এক সহকর্মী পিয়াসা সুলতানাকে। কী চমৎকার সেই বউ। মরাঠী মেয়ে বাংলা শিখতে তার কতদিন। কী সুন্দর চিঠি পাঠাত, মেল পাঠাত। বাবা, তুমি এস, তোমাকে সেবা করব, ভালবাসব। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তর কথা শুনব। মেঘনাদ বধ কাব্যের কথা শুনব। তোমার সেই সতের বছর বয়সে দিল্লি ভ্রমণের কথা শুনব। বীরাঙ্গনা দিদিমার সঙ্গে সেই যে পঞ্চাশ বছর আগে মধুকবির কথা নিয়ে দিল্লি গেলে, তারপর?

রাত অনেক। গোটা ট্রেন ঘুমিয়ে পড়েছে। যত উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থেকে এই মুহূর্তে মুক্তি। কিন্তু জেগে আছে সেই অমিতাভ রায়। প্যাসেজ সাইডে লোয়ার বার্থ তার। খোলা জানালা দিয়ে সে বাইরে তাকিয়ে। পুব থেকে পশ্চিমে চলেছে ট্রেন। খন্ডিত ভারতবর্ষ ফুঁড়ে ছুটে যাচ্ছে এক ভারতবর্ষ থেকে আর এক ভারতবর্ষের দিকে। হিন্দুস্থান পাকিস্তান এক করা, অমিতাভর সেই উনিশ বছরেও যা ছিল তাই রয়ে গেল। বরং আতঙ্কে আতঙ্কে মানুষ যেন হিমঘরে ঢুকে যাচ্ছে ক্রমাগত। মুম্বই, পুনে, দিল্লি, বাঙ্গালুরু, লাহোর করাচি ইসলামাবাদ—সর্বত্র মানুষ প্রাণ হাতে করে পথে। সেই পথের কোনো এক দিকে ছুটে যাচ্ছে মুম্বই-এর ট্রেন। আতঙ্কের হিমঘরে চলেছে অমিতাভ রায়। বাইরে অন্ধকার রাত্রি, আকাশে মেঘের কুন্ডলী। সমস্ত ভারত জুড়ে বৃষ্টি নেমে গেছে। আর পশ্চিমঘাট পর্বতমালা তো দেশের পশ্চিম উপকূলে মেঘ ডেকেছে সবার আগে। এখন গাঁয়ে গাঁয়ে ধুম লেগেছে বীজ বোনার। মৌসুমী বায়ু ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বর্ষার মেঘ রামগিরি থেকে অলকাপুরীর দিকে। পুত্রবধূ পিয়াসা মেল পাঠিয়েছিল, বাবা, কবে শুনব তোমার সেই কথা, জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে তুমি চলেছ সাতঘোড়ার রথে চেপে। সূর্যের সেই সাত রঙের সাতটি ঘোড়া তোমাদের ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাপুর কাছে সেই যমুনার তীরে। অমিতাভ রায় রিপ্লাই দিয়েছিল, ও আমার কল্পনা রে পিয়াসা, সে কবের কথা, ভেসে বেড়াচ্ছি এপারে, তখন মাথায় ছিল সব আবার রদ করে নেব দিল্লি গিয়ে, এপার ওপার এক করে দেব।

বাবা সেই বীরাঙ্গনারে তুমি কোথায় হারালে? পিয়াসা তার সঙ্গে ইন্টারনেটে কথা বলে। ফেসবুক চ্যাট। ওয়েব ক্যামে পিয়াসার আড়ম্বরহীন ফ্ল্যাট দেখা যায়। তার ঝলমলে মুখ দেখা যায়। বলে, বীরাঙ্গনার কথা বলো বাবা।

দিল্লি থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ট্রেনে চির ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিল বীরা বুড়ি, ঘুমোনর আগে পর্যন্ত মধুর কথা বলতে বলতে গিয়েছিল, তারপর মধুর দেশে গিয়ে দুঃখী বুড়ি বাঁচল, মধুর মরণের কথা বলতে বলতে ঢলে পড়ল বুড়ি।

মধুর কথা বলবে বাবা।

আমি কি বীরার মতো পারবরে মা?

পারবে বাবা পারবে, বীরা বুড়ি তোমায় সেই ভার দিয়ে গেছে বাবা।

তুই কী করে জানলিরে পিয়াসা?

আমি টের পাই বাবা, বলো তুমি সেই কথা, যা শোনা হয় নি আমার।

মেঘ ডাকছে আকাশ ফাটিয়ে। সে দিন কলকাতার আকাশে যে মেঘ ছিল সেই মেঘই ফিরে এল যেন। বর্ষার নতুন মেঘ এসে দেখল কলকাতার বাতাসে দুঃখের ধূলিকণা লেগেছে।

মধু মায়ের কোল ছিঁড়ে মাদ্রাজ গিয়েছিল, রেবেকাকে ত্যাগ করে মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসেছিল নিষ্ঠুর মধু। হেনরিয়েটা এল কলকাতায়। হেনরিয়েটার সঙ্গে সংসার পাতল মধু কলকাতায়। তারপর মধু চলল ইংল্যান্ড। হেনরিয়েটা আর সন্তানেরা থাকল কলকাতায়। ইংল্যান্ডগামী জাহাজ রওনা হলো কবি মধুসূদনকে নিয়ে। তিনি চলেছেন সেক্সপীয়র, বায়রন, মিল্টনের জন্মভূমির দিকে। তিনি চলেছেন সেই মহাদেশে যা ছিল কবি ভার্জিল, দান্তের লীলাভূমি। ইয়োরোপ ছিল তাঁর কাছে তীর্থক্ষেত্র। তাঁর ভিতরে তখনো স্বপ্ন ছিল তিনি বড় কবির খ্যাতি অর্জন করবেন ইংরেজি ভাষা, রাজার ভাষায় কাব্য রচনা করে। অথচ তখন মেঘনাদ বধ কাব্য লেখা হয়ে গেছে। মধু তখন খ্যাতিমান, প্রহসন লিখেছে, নীল দর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছে। তবু মধু চলল তার স্বপ্নের দেশ ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে। শ্রাবণের মেঘে ঢাকা আকাশ মাথার উপর। মধুর চোখের সামনে থেকে ক্রমে সাধু পলের গির্জার উচ্চ শৃঙ্গ অদৃশ্য হয়ে গেল। গঙ্গাতীরের নারিকেল শ্রেণী অদৃশ্য হলো। সাগরের দিকে চলল জাহাজ। ক্রমে সমুদ্রের নীলে প্রবেশ করল সেই জাহাজ। মাদ্রাজে গিয়ে ভারত মহাসাগরের বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখেছিল মধু। আবার মহাসমুদ্রের দিকে চলেছে কবি। মগ্ন হয়েছে তখন কবি মধুসূদন।

বাবা আমি পিয়াসা বলছি, মধু বিলেতে গিয়ে খুব কষ্ট পেয়েছিল জানি, হেনরিয়েটা তার বাচ্চাগুলিকে নিয়ে মধুর কাছে গিয়েছিল ভার্সাইয়ে, সেখানে না খেয়ে মরার দশা হয়েছিল মধুর।

অমিতাভ ঃ এসব কথা জানত বীরাঙ্গনা, বলত আমাকে, বলতে বলতে কাঁদত, মধু দুঃখ পেতেই যেন এসেছিল মা জাহ্নবীর কোলে, আর মা জাহ্নবীও তো দুঃখ নিয়ে গেল, তার কেউ ছিল না, না পুত্র না স্বামী, রাজনারায়ণ দত্ত আবার বিয়ে করেছিল তা জানিস তুই।

বাবা, মধুর মৃত্যুর কথা বলে তোমার ছেলে, তুমি তাকে বলতে তার ছেলেবেলায়।

অমিতাভ ঃ বলতাম, ওকে বলতাম সমাজ যে পথ তোমাকে দেখায়, তা লঙ্ঘন করলে এমন হয়, কিন্তু সমাজের দেখান পথ শেষ পর্যন্ত মানুষের কাজে লাগে না, যে শাসন করে তার কাজে লাগে।

পিয়াসা ঃ একটা মানুষের কাছে এত সুন্দর পৃথিবীটা নরক হয়ে গিয়েছিল, নরকেও এমন কষ্ট পায় না আত্মা তার নরকবাসে।

ঠিক বলেছিস মেয়ে, সে নিজেকে নিজে মেরেছিল, আত্মহত্যা ব্যতীত তার অন্য কোন উপায় জানা ছিল না, ইংরেজ তাকে কিছুই দেয় নি, বিলেত, সেক্সপীয়র মিল্টনের দেশ তাকে কিছুই দেয় নি, আরো দুঃখের সাগরে ভাসিয়েছিল। যে কষ্ট বিলেত থেকে শুরু হলো তা তার সঙ্গী হলো।

পিয়াসার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি কত সময় পার করেন। পিয়াসা বলে, বাবা, সামনের বার পঁচিশে জানুয়ারি, মধুর জন্মদিনে যাব সাগরদাঁড়ি।

যাবি মা যাবি, আমাকেও নিয়ে যাবি, সফিউদ্দিনের খোঁজ করে আসব, তাকে আমরা পাঠিয়েছিলাম এপার থেকে।

বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স পঁচাশির মতো, তাই তো।

তাই তো হবে। বিড়বিড় করে বলতে থাকেন অমিতাভ রায়। আধশোয়া হয়ে বসে আছে অমিতাভ। বাইরে মেঘাচ্ছন্ন পৃথিবী। ট্রেন ছুটছে অজানা অন্ধকার ভেদ করে। বেঁচে থাকলে বীরাঙ্গনার হতো একশো তিরিশ পঁয়তিরিশ। আর সেই টিয়া? সেও সত্তর। খোকন? তার ষাট পেরুনর কথা। খোকনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, সে গেল জাম্বিয়ায় চাকরি নিয়ে, আর ফিরল কিনা জানা নেই। টিয়া কোথায়? অন্ধকারে সেই সব মুখ চলেছিল অমিতাভর সঙ্গে। জীবন এমনি হয়। সেই যে বেরোল বেলগেছে থেকে আর যাওয়া হয় নি তার। সাতখানা চিঠি এসে পড়েছিল বসিরহাটে বীরাঙ্গনার বাড়িতে। সেই সব চিঠি তার কাছে এসেছিল কত পরে। পরে এসেছিল মানে, বীরাঙ্গনা দেয় নি একটিও, কিন্তু নষ্টও করে নি। নিজের কাছে রেখেছিল। চিঠি খুলে পড়েছিল। চিঠির উপর পেনসিল দিয়ে লিখেছিল, মুখপুড়ি তুই পাবিনে, তোরে দেব না সব্বোনাশী।

বীরাঙ্গনা বলল, ওসব তুই বুজবিনে হাবলু, তুই দিল্লি চ আমার সঙ্গে।

সে যেদিন ফিরল আশাশুনি থেকে, সেদিন কতরাত পর্যন্ত কথা হলো। বীরাঙ্গনা তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, আমি ভাবি আমার মাসসাই বুজি ফেরবে না।

মাসসাই কেডা?

তুই, তুই আমার মাসসাই ছিলি আগের জন্মে।

ও দিদমা তা আবার হয়।

তুই বীরা বল, বীরা ডাক আমারে, কবে কোন জন্মে সে ডাক শুনিছিলাম, সে কবে মুছে গেল, তুই আমারে তাঁর মতো ডাক।

গা শিহরিত হলো অমিতাভর এই এতকাল বাদে। তার কোলেই ঢলে পড়েছিল বীরাঙ্গনা দাসী ট্রেনের ভিতর। অমিতাভ ফিসফিস করে ডাকল, বীরা, বীরাঙ্গনা...। সেই

ডাক নিয়ে বর্ষারাত্রি তার সঙ্গে বয়ে যাচ্ছিল। অমিতাভ সেই পত্রটি হাতিয়েছিল, আছে আছে সেই উজ্জ্বল অক্ষরগুলি, 'তোরে দেব না সব্বোনাশী।'

অন্ধকারে কোথায় ভেসে উঠল বিনবিনে কান্না।

একষট্টি

প্রিয়তম,

সেই যে তুমি আমাকে না বলিয়া আমার অজ্ঞাতে বেলগাছিয়া হইতে চলিয়া গেলে, আর আসিবার নাম নাই। এই হতভাগিনীকে কি ভুলিয়া গেলে ওই ডাকিনী বীরাঙ্গনার বশীকরণে? আমার সোনা, অমিতাভ, কবে আসিবে তুমি? কবে কবে কবে? আমার আহার নিদ্রা সব গিয়াছে, গোপনে শুধু কাঁদিতেছি তোমার জন্য। শোনো প্রিয়তম, রেবেকার জীবন নষ্ট করিয়াছিল এই বীরাঙ্গনা, ডাকিনী, এখন আমার জীবন শেষ করিতে উদ্যত। তোমাকে বুঝিতে হইবে সব, বীরাঙ্গনা হইতে সাবধান হও অমিতাভ, আমার কাছে ফিরিয়া আইসো, মিলন হউক আমাদিগের। সিন্ধুর অশ্রু নামে একটি বই আমি পড়িতেছি এখন, প্রেমিক প্রেমিকার জীবন কী করিয়া ধ্বংস করিয়া দেয় বীরাঙ্গনার ন্যায় বৃদ্ধা এক কুটনি, তাহা আছে উহাতে, তুমি অবশ্যই ওই বই পড়িবে।

আমি তোমার প্রতীক্ষায় আছি।

সহস্র ভালবাসা নিয়ো প্রিয়তম আমার।

ইতি

তোমার সবুজ টিয়া

চিঠিটির নিচে বীরাঙ্গনার হিংস্র মন্তব্য। সে ওইট রেখে দিয়ে আর একটি পড়েছিল। পরপর সাতটি। বীরাঙ্গনা জানল না। কিন্তু তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল খুব। এখন মনে হয় হয়তো তাকে পড়ানোর জন্যই বীরাঙ্গনা অরক্ষিত করে রেখেছিল চিঠিগুলি।

অন্ধকারে ভেসে ওঠা বিনবিনে কান্না ট্রেনের ভিতর ছড়িয়ে যেতে লাগল। হাত তুলল অমিতাভ রায়। এই কান্না ভেসে আসছে কত বছর পিছন থেকে। এই কান্না শুনতে শুনতে এত বছর গেল। এতটা বয়স হলো। এর কি শেষ নেই? শেষ হবে না কোনোদিন?

পন্ডিতজি বললেন, হবে অমিতাভ, আবার হবেও না।

অমিতাভ বলল, হবে আবার হবেও না, তাহলে দেশ কোথায় যাবে পন্ডিতজি?

তোমরা নিয়ে যাবে যেখানে।

সেই রথে এখনো বসে আছে যেন অমিতাভ রায়। তার পাশে জওহরলাল। তারা সেই যে রাজঘাটের পথে ঘোড়া ছুটিয়েছিল, সেই ঘোড়া ছুটেই চলেছে। রাজঘাট পৌঁছনো যাচ্ছে না। সমস্তজীবন ধরে ছুটে চলল রথ, পৌঁছন গেল না বুঝি।

আর কতদূর পন্ডিতজি?

সাতটি ঘোড়া ওই পথ চেনে। পন্ডিতজি বললেন।

পিয়াসা লিখেছিল, থেমে গেলে কেন বাবা, তারপর?

নেহেরু বললেন, অমিতাভ তুমি বলো কী করে কী হতে পারে।

একটা ট্রেন হোক পন্ডিতজি, দিল্লি, লাহোর, কলকাতা, ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরে, আশাশুনি, উথলি, ধূলিহর হয়ে সে চলতেই থাকবে। সেই ট্রেন কখনো থামবে না।

সাত ঘোড়ার রথ কত পথ ছুটল। বিকেল হয়ে গেল, আলো মুছে গেল, সারে জাঁহাসে আচ্ছা বাজল ব্যান্ডে, জাতীয় পতাকা নেমে এল আকাশ থেকে। লাল কেল্লায় ঘুরঘুর করতে লাগল মোগল যুগের সৈনিক সিপাহীরা। কেল্লার কুটুরি কুটুরিতে ফিরে এল সম্রাট বাহাদুর শাহ্-র জেনানা মহল। মসজিদে মসজিদে জেগে উঠল আজান ধ্বনি। মন্দিরে মন্দিরে স্তোত্র, গির্জায় গির্জায় বাজল ঘন্টা। রথ চলতে লাগল। খণ্ডিত স্বদেশের রথ চলতে লাগল।

অমিতাভ বলতে লাগল, পণ্ডিতজি অবাক হয়ে তাঁর কাছে ভারতেতিহাস শুনতে লাগলেন। মধুকবির কথাই ভারতেতিহাস। এ ইতিহাস পন্ডিতজির জানা নেই। বিদায়ঘাটে ভারতেতিহাস নতুন করে লেখা শুরু হলো। বিদায়ঘাট দেশজুড়ে, এপার-ওপার জুড়ে বিদায়ঘাট পন্ডিতজি। বিদায়ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছে দেশবাসী, পুব পশ্চিমে। বিদায়ঘাটে ঘাতকও হাজির। বাঁচতে দেবে না তারা। শত শত বর্ষ ধরে তারা অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে কত কপোতাক্ষ আর যমুনা, সিন্ধুর তীরে। অমিতাভ রায় বলতে লাগল মধুর কথাও। মধু বাতাস থেমে গেল পন্ডিতজি, নিরন্ন কবি যাবেন ফিরে তাঁর সৃষ্টিকর্তার কাছে। কবি মধুসূদন আর হেনরিয়েটা হতভাগিনী টের পেয়েই গিয়েছিল, এ জীবন আর নয়, ফুরাইয়াছে জীবনের মধু।

কবি মধুসূদন আর হতভাগিনী অ্যামেলিয়া হেনরিয়েটা সফাইয়া টের পেয়েই গিয়েছিল, এ জীবন আর নয়, ফুরিয়েছে জীবনের মধু। কবি মধুসূদন অভাবে, রোগের ভারে জীর্ণ হয়ে পড়েছিলেন। কাব্য সরস্বতী তাঁকে যশ দিয়েছিল, অন্ন দেয় নাই। শরীর অসুস্থ। সন্তানের মুখে অন্ন নেই। ক্ষুধায় কাঁদে। উত্তরপাড়ার রাজা জয়কৃষ্ণ ভগ্ন স্বাস্থ্য কবিকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। গঙ্গা তীরে রাজবাড়ি। অলিন্দ থেকে কবি মধুসূদন দেখতে পান নদী চলেছে সাগরের দিকে। দেখতে পান সাগর থেকে তুমুল উচ্ছ্বাসে ফিরছে নদী। সাগর থেকে ফিরছে সে পরিপূর্ণ হয়ে। তাঁর মনে পড়ে সাগরের ওপারের কথা। হেনরিয়েটা তাঁর বহুদিনের সঙ্গিনী। মাদ্রাজে রেবেকা আর দুই সন্তান মার্থা আর ফিবিকে ছেড়ে, প্রায় পালিয়ে কলকাতা চলে আসার পর হেনরিয়েটাও জীবনসমুদ্রে ভাসল তাঁর সঙ্গে। রেবেকার সঙ্গে আইন সম্মত বিচ্ছেদ না হওয়া অ্যামেলিয়া হেনরিয়েটা

সফাইয়া নামের পাশে ডাট লিখতে পারেনি, মধুর স্ত্রী হতে পারেনি, অথচ সন্তানের জননী, মধুর দুঃখময় জীবনের সঙ্গিনী। এখন রোগজর্জর কবি মধুসূদন ও হেনরিয়েটা প্রশস্ত অলিন্দে বসে ধীর প্রবাহিনী গঙ্গার দিকে চেয়ে। নদী চলেছে সাগরে। গঙ্গার পশ্চিমকুলে আছেন তাঁরা। পশ্চিমকুল বারানসী সমতুল। বারানসীর কথা শুনেছে হেনরিয়েটা। সব তার প্রিয়তম মধুর কাছে। রাজা জয়কৃষ্ণের এই বসতবাটি, নিস্তব্ধ প্রকৃতি হেনরিয়েটাকে যেন এই সায়াহ্নে অদেখা বারানসীর রূপ প্রত্যক্ষ করায়। বারানসী হিন্দুর পবিত্র তীর্থ, বারানসীর গঙ্গা পতিতোদ্ধারিণী, মানুষের সমস্ত পাপ হরণ করে এই দুঃখের পৃথিবী থেকে মুক্তি দেয়। গঙ্গা যেন ঈশ্বরীর অন্য এক রূপ। ভরা গঙ্গার রূপ এক, আর নিঃস্ব গঙ্গা-তীরের রূপ অন্য, ক্রুশবিদ্ধ ঈশ্বরপুত্র বেরিয়ে আসেন জল-তল থেকে মা মেরি, ঈশ্বরীর কোলে। সেই চেহারার ভিতর নিজেদের যেন দেখতে পায় মধু, হেনরিয়েটা। আষাঢ় মাস পড়েছে ক'দিন আগে। মধু আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে প্রাচীন কবির কাব্যের কথা বলেছিল হেনরিয়েটাকে। সেদিন আকাশে মেঘ এসেছিল। বৃষ্টি হয় নি। এদেশের প্রাচীন কবি কালিদাসের মেঘদূতমের কথা শোনাতে শোনাতে মধু বলেছিল, কবির ওই কল্পনা মধুর, কিন্তু পৃথিবী অত মধুর নয় প্রিয়তমা, আমি কেন অমন স্বপ্নের কথা ভাবতে পারি নি এ জীবনে?

কোন স্বপ্ন প্রিয়তম?

মেঘদূতমের পৃথিবী কত সুন্দর, আমি অমন পৃথিবীতে তো জন্মাই নি।

হেনরিয়েটা মধুর কথা শোনে আর অভিভূত হয়। মধু শোনায় যক্ষের বিরহ বেদনার কথা। শোনাতে শোনাতে বলে, বিরহ সত্য, কিন্তু আমি যে দেখেছি অন্য পৃথিবী, অপমান আর ক্ষুধার পৃথিবী।

হেনরিয়েটা চুপ করে থাকে। সে সামান্য রমণী। মধুকে ভালবাসে, মধুর ভালবাসা পেয়ে সে ধন্য। মধুর মননের কাছাকাছি যেতে চায়, পারে না, তাই শান্ত হয়ে শোনে। মধু কোন পৃথিবীর কথা বলতে চায় তা সে ধরতে পারে। মধু বারবার শোনায় মেঘনাদের মৃত্যুর কথা। সে দেখেছে জগৎটাকে ওই ভাবে। বিড়বিড় করে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে মধু উচ্চারণ করতে থাকে,

করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।।

নিজের রচনা মেঘনাদ বধ কাব্যের অন্তিম এই হাহাকার উচ্চারণের সময় তার দুচোখ আর্দ্র হয়ে আসে। হেনরিয়েটা অন্যদিকে মুখ ফেরায়। এই মস্ত দালানবাটিতে কত কৌতর। তারা চুপ করে আছে। সারি সারি বসে আছে খিলানে খিলানে। কবি আর হেনরিয়েটার কথোপকথন তাদের নিস্তব্ধ করেছে।

মধু বলল, হেনরিয়েটা, তোমার মাদ্রাজের কথা মনে পড়ে?

হেনরিয়েটা বলল, তোমার কি মনে আসে মাদ্রাজ সিটির কথা?

এখন মনে পড়ছে, তোমার রেবেকার কথা মনে পড়ে?

হেনরিয়েটা বলল, আমার কিছুই মনে পড়ে না।

সে কি অভিশপ্ত করেছিল তোমাকে আমাকে?

হেনরিয়েটা বলল, কবি তুমি বিশ্বাস কর অভিশাপে?

জানি না আমি বিশ্বাস করি কিনা, কিন্তু এখন মনে হয় প্রতারণা করেছিলাম রেবেকা ও আমার সন্তানদের।

হেনরিয়েটা বলল, আমার ভালবাসা তাহলে কি মিথ্যা হত?

মধু বলল, ওদের কথা এখন মনে পড়ছে কেন হেনরিয়েটা?

তোমার অন্তরের কথা তুমি জান, কিন্তু এও সত্য প্রেমহীন দাম্পত্য কি তোমাকে সুখী করত? রোগজীর্ণ হেনরিয়েটার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। রেবেকা তার প্রেমের বাধা হয়ে উঠেছিল। মধু তো সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছিল রেবেকাকে ছেড়ে আসবে না। বাড়িতে তার নতুন মা তাকে গঞ্জনা দিচ্ছিল, যা তুই, ওই ব্ল্যাক নেটিভটার সঙ্গে ভেগে যা, আমি ওই নেটিভটাকে সহ্য করতে পারি না, বউ আছে, আবার তোকে ধরেছে। উফ! কী দিন গেছে সেইসব। রেবেকা তার সতীন, তার কথা ভুলতে চায় সে। রেবেকার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল সে পোয়েটকে। কবির দিকে প্রেমময় দৃষ্টিতে তাকায় হেনরিয়েটা। মধুসূদন নিশ্চুপ। শীর্ণ শরীরের দীপ্তিময় দুটি চোখ নিমীলিত। হেনরিয়েটা বলল, তুমি আমার ভালবাসায় তৃপ্ত হও নাই?

মধুসূদন তার শীর্ণ দক্ষিণ হস্তটি হেনরিয়েটার মাথায় রাখল। কী সুন্দর সোনালি চুলের সোনালি চোখের অ্যাঞ্জেলকে সে দেখেছিল মাদ্রাজে। মাতৃহীন কিশোরী। কী ছিল তার প্রেমময় চাহনি। দেখা মাত্র তাকে মন দিয়ে ফেলেছিল বিবাহিত পুরুষ মাইকেল এম. ডাট। বিবাহ করেছে মাদ্রাজেরই এক শ্বেতাঙ্গিনীকে। রেবেকার সঙ্গে বিবাহে মাদ্রাজের শ্বেতাঙ্গ সমাজ খুশি হয় নি। দেশি কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ কেন শ্বেতাঙ্গিনীকে বিবাহ করবে। লোকটি কবি। খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে, অসাধারণ ওর পাণ্ডিত্য, কিন্তু কালো মানুষ তো। সেই বিবাহিত পুরুষের প্রেমে পড়ল কিনা সদ্য যুবতী এক শ্বেতাঙ্গ কন্যা।

নির্জন বাংলো বাড়িতে আচমকা একদিন মধু চলে এল। মধুসূদন নাকি এসেছিল হেনরিয়েটার বাবা, তার শুভানুধ্যায়ী জর্জ জাইলস হোয়াইটের সঙ্গে দেখা করতে। সেই কথা বলেছিল হেনরিয়েটাকে। মিথ্যা। সাতচল্লিশ বছরের জর্জ হোয়াইট তার কন্যা হেনরিয়েটার চেয়ে বয়সে ছোট হেনরিয়েটার সৎ মা, নতুন বউকে নিয়ে গিয়েছিল

চার্চে। সেদিন ছিল রবিবার। রবিবার অপরাহ্ণ বেলায় চার্চে গেছে সবাই। হেনরিয়েটার পরের দুই ভাই টমাস আর আর্থারও। সমবয়স্ক নতুন মা সহ্য করতে পারত না হেনরিয়েটাকে। সেদিন সকাল থেকে স্টেপ মাদারের সঙ্গে বার বার কলহে জড়িয়ে পড়ছিল হেনরিয়েটা। বাইরের মেয়েটি এসে বাবাকে দখল করে নিয়েছিল। কলহের সময় নতুন মায়ের পক্ষ নিত বাবা। বাবার প্রতি অভিমানও তাই হয়েছিল প্রবল। পরিবারের সঙ্গে চার্চে না গিয়ে বাড়িতে একা বসেছিল বিষণ্ণ মনে।

স্ত্রী রেবেকা আর সন্তানদের নিয়ে মধু গিয়েছিল চার্চে। গিয়েছিল হেনরিয়েটার সঙ্গে দেখা হবে সেই আশায়ও। মিঃ হোয়াইটের সঙ্গে তাঁর কন্যাকে না দেখে মধু একা ফিরে এসেছিল রেবেকাদের চার্চে পৌঁছে দিয়ে। হেনরিয়েটা প্রেয়ারে নেই। তার সঙ্গে কথা বলতে মধুর ভাল লাগে। মাতৃহীন কন্যাটির প্রতি তার এক ধরণের স্নেহ আছে। তাকে নিজের কবিতা পড়ে শোনায়। বায়রনের কথা শোনায়। সেই সোনালি চুলের কন্যাটির সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে তাই তো চার্চে যাওয়া। হেনরিয়েটা বাড়ি আছে শুনল ওর বাবার কাছে, শরীর ভাল নেই। মধু চলে এসেছিল ইউরোপিয়ান কলোনিতে।

আমি জানি না আমি কী করব, মাই মাদার ইজ আ বিচ। হেনরিয়েটা তার সোনালি চুলে ভরা মাথাটি ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বিপর্যস্ত গলায় বলে উঠেছিল, মিঃ ডাট, কোনদিন শুনবে হেনরিয়েটা নেই, সি কমিটেড সুইসাইড।

এ তুমি কী বলছ হেনরিয়েটা, আমি মিঃ হোয়াইটকে বলব।

নো, হু ইজ মিঃ হোয়াইট, আমার বাবা মিঃ হোয়াইট মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্যানিশ হয়ে গেছে, এক যাদুকরী তাকে ভেড়া করে দিয়েছে, তুমি দেখতে পাও না মিঃ ডাট?

মধু তার পাশে গিয়ে বসেছিল, তার সোনালি চুলের উপর হাত রেখে বলেছিল, দেখ, তোমার বাবা তোমার কাছেই ফিরবে, তোমার স্টেপ মাদারও রিয়ালাইজ করবে সব।

ইউ আর রং, তুমি আমাকে স্তোক দিচ্ছ মিঃ ডাট, মাই ফাদার ইজ আ শেমলেস পার্সন, কী করে তার মতো একটা এজেড পার্সন মেয়ের বয়সী একটা মেয়েকে নিয়ে ঘরে দরজা দেয়, আমরা, আমি আর আমার দুই ভাই টমাস ও আর্থার তখন বাইরে দাঁড়িয়ে, ওরা বালক, ওরা জানে ওদের বাবা একটা উইচের কবলে পড়ে গেছে, সি ইজ আ হোর, আমাদের সামনেই বাবার সঙ্গে যা করে, ওহ্ গড, আমি কী করব, আমি তো সুইসাইড করব ভেবেছিলাম, ইউ সেভড মি দিজ টাইম, কিন্তু আমি করব, করবই।

মধু কিছু বলে নি। বুঝতে পারছিল হেনরিয়েটা বড় হয়ে গেছে। তিন বছর আগের বালিকাটি আর নেই। বুঝতে পারছিল হেনরিয়েটার ভিতর বিদ্বেষ জন্মেছে তার সৎ মায়ের প্রতি। যা বলছিল অ্যামেলিয়া হেনরিয়েটা সাফাইয়াই, মধু শুনছিল। শুনছিল, হেনরিয়েটা একটা গাছের বিষাক্ত বীজ সংগ্রহ করে ফেলেছে তাদের মেড-সার্ভেন্টকে দিয়ে। আর একটু বাদে, প্রেয়ার টাইম শেষ হলে সে ওটা খেয়ে ফেলত। মধু সেই বিষাক্ত বীজের মোড়কটি কেড়ে নিয়েছিল হেনরিয়েটার কাছ থেকে।

সেই হল অন্তরঙ্গতার শুরু। মিঃ হোয়াইট এবং তাঁর স্ত্রীর অসম্মতি ছিল না মেলামেশায়। তারা তো মেয়েটিকে গা থেকে কীটপতঙ্গের মত ঝেড়ে ফেলতে চায়। সেই হেনরিয়েটা আর বিবাহিত কৃষ্ণাঙ্গ মাইকেল এম. ডাট নিয়ে কথা উঠতে লাগল। রেবেকার কোলে তখন তিন সন্তান, একটি হয়ত ভ্রূণ হয়েও। মার্থা বড় হয়ে উঠছে। কী ঝড়ের দিন গেছে তখন। একদিন আচমকা তাদের বাংলো বাড়িতে হেনরিয়েটা বলে উঠল, আয়াম ইন লাভ মিঃ ডাট, ও গড, আয়াম ইন লাভ।

হু ইজ দ্যাট লাকি পার্সন? মধু জিজ্ঞেস করেছিল।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে দুজনে মুখোমুখি। লং স্কার্ট আর ব্লাউজ, মাথার সোনালি চুলের গোড়ায় একটি লাল রিবন। হেনরিয়েটা মাথা নামিয়ে বসে আছে। তখন বর্ষা গিয়ে সবদিকে কেমন প্রশান্তি। মধু আবার জিজ্ঞেস করেছিল, হু ইজ হি?

হি ইজ আ স্পেশাল পার্সন।

তুমি যখন তার প্রেমে পড়েছ, হি মাস্ট বি আ স্পেশাল পার্সন, সে কি আর্মিতে আছে?

নো মিঃ মাইকেল, হি ইজ আ সিভিলিয়ান।

তখন মধুসূদন জিজ্ঞেস করেছিল, আ ব্রিটিশ?

ডিয়ার মিঃ ডাট, হোয়াই ডু ইউ কাম হিয়ার এভরি ডে? আচমকা জিজ্ঞেস করে উঠেছিল হেনরিয়েটা, তুমি আমার কাছে আস কেন?

এমনি আসি, ইউ আর আ নাইস লেডি, তুমি লেডি হয়ে উঠছ দিনে দিনে, বিউটিফুল লেডি।

রেবেকার চেয়েও?

কী বলছ?

বলছি তোমার বউ-এর চেয়েও সুন্দর?

তুমি তোমার মতো সুন্দর হেনরিয়েটা।

নো নো, প্লিজ টেল মি, হু ইজ বিউটিফুল, রেবেকা অর মি।

ইউ, ইউ অ্যান্ড ইউ, তুমি পরির মতো সুন্দর।

ও মধু, আই লাভ ইউ, আয়াম ইন লাভ অফ মাইকেল এম ডাট, আই লাভ ইউ লাভ ইউ, ওহ্ গড, আই অ্যাম ইন লাভ।

বাষট্টি

হেনরিয়েটার সব মনে আছে। মধুসূদন সরতেও চেয়েছিল, তাকে বুঝিয়েছিল। সে এক বিবাহিত পুরুষ, হেনরিয়েটা কেন তাকে ভালবাসবে। রেবেকা কখনোই ডিভোর্স দেবে না, এক সঙ্গে দুই স্ত্রীর কথাও বলেছিল মধু রেবেকাকে। হেনরিয়েটা তার দাসীর

মতো থাকবে। তার মা বেঁচে থাকতে বাবা রাজনারায়ণ আরো দুটি বিবাহ করেছেন জেনেছে মধু। ভারতবর্ষে এমন ঘটে থাকে। প্রথম স্ত্রী হিসেবে রেবেকা অনুমতি দিলেই হবে। রেবেকা দেয় নি। বরং তার নাবালক সন্তানগুলি নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবেও ফুঁসে উঠেছিল। তারপর তো মধুর পিতৃবিয়োগ, কলকাতায় ফিরে আর মাদ্রাজে না যাওয়া।

হেনরিয়েটা তুমি মাদ্রাজের কথা সবই ভুলে গেছ?

হেনরিয়েটা ঃ আমার মনে পড়ে কবি তোমার কপোতাকসোর কথা, তুমি যে ছবি আঁকিয়াছিলে তোমার কবিতায়।

তুমি রেবেকার কথা ভুলে গেছে হেনরিয়েটা?

কপোতাকসো নদের কথা তোমার মনে পড়ে না কবি?

তোমার মনে আছে হেনরিয়েটা? কবির পাণ্ডুর মুখে আলো ফুটল বুঝি।

তোমার কত লেখা আমার মনে আছে মাই ডিয়ার পোয়েট!

কপোতাক্ষর কথা শোনাও দেখি। কবির চোখ মুখে প্রত্যাশা ফোটে। চুপ করে তাকিয়ে থাকেন হেনরিয়েটার দিকে। হেনরিয়েটার দু চোখ বোঁজা, মুখের উপর কালো ছায়া। দম আটকে আছে যেন সে। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। গঙ্গাতীরেও বাতাস বুঝি অপ্রতুল। ওই দেখা যায় মা জাহ্নবীর আর এক রূপ, প্রাণদায়িনী গঙ্গা, তার ভিতরে কি কপোতাক্ষর জল নেই? গঙ্গার উপরে বর্ষার মেঘ, সাড়া পড়েছে প্রকৃতি ও প্রাণের ভিতর। গাঁয়ে গাঁয়ে ডাক এসেছে মাটির। বীজ বপনে এস মানুষ।

হেনরিয়েটা তখন ধীরে ধীরে উচ্চারণ করছিল,

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
....
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপি তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে!
আর কি হবে দেখা?—যত দিন যাবে,

বলতে বলতে হেনরিয়েটার গলা বুঁজে আসতে লাগল। শ্বাস নিতে লাগল জোরে জোরে। থেমে গেল সে।

'তোমার কষ্ট হচ্ছে হেনরিয়েটা?' কবি ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করেন।

হেনরিয়েটা মাথা নাড়ল, না কবি, সবটা মনে পড়ছে না, আর তুমি ভাল থাকলে আমি ভাল থাকি প্রিয়তম।

আমার সেই কপোতাক্ষর দেশে এত ফসল, এত ধান্য, কলাই, এত ফল-ফলারি, এবার আম হয়েছিল অনেক অনেক, আমার জন্মভূমি আম ধান নারিকেলের দেশ, এ দেশে এত নদী, স্রোতোস্বিনী, রূপালি মৎস্য খেলা করে সেখানে, নদী-জলের শস্য তা, নদীতীর কত সবুজ, সবই আমাদের শাকান্ন, ভাবি নি অন্নের অভাবে ক্রন্দন করবে আমার সন্তান।

হেনরিয়েটা ঃ থাক কবি, সবাই অন্ন পাবে, কবি তুমিই আমাদের অন্ন, অন্ন, অন্ন, ধান্য, নারিকেল, অমৃতফল।

'আমাকে গোপন করলে কী হবে প্রিয়া, এখন ধান্য রোপনের কাল, বর্ষা সমাগত, আমি দেখতে পাচ্ছি মাটি ধারণ করেছে ফসলের বীজ, এই ফসল পাকার কালে, সামনের হেমন্তে নবান্নে আমাদের অন্নাভাব ঘুঁচবে, আমার সন্তান আবার থাকবে দুধে ভাতে।' ধীরে ধীরে কবি বললেন।

অন্নহীন চাষা যেন বসে ছিল বর্ষার মেঘের দিকে চেয়ে। তার কণ্ঠস্বর শুনতে পায় বুঝি হেনরিয়েটা। চাষা তার সন্তানের জননীর চোখে মায়া-কাজল এঁকে দিচ্ছিল ক্রমাগত।

কবির স্বপ্ন সত্য হবে কবি। হেনরিয়েটা বলেছিল।

আমি তুমি ফসলের ক্ষেতে নেমে যাব আমাদের সন্তানদের নিয়ে, হেনরিয়েটা হেমন্তের শস্য ক্ষেত্রের কী অপার সৌন্দর্য, সে যেন কাব্য সরস্বতীর আর এক রূপ, লক্ষ্মী সরস্বতী একাকার হয়ে যায় হেমন্তের পূর্ণতায়, খর্জুর বৃক্ষ রসবতী হয়ে ওঠে, মা জাহ্নবী সমস্তদিন ধরে পরমান্ন রাঁধেন, পিঠে-পুলি করেন কত রাত জেগে। সবই সন্তানের জন্য। তুমিও তেমনি হয়ে উঠবে হেনরিয়েটা।

হেনরিয়েটা ঃ তোমার কথায় আমার ভিতরে কল্পনা জন্ম নেয় কবি।

তোমার কি সত্যই মনে নেই আর এক হতভাগিনীর কথা?

হেনরিয়েটা ঃ মনে করিলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে কবি, সে যদি আমাকে গ্রহণ করিত, জীবন অন্য রকম হইত হয়ত, তুমি তাহাকে এখনো মনে রাখিয়াছ, তাহার কথা ভাব কবি?

না, এখনই মনে এল সে, মনে পড়ে সেই সমুদ্র প্রমাণ তৃষ্ণার কথা, মার্থা, ফিবি তাদের মা রেবেকা, রেবেকার কান্না আমি টের পাই হেনরিয়েটা।

হেনরিয়েটা ঃ তুমি কি বিদায়ঘাটের কথা ভুলিয়াছ কবি, রিভার কপোতাকসো?

উত্তরপাড়ার গঙ্গার ধারে বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লাইব্রেরি ঘরে পীড়িত স্বামী স্ত্রী, হেনরিয়েটার কথায় মধুসূদন মাথা নামিয়ে থাকে। শীর্ণ দেহ, সর্বাঙ্গে মরণের ছায়া ঘনিয়েছে দুজনের ভিতর। অভুক্ত সন্তান দুটির মলিন মুখের দিকে মধু তাকাতে পারে না। বিদায়ঘাটের কথা বলে হেনরিয়েটা চুপ। সমস্ত দেহ জুড়ে মৃত্যু যন্ত্রণা নেমেছে তা টের পেয়ে গেছে হেনরিয়েটা। কত আর সহ্য করবে এ দেহ, কিন্তু তার কিছু হলে কে

দেখবে কবিকে? ওই যে রোগ শয্যায় শায়িত কবি বিনবিন করে মহাকবিকে স্মরণ করছে,

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death, Out, out, brief candle!
হেনরিয়েটা বলে ওঠে, ম্যাকবেথ, ম্যাকবেথ।
মধুসূদন বিড়বিড় করছিল ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে,
Life's but a walking shadow;....
....it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
signifying nothing.

কবির অন্ন ছিল না। অভাব হয়েছিল। অথচ অন্নই প্রাণ, অন্নই জীবন, এই সামান্য জীবন। অন্নই কাব্য, সরস্বতী, রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি, বাল্মিকী, দান্তে, বায়রন, মিল্টন। সে কেমন অভাব? মধুর মৃত্যুর সত্তর বছর পরে ৪৩-এর মন্বন্তরে যে অভাবে মরেছিল মানুষ, সেই অভাব। ফ্যান দে মা, ফ্যান দে... ''দেশে উঠলো হাহাকার...ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কি আইল দেশে পুনর্বার?"

মন্বন্তরের ক্ষুধা আর তৃষ্ণা নিয়ে গেল কবি আর তার আগে হেনরিয়েটা। আগামী হেমন্তে যে নবান্ন হবে, সেই নবান্নের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গেল তারা।

মধু ছিল তখন আলিপুর জেনারেল হাসপাতাল—দাতব্য চিকিৎসালয়ে। উত্তরপাড়া থেকে তাকে আনা হয়েছিল শেষ দিন কয়েকটির জন্য। শেষ চিকিৎসা। যদি বাঁচেন কবি। কবির যাওয়ার তিনদিন আগে গেল হেনরিয়েটা হতভাগিনী, মধুর জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখের ভাগিনী।

তিনদিন বাদে মধুকবি গেল। আবার বিদায় নিল কবি মধুসূদন। ফিরে গেল তার স্রষ্টার কাছে। কলকাতা তার বিদায় ঘাট হলো মধ্য আষাঢ়ের এক দ্বিপ্রহরে। খ্রিস্টান মধুকে কবরের জায়গা দিতে চায় নি তাদের পুরোহিত পন্ডিতরা। ২৪ ঘণ্টা মর্গে পচেছে কবির দেহ। তারপর গতি করেন এক সাহসী ধর্মযাজক, বড় ধর্মগুরুর অনুমতি ব্যতীত মধুকে মাটি দিতে উদ্যোগী হলেন।

তখন বাপু হয়তো ছিলেন না। ছিলেনও হয়তো। জাতকের মতো কত জন্ম তাঁর। শেষ হলো এই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধিতে। নাকি শেষ হয় নি তাঁর জন্মান্তর। শুনতে

শুনতে কত রাত। পিয়াসা সেই পশ্চিমের শহর থেকে বলে, বাবা, তোমার কথা সব ধরতে পারি আবার পারিও না, রাত হলো বাবা, এবার তুমি শুতে যাও, কাল আবার কথা হবে, বাপুর কথা শুনব আরো।

ঘন অন্ধকারে অমিতাভ পৌঁছল পন্ডিতজির সঙ্গে যমুনার তীরে, তখন বাপু সেখানে নেই। কোথায় বাপু?

যমুনার বালুচর ভেঙে উঠে এল এক বুড়ো, শত শত বছর হয়ে গেছে বুঝি তার, মুখমন্ডলে যে বলিরেখা তার গায়ে বুঝি শতবর্ষের নানা চিহ্ন। হাতে একটি দোতারা, টুংটাং করছিল সে তার বাদ্য যন্ত্রে, তার কাজ বাপুর আশ্রয় পাহারা দেওয়া, বলল বাপু নেই।

বাপু নেই. বাপু গেছেন পাকিস্তান, দাঙ্গা থামিয়ে আসবেন সুরাত, সুরাত থেকে যাবেন বিহার, ভাগলপুর, রায়ট হচ্ছে মানুষ মরছে। ভাগলপুর থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল, রিফিউজি ক্যাম্পে ক্যাম্পে, শিয়ালদা বনগাঁ স্টেশনে, মানুষ সেখানে কাঁদছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে ইস্ট বেঙ্গল—, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, রায়ট চলছেই। মানুষ মরছে। যাবেন কাশ্মিরের এপার ওপার, রাওয়ালপিন্ডি, পেশোয়ার লাহোর। লাঠি হাতে বুড়ো ফকির হাঁটা থামাতে পারেন নি, তাঁকে যেতে হচ্ছেই। এত পুলিশ মিলিটারি, নেতা, মন্ত্রী আমলা—কারোর ক্ষমতা নেই রায়ট থামায়। বুড়ো ফকির এলে থামবে। তাঁর কোনো বিশ্রাম নেই। সমাধি ফেলে রেখে, যমুনায় অবগাহন করে বাপু পথে নেমেছেন। তারপর কতদিন কতবার যমুনার তীরে তাঁর সমাধিতে গেছে অমিতাভ, তিনি নেই। কোথায়? তিনি গেছেন উত্তর প্রদেশের গাঁয়ে, দলিত মরেছে, আবার মরবে, বাপু গিয়ে দাঁড়ালেই তারা বাঁচবে। বিহারের ভোজপুরে গেছেন, কুয়োর জল নিয়ে দাঙ্গায় মরেছে পাঁচটা চামার, তিনটে মেয়ে লুট করে নিয়ে গেছে রাজপুতরা। ধর্ষণ করে ফেলে গেছে দুই মা জননীকে। বাপু সেখেনে গেছেন। বাপু গেছেন মানচিত্রের রেখা ধরে ধরে। চামার, দুসাদ, হরিজন পল্লীতে পল্লীতে, গরিব মুসলমান হিন্দুর কুটিরে কুটিরে। নিরন্ন আদিবাসী গাঁয়ে। পেশোয়ারে, লাহোরে, সিন্ধু প্রদেশে...আর্ত মানুষের কুটিরে কুটিরে, পাহাড়ে পর্বতে, অরণ্যে, মানুষ ভয়ে লুকিয়ে আছে যেথায়।

বাবা তুমি সত্যি বলছ, বাবা? পিয়াসা মেল পাঠিয়েছিল।

বাপুর নামে মিথ্যে বলব, যতবার রাজঘাটে গেছি, বাপুকে পাইনি, তিনি বেরিয়ে গেছেন।

বাবা, তারপর?

তারপর! শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেছে সেই বউ-এর। বিস্ফোরণে তার স্বামী মরেছে তিনদিন আগের সন্ধেয়। মুম্বই-এর হিরের বাজারে হিরের কারিগর ছিল সে। ফিরেছিল মাত্র ক'দিন আগে। বিনবিন কান্না শুরু হলো আবার। স্বামীর দেহ আনতে যাচ্ছে সে

মুম্বই। অমিতাভ রায় মাথা নামিয়ে আছে। মেল আর আসছে না। পিয়াসা আর অনলাভর মেল আসা শেষ হয়ে গেছে তিনদিন আগে। তিনি লিখেছিলেন, 'বাপু আছেন তাই সব এখনো টিকে আছে পিয়াসা।'

জবাব পান নি। তারা তখন হিরের বাজারে। সমীক্ষা করছিল কারিগরদের নিয়ে। তারপরই তো টিভিতে মুম্বই-এর অন্ধকার, জাভেরি মার্কেটের অন্ধকার। কান্না সংক্রামক। অন্ধকারে এই স্পেশাল বগির আর কোথাও কেউ কাঁদতে শুরু করল। অমিতাভ উঠলেন। বাপু উঠলেন। বাপু চোখ মুছলেন। বাপু মনে মনে কোরাণের এক সূরা উচ্চারণ করলেন। রঘুপতি রাঘব রাজা রাম বিনবিন করলেন। আবার চোখ মুছলেন। আমেন ! অন্ধকারে ছেয়ে থাকা অখণ্ড ভারতবর্ষের দিকে চেয়ে থাকলেন তিনি।

(এই উপন্যাসে কবি মদুসূদন, মানকুমারী বসু, সেক্সপীয়র এবং
হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কবিতা, গান ব্যবহার করা হয়েছে)